কিশলয় ঠাকুর

পথের কবি

পথের কবি

কিশলয় ঠাকুর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

॥ এই বই নিয়ে ॥

ভূমিকা? যদি হয়, তবে এটা একটা অদ্ভুত ভূমিকা। এমন ভূমিকা, যার ভূমিই নেই। না থাক, তবু দৃশ্য আছে, রৌদ্র, রূপ, গন্ধ, রস—সব আছে। বইয়ের নাম "পথের কবি"। কবির নাম বিভূতিভূষণ।

"পথের কবি"—এই কথাটা শব্দ দিয়ে কাছাকাছিই যিনি গাঁথেন (যিনি কবি তিনিই তো সাথী, এই অর্থে), সেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কিন্তু এই নামটা কখনও দেননি। বরং তাঁকে বারংবার নমস্কার জানিয়েছেন। আজ হঠাৎ মনে হল, সেই কবি বিভূতিভূষণও তো হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ কোনও স্রষ্টাকে নিশ্চয় প্রণতি জানিয়েছেন, তবু যিনি আসেননি, অথচ ধ্রুব আসবেন, তাঁর প্রতি তাঁর নমস্কার কখন যেন তাঁরই অজানিতে সবে যিনি এলেন, তাঁরই প্রতি নিবেদিত হয়ে গেছে।

না হয়ে উপায় ছিল না। মহৎ মহৎকেই চিহ্ন দেখে চিনে নেয়। অতএব তাঁর জীবনের ক্লান্ত ঘণ্টায় যে পাঁচালীকার এলেন, তাঁকে সুস্বাগত না জানিয়ে পিতৃপ্রতিম কবির উপায় ছিল না। কারণ নিজে সমস্ত জীবন ধরে ভাঙা পথের রাঙা ধুলো যে অবিরত উড়িয়েছেন! স্থিত থেকেও অস্থিত। শুধু গান "নিশীথে কী কয়ে গেল মনে"? কে কাকে কী বলে যায়? "বলে মোরে, চলো দূরে"।

এই চলো-চলো-চলো চলো যাই সত্যের ছন্দে, কিংবা চরৈবেতি মন্ত্রটি তাঁর নিজের জীবনে যেমন, বিভূতিভূষণেব রচনা এবং পথ-পরিক্রমার মধ্যে অবশ্যই আভাসিত হয়েছে তিনি দেখে থাকবেন। আজ এই কথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে, রবীন্দ্র-নাথের সগোত্র, তাঁবই ধারার অনুসারী আর একটি লেখকের কথা যদি লিখিত হয়, তবে একমাত্র নামটি বিভূতিভূষণ।

কোথায় যেন মিল! এই প্রাত্যহিকতার ধূলিমলিন জীবনের বাইরে, অনেক উপরে শিল্পকে স্থাপন করার কীর্তি (কয়েকজন কবিকে বাদ দিলে) খালি বিভূতিবাবুর। এখানে তিনি তাঁর পূর্বসূরীর সঙ্গী, এখানে রবীন্দ্রনাথ আর বিভূতিভূষণ পাশাপাশি।

হয়তো পরবর্তী বলেই গল্পগুচ্ছের, ছিন্নপত্রের আর চৈতালির কবি যতদূর গিয়ে-ছিলেন, বিভূতিভূষণ তার চেয়েও অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর এবং যশোর চব্বিশ পরগনা নদীয়ার মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব সামান্যই। ভূপ্রকৃতিও এক। আর মানুষ? তাদের কষ্ট, তাদের দারিদ্র্য, এক—এক—এক। সেই মানুষদেরও হাজির করেছেন বিভূতিভূষণ। অনাহার চিরকালের শিল্পের আহার বা আহরণ হয়ে গেছে। প্রেম, অপ্রেম, সবই। দুজনেই যা সুন্দর, যা শোভমান, তাকে খুব উপরে, সব ছাপিয়ে জায়গা দিতেন। সেই জন্যে দুঃখের একটা মেঘে-ছাওয়া আকাশ চোখে পড়ে। তবে তার বিকৃত বীভৎস আকার তেমন আবির্ভূত হয় না। অথচ তাদের বোঁঝা যায়, ছোঁয়া যায়। কিন্তু উত্তরণ? সেটা পূর্বসূরীর মতো উত্তরসূরী বিভূতি-ভূষণেরও নিজস্ব।

কিন্তু ওই যে বলেছিলাম না, তিনি এগিয়ে গেছেন? যেভাবে একটা মশাল থেকে আর একটা মশাল জ্বালিয়ে কেউ অগ্রসর হয়—এ সেই অগ্রগামিতা। উৎসের স্রোতকে সমতলের ধারাতে শুধু অব্যাহত রাখা নয়, যেন আরও বিস্তীর্ণ, আরও উদার করে দেওয়া।

বিভূতিভূষণ নইলে আমরা কালকাসুন্দি, ঘেঁটু, পুঁই, মুথাঘাস, কাশ, শরবন, শালুক, শ্যাওলা, ডুমুর, চালতা, গোলগুঁ, হেলেঞ্চা, কলমি প্রভৃতির সবুজে যে এত রঙ, এত মনোরম সুবাস, তা কোনও দিন জানতে পেতাম কি? মহাকবি তো "নাম-না-জানা তৃণকুসুম" বলেই ক্ষান্তি দেন। তাদের নামে নামে চিহ্নিত করলেন বিভূতিবাবু। রঙ আর গন্ধকে শব্দে শব্দে, বর্ণে বর্ণে চোখের সমুখে উপস্থিত করলেন। সেই শব্দ রূপবান হল। তারা অকাতর বাসও বিলোতে থাকল। শব্দেরও যে ঘ্রাণ আছে, আমরা জানলাম, পেলাম, বুক ভরে নিলাম।

আর অরণ্য? বিভূতিভূষণের অরণ্য কোনও শৌখিন সাফারির আলতো ভালো লাগা নয়। এই নীল অরণ্য দূর হতে শিহরে না। একেবারে কাছে আসে, তার পত্রপ্রচ্ছায়, তার ভয়ংকর সত্তা দিয়ে আমাদের আবৃত করে, আমাদের মধ্যে মিশে যায়। তাঁর বন বড়ো ঘন, বড়ো ভীষণ এবং বড়োই সত্য।

বাউলের স্বভাব তাঁর। পথের কবি হিসেবে তিনি শুধু দেখেছেন। না, ভুল হল। মাখামাখি হয়ে গেছেন। জগতে যত প্রাণ উদ্ভিজ্জ এবং স্থাণু, যত প্রাণ সঞ্চরণশীল এবং সরব, তাদের সমবেত সংগীত শুনিয়েছেন তিনি। অস্থির অথচ সরল, স্থিত কিন্তু সন্ধানী, এমন কোনও শিল্পীর নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে যদি থাকে, তবে তিনি বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে, অন্তত আমাদের কাছে হেমিংওয়ে তুলনীয় তো বটেনই, উপরন্তু বিদেশী ওই মহৎ লেখকও যেন বিভূতিভূষণের কাছে ঈষৎ সুদূর ধূসর হয়ে যান।

নিসর্গের সঙ্গে সৃষ্টির যা অন্যতম প্রধান উপাদান, সেই নারীকেও তিনি অবহেলা করেননি। সন্ধান, শুধু সন্ধান। প্রাপ্তি আর বঞ্চনার ফিরিস্তি দিতে গেলে তাঁর সত্তাকে ছোট করা হবে। তবু জিজ্ঞাসা থাকে। বিশেষ বিশেষ রমণী-কমনী, কে, কে, আর কে? তাঁদের প্রভা যেন সব ঢেকে দেয়, কেউ কেউ রেণু হয়ে ঝিকমিক করে। অবশেষে একটি কল্যাণীহস্ত সব-কিছুর আধার আর আবরণ হয়।

এই গ্রন্থে সমস্তই আছে। উদার প্রান্তর, গহন বন আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ শস্য-শষ্প-কুসুমাদি। আর তাঁর জীবনের সমুদয় অন্বেষণাও। নারী, প্রকৃতি। রূপ-রসের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ আর মোহ মিলিয়ে এক-একজন শিল্পী যেভাবে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেন, তারই কাহিনী। অকালে প্রয়াত হয়েও তিনি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন বলেই তো আমাদের আজও পূর্ণ করে দিচ্ছেন। সারা জীবন তিল তিল অক্লান্ত আহরণ করে যিনি তিলোত্তম, "পথের কবি" তারই পরিশ্রমী আলেখ্য। একটি শিল্পীর জন-জীবন আর মনোজীবনের এমন মরমী পরিচয় খুব বেশি জীবন-বৃত্তান্তে পাইনি। লেখককে আমার ঈর্ষা, লেখককে আমার অভিনন্দন।

আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয়। কলকাতা

সন্তোষকুমার ঘোষ

॥ অশ্রুর অর্ঘ্য ॥

শ্রীযুক্ত কিশলয় ঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় বহু দিনের। আমার পরম গুরু স্বর্গীয় বিভূতিভূষণের তিনি পরম অনুরাগী। বিভূতিভূষণের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী রচনায় তিনি ব্রতী হন। আর সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের পরিচয়। সেই পরিচয় পরবর্তীকালে আত্মীয়তার মতো হয়েছে।

তিনি কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের জীবনকাহিনী যে-ভাবে সাজিয়েছেন, তার পিছনে রয়েছে একই সঙ্গে প্রচণ্ড কায়িক এবং মানসিক শ্রম। বিভূতিভূষণের জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি জায়গায় তিনি নিজে গিয়েছেন, প্রত্যেকটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের মুখ থেকে তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সম্ভবপর সকল উপায়ে তা যাচাই করেছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর যে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি মুগ্ধ, অভিভূত।

আজ তাঁর সেই সুদীর্ঘ সাধনার ফল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'ল। আমার স্বামীর জীবন-স্মৃতির আকর এই পরম আদরণীয় গ্রন্থখানির জন্মলগ্নে আমি আমার অশ্রুর অর্ঘ্য উপহার দিলাম গ্রন্থকারকে। এ-ছাড়া দেবার আমার আর কী-ই বা আছে।

আরণ্যক
ব্যারাকপুর

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ নিবেদন ॥

'তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।' তন্ময় আমি তাঁকে খুঁজে ফিরি তাঁর সৃষ্টিতে, স্মৃতিতে।

আত্মকথা লিখে যাননি বিভূতিভূষণ। রেখে যা গেছেন, সে-সম্পর্কে শনিবারের চিঠির বিভূতি-সংখ্যায় সজনীকান্তর কথা—'তিনি স্বীয় জীবনের সত্য-মিথ্যা ঘটনা লইয়া এমন জট পাকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, জট খুলিয়া সত্য-মিথ্যা বাছাই করিয়া একটা পাকা, নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে।...জট-পাকানোর উপমা বোধহয় ঠিক হইল না, সমস্ত ব্যাপারটাকে বিভূতিভূষণ ঘুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।'

আমার দ্বিগুণ হল উদ্দীপনা। তন্নিষ্ঠ হলে স্বরূপে তাঁকে পাবোই। বিভূতি-জীবনকথা নানারঙে ছড়ানো তাঁর সাহিত্যে। সে-সবের ছক আর উৎস মেলে তাঁর নোট-বুকে। আর আছে তাঁর দিনলিপির আশ্চর্য ভাণ্ডার। অনেক পাতা অবশ্য উড়ে গেছে জীবনের ঝড়ে।

সন্ধান পাই বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দর ডায়েরি-পুঁথির, পুত্রও যার সবটা ঘেঁটে দেখেন নি। সব মেলালে সূত্র মেলে। তবে ছেঁড়েও সুতো মাঝে মাঝে। যোগসূত্র রচনায় তাই বিচরণ করি পথের কবির পদচিহ্ন ধরে। অন্তরঙ্গরা উজাড় করে দিয়েছেন উপাদান, স্মৃতি-উপহার। সজনীকান্তর সাক্ষ্য, তারাশঙ্করের তথ্য, নীরদ চৌধুরীর নিশিত বিশ্লেষণ বা গজেনবাবুর অনবদ্য গুছিয়ে বলার সঙ্গে পাঁচি-পুঁটিদি-আশালতার স্মৃতি, এরসাদ-আফজল-ফটিকের অফুরন্ত আবেগ—কতজনের দানে ধন্য আমি। সাহায্য পেয়েছি বিভূতিভূষণের সহচর সুধী, সাহিত্যিকদের রচনা থেকেও। নানা পত্রপুস্তকের মধ্যে কথাসাহিত্য, শনিবারের চিঠি এবং আনন্দবাজার পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সাহায্য পেয়েছি বিভূতিভূষণের অগণিত অলেখক আপনজনের অনেক কথায়। তবে সবার সব কথা রাখতে পারিনি। নির্বাচনে স্মৃতি এবং দলিল-প্রমাণে সাহায্য পেয়েছি বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা দেবী, শ্যালক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের। কাহিনীবিন্যাসে স্মৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নরনারীর নাম এবং পুঁথি-পত্রের উদ্ধৃতির সমর্থন রেখেছি সাধ্যমত। তবু স্বীকার করি, বিভূতিমণ্ডলে আমার দীর্ঘবিচরণজাত আবেশানুভূতি এড়াতে পারিনি। গ্রন্থ কি কেবল গ্রন্থনা? তাঁর জগৎ এবং জীবন নিয়েই এই জীবনায়ন।

এ-কাজে প্রথম থেকে সন্তোষকুমার ঘোষের উৎসাহ আমার অন্যতম সম্বল।

সহযোগিতা পেয়েছি অনেকের। সাংবাদিক সুধাংশু দে এবং রঞ্জন ভাদুড়ী সাহায্য করেছেন প্রুফ এবং কপি দেখায়। তবু বই লেখা এবং প্রকাশের মধ্যে প্রায় এক যুগের ব্যবধান ঘটল।

দশ বছর আগে লেখা শেষ। সঙ্গে সঙ্গেই এক চক্রাবর্তে পাণ্ডুলিপি বন্দী। আট-বছর পরে, আমার আনন্দবাজার পত্রিকার সহকর্মী সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্তর সন্ধানী ও সাহসী প্রয়াসে উদ্ধার পায় ক্ষত-বিক্ষত পাণ্ডুলিপি। এত ঋণে ঋণী আমি, ধন্য এত দানে। সব নিয়ে এই 'পথের কবি' রচনা। এ-বই প্রকাশ আমার বিভূতিপ্রণাম।

কিশলয় ঠাকুর

পিতৃদেব শ্রীপ্রসন্ন ঠাকুর

ও

মাতৃদেবী চিন্তামণি দেবীর

স্মৃতির উদ্দেশে

॥ এক ॥

পথ এখানে সবুজের সমুদ্রে হারা। এখনও হয়ত এক কিশোর কঞ্চিহাতে এর মাঝে অবিরাম ঘুরে বেড়ায়। হারিয়ে যায় বনধুঁদুলের আড়ালে, উলটি-বাঁচরা-বৈঁচি ঝোপের জটলায়। তার লুকোচুরি বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে, আম-বকুল আর সাঁইবাবলার শ্যাম ছায়ায়। সে যেন এই বনস্থলীর সবুজ আত্মার প্রতীক। তাকে ঘিরেই ঋতুতে ঋতুতে বনপুষ্পের মহোৎসব।

তার অঙ্গে অঙ্গে ঘেঁটুফুল আর সোঁদালির সৌরভ। এখানে ঝোপে-ঝাড়ে আতরের গন্ধ ছড়ায় কণ্টিকারি, নাটাকাঁটার ফুল। প্রান্তরে তার ভেদলা ঘাসের সাদা চুমকি-বোনা শষ্পাস্তরণ। পথে পথে কাকজঙ্ঘার লাল আবির, এড়াঞ্চির শুভ্রাঞ্জলি, বনশিমুলের বেগুনে বাহার, তিৎপল্লার হলদে আভা, মাখমসিমের বিচিত্র বর্ণালী। কাকলীমুখর সে বনস্থলীর ঐকতানে মিলে যায় ছোট্ট নদী ইছামতীর কলতান।

বারাকপুরের শ্যামরসে বিভোর সে কিশোর ভাবে আর ভাবে। একদিন, তার পিতামহর কালে, ছিল এখানে কত মানব-মানবীর বিচিত্র জীবনোদ্‌যাপন। তাঁদেরই আনন্দ-বেদনার স্মারক এই কুসুমিত বনকুঞ্জ। তাঁদেরই স্বপ্ন নিয়ে আকাশ আজও তিসির ফুলের মত নীল।

পোঁটলা-পুঁটুলি, হামানদিস্তা আর চরক-সুশ্রুত-মাধব নিদানের বানডিল বগলে পিতামহ কবিরাজ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, একদা এখানে এসে দাঁড়ালেন। না, আর হন্যে হয়ে ঘোরা নয়। লক্ষ্মী যদি ধরা দেন, এখানেই দেবেন। চব্বিশ পরগনার পানিতরের পাট তুলে যশোহরের বনগ্রাম মহকুমার এই গোপালনগর-বারাকপুরেরই বাসিন্দা হলেন।

হাঁ, বারাকপুরের জেলা এখন চব্বিশ পরগনা; কিন্তু তখন যশোহরই। এবং যে-কালের কথা, ঠিক তার কিছুকাল আগে ছিল নদীয়ার মধ্যে। আঠারশ' তেষট্টিতে গোটা বনগ্রাম মহকুমাই নদীয়া থেকে যশোহরে জেলান্তরিত হয়।

বাঙলাদেশময় তখন নীলকর সাহেবদের প্রায় সাড়ে তিনশ' কুঠিবাড়ি। ইছামতীর তীর বরাবরই তার দপদপিটা বেশি। দু'পার ধরে নীলের চাষ আর কুঠিয়ালদের কর্মকাণ্ড। বারাকপুর, নিশ্চিন্দিপুর, জয়পুর, দেবীতিয়া দুর্গাপুর, শিমুলিয়া, শাহী-বাজার, শিলহাটি, মোল্লাহাটি—কত কুঠি। মোট প্রায় সতেরটি কুঠি এ তল্লাটে। আর বারাকপুরের কাছে মোল্লাহাটি সদর দফতর। একে কেন্দ্র করেই দু' লাখের বেশি মানুষের বসবাস। যেন একটা আলাদা ঘন জেলা।

প্রকাণ্ড সব গভীর বাঁধানো খাল, ওরা বলে হৌস। পাশে বিরাট বিরাট চুল্লি। বক্রিপাড়ার বুনো সর্দার আর মুচি, ডোম, বাগদিরা দিন-রাত নীলের জারক করছে সেখানে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাজিরা পড়বে নায়েব, আমিন, দেওয়ানদের। দোর্দণ্ড-প্রতাপ কুঠিয়াল সাহেবরা ঘুমজড়ান চোখে হাইতুলে টলতে টলতে উঠবেন। একটু পরে চারদিক তাকাবেন। চাকর, নফর, গাবুরের সেবাবাহুল্যে চৌপায়ায় বসে তাজা হওয়া। খিদমদগার এগিয়ে দেবে জুতো, জামা, পাতলুন। এবার সাহেব বালাখানায়

গিয়ে বসবেন। মুৎসুদ্দি-মোসায়েবের দল দণ্ডবৎ। হুজুরের মেজাজ শরিফ রাখতে পাংখাওলা গলদঘর্ম। বড়, মেঝো, খুচরো, রেজগি কত সাহেব। পান থেকে চুন খসলেই—হে'ইও। বাজখাঁই গর্জন। তারপরই বালাখানায় তলব। এটাই কাছারি, এখানেই বিচার, দণ্ডমুণ্ড বিধান। দেশের শাসন তখনও ওদের সগোত্রদের হাতে। এ-নিয়ে অতএব বোঝাপড়াটা সহজেই হত। কুঠিয়াল সাহেবরাও নির্ভাবনায় যখন তখন লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপেন, টমটম হাঁকান। চাবুক বাগিয়ে গোটা তল্লাট চটিয়ে ফেরেন দাবড়ে। দাপটে দিগ্‌বিদিক গমগম।

সরগরম তখন বারাকপুরের গোপালনগর ডাকঘরও, নীলকুঠির টাকার শব্দে। এই এলাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে সরকারি সারভে বিভাগ মেজর আর. স্মিথকে দিয়ে আঁকিয়ে আলাদা এক মানচিত্র বার করে ফেললেন আঠারশ' পঞ্চাশে। তাতে মোল্লাহাটির সঙ্গে বারাকপুর-গোপালনগরের ডবডাবিটাও বোঝানো হল বিশেষ করে। ওই উত্তাপেই তখন সেখানে নিত্য-নতুন লোকের আনাগোনা, কর্মকোলাহল ছেলে নিয়ে হন্যে হয়ে ঘোরা তারিণীচরণও সেদিন আশা করেছিলেন, তাঁর হালও বদলাবে। এই প্রাচুর্যের হাওয়া তাঁকেও হয়ত ছুঁয়ে যাবে এক-আধবার। কালটাও তখন হাওয়া বদলের।

ইছামতী-লালিত সবুজসমৃদ্ধ গ্রাম এই বারাকপুর। বামুন, কায়েত আর জেলে নিয়ে প্রায় দু'শ' ঘর লোকের বাস। লোকে বলে চালকি-বারাকপুর। চালকি পাশের গ্রাম। কিন্তু ব্যারাক বা বারাক থাকলেই বারাকপুর; এ-নামের তল্লাট আরও আছে বইকি! তাই তখনকার দিনের রেওয়াজ, পাশের গ্রামের একটা বিশেষণ লাগানো। তা বলে চালকি ছাড়া কি গ্রাম নেই পাশে? সাইলেপাড়া, সুন্দরপুর, সবাইপুর, মাধবপুর, চিত্রাঙ্গপুর থেকে নিশ্চিন্দিপুর পর্যন্ত কত জনপদ। সেখানকার কয়েক হাজার মানুষের মুখ কুঠির হাসপাতালের মিকচার গিলে গিলে তেতো। মেলেচ্ছোর জল যতো সব! তার চাইতে এক ফোঁটা গঙ্গাজল বা ঠাকুরের চন্নামেরতো মুখে দিয়ে তনুত্যাগ, অনেক শান্তির অনেকের কাছে। পল্লীতে একজন ব্রাহ্মণ কবিরাজের আগমনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচলো তারা।

থরে থরে সাজানো স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, বাসকজাপ, বৃহৎবঙ্গচূর্ণ, কালোমেঘ, সোনার ফুল, সোঁদালি ফুলের গুঁড়ো, ঘেঁটুপাতার কৃমিনাশক পাচন, পদ্মগুরুচ, কেলেকোঁড়া আর নালিমূলের লতা, ক্ষেতপাপড়া, পুনর্নবা—কত কি সালসা-অরিষ্টের নির্ভেজাল ভেষজ সংগ্রহ। বারাকপুরের সবুজ থেকে প্রাণরসের অমেয় অমৃত আহরণ করেন কবিরাজ তারিণীচরণ। চারদিক থেকে রোগীর ভিড়। তিনিও যমের সঙ্গে পাঞ্জা কষেন শক্ত হাতে। চিকিৎসা তো নেহাৎ বৃত্তি নয়, এ এক ব্রত উদ্‌যাপন।

এই আদর্শই তারিণীচরণের পসার জমায়, যশ আনে, অর্থও কিঞ্চিৎ হয় বইকি! আর তারই মধ্যে একটা স্বপ্নকে নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে বার বার তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। দেখেন আর ভাবেন, নিজে আর তিনি ক'দিন? নাবালক পুত্র মহানন্দকে বুকে ধরে পড়ন্ত বেলায় পথে নামা। বিপত্নীক জীবনের স্বপ্ন-সাধ এই মহানন্দকে নিয়ে। এই তাঁর একমাত্র ভবিষ্যত। কাজের ফাঁকে ভাবতে ভাবতে ছেলেকে কাছে ডাকেন। স্বীয় সিদ্ধি-সাধনার পুঁজি-পাটা ওকেই তো বুঝিয়ে দিতে হবে।

আর মহানন্দ? যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন? বৃদ্ধ পিতা নিদান হাতে খুঁজে বেড়ান।

পুত্র তখন গলায় পদ্মবীজের মালা দুলিয়ে প্রতিবেশী কারো দাওয়ায় এক দঙ্গল নরনারীর মধ্যমণি হয়ে বসে আছে। সামনে খোলা তুলোটের পুঁথি। এটা কথকতার প্রথা। ও থেকেই পাঠ হবে এমন কোন কথা নেই। মহানন্দও তা করছে না। প্রথমে বন্দনা। একটা ছড়া ফেঁদে নিয়েছে তার জন্য।—

নমো নমঃ মহাশয় করি নিবেদন।
মম শিরে পদধূলি করুন অর্পণ॥
জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, নাইকো উপায়।
দয়া করে দয়াময় রাখিবেন পায়॥

এর পর কিছুটা ভনিতা এবং শুরু। মধু কান এবং দাশু রায়ের গান জনপ্রিয় এই অঞ্চলে। মধু কান এ-এলাকারই উলসীর লোক। দাশরথি বাইরের লোক হলেও কাজ করতেন এই নীলকুঠিতে। নীলকণ্ঠ, শ্রীধর কথকের সঙ্গে ওদের গান তখন এ-অঞ্চলের ঘরে ঘরে। তাই-ই সবাই শুনতে চায়। সে-সব গানে মিষ্টিসুরের ভিয়েন দিয়ে আশ্চর্য আসর জমায় মহানন্দ। বুড়োরা আন্দোলিত শির থামিয়ে থামিয়ে আবেগের তেহাই মারেন। যুবা-প্রৌঢ় রুদ্ধশ্বাস, মহিলাকুল বিগলিতাশ্রু। যারা শোনেনি কখনও, অবাক বনে। মহানন্দ? সে আবার কথক হল কবে? অন্যেরা বলে—না, কবরেজ তাঁর ছেলেকে শাস্তরটা পড়িয়েছেন খুব। তা না হয় হল; কিন্তু মহানন্দ তো তোতলা, গাইবে কি করে? কম বয়সে কথা একটু আটকাত ওর ঠিকই। তবে শুনতে গিয়ে হতবাক। সবই তাঁর লীলা।

তাই বলে তারিণীচরণের তো লীলা বুঝবার উপায় নেই। তাঁর একমাত্র ভবিষ্যতকে তিনি গানের সুরের মত হাওয়ায় ভেসে যেতে দেবেন কেমন করে? তিনি চান, মহানন্দ কবিরাজ হোক। গাঁয়ের পাঁচজন বলে, আধাআধি তো হয়েছেই।

আধাআধি! ক্ষুব্ধ পিতা মনে মনে ফন্দি আঁটেন, হওয়াচ্ছি তোমাকে কবি! যে রোগের যে ওষুধ।

মাত্র দেড় ক্রোশ দূরে বৈরামপুর, তখনকার দিনের এক সমৃদ্ধ গ্রাম। বৈরামপুরের রামকৃষ্ণ মুখুজ্যে ইনজিনিয়ার লোক, সরকারের উচ্চপদে আছেন। তাঁরই কন্যার জন্য প্রস্তাব। মেয়ের বড় ভাই খগেন মুখুজ্যেকে আবার রায় বাহাদুর খেতাব দিয়েছেন সরকার। বোঝা যাচ্ছে, যে-সে ঘর নয়। মেধা, বুদ্ধি, বংশকৌলীন্যের পুঁজিতে তাঁর পুত্রও হেয় নয় কোনক্রমেই। তবে সে তো পরের কথা। আগে মেয়ে দেখা হোক, মনে ধরুক, মহানন্দর বাউন্ডুলেপনা ঘুচিয়ে তাকে সংসারে বাঁধবার শক্তি আছে কিনা তাঁদের মেয়ের, বিচার হোক, তারপর তো কাজের কথা, সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব। তারিণীচরণ বৈরামপুরে পৌঁছুলেন।

কুলশীল দেখেই ক্রিয়াকর্ম করে লোকে তখনও। খগেন মুখুজ্যে বোন হেমাঙ্গিনীকে তারিণী বাঁড়ুজ্যের বিশ্লেষণী দৃষ্টির সামনে দাঁড় করালেন। তারিণীচরণ হেমাঙ্গিনীকে দেখলেন, আশীর্বাদ করলেন এবং কথা পাকা করেই ফিরে এলেন বারাকপুরে।

মহানন্দ এত কাণ্ডের বিন্দুবিসর্গ জানে না। জানার গরজও নেই। তার বলে হাতে কত কাজ! একখানা নাটক ফাঁদা চলছে নতুন। তার উপর এ-বাড়ি, ও-বাড়ি, গাঁয়ে-ভিনগাঁয়ে কথকতার ডাক, পুঁথিপাঠের নিমন্ত্রণ। ছেলের নাগাল আর পান না বুড়ো বাপ।

তক্কে তক্কে থেকে পাকড়াও করলেন পুত্রকে। মহানন্দ প্রমাদ গুনল। হুঁকোয় টান

দিতে দিতে পুত্রের অবস্থাটা আন্দাজ করতে চান তারিণীচরণ। নিজের হাতে এই মাতৃহারা সন্তানকে তিনি বড় করেছেন, শাস্ত্র পড়িয়েছেন। মহানন্দ তাঁর পুত্র এবং ছাত্র। ওর চোখের দিকে তাকালেই তাঁর ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্না সব দেখা হয়ে যায়। বৈরামপুর-ঘটিত ব্যবস্থাটির কথা নির্দেশের মত জারি করলেন তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর খড়মের শব্দ তুলে বিমূঢ় মহানন্দর সামনে থেকে কার্যান্তরে চলে গেলেন।

হেমাঙ্গিনী ঘরে এলো। এলো রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে। কৌতূহল সব কিছুতেই। সবচাইতে বেশি স্বামীর ব্যাপারে। কিন্তু সে-যুগে মেয়েরা যে-বয়সে স্বামীর ঘর করতে আসত, সেটা নেহাৎ পুতুলখেলার বয়স। পতিদেবতাটি তার নাগালের বাইবে। পথ চলতে ডাক পড়ে। হাতে থেলোহুঁকোর তামুক ধরিয়েই দাবি—একটা রগড়ের পদ শুনব। এ তল্লাটে মধু কানের গানই চলে বেশি। বনগাঁর উলসীর ঢপ-টপ্পার বিখ্যাত কবিয়াল মধুসূদন কিন্নর—সংক্ষেপে মধু কান। কেউ কেউ বলে 'সূদন'। সাগরদাঁড়ির কবি মধু থেকে নিজের পরিচয়টা আলাদা করে দিতে ভনিতায় শুধু 'সূদন' বলতেন মধু কান। নিজেকে মহানন্দ বলেন উদ্ধব শিরোমণির শিষ্য। তবু লোকের চাহিদামত গান ধরেন মধু কানের—

দেখলেম কুবুজায়, কু-বুঝায়/রাইরক্ষে কি ভাল বুঝায় সদ্য কু বুঝায়॥
যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গী/তোমার থেকে ভঙ্গী তার কিছু বুঝায়॥
দেখে এলেম এমন কু, যেমন তেপেঁচাকু/হরি হয়েছেন কু, পড়ে কুবুঝায়॥
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়/যেমন প্রেম ঘটেনা বুঝায়-অবুঝায॥
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কু-বুঝায়/সূদন যে প্রাণে যায় তারে কে বুঝায়॥

বেশ পোক্টাই হয় এ-সব গানে। মজা পেয়ে দুলতে থাকে শ্রোতারা। মহানন্দ সেই সুযোগেই হাওয়া। না হলে আবার অন্য গানের বাযনা আসবে। দিন মাটি। বাবার ভয়ে উঠতেই হয়। নয়ত এমন ছড়া তাঁর ভাণ্ডারে ভরা। কার রচনা কে জানে। ঠাকুরের খাতায় তিল্লক-কামোদে বাঁধা এক জবর প্যারোডি রয়েছে, শুক-শারী সংবাদ—

ইডেন বন বিলাসিনী খেঁদি আমাদের
খেঁদি আমাদের খেঁদা আমাদের
আমরা খেঁদির, খেঁদি সকলের
শুক বলে আমার খেঁদা কল্কি অবতার
শারী বলে আমার খেঁদি কিম্ভূত কিমাকার
নইলে মানাবে কেন?
শুক বলে আমাব খেঁদা কেমন সাবান মাখে
শারী বলে আমার খেঁদি পাউডাবে মুখ ঢাকে
কোথায় সাবান লাগে?
শুক বলে আমার খেঁদার বামে টেরি কাটা
শারী বলে খেঁদির মাথার মাঝখানেতে ফাটা
সিঁতের বাহার কত

শুক বলে আমার খেঁদার ফ্রেঞ্চকাট হেয়ার
শারী বলে আমার খেঁদি করেনাকো কেয়ার
কারণ কু'করে পড়ে

শুক বলে আমার খেঁদার পমেটম চুলে
শারী বলে খেঁদির চুলে কত বঁধু ঝুলে
কোথায় খেঁদা লাগে?

শুক বলে আমার খেঁদা হ্যাটকোট পরে
শারী বলে আমার খেঁদি আড়ঘোমটা মারে
ঘোমটার বাহার কত।

শুক বলে আমার খেঁদা তাল ধরিয়ে দেয়
শারী বলে আমার খেঁদি গাওনাতে মাতায়
সে যে মিঠে আওয়াজ।

শুক বলে আমার খেঁদা পুরুষের মণি
শারী বলে আমার খেঁদি ত্রৈলোক্য তারিণী
খেঁদার মাথায় থাকে।

শুক বলে আমার খেঁদা কোরটশিপ করে
শারী বলে সে তো কেবল আমার খেঁদির তরে
নইলে কিসের লাগি?

শুক বলে আমার খেঁদা বড় চাকরি করে
শারি বলে আমার খেঁদির সুপারিশের জোরে
খেঁদায় চেনে কে রে?

শুক বলে আমার খেঁদা খবরের কাগজ লেখে
শারী বলে আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে
দুয়ের কোনটা ভাল?

শুক বলে আমার খেঁদার রূপে ঘর আলো
শারী বলে আমার খেঁদির চোখেই জগত মলো
রূপের গুমর কিলো!

লোকটা বেশ আমুদে। ওকে পেলে সবাই ভোলে। কৌতুকে হাসাবে আর পুণ্য-কথায় কাঁদাবে, আপ্লুত করবে। তা যাই করা—বাইরে সে-সব। ঘরে হড়া বাপ। ভয়টা বউকে নিয়েও কম ছিল? শুনেছিল, কাব্যরোগের পাট চুকোতেই নাকি হেমাঙ্গিনীকে লাগানো হয়েছে। ধীরে সে ভয় কাটে, আসর জমে, লোকের সন্দেহ একটু ভাল করেই জমে। বউ মান করলে গান ধরেন, নীলকণ্ঠের ছড়া—

নারী হব আমি এবার মলে
আমি কথায় কথায় মান, করব অভিমান
চাইব না চাঁদ-বদন তুলে।

কাজ না হলে হয়ত ধরবেন শ্রীধর কথকের পদ—

মনে মনে সাধ রে
কে আগে সাধিবে বল?
ঘটিল প্রমাদ রে!

প্রমাদ গুনলেন তারিণীচরণও। তিনি বুঝতে পারেন, ওই একরত্তি বউয়ের পক্ষে

অতবড় দায় বহন অসম্ভব। সন্দেহটা তাঁর আগে থেকেই ছিল। বিকল্প ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছিলেন। ছেলেকে বললেন, সকাল-সন্ধ্যা রোজ বই নিয়ে বসবি আমার কাছে। কাশী গিয়ে একটা উপাধি পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে তোকে। মহানন্দ বুঝলেন, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে—। ক' মাস বাগে রেখে তালিম দিয়ে ছেলেকে কাশীধামে পাঠালেন বাপ।

সেকালে বউমারা শ্বশুরের সামনে মুখ তুলতো না। তবু ঘোমটার আড়ালের অবস্থাটা আন্দাজ করতে কবিরাজ শ্বশুরের কষ্ট হয় না। আর বোঝা কি নিজেকে দিয়েই হচ্ছে না বাপের! ছেলে ছাড়া তিনি যেন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বলেন, তামুক দাও তো বউমা। হেমাঙ্গিনী তামাক সেজে এনে দাঁড়ায়। তারিণীচরণ তাকে এবং নিজেকে, একসঙ্গে দু'জনকেই যেন সান্ত্বনা দেন, আর কয়েকটা মাস মাত্র। পরীক্ষাটা উৎরে গেলে ও এবার শাস্ত্রী উপাধি পাবে। তা উৎরোবেও। তখন দেখব, কার ব্যাটা ওর কাছে দাঁড়ায়। গুড়ুক গুড়ুক টান দেন তামাকে।

এদিকে কিন্তু কাশীর দিনগুলি মন্দ কাটছে না মহানন্দর। আগে থেকেই যোগাযোগ করে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জঙ্গমবাড়ি এলাকায় দুর্গাচরণ মজুমদারদের ওখানে। সেখান থেকেই বিদ্যাপীঠে যাতায়াত। কিন্তু মহানন্দর কর্মসূচী কেবল ওইটুকুই নয়। প্রথম দিনই বিকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে দেখলেন দীর্ঘ সোপানশ্রেণীর এখানে-ওখানে চমৎকার কথকতার আসর। একজন গাইছেন, 'কুরু কৃপা লেশম্, করুণামশেষম্, কুরুণাম্ কুদিনে দীন শুভঙ্করে'। কেবল এই একটি ঘাটই নয়, বা শুভঙ্করের পদই নয়, ঘাটে-ঘাটে, মন্দিরে, আশ্রমে, অলিতে-গলিতে নানা পুণ্যকথার সুন্দর আসর। আর সত্যিই কাশীধামে এসব ভাল কথা শুনবার লোকেরও অভাব হয় না। মহানন্দও উদাস বিকালগুলি ঘুরে ঘুরে এসব আসরে জমতে থাকেন। অর্থাৎ শাস্ত্রী এবং কথক —দুয়েরই তালিম চলতে লাগল একসঙ্গে। নিজেই তিনি ছড়া বেঁধে এসব কথা লিখে রেখেছেন তাঁর লাল মলাটে আঁটা কাশীর খাতাখানিতে। খুলে খানিকটা পড়ছি—

বেদের চালনা আর জ্যোতিষের ব্যাখ্যা।
কাশীধামে ভাল হয় কর গিয়া শিক্ষা॥
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রচর্চা সম্ভবত হয়।
স্থানে স্থানে সঙ্গীতের আছে পরিচয়॥
হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা পড়ি কাশীধামে।
বিদ্যাবুদ্ধি মুখশুদ্ধি পড়াশুনা নামে॥
তবে, মূল ব্যাখ্যা কথকতা বার মাস হয়।
কাশীধাম মধ্যে এটি মুখ্য পরিচয়॥ ইত্যাদি

এ তো দেখি শাপে বর হল। পড়ো, ঘোরো, আসরে জমো, কেউ বলার নেই। অতএব ঘরে ফেরার আর গরজ কিসের?

এদিকে ধুলো জমছে ওষুধের মৃৎপাত্রগুলিতে। তাকে তাকে ঝুল, মাকড়সাদের জাল জুড়বার তোড়জোড়। তারিণীচরণ আতঙ্কিত। সব বুঝি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।

হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারেন শ্বশুরের শরীরটা ইদানীং ভেঙে পড়ছে। পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধের। পালিয়ে চললেও বাপ জানতেন, আছেই কাছে কোথাও। কিন্তু এ যে অনেক দূর, অনেক দিনের পথ। বাপকে যে চিঠি দিচ্ছেন, তাতে শুধু কাশীই নয়, আরও অনেক দূরে দূরে ভ্রমণের কথা!

পাশের বাড়ির জ্যোতিষ বাঁড়ুজ্যের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর নামও হেমাঙ্গিনী। দুজনে তাই সই পাতানো। মহানন্দ-জায়া হেমাঙ্গিনী তার কাছে গিয়ে সময় কাটান সুযোগ পেলে। কিন্তু তাতেই সময় কাটে কই! ফেরার সময় কি হয় না ঘরে? হাঁ, ফেরার সময় হল মহানন্দর। একেবারে শাস্ত্রী উপাধি নিয়েই ফিরলেন। শ্বশুরের সে কী আনন্দ। সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাচ্ছেন কথাটা। তাৎপর্যটা হেমাঙ্গিনী পুরো বোঝেন না। তবু স্বামী যেন তাঁর ললাটেও একটি গৌরবের টিকা পরিয়ে দিলেন, এটা বোঝেন প্রতিবেশীদের কথায়।

ক'দিন গেলে তারিণীচরণ পুত্রকে ডেকে সংসার, বিষয়-আশয়, বৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে উপদেশ দিলেন। বললেন, নিজের শরীরের অবস্থাটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। এবার মহানন্দকেই হাল ধরতে হবে।

কিন্তু মহানন্দর পালে তখন পাগলা হাওয়া। ঘোরা, কথকতার নেশা আরও পাকা করে ফিরেছেন তিনি। একে কথক, তায় শাস্ত্রী। শুধু কি বারাকপুর? গরীবপুর, চিত্রাঙ্গপুর, মাধবপুর, আরামডাঙা, নতিডাঙ্গা, বারাসত অবধি কত গাঁ থেকে ডাক আসছে। মহানন্দও যেন দাঁড়িয়ে থাকেন এক পা বাড়িয়ে। লোকে বলে, এবার শাস্ত্রীমশাই, কাশীর কথা শুনবো। তাতে আর আটকাচ্ছে কোথায়? ছড়ায় বেঁধে তো কাশীর পট তুলে এনেছেন তিনি। লাল মলাটের খাতাখানি খুলে শুরু করেন—

কাশী ফাঁসী সর্বনাশী লীলা চমৎকার।
তীর্থবাস দূরে থাক পায়ে নমস্কার॥
ভাগ্যবতী ভাগীরথী উত্তর বাহিনী।
বহিছেন বারাণসী দিবস যামিনী॥
তীর্থেতে বিরক্ত বড় করে পাণ্ডাগণ।
মোণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয় দুর্ঘটন॥
জুয়াচুরির বাটপাড়ি বঞ্চনা ছলনা।
মূর্তিমতী কাশীধাম না হয় বর্ণনা॥
ষণ্ড ষণ্ডা গুণ্ডা যত কাশীবাস করে।
সাবধানে না থাকিলে গলা টিপে ধরে॥
বিনা দোষে একদিন পড়েছিনু দায়।
গুণ্ডা হতে মানটা রাখতে দুটি টাকা যায়॥
তবে, ব্রাহ্মণের অনুপায় কাশী নাহি হয়।
পরিচয় ভাল হলে পেট চলে যায়॥
মজা করে পেট টানো বসে থাক ঘরে।
মাসে মাসে কিছু দান পাবে তুমি করে॥
কোন মাসে তিন চার, কোন মাসে ছয়।
ষোল আনা অধিষ্ঠান তাহাকেই কয়॥
নিত্য যদি নিমন্ত্রণ জুটাইতে পারো।
তবেই তোমার প্রতি হাতে পোয়া বারো॥
ভাল মন্দ প্রতিদিন কত রূপ খাবে।
দক্ষিণার পয়সায় ভাঁড় ভরে যাবে॥
কত যুবা এইরূপ অন্ন-দাস হয়ে।
পড়ে আছে কাশীধামে পরকাল খেয়ে॥

সভাতে বিচার বড় দেখতে পরিপাটি।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে দ্বন্দ্ব ক্রমে লাঠালাঠি॥
মনে হয় শিক্ষা কিছু করি এইবার।
সাক্ষী দিতে হয় পাছে, থাকা বড় ভার॥
বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি কত আছে কাশী।
টিকি নেড়ে ধিকি ধিকি ঘোরে দিবানিশি॥
পড়া নাই শুনা নাই নাম বিদ্যানিধি।
অবিদ্যা সেবাতে রত হায় পোড়া বিধি॥
সাধু সন্ত শহরেতে ক্কচিৎ দেখা যায়।
যেথা সেথা দরশন ভাগ্যে ঘটা দায়॥
ভিক্ষুক ভুখির কথা ছেড়ে দাও ভাই।
পথে ঘাটে কত আছে সংখ্যা নাহি পাই॥
মেয়েছেলের চরিত্র কিছু ভাল নয়।
এক রূপ সব তীর্থে প্রায় দেখা যায়॥

এমনি ছড়ায়, কথকতায় সবার মন জয় করে ঘরে ফেরেন মহানন্দ। যজমানও বেড়েছে দু'চার ঘর। রোজগারও বাড়ে। পুত্রের এরকম অর্থ-যশ বৃদ্ধি দেখতে দেখতেই বৃদ্ধ পিতার চোখ বোজার দিন ঘনায়। ছেলেকে ডাকেন, কাছে আয়। অতি কষ্টে চোখ মেলেন, বুঝতে পারছিস!

বুঝেছেন বইকি মহানন্দ। সে তো তারিণী কবিরাজেরই ছেলে। চব্বিশ পরগনার পানিতর থেকে পথে বেরিয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘোরা তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লান্তজীবনের অন্তবেলায় এই বারাকপুরের ভিটেয় দীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন। জীবনদীপই নিবে যাচ্ছে আজ তাঁর। যে-যুগে কুলীনেরা মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত দারপরিগ্রহ করতেন, সে-যুগের লোক হয়েও তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন না, সে কার জন্য? যাকে বুকে আগলে রাখতে চাইলেন জীবনভোর, সেই নন্দকে ছেড়েই আজ চলে যাচ্ছেন। বৃদ্ধের শীর্ণ হাতখানি মহানন্দ-হেমাঙ্গিনীর উদ্দেশে উত্তোলিত হয়ে ধীরে শিথিল হয়ে পড়ে। সব শীতল হয়ে গেল। ওদের চোখের জলেও তা আর তপ্ত হল না।

হেমাঙ্গিনী রোজ সকাল-সন্ধ্যায় দাওয়ায় মাদুর পেতে জলচৌকির উপর পুঁথির পুলিন্দা সাজিয়ে রাখেন। কালি-কলম গুছিয়ে দেন। বৃথা কাটে দিনমান। মিছেই তেল পুড়ে চলে সন্ধ্যা থেকে দীর্ঘ রাত্রি। মহানন্দ উন্মনা। কেবল একটি গান মাঝে মাঝে হেমাঙ্গিনীর কানে আসে—

হরি দুঃখ দাও যে জনারে
যার কপালে নাই সুখ, বিধাতা বৈমুখ
দুঃখের উপর দুঃখ দাও যে তারে

মহানন্দর কণ্ঠে নীলকণ্ঠের ওই একটি গানই যেন স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। কিছুদিন দেখে দেখে স্বামীর মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেন হেমাঙ্গিনী, চলো কোথাও ঘুরে আসি। কোথায় শান্তি পাওয়া যাবে? কাশী? চলো কাশীই যাই। সেই দুর্গাচরণ মজুমদারদের ওখানে অনেকগুলি ঘর আছে। থাকার কোন অসুবিধা হবে না। ওখানকার গৃহকর্ত্রী

বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ শাস্ত্রীর পুঁথির পাতা।

মহানন্দকে ভাইয়ের মত ভালবাসেন। মহানন্দও বলেন—বিমলাদিদি। আর এক 'দিদি'র 'পরে বারাকপুরের ঘর আগলানোর দায় দিয়ে সস্ত্রীক কাশী গেলেন মহানন্দ। কিন্তু 'আর এক দিদি' কে? বনগাঁর সাব-রেজিস্ট্রার গোলোক মুখুজ্যের সহোদরা। বাল-বিধবা সে। মহানন্দর এক দূরসম্পর্কের মামাতো বোন মেনকা। কিছুদিন ছিলেন ভাইয়ের ঘরে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর এই বল্লালি বালাইটিও আশ্রয় খুঁজছিলেন। তবে তাঁর কথায় পরে আসা যাবে।

কাশীতে দিন ভালই কাটে। হেমাঙ্গিনীর আছে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির এবং মোড়ে মোড়ে অজস্র দেব-দেবী। মন্দ যায় না মহানন্দরও। কারণ সেখানে তো 'মূল ব্যাখ্যা কথকতা বার মাস হয়'। আয়ও আছে তাতে। তাই বলে বার মাসই বাইরে থাকা চলে না। ভিটার টান আছে। আছে দু'চার ঘর যজমানের ডাক। ফেরা হল। কিন্তু পাততাড়ি পুরো গুটানো হল না। কিছু জিনিসপত্তর রেখে গেলেন বিমলা-দিদির জিম্মায়। আবার এলে লাগবে।

লাগে তো অনেক কিছুই; কিন্তু কিসের জন্য? তারিণীচরণের স্বপ্ন ছিল মহানন্দকে নিয়ে, আর মহানন্দর? আজকাল সব কিছুর মধ্যেই এই এক ভাবনার এলোমেলো হাওয়া হেমাঙ্গিনীকে উদাস করে তোলে। মাস যায়, বছর যায়, আর তারা যেন এক বিষণ্ণ ব্যর্থতার ছায়া ফেলে যায় ও'র ভাবনায়। আলাভোলা স্বামী তাঁর কবিতায় বিভোর। তাঁর তো এদিকে হুঁশ নেই, থাকবার কথাও নয়। কিন্তু হেমাঙ্গিনী নিজেকে ভোলাবেন কি দিয়ে? সেই দুধ-আলতা গোলায় পা রেখে যেদিন এ-বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন, শ্বশুরের সেদিন কত আশা, বাঁড়ুজ্যে-বাড়িতে আমি লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করলাম। তা বংশই যদি না রইল, ভিটে তো এমনিই লক্ষ্মীছাড়া হবে। অসহ্য-অস্থির ভাবনার মধ্যে একটা বিষম সংকল্পে নিজেকে স্থির করলেন হেমাঙ্গিনী।

একটু একটু করে মহানন্দর কাছেও প্রাঞ্জল হয় ব্যাপারটা। পথে-ঘাটে, আড্ডা-আখড়ায়, বন্ধু-বান্ধব, গুরুস্থানীয়েরা অনেকেই অনেকভাবে কথাটা তুলে দেখেছেন। তাতে সাড়া মেলেনি তারিণী-তনয়ের। কথার তোড়ে কথা উড়িয়ে প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছতে বেগ পেতে হয়নি কথক মহানন্দর। শেষ পর্যন্ত সহধর্মিণীও কিনা সতীনের প্রস্তাব করে!

হেমাঙ্গিনীর কথা, আমরা যে ক'দিন আছি, আছি। তারপর? আমার স্বামী-শ্বশুরের এই ভিটে শূন্য পড়ে থাকবে! সকাল-সন্ধ্যা ঝাঁট পড়্‌ব না! তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলবে না! এক ফোঁটা জল অবধি পাবে না বংশের বাপ-পিতামো' কেউ! আর পথ দিয়ে লোক যেতে-আসতে ভিটেটার দিকে চেয়ে বলবে, বাঁজা বউয়েব দোষে বংশটা নষ্ট হয়ে গেল। সে আমি সইতে পারব না। অমন শ্বশুরঠাকুরের আশায় ছাই ছিটিয়ে আমার যে নবকেও ঠাঁই হবে না গো!

মহামুশকিল মহানন্দর। তিনি যে ইতিমধ্যেই একখানা নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। নাম হবে 'ভুবনমোহিনী'। আর সে-নাটকের প্রতিপাদ্য হল বহু-বিবাহের নিন্দা। অনেক কথায় স্ত্রীকে কাটান দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হেমাঙ্গিনী মচকান না। মহানন্দ তাঁকে সর্বদিক ভেবে দেখতে বলেন, সতীন কাঁটা সইতে পারবে?

পারবেন। সইবার মতই সই খুঁজে আনবেন হেমাঙ্গিনী। তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল। স্বামীর উপর ওইটুকু জোর সম্বল করেই হেমাঙ্গিনী লোক লাগালেন তত্ত্ব-তালাস করতে।

কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রাম। সেখানকার গুরুচরণ

চট্টোপাধ্যায়ের চার কন্যার প্রথমা, নাম মৃণালিনী। চাটুজ্যেদের আদিবাস বর্ধমানের খোসবাগ। মেল ভালই। অতএব শুভদিনে শুভকার্য সম্পন্ন করালেন হেমাঙ্গিনী। তারিখটা খুঁজতে হবে না। মহানন্দর রোজনামচায় তা লিপিবদ্ধ আছে—'১২৯৬ সন। ২৪ জ্যৈষ্ঠ পক্ষান্তরে বিবাহ করি। এই মাসেই পরিবারের বয়স পূর্ণ ১২।'

এক নারীর আত্মদহনের দীপারতিতে একটি সংসারের মাঙ্গলিক হল। মাত্র বার বছরের মেয়ে মৃণালিনী। ওদের সংসার গুছিয়ে দিতে কিছুটা সময় লাগল হেমাঙ্গিনীর। তারপর কখনও বারাকপুর, কখনও বৈরামপুর—বাপের বাড়ি। এমনি করে করে একদিন বারাণসী ধামে চলে গেলেন। মৃণালিনীকে বলেন, ভাবিসনে বোন, আমি বাবা বিশ্বনাথের পায়ে পুজো দেবো। তোর কোলজোড়া ধন আসবে। মহানন্দকে বোঝান, না গো না, অনে ‍ আদর খেলাম। আবার ছোট বোনটার সাধের উপর ভাগ বসালে ধম্মো থাকবে না। এমনি করেই ধীরে ধীরে নিজেকে আড়ালে নিয়ে গেলেন বড় বউ হেমাঙ্গিনী।

বিদায় তো নিলেন বড়দি হেমাঙ্গিনী। কিন্তু মৃণালিনীর ভাবনা, কেমন করে পারবে সে! লোকটার ছন্দই তো ধরতে পারে না। যত দেখে তত অবাক লাগে। এ এক অদ্ভুত-চরিত্র মানুষ।

দিন যায়, মহানন্দর মতিগতি বদলায় না। যজমানি, দীক্ষাদান, কথকতার ভোজ্য-পার্বণী-দক্ষিণা কালে-ভদ্রে জুটলেও তা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। অথচ সে-কথা বোঝানোর উপায় নেই মানুষটিকে। সংসারি কথার আঁচ পেলেই সে-কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবেন কথক মহানন্দ। বলবেন, শাস্ত্রী মানুষ, শাস্ত্রমতে চলছি! জানো, বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম কি? 'যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন'—এর সব কটাই করছি।

কথকতাকেই মহানন্দ অধ্যাপনা বিবেচনা করেন। সে-কথা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলবেন, এর পর ধরো গিয়ে গুরুর কৃপা, উপরের আশীর্বাদ।

রাত্রে নিরিবিলিতেও কিছু কি বলা যাবে! মহানন্দই ডাকবেন আগ বাড়িয়ে, এবার তো হাতে কাজ নেই বউ, কাছে বসো, শোনো, তোমাকে আমার নতুন পালাগান শোনাই।

নতুন উৎসাহে ছড়া লিখছেন মহানন্দ। বড় বউ বুঝতে শুরু করেছিল এ-সব ছড়া-শ্লোকের তত্ত্বকথা। ছোট বউ এখনও ছোট, হালকা মন-মেজাজ। এ-সব গভীর ব্যাপারে ঠিক রস পায় না যেন। কাব্য শোনাবার মত বাগেও ঠিক পান না মহানন্দ। তা একবার যদি পাওয়া গেল, ধন্য মানেন তিনি। অমনি পুঁথি খুলে পাঠ শুরু। কতটা শোনা হয় তা নিজেও জানে না মৃণালিনী। সে শুধু দেখে স্বামীর বিমুগ্ধ তন্ময়তা। চোখে ঘুম নয়, জল আসে। রজনী গাঢ়, গাঢ়তর হয়। সে-রাতে, আর যাই হোক, কাজের কথা পাড়া হয় না মৃণালিনীর।

কথকঠাকুর বাড়ি আছেন গো?

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

আলাম সেই বানপুর থেকে। বাবাঠাকুরের শ্রীকণ্ঠের পালা শুনতি চাই।

কোথায় বারাকপুর আর কোথায় বানপুর! তা ডাক আসে বইকি! গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর, রাধানগর, রানাঘাট, শা'গঞ্জ-কেওটা, দূর দূর বহু গাঁয়ের কত নরনারী কথকঠাকুরের শ্রীকণ্ঠের রসধারায় আপ্লুত হয়, হতে চায়। গামছায় পুঁথি বেঁধে,

গলায় চাদর ঝুলিয়ে, কোঁচা দুলিয়ে, ছাতা হাতে শাস্ত্রী মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সারা চাকলার কথকঠাকুর বেরিয়ে পড়েন হাসিমুখে। আর এই বেরোতে বেরোতেই ঘোরন-চণ্ডী মেজাজটা আবার চাঙ্গা হল। দ্বিতীয় বিয়ের একটা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একেবারে দূরপাল্লায়—পশ্চিমে। মজঃফরপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত। কেবল ঘোরো, দ্যাখো আর খাতায় টুকে রাখো। পশ্চিম ভ্রমণের খাতাখানা ভরে গেল এই বৃত্তান্তে।

ফিরতি পথে কাশীতে কাটালেন বড় বউ হেমাঙ্গিনীর কাছে ক'মাস। হেমাঙ্গিনীই সংসার-ধর্ম রক্ষা করতে আবার দেশে মৃণালিনীর কাছে ফেরালেন স্বামীকে।

সে বৃত্তান্ত লেখা আছে বারশ' সাতানব্বুই সালের লেখা খাতাখানিতে।

দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে যায়। এই পাঁচ বছরে ইছামতীর জলে কত জোয়ার এলো, কত ভাঁটা পলি রেখে গেল বারাকপুরের তটভূমিতে। জীর্ণপাতা ঝরে গেল, নবপত্রিকায় পল্লবিত হল জনপদ-বনস্থলী। পুষ্পিত হয় কত বীথিতল। সপ্তদশী মৃণালিনীর বুকেও বুঝি একটি স্বপ্ন মঞ্জরিত হয়। মৃণালিনী বাপের বাড়ি গেলেন।

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ মহানন্দর। মনের ভুবনে বয়ে আসে কুসুমের মাস। সন্তান। তারিণীচরণের বাস্তুপ্রহরী। তিনি পিতা হতে চলেছেন।

এক মাস, দু'মাস, তিন মাস। তিন মাসের মাথায় খবর এলো মুরাতিপুর থেকে। ছেলে। ছেলে হয়েছে মহানন্দর। আঠাশে ভাদ্র, বুধবার, বেলা ঠিক সাড়ে দশটায় মৃণালিনী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। সালটা বাঙলা তেরশ' এক, ইংরাজি বার সেপটেমবর, আঠারশ' চুরানব্বুই।

শুভদিনে নবজাতক বিভূতিভূষণকে নিয়ে শ্বশুরের ভিটেয় পা দিলেন মা মৃণালিনী।

বিভূতিভূষণ! নামটা পেলাম কোথায়?

নামটা মুখে-ভাতের সময় পাকা হোক। তাই বলে শাস্ত্রী মানুষ মহানন্দ জন্মলগ্ন বিচার করে নাম নির্বাচনে দেরি করলেন না। দিনলিপির পাতায় লিখেছেন—'শুক্লপক্ষ, ১৩০১ সন, ২৮ ভাদ্র, বুধবার, দিবা সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয়। মুরাতিপুর গ্রামে। ইঙ্গরাজী ১৮৯৪/১২ সেপ্টেম্বর। দিবা ৩০/৪২, রাত্র ২৯১৮॥'

রাশি, গণ বিচার করে জাতকের ভবিষ্যতটাও একবার দৈবালোকে দেখে নিলেন। তৈরি হল বিভূতিভূষণের জন্মপত্রিকা—

২৮শে ভাদ্র, বুধবার, ত্রয়োদশী ৬০। শ্রবণা নক্ষত্র। ১২/৪৫ ইং দিবা ১০/৫৮ কৌলাবকরণ অতিগণ্ড যোগ। ১২/২২ ইং দিবা ১/৪৮/৪৮ যাত্রা নাস্তি পাপযোগ।.. জন্মে মকর রাশি, দেবগণ, শূদ্রবর্ণ।

জন্মপত্রিকার নিচে নিজ স্বাক্ষর—শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী কথক।

ছেলের জন্মপত্রিকা দেখে বাপ খুশি। ত্রয়োদশীর ন্যায় উত্তম তিথিতে জাতকের আবির্ভাব। বার হিসাবে বুধ তাকে দেবে শিল্পপ্রতিভা। মহৎ চরিত্রের অধিকারী হবে সে দেবগণাশ্রিত বলে। এর সঙ্গে যুক্ত চিন্তাশীলতা ও চেতনা প্রসারের দ্যোতক মকর রাশি। আবার শূদ্রবর্ণে সে হবে বৈষ্ণবের বিনয়মণ্ডিত। সর্বোপরি, সবগুলির সঙ্গে বলবান হয়ে বিরাজমান রবি। এ-রকম যোটকে রবিই জাতকের জীবনে নিয়ে আসে অপ্রত্যাশিত যশোরাশি। বাঃ। মন ভরে যায় মহানন্দর।

ফল দাঁড়ালো—কানু ছাড়া গীত নাই, খোকা ছাড়া কথা নাই। জ্যেষ্ঠপুত্রকে নাম ধরে ডাকেন না বাপ-মা। বিভূতিভূষণকে ও'রা খোকা বলেই ডাকেন। কাশীতে শিবের পুজার পর, এই বেশি বয়সে সন্তান লাভে বাপের আদরটা বুঝি বাড়াবাড়িতেই দাঁড়ায়।

মৃণালিনী আর কতটুকু পান ছেলেকে। মহানন্দ একটু এদিক-ওদিক বেরুলে ছাড়া খোকাকে কোলে পাওয়া ভার। মেনকা পিসিরও ওইটুকু ফুরসত। লাঠি ভর করে বাঁকা কাঁখে ভাইপো নিয়ে পাড়া চক্কর তাঁর। কাঁখ বাঁকা হলেও বৃথা সাবধানী। কিন্তু বাপ? ওই একরত্তি ছেলেকে নিয়েই খুনসুটি জুড়ে দেন। মেনকা হাসেন, এ-বয়সে ও-রকম একটু হবেই তো!

তা একটু কেন, বাড়াবাড়িই হয় বোধহয়। হোক, এখন কারো তোয়াক্কা নেই মহানন্দ বাঁড়ুজ্যের। খোকার জবানীতেই কুল-পরিচয়ের এক লম্বা পয়ার বে'ধে ফেললেন এর মধ্যে।

কুল পরিচয় মম শুন সর্বজন।
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হই ব্রহ্মপরায়ণ॥
ফুলিয়া খড়দহ সর্বানন্দী আর।
বল্লভী নামেতে আছে বাঁধা মেল চার॥
খড়দহ মেলে থাকি কুলে বড় খাঁটি।
বিভূতিভূষণ নাম আমি বন্দ্যঘাঁটি॥
নবাই সবাই আর বিখ্যাত সুন্দর।
ছিলেন পূর্বপুরুষ তিন সহোদর॥
সুন্দরের বংশাভাব এই কথা খ্যাত।
নবাই সন্তান নানা স্থানে পরিচিত॥
মধ্যম সবাই বড় ধর্মপরায়ণ।
তস্য বংশধর আমি করহ শ্রবণ॥
ভাবে ভংগ নহে ব্যংগ প্রববেতে তিন।
শাণ্ডিল্য গোত্র মম কভু নহে হীন॥
কুলীনের পরিচয় আর কত চাও।
মেকি টাকা নহি আমি বাজাইয়া লও॥

'চাও'-এর সঙ্গে 'লও'—মিললো না বুঝি অন্ত্যানুপ্রাসে? না কি, আশ মেটে না কেবল এতেই! পাত্রী খ'ুজে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত করা সারা ওই দুধের ছেলের। আবার ঘুরিয়ে ছড়া বাঁধা হল—

বিভূতিভূষণ নাম আমি বন্দ্যঘাঁটি।
খড়দহ মেলে থাকি কুলে বড় খাঁটি॥
সবাই সন্তান দুই ভঙ্গ সবে জানে।
সভায় বসিলে আগে দশে মোরে মানে॥
কুলীনের পরিচয় আর কত চাও।
মনে ধরে ভালো মেয়ে বিয়ে দিয়ে যাও॥

টাকাঁটা যত সাচ্চাই হোক, বাগ্‌দেবী ও তাঁর সহোদরা, দু'জনের সভাতেই তা সমমূল্যে বিকোবে এমন কথা নয়। খড়দহ মেলের কুলীন সর্বানন্দের উত্তরপুরুষ এই

কবি এবং তস্য বংশধর এই কবিপুত্রের বেলায়ও তার ব্যতিক্রমের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না।

সস্তা-গণ্ডার দিনেও কথকঠাকুরের সংসারে নিত্য অভাব। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, নুন আনতে পানতা ফুরোয়। মাটির দাওয়া, মাটির দেয়াল। খড়ের চালাটা পশ্চিম দিকে খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া। সেখানে চারদিক থেকে মাটি কিছুটা উঁচু করে নোনা, ভাঁটুই, কেঁওঝাক আর কঞ্চির বেড়া—মৃণালিনীর রান্নাঘর।

তা নামেই রান্নাঘর, রাঁধবেন কি? ছেলে নিয়ে, পয়ার বেঁধে, কথকতা করে দিব্য আনন্দে আছেন মহানন্দ। হাতের কড়ি একেবারে নিঃশেষ না হলে আর আড়মোড়া ভাঙবেন না। আবার নড়লেন তো সে এক জ্বালা। পুঁথিপত্র নিয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লেন, ব্যস, ঘরে ফেরার নামটি নেই। না কোন খোঁজখবর, না কোন চিঠিপত্তর।

ছোট গ্রামখানিতে বামুন, কায়েত, ধোপা, নাপিত, জেলে, কাপালী কত লোকই তো সংসার চালাচ্ছে। পাড়াতেই আরও বিশ ঘর বামুনের বাস। কিন্তু কই, এমন হাল আর কোন্ সংসারের? স্বামীর নাম-যশের কথায় পাড়া-বেপাড়া পঞ্চমুখ। গর্বে মৃণালিনীর বুক ভরে যায়, এমন স্বামী ক'জনে পায়! তবু তিনি কেন সুখী হতে পারেন না? উদাস অসহ্য মুহূর্তগুলি সই কাদম্বিনীর কাছে বসে কাটান। কাদম্বিনী পাশের বাড়ির বরদা চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। মৃণালিনীর সঙ্গে তাঁর সই পাতানো। কাদম্বিনীর আর এক নাম ক্ষীরোদবাসিনী। তিনি ওঁর দুঃখ বোঝেন। চোখের জল ফেলতে বারণ করেন—স্বামী-পুত্রের অমঙ্গল হবে রে!

স্বামীকে কিছু যদি বলতে যাবেন মৃণালিনী, আর রক্ষে নেই, কবিতার তোড় বইয়ে দেবেন। বলবেন, বিধির বিধান। কী করব ছোটবউ—কথায় আছে—লক্ষ্মী যাকে কোল দেন, সেই লক্ষপতি। সরস্বতী কোল দিলে পাঁতি আর পুঁথি।

মৃণালিনী বলবেন, থাক, আর শুনতে চাইনে, আমার ঘাট হয়েছে। আর কক্ষনো কিছু বলব না আমি। দায়ও আর বইতে পারবো না এ সংসারের।

সে কি কথা? মহানন্দ আবার ছড়া ধরেন, বলেন, শোন—

পতিসেবা করে নারী সতীধর্ম রাখে
তার জন্য স্বর্গদ্বার সদামুক্ত থাকে
অতএব সতীধর্ম অমূল্য রতন
নারীর উচিত নয় করা অযতন

বলেন বটে, তবু কাব্যেই সব ভরে না, অর্জনের জন্য ধনের আশায় তাঁকেও বেরোতে হয়। তাতে জোটেও কিছু। কিছুদিন চলে যায়। মৃণালিনী বলেন যদি খবর দিতে, সকাল করে ফিরতে; মহানন্দ ছড়া কাটবেন, শ্রীধর কথকের ছড়া—

প্রেম সাগরের জল তবে হইত শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত॥

এমনি করেই দিন, মাস, বছর, এক, দুই, তিন করে ঘোরে। স্বামী বাইরে গেলে অভাব সামলাতে বেশির ভাগ বাপের বাড়িই থাকেন মৃণালিনী। সেখানেই নতুন আগন্তুক আসে মৃণালিনীর কোলে। ইন্দুভূষণ—বিভূতিভূষণের ভাই। জন্ম—আঠারো ভাদ্র, তেরশ' চার। কথক মহানন্দর রোজনামচার খাতাখানি খুলে দেখলে এতদিন পরেও এ-সব তথ্য আরও বিস্তারিত ভাবে পেতে কোন অসুবিধা হয় না। লেখাজোকার ব্যাপারে ভুল নেই কোন হিসাবে। বেভুল বেহিসাবি কেবল সংসারের

আর-দশ কাজে। কিন্তু মৃণালিনী যে মা। সংসারে ডাইনে-বাঁয়ে তিনি যে কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারেন না। নিজের স্বামী, দুই ছেলে তো আছেই। তার উপরে আর একটি উপসর্গ এই জুটে-যাওয়া বড় ননদ মেনকাঠাকরুন।

প্রথমটা মৃণালিনী খুশিই হয়েছিলেন। তবু সংসারে ভাল-মন্দ একটা কথা বলতে মাথার উপর একজন রইলেন। কঞ্চি-পাতা কুড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা কাপড় সেলাই করে খরচার কিছু সাশ্রয়ও করতেন বটে। দাওয়া গোবর লেপে, খুঁটিনাটি গুছিয়ে, দুরন্ত খোকাকে সামলে এক কথায় এক রকম গেরস্থপনার হাওয়া খেলিয়ে রাখতেন বাড়িটাতে। না, পরের বাড়ি ভাবেননি মেনকা এ-বাড়িটাকে।

তবে এটাই তো সব কথা নয় যে, ননদ দোকতা খাবেন, কঞ্চি কাটবেন, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে পাড়া বেড়াবেন। তাঁরও একটা পেট আছে। ব্যামো-পীড়া আছে। আছে একাদশী, চতুর্দশী, ওষুধ, পথ্যি, কাঁথা, কাপড়, সবেরই চাহিদা। কোন্‌টা না হলে চলে সংসারে? মৃণালিনীর সংসার যে এমনিতেই প্রায় অচল। তার উপর এই বাড়তি দায়। অভাবের সংসারে ছুতো-নাতা নিয়ে মাঝে মাঝে লেগে যায়। মেনকারও নানা দুঃখে পোড়খাওয়া শরীরটা ভেঙে পড়ায় মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে।

ঝগড়াটা জোরালো হলেই ননদ গৃহত্যাগিনী হবেন। তবে বেশী দূর যান না বা যেতে পারেন না। বাঁশবাগানের মধ্য দিয়ে পথটার পাশে হয়ত বসে থাকবেন। পাড়ার পথ-চলতি কেউ অমনি দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলেও কথা বলবেন না। আর আজকাল পাড়ার লোকেরও কারণটা জানা। তবু কৌতুক করার জন্য বা খুঁচিয়ে দিতে কেউ কেউ দু'-চারটে প্রশ্ন করে বইকি। মেনকা কিন্তু গুম মেরে বসে থাকবেন নন্দর ঘরে ফেরার পথ চেয়ে। নন্দ আসবে, দিদিকে হাত ধরে তুলবে। তিনি তখন কড়া নালিশ লাগাবেন বউয়ের নামে। মহানন্দও বউকে ধমকানোর আশ্বাস দিয়ে দিদিকে তুষ্ট করে ঘরে ফেরাবেন।

দীর্ঘদিন মহানন্দ বাইরে থাকলে মেনকাঠাকরুনের গৃহ প্রত্যাগমনের প্রক্রিয়াটি অন্য রকম হত। পাশের কারো বাড়ি গিয়ে দু'-এক বেলা কাটাবেন, তারপর একটু দোকতাপাতা চেয়েচিন্তে নিয়ে আসবেন মৃণালিনীর জন্য। নয়ত কোন ফল-পাকড়া বুনোগাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসবেন ছোটদের জন্য। ছোট বলতে বড় ছেলে বিভূতি। বয়স চার ছাড়িয়ে পাঁচে পড়ল। ইন্দু একান্তই ছোট। সে তো বোঝে না কিছু। বোঝে বিভূতি। মেনকা ডাকেন ভিবতি। ও'র দন্তবিরল বদনে উচ্চারণটা ওই রকমই দাঁড়িয়েছে। আর পিসির ওই মিষ্টি ডাকটির জন্য বিভূতিও যেন কান পেতে থাকে। পিসি এসেই লুকিয়ে কোন ফল-পাকড়া দেবেন ওর হাতে। মেনকা লক্ষ্য করেছেন, সন্ধিপ্রস্তাবের পক্ষে এই ঘটনাটি মোক্ষম ফলপ্রদ। মৃণালিনীও রাগ রাখতে পারেন না। মেনকাও না। মাঝখানে এক শিশুর আশ্চর্য সেতুবন্ধন।

মাঝে মাঝে মেনকাকে জ্বরে ধরত বেশ কিছুদিনের পাল্লায়। সেবার মাস দুই ধরে ঘুসঘুসে জ্বর। হেমন্তে সেটা বেড়ে যায়। জ্বরের ধমকে ভুল বকতেন অনর্গল। মহানন্দ বাইরে কোথায়। জ্বরের সঙ্গে বিকারের মত মৃণালিনীর সঙ্গে খিটিমিটি চলছে। ইন্দু কাছে এলে বলেন, আমার যে শরীল খারাপ বাবা, তোমায নেব না। মার কাছে যাও। মৃণালিনীও একলা আর সামলে উঠতে পারেন না। তার উপর এই রুগ্না, বৃদ্ধার শুশ্রূষা কী করবেন!

বউর 'পরে রাগ করে মেনকা ভাইপো বিভূতিকে ডাকবেন, ভিবতি, নক্কি চাঁদ আমার, ইদিকে আয়। আলনা থেকে কাঁথাডা পাড়ি দে। আমার গায়ে চাপি ধর। কেরমোশোই

কেমন লাগতিছে যেন। নামিয়ে দেন কাঁথা মৃণালিনী, বিভূতির হাত অত উঁচুতে পৌঁছতে পারে না, মেনকাও তা জানেন। তবু ওইভাবে বলেন। কোনক্রমে বিভূতি পিসির গায়ের 'পরে চেপে ধরে। মেনকা বলেন, উঃ, কম্প দিয়ে জ্বর এয়েলো, তুই আমার গায়ের 'পরে চাড় বোস। আমার বুঝি হয়ে গেল!

শেষের দিকের কথাগুলি বলবেন যথাসাধ্য চেঁচিয়ে, বউকে শুনিয়ে। যেন তাঁকে আক্কেল দিচ্ছেন। এদিকে বশংবদ ভাইপোটি পরমোৎসাহে আপাদমস্তক ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো পিসির গায়ের উপর সটান শুয়ে পড়ে। ওর সে উৎসাহের কলরোলে ছেলে কোলে মৃণালিনী ছুটে আসেন। কাণ্ড দেখে চক্ষু স্থির! ও কি করছিস, দম আটকে যাবে যে!

ব্যস, বৃদ্ধাও এইটেই চান, বউ কিছু বলুক। দু'কথা শুনিয়ে দেওয়ার ওইতো সুযোগ! ফোঁস করে স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে সোচ্চার হবেন, যাক দম আটকে, তোরা চেপে ধর। তোদের হাতেই আমার সগ্গ পেরাপ্তি হোক।

কথার ছিরি দেখে মৃণালিনীর গা জ্বলে যায়। তিনি সরে পড়েন, ছোট ছেলের হাত ধরে। বড় পুত্র, তিনি জানেন, তাঁর কথা আমলে আনবে না।

ক'দিন এভাবে কাটিয়ে বৃদ্ধা হঠাৎ একদিন 'উদাসী' হলেন। এটা ও'র নিজের ভাষা, অর্থাৎ উধাও হলেন মেনকা। মৃণালিনী জানতেন, পাড়ার ন'দি, অর্থাৎ মুখুজ্যেবাড়ির শান্তশীলা দেবীর ওখানে বা পুরুতবাড়ি, যেখানে হয় উঠেছেন, এর বেশি যেতে পারেন না। মাকে দু'-একবার জিজ্ঞেস করেছিল বিভূতি, পিসির খবর। মৃণালিনী বোঝালেন, পিসি গিয়েছেন বাগান গাঁয়ে তাঁর বোন রাখালী পিসির বাড়ি। পাড়ার কোথাও বললে, মা জানতেন, ওই অবুঝ শিশুই খুঁজতে বেরুবে, সে আর এক বিপদ। ইন্দুকে আগলে তিনি আর কত দিক দেখতে পারেন একলা!

কোথায়, কেন পিসি গেলেন, কবে ফিরবেন বা আদৌ আর ফিরবেন কিনা এ-সব দু'-চারটে প্রশ্নের মুখে মার ধমক খেয়ে চুপ মেরে যায় বিভূতি। ধীরে ধীরে ইছামতীতে সন্ধ্যা নামে। বারাকপুরের বনজঙ্গল অন্ধকারে ঘন হয়। বিভূতি ইন্দুর হাত ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে, পিসিমার কঞ্চিকাটা বাঁশবনের পথটাও অন্ধকারে ডুবে যায়। না, পিসি সত্যিই এলো না।

শিশুমন সহজেই গল্পে ভোলে। ইন্দুকে ঘুম পাড়িয়ে মৃণালিনী তখন ছেলেকে গল্পে বেঁধে রান্নাঘরে বসেন। গল্প শুনতে শুনতে ছেলে ঘুমে আঢুল। হঠাৎ তাড়া-হুড়ো পড়ে যায়—ওঠ, ওঠ, বৃষ্টি নামলো।

আকাশ ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পড়তেই পালাও হেঁশেল নিয়ে, এই হাল মৃণালিনীর হেঁশেলের। ইন্দুকে বিভূতির সঙ্গে পাঠিয়ে আধসিদ্ধ ভাতের হাঁড়ি নিয়ে মা ঘরে ছুটলেন। ঘরও হাওয়ার ধমকে কাঁপে। বারান্দার কী দশা কে জানে! খড় তো ওখানের চালায় নেই বললেই চলে। ঘরের কোণে ওদের আগলে মৃণালিনী। হঠাৎ মায়ের হাত ছাড়িয়ে বিভূতি বারান্দায় ছুট। মৃণালিনী চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ, কোথায় যাস। পরক্ষণেই একটা ছেঁড়া মাদুর বগলে ঘরে ঢুকল ছেলে, ইস্, পিসির মাদুরটা একদম ভিজে গেছে।

অবাক মৃণালিনী। কই, তাঁর কাপড়-কাঁথার জন্য তো এমন গরজ হয় না ছেলের! আবার কী ভেবে মায়াও হয় বুড়ির জন্য।

বিভূতির হাত ধরে এক সকালে বাড়ির ঈশান-কোণে এসে বসলেন মেনকা। না, ঘরে যাওয়ার আদৌ ইচ্ছা নেই। বিভূতি বললে, দ্যাখো মা, ভাঁটুই গাছগুলির

মাঝখানে বসে পিসি আমায় ডাকছিল। বললে, কুটুমবাড়ি থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেম।

মৃণালিনী হাসি চাপতে পারেন না। আর অমনি ননদ বিগড়ে যান। মৃণালিনীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুলতে থাকেন, না, কেউ যেন ভাবে না, আমি থাকতে এয়েচি। ভিবতি আর ছোটর জন্যে পেরানডা পোড়ে। ভাবলেম, যাই দিনি, একবারটি দেখি আসি।

মৃণালিনী সত্যিই আবার হেসে ফেলেন। হাত ধরে নিজেই তুলে আনেন ননদকে। একবারটি দেখলেই হবে? সব্বোক্ষণ আগলে রাখতে হবে।

মেনকাও মান ভাঙেন। এমনি করেই দিন কাটে। কখনও দুজনে হাসি-ঠাট্টা। আবার কখনও কলহ। লাঠি ভর করে উঠে পড়বেন বৃদ্ধা। মৃণালিনী বলবেন, আমায় দোষী করে কি ভাল হবে? মেনকা ফোঁস করবেন, না, না, না, ভাল আমি চাইনে, চাইনে। নন্দ আসুক, বলব আমায় গঙ্গা পারে রেখে আয়। গঙ্গা পেরাপ্তি ছাড়া সোয়াস্তি নেই শরীলে।

কিন্তু বললেই কি আর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। এমনি করেই দীর্ঘদিন বর্তে ছিলেন এই বল্লালি বালাইটি। ভাই, ভাইয়ের বউয়ের মৃত্যুর পরেও। তারপর এ-বাড়ি ও-বাড়ি দুঃখের হবিষ্যি। ব্রাহ্মণ-ঘরের নিষ্ঠাবতী বালবিধবা। দু'চারদিন করে দুটি অন্নপান জুটতও বামুনপাড়ায়। সেবার ক'দিন ছিলেন গাঁয়ের সীমায় পুরুত ফণী চক্রবর্তীর বাড়ি। কী একটা কারণে হঠাৎ বেঁকে বসলেন। জলস্পর্শ করবেন না। অথচ অন্য কোথাও যাওয়ার চেষ্টাও নেই। সবার সাধ্য-সাধনা ব্যর্থ হল। একটা মাদুরে শয্যা নিলেন বৃদ্ধা। এটা ব্যতিক্রম। অন্য সময় হলে উনি উদাসী হতেন। বিপদ পুরুত বাড়ির। ব্রাহ্মণ বিধবাকে উপবাসী রেখে ওরা খায় কি করে! দ্বিতীয় দিনে অনেক চেষ্টায় একেবারে শেষ বেলায় ভাতের সামনে বসানো গেল। বসলেন বটে, কিন্তু খেতে পারলেন না কিছুই। কী যেন বিড়বিড় প্রলাপ বকছিলেন। একটু পরে ঘাটের উদ্দেশে পাথর নিয়ে উঠলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাথর ভরতি ভাত নিয়ে গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। আর উঠলেন না।

॥ দুই ॥

হুগলি জেলার শা'গঞ্জ-কেওটায় মহানন্দ প্রথম আসেন মাত্র কয়েক দিনের 'কথা'র বায়না নিয়ে। থেকে গেলেন কিন্তু দেড় বছর। এটা তেরশ' পাঁচ সালের কথা।

এখানকার ঝাপপুকুরের এক দল রাণাঘাট গিয়েছিল বরযাত্রী হয়ে। সেখানে রাধাকান্ত তলায় তখন আসর পড়েছে কথক মহানন্দ শাস্ত্রীর। সেখানেই বায়না। শা'গঞ্জ-কেওটা তখনকার দিনের সমৃদ্ধ তল্লাট। কেওটার ছুতোর মিস্ত্রিদের তৈরি কাঠের জিনিস কিনতে এখানকার গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তখন নৌকোর ভিড়। সরকারের দৌলতে হুগলি-চুঁচুড়ার টাকা-কড়ি গড়িয়ে আসত এ গাঁয়েও। শাস্ত্রী মশাইরও অপরিচিত নয় জায়গাটা। শ্বশুরবাড়ি মুরাতিপুরের উল্টো দিকে এই শা'গঞ্জ। অতএব চলে এলেন। ঢপ, কীর্তন, কথকতা, পালাগানের পিছনে পয়সা খরচা করার লোকের অভাব নেই এখানে। ভোজ্য-সিধের সমাদর, ব্রাহ্মণ ভোজনের ঘটাও বেশ। মহানন্দ প্রথম উঠেছিলেন শা'গঞ্জে বুড়ো শিবের মন্দিরের ঠিক ঘাটের উপরে নিতাই বাঁড়ুজ্যের

কুল-পরিচয়।

× কুলপরিচয় মম,
সংক্ষেপে পরিচয় শুন সর্ব্বজন।
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হই ব্রহ্ম পরায়ণ॥
ফুলিয়া মুড়াদহ সর্ব্বানন্দী আর।
বঙ্কিম নামেতে বাঁধা, আছে মেল চার॥
(সেই) মুড়াদহ মেলে থাকি; কুলে বড় খাঁটী।
বিভূতিভূষণ নাম আমি বন্দ্য ঘাটী॥
নবাই সবাই আর, বিখ্যাত সুন্দর।
ছিলেন পূর্ব্বপুরুষ, তিন সহোদর॥
সুন্দরের বংশ ভার, এই কথা খ্যাত।
নবাই সন্তান সর্ব্ব স্থানে পরিচিত॥
(আমার) সবাই বংশেতে জন্ম, জেনে রেখ মনে।
ভাবে ভঙ্গী নহে ব্যঙ্গ, সবে মোরে মানে॥
কুলের পরিচয়, আর কত চাও।
মেকি টাকা নহি আমি, বাজাইয়া লও॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং, নবধা কুললক্ষণম্॥

মধ্যম সবাই ... বড়, ধর্ম্মপরায়ণ।
ভগ্ন বংশীয় আমি, করহ শ্রবণ॥
ভাবভঙ্গী নহে ব্যঙ্গী, প্রবরেতে তিন।
শাণ্ডিল্য গোত্র আর প্রবরেতে তিন।
সমান ... জেনেছে, কভু নহি হীন॥
শাণ্ডিল্য গোত্র মম, কভু নহি হীন॥

মহানন্দ-রচিত পয়ারে পত্র বিভূতিভূষণের কুল-পরিচয়।

প্রারম্ভ।

বিভূতি-ভূষণ নাম, আমি বন্দ্যঘাটী।
খড়দহ মেলে থাকি, ~~[illegible]~~ কুলে কড় খাঁটি।
সবাই সম্ভ্রান্ত হই, তাহা সবে জানে।
সভায় বসিলে আগে, দশে মোরে মানে॥
কুলীনের পরিচয়, তাঁকে [illegible] [illegible]।
যার ঘরে ভাল মেয়ে, বিয়ে দিয়ে যাও॥

কুল-পরিচয়ের পাঠান্তর।

বাড়ি। কিছুদিন দেখে-শুনে সপরিবারেই চলে এলেন বারাকপুরের বাড়ি তালা দিয়ে। এবার বাসা করলেন কেওটায়, দূর সম্পর্কের আত্মীয় রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির কাছে।

ঘুরে ঘুরে আসর পড়ে কথক ঠাকুরের। শীতের গভীর রাতেও পাশের পাড়ার ঝি-বউ লেপের তলায় চমকে ওঠে তাঁর ঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বরে—'তরণী, তুমি তর নি?' বুড়োরা বলেন, ওই তরণীসেন বধ হচ্ছে। কখনও পালাকীর্তন জমে বুড়ো শিবের ঘাটে। গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন ওঁর গানের সুরও ঢেউ খেলায়। ধরেছেন মধু কানের বয়ান। যশোদা বলছেন নারদের কাছে—

আর কি হবে সে কপাল, আর কি ফিরে হবে সে কাল।
দেবকী দিবে কি গোপাল, চরাবে গো-পাল।
গো-পালিতে গোপাল যাবে, গোপের গোপাল সঙ্গে রবে
মোহন বেণু বাজাইবে, রবে ধাবে পাল।

মুগ্ধ আসরের ভোজ্য-প্রণামিতে কথক ঠাকুরের পাত্র পূর্ণ হয়। খোকা, ইন্দুকে নিয়ে স্বামীর সংসারে একটু যেন সুখ দেখতে পান মৃণালিনী। খোকাও আজকাল রেজাই জড়িয়ে মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে আসরে গিয়ে বসে। কখনও ঘুমে আঢুল, কখনও পুণ্য-কথার জয়ধ্বনিতে উচ্চকিত। এর মাঝেই অনেক ছড়া শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করেছে। বাপ-মা দুজনেই খুশি—পাঁচ বছরের খোকা তাঁদের কেমন ছড়া বলে! মহানন্দ মৃণালিনীকে বলেন, জানো ছোট বউ—

পৌষ মাসেতে আউনি বাউনি পিঠের ছড়াছড়ি।
মাঘ মাসেতে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি॥

এবার হাতেখড়ি দেবো খোকার, কি বল?

মৃণালিনীর তো এমনিতেই তর সইছিল না। একেই ও দুরন্ত। তায় বাপের চেলাগিরি করলে আখেরে টাকা-কড়ির কী হবে তা নিয়েও চিন্তা। লেখাপড়ার হাল শক্ত করে ধরাতে হবে। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁয়ে কি করে হবে হাতেখড়ি? আর হাতে-খড়িই তো সব নয় যে ছেলে অমনি অমনিই বিদ্যে-দিগ্‌গজ হবে। খেই ধরবে কে?

সে-সব ভেবে রেখেছেন মহানন্দ শাস্ত্রী। এই কেওটাতেই মুখুজ্যে বাড়ির সামনে পাঠশালা চালাচ্ছেন মোদক মশাই—প্রসন্ন মোদক। রাখাল চক্রবর্তীর ছেলে পুলিন যায় সেখানে। তার সঙ্গে রোজ যাবে আসবে খোকা। পুলিন বলে, খুব ভাল মানুষ প্রসন্ন গুরুমশাই, কাউকে মারেন না। ওখানেই শুরু হোক। বারাকপুর ফেরার জন্য দিন গুণে আর সময় নষ্ট করা কিছু কাজের কথা নয়।

তাই-ই হল। শুভদিনে হাতেখড়ি দিয়ে প্রসন্নচরণ মোদকের কাছে পাঠানো হল খোকাকে। তিনিও তাঁর কাঁঠালতলার পাঠশালায় পাড়ার আরও দশটি ছাত্রের অন্যতম করে নিলেন মৃণালিনী-মহানন্দর খোকা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

আশ-পাশে আগাছা জঙ্গল। উঁচু ভিটের 'পরে গঙ্গামাটির শক্ত দাওয়া। কয়েকটা কাঠের খুঁটির উপর খোলার চালা। কাঠের চৌকিতে সমাসীন প্রসন্ন গুরুমশাই। বৃত্ত রচনা করা ছাত্রদের পাঠবিতান। বর্ণবোধ, আখ্যানমঞ্জরী, প্যারীচরণের ইংরাজি ফার্স্ট-বুক ইত্যাদি পাঠ্য, তবে তা উচ্চশ্রেণীর জন্য। প্রথম পাঠে, বই, খাতা, পেনসিল তো দূরের কথা, পাততাড়িও চাইনে। শক্ত মাটির মেঝেতে গভীর করে অ-আ-ক-খ থেকে বানান অবধি খোদাই করা। তার উপর দিয়ে কঞ্চি বুলিয়ে যাও। আর উপর দিয়েই বা বলা কেন, বহু ছাত্রের বোপদেবতুল্য সাধনায় অক্ষরগুলি গর্তে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে কঞ্চি গলিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে টানলেও নির্ভুল মকশ-করা হবে। এভাবেই

এ-পাঠশালে সবাই ধাপে ধাপে উপরে ওঠে।

অবশ্য আরও দ্রুত উপরে এবং অনেক উপরে ওঠার দিব্য আয়োজনও একেবারে নাগালের মধ্যেই—সে এই হেলান-গুঁড়ি কাঁঠালগাছটি। দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফের আশ্রয়ে প্রসন্ন গুরুমশাই যখনই প্রসন্নচিত্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন হবেন, সেই সুযোগে উদ্যোগী ছাত্ররা নিজ নিজ অধ্যবসায়গুণে সেই বৃক্ষের শাখাশ্রেণীতে উঠবে। গুরুর হাঁক-ডাকে আবার গোত্তা মেরে নিচে পড়ে এবং পড়তে বসে। গুরু অল্প সময়ের জন্য কার্যান্তরে গেলে ছাত্রকুলও মহাজনপন্থা অনুসরণ করে কর্মান্তরে চলে যায়। সুবিধের মধ্যে বাচনিক নিন্দা ছাড়া অন্য কোন বিপদের আশঙ্কা নেই এখানে।

ছাত্ররাও হয়ত সে-কারণে অতিমাত্রায় ভক্তিমান প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের প্রতি। পদবী মোদক, দু'পায়ে হাঁটু পর্যন্ত স্থায়ী ঘা। সেই পায়েই নিরতিশয় ভক্তিতে হাত-মাথা ঠেকাতো প্রবোধ, প্রভাস, পুলিন, বিভূতিদের ন্যায় ব্রাহ্মণ-তনয়গণ। গুরুর স্নেহ যে তাদের 'পরে অকৃপণ বর্ষিত হত তাতেও সন্দেহ নেই। তবে কিনা খুব বেশি দিন তিনি সশরীরে থেকে তা দিতে পারেননি ছাত্রদের।

বিপত্নীক প্রসন্ন মোদক পাঠশালার কাছেই এক চালাঘরে থাকতেন। পাশের কোন গাঁয়ের এক বিধবা তাঁর রান্নাবান্না থেকে দেখাশুনো পর্যন্ত দশটা কাজ করে দিতেন, থাকতেনও সেখানেই। তাঁকে নিয়েই কী একটা গোলমাল চলছিল কিছু বাজে লোকের সঙ্গে। এক রাত্রে আর্ত চিৎকারে সচকিত প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখল প্রসন্ন মোদক ও সেই বিধবাকে কে বা কারা দা দিয়ে একসঙ্গে কেটে রেখে গিয়েছে।

এ-দুর্ঘটনায় পাঠশালা উঠে গেল। জোড়া খুনের পর ওর চারদিকে আর কেউ ছায়া মাড়াতে সাহস পায়নি। ছাত্ররা অন্যত্র যার যেখানে সম্ভব চলে গেল। বিভূতি অবশ্য ওই দুর্ঘটনা অবধি দেরি করেনি। তারও আগে নিজ পরিবারের এক দুর্ঘটনায় মহানন্দ সপরিবারে শা-গঞ্জ-কেওটা ত্যাগ করেন। শুরুটা যদিও ভালোই হয়েছিল। অর্থের, সুখের মুখ দেখেছিলেন এখানে এসে। দুই ছেলের পর মেয়ের মুখও এখানেই দেখেন মহানন্দ। একেবারে বছরের শেষে চৈত্রের ছ' তারিখ, শেষরাত্রে, বাঙলা তেরশ' পাঁচ, মৃণালিনীর কোলে এলো জাফরি, ভালো নাম জাহ্নবী। কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেলো ক' দিনের মধ্যেই। বিভূতিভূষণের পরের ভাই ইন্দুভূষণ হঠাৎ হুপিং কাসিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। মাত্র পাঁচ বছরের শিশু। মৃণালিনী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কাঁদল বিভূতিও পুরো ক্ষতিটা না বুঝেই। কথক মহানন্দর কণ্ঠ স্তব্ধ। কেওটার পালা খুশির হাসিতে শুরু করে বুকভরা কান্না নিয়ে সপরিবার ফিরলেন মহানন্দ বারাকপুর।

দু'চারজন বুড়ো, প্রভাসদের বাড়ির সামনের সেই পাঠশালার জংলা উঁচু ভিটে, সেই কাঁঠালগাছটা—এ-রকম কিছু এখনও রয়ে গিয়েছে সাক্ষী হয়ে। ছাত্রকুলের মধ্যেই বা কে আছে এমন? ডাক্তার প্রাণহরি চাটুজ্যের ছেলে প্রবোধ, সেও তো এখন আর প্রবোধ নেই, এখন তাঁর পরিচয়, সীতারামজী ওংকারনাথ ঠাকুর। বাড়ি ডুমুরদহ। বাপ এখানে থাকতেন, সেই সুবাদে এখানেই তাঁর দীর্ঘ বাল্য কাটে।

এমনি দুনিয়ার হাল—অনেক কিছুই বদলায়, হারিয়ে যায়, থাকে স্মৃতি। সে স্মৃতিচারণ থেকে মহানন্দ, মহানন্দ-তনয় বিভূতিরও মুক্তি নেই।

তাই বলে স্মৃতি নিয়ে তো বসে থাকা যায় না। ব্রাহ্মমুহূর্তে খোকাকে শয্যা থেকে তোলেন বাপ। চাণক্যশ্লোক, উদ্ভটশ্লোক, স্তোত্ররত্নমালা প্রভৃতি থেকে রোজ

কিছু না কিছু মুখস্থ করান। একটু একটু বই পড়া আর লেখার অভ্যাসও করান প্রতিদিন।

ছেলের হাত ধরে ও-পাড়ার দীনু গয়লানির বাড়ি হাজির মহানন্দ। কালির তরে আলাম গো।

তা দীনুর ওই এক কাজ। ধানসিদ্ধ হাঁড়ির কালি তুলে রাখে সে। বলে, কালি হবে, কথকঠাকুরের নেকনের কালি।

রায়-বাড়িতে ছিলেন ইন্দুর ঠাকুরমা। তাঁর কাছ থেকে চালঝাড়ন্ত ক্ষুদ এনে ভেজে দেবেন মৃণালিনী। হাঁড়ির কালির সঙ্গে ভাজা ক্ষুদ বেটে শিশিরের জলে তাই মিশিয়ে কালি পাতায় মেতে যাবে বাপ-ব্যাটা।

অতঃপর লেখার পালা। তালের পাতায় একজন লেখে 'অ-আ-ক-খ'। পুঁথির পাতায় আর এরজন রচনা করেন ছড়া, নাটক, পাঁচালী। দুজনের হাতে দুটি কঞ্চির কলম, দোয়াত একটিই। কথক মহানন্দ দোয়াতে কলম ডুবিয়ে ভাবনায় বিভোর। পুত্র আর 'অ'-তে আকার বসিয়ে এগোতেই পারে না। বাপ কলম না তুললে ছেলের উপায় কই কালি নেওয়ার। মুশকিল হচ্ছে, খোকা যত ছোটই হোক, অক্ষরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আর লিখতে শেখার নতুন নেশায় ওর লেখনী যেন ধৈর্য মানতে চায় না। তবু বুঝি বাপের এই ভাব-বিভোর চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে। সে জানে, ছড়া বাঁধা হচ্ছে, বাবা আসরে গাইবেন। বাপের সঙ্গে শা-গঞ্জ-কেওটার আসরে বসে বসে কী একটা বোধ তার জন্মেছে। বাপকে সে বিরক্ত করে না।

ধ্যান ভেঙে দেন মৃণালিনী। খোকা, লিখছ না?

সপ্রতিভ মহানন্দ নিজের কলম তুলে ছেলের লেখায় সাহায্য করেন। খোকাব পড়ার ব্যাপারে মা কম সজাগ নন। ক'দিনের জন্য মুরাতিপুরে বাপের বাড়ি গিয়েছেন মৃণালিনী। খোকাকে তিনি বসিয়ে রাখলেন না। ছোট ভাই বসন্ত যায় সেখানকার বিপিন মাস্টারের স্কুলে। বিভূতিকেও তার সঙ্গে স্কুলে পাঠালেন মৃণালিনী। মামা-ভাগ্নে মিলে পাঠ চলেছে বিপিন মাস্টারের স্কুলে। তবে সে আব ক'দিনের জন্য? মৃণালিনী তো আর চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ি যাননি। পনের দিন, কি এক মাস। আবার এই বারাকপুরেই ফিরতে হয়।

এখানে বাপের পাঠশালা। তবে তার উপর মৃণালিনী কেন, মহানন্দ নিজেও নির্ভর করতে পারেন না। ঘরে থাকলে তবু যাহোক কিন্তু ঘোরনচণ্ডী মানুষ তা-ই বা পারেন কই? অগত্যার গতি পোড়াহবি বা হরিপোড়াব গোহাল।

বারাকপুরের হরিমোহন রায়েরও একদা শৈশব ছিল বইকি· তখনকার দিনে ক'জনের বাপ-মা-ই বা ছেলে-মেয়েকে গরম চাদর দিতে পারতেন শীত ঠেকাতে। পরার কাপড় দু' ভাঁজ কবে ঘাড়ের কাছে গেড়ো দিয়ে গ্রাম্যভাষা, দোলাই বা রেজাই জড়িয়ে দেওয়া হত। সেই দোলাই জড়ানো হরিমোহন মায়ের পাশে পাতার উনুন পোহাচ্ছিলেন। হঠাৎ দোলাইয়ে আগুন ধরে যায়—ঝলসে যায় গা। বাঁচলেন বটে কিন্তু ক্ষতচিহ্নগুলি রয়ে গেল সারা জীবন। আর ঘটনাটি নামের সঙ্গে। হরিমোহন নামান্তরিত হলেন পোড়াহরিতে। সেই হরিমোহন গাঁয়ের মধ্যে পাঠশালা খুলেছেন। ছাত্রদের হাল দেখে অভিভাবকগণ সহজেই পাঠশালাকে বলতে লাগলেন গোহাল। আর উৎসাহী ছাত্রবর্গ গুরুর নামটি নিয়ে, অবশ্যই আড়ালে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেদের জ্বালা মেটাতো পোড়াহরি, হরিপোড়া ইত্যাদি বলে।

কথকতার বায়না নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য দূরপাল্লায় বেরুবার আগে মহানন্দ

হাজির, হরিখুড়ো!

এবারকার সম্বোধনের মধ্যে হৃদ্যতার সুর। বললেন, কিছুদিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি হরিখুড়ো। খোকা আসবে তোমার পাঠশালায়, ওকে একটু দেখো।

শেষের কথাটি বলেই হরিমোহনের হাতটা জড়িয়ে ধরেন মহানন্দ।

তা হরিমোহন দেখবেন বইকি! ছাত্র বৃদ্ধিতেই তো তাঁর আনন্দ বর্ধিত। এ-গাঁয়ের দশ-ঘরের ভরসায়ই তো পাঠশালা পাতানা। তাই বলে বিনে-মাগনায় কাঁহাতক পোষায়?

না, না, খুড়ো!—তারিণী কবিরাজের পথ্য ব্যারাম বুঝে দাওয়াই ছাড়েন। এবারে রঙপুরে লাহিড়ীবাড়ির বায়না, ভালই পাবো, তা তোমায় ঠকাবো কেন? তাছাড়া কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, ওদিকে একের নমবর আফিং, বেশ খানিকটা আনবো ইচ্ছে।

হরিমোহনের দু'চোখ চকচক এই শেষের কথায়।

কেবল বেতনের ভাবনা তো নয়। তেল, নুন, চাল, ডাল, তামাক, চিটেগুড় সবই বাকি-বকেয়ায় চালাতে হয় মহানন্দকে। তার মধ্যে হরিমোহনকে শরিফ রাখার জন্য ওসব জিনিস যোগাড় করতে হবেই তো!

গ্রামের মাঝখান দিয়ে যে-পথটা গোপালনগর হাটের দিকে গিয়েছে, তার এক পাশে প্রবীণ এক রেনট্রি তলায় খড়ের চালা, মাটির দাওয়া—হরিমোহনের মুক্তাঙ্গন বিদ্যা-বিপণি।

একপাশে চাটাই-বে-চাটাই ছাত্র-ছাত্রীকুল সমাসীন। আর পাশে মৃৎপাত্র চাল-চিটেগুড়ের পণ্যসম্ভার। সঙ্গেই হরিমোহনের সপরিবার থাকার ঘর। দুপুরে সেখানে বিশ্রাম। সকাল-বিকাল বিকিকিনি, সুতরাং পাঠশালাও দু'বেলা বসে। ছাত্ররাই পণ্য-পাত্রগুলি আনা-নেওয়া করে দেয়। খদ্দের-লক্ষ্মীর সেবাই সেখানে প্রধান, তারই জন্য মা সরস্বতীকে বেগার খাটিয়ে নেওয়া আর কি!

চাটাই তালপাতা হাতে মহানন্দর খোকা সেখানে এসে দেখল, পাড়ার পরেশ, নগেন, ইন্দু, মানী, ভবত, বুধো, পুঁটিদি সবাই সেখানে পড়তে হাজির। নতন সঙ্গী। ওরাও খুশি। তবে হরি রায়ের সামনে বসে চোখ আর চিমটির প্রয়োগ ছাড়া আলাপ জমানোর সাহস নেই কারও। একটু নড়ে-চড়ে বসতেই হরিমোহন বাজখাঁই গলা ছাড়লেন, এই ও কী হচ্ছে!

বিভূতির দিকে তাকিয়ে বলেন, লেখ, লেখ।

কি লিখবে তা বলেন না হরিমোহন। ওদিকে খদ্দের-লক্ষ্মী হাজির। ইন্দুর বাবা সীতানাথ রায়, তল্লাটের জমিদার গোছের লোক, এসেছেন সওদায়। নতুন ছাত্রটির দিকে নজর রেখে বললেন, নতুন ভর্তি নাকি? কে, মহানন্দর ছেলে না?

হরিমোহন শুধু শব্দ করলেন একটা—হুঁ।

বিভূতিও চেনে ইন্দুর বাবাকে। বাবা বলেন, সীতানাথ খুব বড় লোক। দেখল, তিনি হরিপোড়ার কাছে হাত এগিয়ে ওকে দেখিয়ে কী একটা ইঙ্গিত করলেন। তর্জনীর তলা থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা ছিটকে তুলে সপ্রশ্ন হলেন।

পোড়াহরি তার উত্তরে ঠোঁট উল্টে হাসলেন, ডান হাতটায় পাক মেরে শূন্য-লোকে তুললেন।

দোকানে কেউ এলে ছাত্রদের মনোযোগ সেদিকেই থাকবে। ব্যাপারটা তারাও দেখল। সকালের মত পাঠশালা ছুটি হলে ঘেরাও হল বিভূতি। সহপাঠীদের নানা
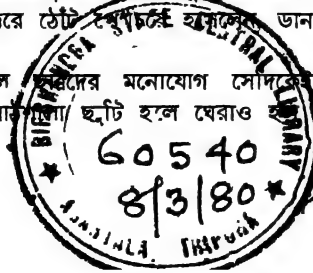
প্রশ্ন। স্বভাব-লাজুক ছেলে বিভূতি বিব্রত। আর প্রশ্নেরও যা ধাঁচ—তুই মাইনে দিবিনে বিভু?

পাঠশালার ব্যাপার-স্যাপারে প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের কাছে সামান্য ক'দিনের অভিজ্ঞতা। তাও মাইনের কথা জানতেন ওর বাবা। এখানেও বাবাই কথা বলেছেন পোড়াহরির সঙ্গে। তিনি আসতে বলেছেন পাততাড়ি নিয়ে, সে আসে। এর বেশি তো সে কিছুই জানে না। চুপ করে থাকে।

উত্তর দেয় ইন্দু। বলে, উঁহু, ওর মাইনে নেই। দেখলিনে, হরিপোড়া বাবাকে হাত ঘুরিয়ে বোঝাল, ফ-ক্কা।

ইন্দুর বোন যেন ঘেন্নায় মরে যায়। বলে, আমরা দু'জনে আট আনা করে এক টাকা দিই। না ভাই, ওমনি পড়ি না আর বাকিও রাখি না।

পরেশ, নগেন, ভরতও পিছনে পড়ে থাকবে কেন?—হাঁ, আমরাও দিই জানবি। তেল-নুনের দামের সঙ্গে মাইনেও দিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

তা, বকেয়া মাইনে আর সওদার বাকি টুকে রাখার জন্য হরিমোহনের একটিই জাবেদা খাতা। সে টুকে রাখুন হরিমোহনের যা ইচ্ছে, কিন্তু দাঁড়ালোটা কি? বিভূতি তো হরিপোড়ার হিসাবেরই বাইরে!

পয়লাতেই বড় হেঁট হয়ে গেল যে বিভূতি! বাড়ি এসে মাকে সব বললে। মা বোঝালেন, ও-সব দুষ্টু ছেলে-মেয়েদের কথায় তুই কান দিসনে খোকা।

পরদিন থেকে বিভূতিও ওদের বোঝাতে চাইলে—নারে, আমারও মাইনে আছে। বাবা এলে [illegible]

যাদের বলা, তারা বিশ্বাস করছিল কিনা বোঝা দায়; তবে মাস কেটে যেতেই হরিমোহন পর পর ওর বাবার খবর জানতে চেয়ে উত্ত্যক্ত করে তুললেন।

মহানন্দও তেমনি, চিঠি দেওয়া তাঁর ধাতের বাইরে। হরিমোহন অগত্যা বলতে শুরু করলেন, তোর মাকে বলবি আমার কথা। গ্রামতুতো এই নাতিটির জন্য বেশি উদার হতে গেলে চলে না গরিব হরিমোহনের।

কি কথা, তা তিনি বলেননি। তবে পাঠশালার যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা গুরুর কথা ইশারামাত্রে বুঝতে পারে। আর বিভুটা কি বোকা! লাজুক-লাজুক ছেলেটা বিষয়-বুদ্ধিতে যে নিরেট তাতে সন্দেহ রইলো না। কিন্তু পাকা মাস্টার পোড়াহরি ধীরে ধীরে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা চালিয়ে ওর চোখও খুলে দিলেন। মাকে বিভূতি প্রথম প্রথম বলত হরিমোহনের কথা। মাকে চুপ করে থাকতে দেখে। আর এ[illegible] ব্যাপারও সে লক্ষ্য করে, হরিপোড়া তাকে মাঝে-মধ্যে যে পড়া ধরতেন, পড়, লেখ বলে যে তাগিদটা দিতেন সেটা এবার তার বেলায় বন্ধ। আগে কোন এক বেলা কামাই করলে কারণ বলতে হত। এখন দু'বেলা কামাইতেও তাঁর তাপ-উত্তাপ নেই। প্রতিক্রিয়াটা সহপাঠী-দের মধ্যেও। কেবল সইমার মেয়ে পুঁটিদি ছাড়া আর সবাই যেন ঘেঁষতে চায় না কাছে। কী অপরাধ সে করেছে বুঝতে পারে না। এদিকে মায়ের চুপ করে থাকা একটা অসহায় ভাব। বড় খারাপ লাগে বিভূতির। ধীরে ধীরে হরিপোড়ার গোহাল থেকে সরে পড়ল সে।

সরে পড়ল জীবনের নতুন পাঠশালার পথে। ঘুমডাকা বাঁশবনের মধ্য দিয়ে সে কিশোর এগিয়ে চলে। হরিপোড়ার পাঠশালে নয়, গোঁড়ালেবুর গন্ধ মাখানো, বন-মালতীর রূপ ছড়ানো, ঘেঁটকোলের রেণু জড়ানো সোঁদালির ঝাড় দোলানো, মধু-মল্লীর সৌরভ-বেভুল বনময় ফুলসজ্জার উৎসব-সভায় তার চলা। এখানে তাকে কে

করবে শাসন? কোন পোড়াহারি? বাঁশবাগান থেকে একখানি কঞ্চি ভেঙে হাতে নেয় বিভূতি।

ইছামতীর তীর পর্যন্ত পেঁছে যায়। দূর্বাঘাসের উপর বসে। সাদা ফুলে খোঁপা সাজানো ভেদলা ঘাসের বালারা বিভূতিকে দেখে যেন নড়েচড়ে ওঠে। পাশের হাঁকড়া-বনের ভিতর থেকে কারা যেন আশ্চর্য সুগন্ধ ছড়ায়।

এত ভালো জিনিস এই সবুজে লুকানো! এ খবর কি কখনও পেঁছায় হরিপোড়ার চৌহদ্দিতে? ইছামতীর দুতীর ধরে কেবল সবুজ আর সবুজ। কত সবুজ যে আছে এ-দেশে! আর তার আড়ালে আড়ালে আলো-ছায়ায় ফুল, ফল, পাখিদের রূপকথার রাজ্য। এ যেন আজই তার প্রথম জানা।

ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে কে-জানে কত দূর থেকে আসে ইছামতীর জল! কত সওদা বোঝাই নৌকা, মাল্লাদের ভাটিয়ালি টান, দাঁড়ের ঝপাং ঝপাং শব্দ!

ওই ভেসে উঠলো কি? কচ্ছপ না? বাবার সঙ্গে গোপালনগরের হাটে সে দেখেছে ওদের। কিন্তু সে তো ডাঙায়। ওদের ঘরবাড়ি হল নদীতে। আর সেখানেই কিনা দেখা হয়ে গেল কচ্ছপের সঙ্গে! আবার কান্ড দেখো, কচ্ছপটা 'ভূ-উ-উস' শব্দে কেমন করে নিশ্বাস নিল।

বিভূতির মনে হয়, সে মজা পাবে বলেই যেন এত ব্যাপার হচ্ছে। ইছামতীর সজল-সবুজ আদরে ওর মন জুড়িয়ে গেল। অলক্ষ্য মিতালি হল সপরিবেশ ইছামতীর সঙ্গে এক অবুঝ বালকের।

আর এক জগতের পাঠবিতানে ভরতি হয়ে গেল মহানন্দ-তনয়। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, একে একে অধ্যায়ে অধ্যায়ে নব নব পাঠ। ভাটফুলের ঝাড়ে নতুন অনেক প্রজাপতি, কত রঙ-রেখা আঁকা তাদের ডানায়। একটা কুকোপাখি ডাকছে। এতদিন ডাক শুনে শুনে কত কথাই ভাবতো ওকে নিয়ে। আজ চেনা হয়ে গেল। রাতে বাবার কাছে শুয়ে শুনতে পেত, ইছামতীর দিক থেকে গান ভেসে আসছে। বাবা বলেন, ও মাল্লা-মাঝির গান। আজ ওর সামনে দিয়েই তাবা গেয়ে যায় দাঁড় টানতে টানতে। কোথা থেকে আসে, যায়ই বা কোথায়?

ভাবতে ভাবতে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। কোথায় কোনো বধূ সাজাল দিয়েছে। তার ধোঁয়া উঠেছে চালকুমড়ো লতার বড় বড় পাতার ফাঁক দিয়ে। কাছের গামার-বন্যবুড়ো-তিত্তিরাজের জঙ্গল অন্ধকারে ঘন হয়। বাঁশবনে জোনাক জ্বলে। আকাশে কুমড়ো-ফালির মত চাঁদ। তার ছায়া দোলে ইছামতীর জলে। এ রূপের রাজ্যে পথ হারিয়ে, নিজেকেই বুঝি হারায় বিভূতি। খেই ফিরে পায় আচমকা কার কণ্ঠস্বরে।

ইছামতীর তীরে সেই নির্জন অন্ধকারে এক বুড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে লাঠি ভর করে।—কে বাবা তুমি? চিনতি পারলাম না তো! ঠাওর পাইনে—। সেই ভরসন্ধ্যায় ছাগল খুঁজতে গিয়ে আঁতকে উঠল লক্ষ্মণ জেলের বউ। খানিকটা সোজা হওয়ার চেষ্টা করে বললে—একলাডি কঞ্চি নিয়ে কি করতিছ এখানে?

বিভূতির মুখ দিয়ে কথা সরে না।

ইছামতীর তীর বরাবর জিতেন কর্মকার ফিরছিল গোপালনগরের হাট করে। সে হাজির হয়েই ধরে ফেললে, এ যে কথকঠাকুরের পুত্তুর দেখছি! আমাদের বট-ঠাকুর গো!

অ গোপাল আমার!

বৃদ্ধা জেলেনী কথকঠাকুরের নাম শুনে ভক্তিতে ভিজে গেল। কিন্তু সব্বোনাশ,

সেই কখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছে। ও-পাশে শিমুল গাছটার তলায় সেদিন ক্ষুদে গোয়ালা মারা গেল। জায়গাটার এমনিতেই একটা যেন ছমছমে ভাব। সেখানে একরত্তি ছেলে কিনা একলা বসে আছে! লক্ষ্মণ জেলের বউ বলে, তুমি ওকে হাত ধরে মা-ঠাকরুনের কাছে পেঁাছে দাও জিতু।

সম্মোহিত বালক বাধা দেয় না, তর্ক করে না। সে অবাকবিস্ময়ে ওদের দেখে। কেমন অদ্ভুত এই বুড়ি। ছাগল চরিয়ে ইছামতীর এ তল্লাটের সঙ্গে ওর অনেক বেশি জানাশোনা। আবার এই যে জিতেন কামার, সেও কেমন রোজ এই দূর্বাঘাসের চরাভূমির উপর দিয়ে, ঝোপঝাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে চাঁদের ছায়ার দোলন দেখতে দেখতে ফেরে। এ-সব তার ভাবনা। টেরই পায় না, জিতেন কর্মকার কখন তাকে বাড়ি পর্যন্ত ধরে নিয়ে হাজির। খবর পেয়ে পাড়ার লোক ছুটে আসে দেখতে।

কোথায় ছিলি হতভাগা! মৃণালিনী চোখের জলে ছেলে বুকে নেন।

তবে তা কতক্ষণের জন্যে? কোলে আর একটি মেয়ে এসেছে, মণি। এই আশ্বিনের এগারো তারিখ। এটা বাঙলা তেরশ' আট। মহানন্দ অবশ্য পরে ভাল নাম দিয়েছেন, সরস্বতী।

সে পরের কথা পরে, এখন নেহাৎ কোলের। জাফরিটাও বড় হয়ে ওঠেনি। বড়টিও যদি এত না-বুঝ হয়, একলা ক'দিক সামলাবেন মৃণালিনী! খোকাকে অনেক করে বোঝান। বোঝেও খোকা তখনকার মত। আবার সব গোলমাল হয়ে যায়। কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ইছামতী?

মহানন্দ রঙপুরে। সেখানে দিকপ্রকাশ নামে এক সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে নিজের ভুবনমোহনী নাটিকা ছাপানোর ব্যাপারে ব্যস্ত। ব্যবস্থাটা পাকা করে ফিরতে একটু বেশিই দেরি হল।

বিদেশ থেকে ফিরলে স্বামীকে সব কথা খুলে বলেন মৃণালিনী।

—তাই তো ছোটবউ, এ-বয়সে অমন মতিগতি হলে আখেরে তো আমার দশাই হবে। মহানন্দ ঘাড় নাড়লেন। আঘাত পেয়েছিলেন হরিমোহনের ব্যবহারে। তবু অভাবের গ্লানি তাঁকে নীরব করে রাখলো। দু'একদিন পরেই বললেন, হোক একটু দূর, তবু রাখাল আমার আত্মীয়, সে নতুন পাঠশালা করেছে। তার কাছেই পাঠাবো খোকাকে। তাছাড়া এবার কিছুদিন বাড়ি থেকে নিজেও নজর রাখতে পারবো।

রাখাল বাঁড়ুজ্যের পাঠশালায় মহানন্দই প্রথম দিন নিয়ে গেলেন বিভূতিকে। বিভূতি পাড়ার চেনা ছেলে-মেয়েদের বড় একটা কাউকে দেখতে পেল না এখানে। বেশির ভাগই ইছামতীর ওপারের মাধবপুরের। জাতে কাপালী বা ওই রকম কিছু। চাষীর ঘরের ছেলে ওরা। বাবার প্রতি খুব ভক্তি-ভালবাসা নাকি ওদের। মা প্রায়ই বলেন, বাবা মাধবপুরে গিয়েছেন। গ্রামটি সম্পর্কে ওর বরাবর কৌতূহল। নদীর এপারে বসে ওপারের মাধবপুরের পানে তাকিয়ে ওর নিশ্বাস পড়ত ওরও বিশ্বাস হত, ওপারেই রূপকথার দেশ। মাধবপুরের মাঠটার দিকে চেয়ে চেয়ে এমনি কত কথাই ওর মনে হত। কতদিন, কত মাঝি-মাল্লাকে সে ডেকে নদীটা পার করে দিতে বলেছে। তা কেউ দেয়নি। আর এবার সে ইচ্ছেমতো ওদিকটার সব দেখতে পারবে!

সহপাঠী পার্বতীর সঙ্গে ক'দিনেই ভাব হল বেশ। তার বাড়িও মাধবপুর। জাতে কাপালী। ওর বাপ বেগুন বেচে গোপালনগর হাটে। বিভূতির বেশ লাগে তা ভাবতে। আবার দেখো, কেমন সব ঝিঙে-পটলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ওরা আসা-যাওয়া করে। পার্বতীর সঙ্গে কথা হয়, সেও একদিন ওই পথ দিয়ে তাদের বাড়ি যাবে।

তা যাক, কিন্তু বাপ তো কেবল ঝিঙে-পটলের ক্ষেতে চরে বেড়াতেই পাঠাননি ওকে রাখাল বাঁড়ুজ্যের ইসকুলে। যে-জন্যে পাঠানো তার কন্দুর?

কন্দুর তা অল্পদিনেই বোঝা গেল। ইনসপেকটর মধুবাবু এলেন পাঠশালা পরিদর্শনে। ছাত্রদের আগে থেকেই তৌড়িয়ে রেখেছিলেন রাখাল মাস্টার—সাবধান, সবাই যেন সেদিন সাফ-সুতরো হয়ে পড়া তৈরি করে আসবি। এই পরিদর্শনের উপরই তাঁর পাঠশালার মঞ্জুরি ইত্যাদি ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ইনসপেকটর মধুবাবু যখন সত্যিই পেঁছলেন, সারা পাঠশালা তখন রুদ্ধশ্বাস। ঘুরে ঘুরে দু'চারটা প্রশ্ন যেমন করছিলেন, উৎরেও যাচ্ছিল বেশ। একখানা বই তুলে ধরে বললেন, এটা কি? সমস্বরে সবাই বললে—বই।

বইয়ের আর এক নাম কি?

গ্রন্থ। এবার একটি কণ্ঠ, বিভূতির।

রাখাল মাস্টার খুশি। মধু ইনসপেকটর তির্যক হলেন।—গ্রন্থ বানান করো।

বিভূতি সঙ্গে সঙ্গে বলল—'গ' তাতে 'র' ফলা, তারপর—

—বলো।

—'ন'-এ

—কোন 'ন'?

কোন 'ন'! সর্বনাশ! 'ন' আবার দুটো হতে গেল কেন? ইনসপেকটর, মাস্টারদের কারসাজিতেই যে নানা রকম ন, শ, রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে ওর মনে কোন সন্দেহই রইলো না।

বলবেটা কি। 'ন' না হয় যে কোন একটা বলা গেল। কিন্তু তারপর? 'ন'-এর নীচে ওটা কি? পড়ছি 'থ', অথচ লেখা আছে 'হ'। ক্লাশসুদ্ধ ভেবে আর থই পায় না।

ইনসপেকটর মধুবাবু সবাইকে বসতে বললেন। বিভূতিও বসল। কিন্তু রাখাল মাস্টার যেন গোটা ইসকুল সমেত বসে পড়লেন। ক্ষতির ভার কমিয়ে দিয়ে ক'দিনেই বিভূতি বিদায় নিল রাখাল বাঁড়ুজ্যের পাঠশালা থেকে।

মহানন্দ যুগলক্ষণ বোঝেন। এ-যুগটা স্কুল-কলেজের, কেতাবের, খেতাবের। কিন্তু পাঠশালা-স্কুলে পাঠানোর আগে আর একটু পাকা-পোক্ত করে নেওয়াই ভালো। এখনও বড় অবুঝ খোকা। কিছুদিন কাছে থেকে নিজেই তিনি তালিম দেবেন ঠিক করলেন।

সকাল-সন্ধ্যা কাছে নিয়ে পড়াতে বসেন। রোগ তিনি ধরে ফেলেছেন। বেলা পড়লে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গাছ-গাছালি, পক্ষী-পাখালির জগতে, ইছামতীর পাড়ে।

তারিণী কবিরাজের পুত্র মহানন্দ বিচিত্র বৃক্ষ-লতা-পুষ্পের নাম, গুণাগুণ অনেকের চাইতে বেশি জানেন। এতে সুবিধাই হল বিভূতির। বনমরিচের জঙ্গলটার মধ্য দিয়ে পুত্রের হাত ধরে প্রকাণ্ড, প্রবীণ এক বৃক্ষের কাছে দাঁড়ান পিতা।—এইটে হল সপ্তপর্ণ জুনিপার গাছ। বাবা—তোমার দাদু, ওষুধ করতেন এর বাকলা দিয়ে। আমি ছেঁচে, বেঁটে দিতেম।

বিভূতি অবাক। দাদু কবে হাড়গোড় সমেত শেষ হয়ে গেলেন! আর গাছটার গায়ে বাকলা তোলার দাগগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট। এখনও কেমন ডাল-পালা-ছায়া ছড়িয়ে

খাড়া আছে! খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ দু'হাত তুলে নমস্কার করল গাছটাকে বিভূতি। দাদুর স্মৃতির স্মারক, পুরনো দিনের প্রতিনিধি ওই সপ্তপর্ণ জুনিপার গাছটাকে ওর দেবতার মত একটা অলৌকিক কিছু মনে হয়। পুত্রের এ জাতীয় মানসিকতায় মহানন্দ খুশি।

তবে সব আগাছার নাম তো তারও জানবার কথা নয়। আর সব গাছ নিয়ে অমন ভক্তিরও কোন কারণ নেই। ছেলের কিন্তু ওই এক বাতিক। হাতে বাঁশের কঞ্চি। তা তুলে তুলে এটা কী গাছ, ওটা কী লতা, কোন্ ফুল, গন্ধ কেমন, কিসের ফল খাওয়া যায়, কিসের খেতে নেই, সব তার জানতে চাওয়া।

শুধু তাই? ইদানীং আবার নোট বুকের মত ছোট্ট একটি খাতা তৈরি করা হয়েছে। জামা-প্যান্ট পরে না যে পকেটে রাখবে, কোমরে কাপড় মুড়ে রাখা হয়। নতুন চেনা গাছ, ফুল, লতা, পাখির নাম-গোত্র পেন্সিল দিয়ে টোকা হয় তাতে। পুরো পছন্দ না হলেও বাধা দেন না বাপ। এতে পড়ার উৎসাহটা বরং বাড়ছেই।

বাপ বলেছেন, একটু তৈরি হলেই এবার তাকে গোপালনগরে গগন পালের ইউ পি স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। ছেলে তাই সবাল-সন্ধ্যা পরমোৎসাহে পড়ে। বাপও তাঁর কথা রাখেন, ঘোরেন, বেড়ান, ইছামতীতে স্নান, বিহার করেন ছেলেকে নিয়ে। নীলকণ্ঠ পাখি দেখান নীলকুঠির মাঠে। কুঠির ইতিহাস গল্প করেন। তার পরে বলেন, বড় হলে আরও কত জানবে, ওই দিকে চৌবেড়ে গ্রাম। সেখানে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র নামে একজন নামকরা লোক। নীলকুঠি আর কুঠিয়ালদের সব কথা জানতে পারবে তাঁর 'নীলদর্পণ' বই পড়লে।

নীলকুঠি, নীলকণ্ঠ পাখি, নীলদর্পণ। নীল আকাশের নীচে বসে ভাবতে ভাবতে ওর তন্ময়তা আসে। কোথায় চৌবেড়ে, কে দীনবন্ধু মিত্র? তাঁকে তো সে চেনে না। তিনি লিখেছেন, বড় হলে পড়তে হবে। বাড়িতে এসে পড়ার বই দেখতে দেখতে চমকে ওঠে—এই তো সেই দীনবন্ধু মিত্র। কী সুন্দর কবিতা লিখেছেন—প্রভাত চিত্র! এ তো সবটাই তার ইছামতীর পারের কথা। ভোর হতেই বউ-কথা-কও, কোকিল সব ডাক জুড়ে দিয়েছে, হাঁস চলছে ইছামতীর জলে। ছোটবউয়ের দল বাসন মাজছে ঘাটে ঘাটে, তালে তালে বাজে তাদের তাবিজ, লংগামল। আবার সকাল সকাল পান্তা ভাত খেয়ে, গায়ে কাপড় জড়িয়ে রাখালের দল পাচন হাতে গরু চরাতে চলেছে মাঠে। এ-সব তো তার নিজের চোখে দেখা। অবশ্য সব কথার সে মানে বোঝে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করে—'গজগামিনী-গোয়ালিনী' কাকে বলে? 'হাসছে ব[illegible] রূপের ডালা' মানে কি? আবার কোন কোন কলি তার এত ভালো লাগে যে সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নেয়। বার বার আবৃত্তি করে—

কত কুমারী সারি সারি দুলচে কানে দুল
কানন হতে কচুর পাতে আনচে তুলে ফুল॥

শেষের দিকটায় আরও মজা—

তাড়ী বগলে ছেলের দলে পাঠশালাতে যায়
পথে যেতে কোঁচড় হতে খাবার নিয়ে খায়।

এই কলি ক'টি পড়তে পড়তে ছেলের দলের মধ্যে নিজেকেও যেন দেখতে পায় বিভূতি। তবে আর দেরি নেই তার। বিভূতির ভর্তির কথাবার্তা বলে এসেছেন বাপ গগন পালের সঙ্গে। সেই সঙ্গে নিজের ভর্তির কথাও। কিছুদিন কাছে থেকে ছেলেকে তিনি স্কুলে ধাতস্থ করাতে চান। কিন্তু যা টানাটানির সংসার তাঁর, তাতে

কেবল ছেলের সঙ্গে দিন কাটালেই তো চলবে না। একটা রোজগারের ব্যবস্থা চাই। 'শাস্ত্রী'মানুষ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প বেতনে, অস্থায়ীভাবে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিয়ে নিলেন তাঁকে গগন পাল। শুভদিন দেখে পিতা-পুত্র হাত ধরাধরি করে গোপালনগর ইউ পি-র পথে চললেন। ওদের পথের দিকে চেয়ে মৃণালিনী বোধহয় হাসেন মনে মনে। দু'জনেই ঘোরনচণ্ডী, বাঁধন ছেঁড়া। আর এমন মজা, ছেলেকে বাঁধতে বাপ নিজেও কেমন বাঁধা পড়লেন! মৃণালিনী হাজার বলে হাল ছেড়েছিলেন। এবার দেখো, বিনি সুতোর বন্ধন। এটা উনিশ শ' পাঁচ সালের কথা।

একটা তুঁতগাছতলায় স্কুলবাড়ি। চৈত্রের তপ্ত দিনে তুঁত ফল ঝরে পড়ে। রাঙা রাঙা শুঁটির মেলা চারদিকে। সবাই বলে তুঁততলার ইস্কুল। সবাই বলতে ছাত্ররা বাদে। কুমোর পাল গগনকে তারা বলে হাঁড়ি-বেচা মাস্টার, তাঁর স্কুল। এসব গোপন-কথা দু'দিনেই সহপাঠীরা উৎসাহে জানিয়ে দিল বিভূতিকে।

ছাত্রদের মধ্যে পাড়ার চাটুজ্যে বাড়ির হরিপদ, নগেন, ইন্দু, পরেশ ছাড়াও আফজল, গৌর কলু, নেপাল মাঝির ছেলে জিতেন, এরা ছিল বিভূতির সহপাঠী। বারাকপুর ছাড়াও সদানন্দপুর, চিত্রাঙ্গপুর, আরামডাঙা, নাতিডাঙা ইত্যাদি পাঁচ গাঁ থেকে আসত সবাই পড়তে। আসত তারা নিজ নিজ গাঁয়ের নানা বার্তা-বৈচিত্র্য নিয়ে। এ বৈচিত্র্য ভালো লাগে বিভূতির।

স্কুলের পথটাও ওর মোটামুটি পছন্দ। বড় একটা বটগাছ, আম বন, বড় বড় কুকুরে-আলুর লতা। সেগুলি আবার ঠিক পদ্ম-গুরুচের মত জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে গাছের গায়ে। কোথাও বা কুঁচ ঝোপ, ঘন আবওয়াবের জংগল। কাঁঠাল ঝুলছে গাছে গাছে। এদিকে আবার ইছামতীর বাঁওর। সেখানে কচুরিপানার দাম। পার ঘেঁষে সারি সারি বাবলা গাছ। সোনালি ফুল দোলায় হাওয়ায় হাওয়ায়। ঘেঁটু ফুলের ভুরভুর গন্ধ। সঙ্গে বাবা না থাকলে মাঝে মাঝে স্কুল পালিয়ে কাটাতে পারতো পথে পথে ঘুরে।

অবশ্য ছেলের আগেই বাপ স্কুল পালাতে শুরু করেন। কথকতার ডাক এলে আর স্থির থাকতে পারেন না মহানন্দ। এই করে করে বছর না ঘুরতেই তিনি স্কুল ছাড়লেন।

ছাড় পেল ছেলেও। পথের পাশে চড়কতলায় মেলা বসেছে। লাঠি খেলা, জেলেদের কাঁটা ভাঙা, বান ফোঁড়া এসব চলছে হরদম। ওর মত আরও অনেককেই সেখানে দেখতে পায় জমে যেতে। মাটির রঙ করা ছোরা, মাটির পাল্কি, বাঁশের বাঁশি, ভেঁপু, তেলেভাজা, জিলিপি—কেনার মত কত জিনিস। ছোটদের ভিড় সেদিকটাতেই বেশি। কিন্তু শূন্য হাত মহানন্দ-পুত্র সেদিক থেকে ফিরে আসে, যাত্রাগান হচ্ছে—গোষ্ঠবিহার পালা, সেখানে এসে বসে।

সে রকম আসরে অবশ্য সহপাঠী-সমবয়সীদের পাওয়া যেত। যেমন পাওয়া যেত চু, কপাটি বা গাদি খেলার সময়। শুকনো দিনে, মাঠে-ঘাটে, ইছামতীর পাড়ে। বাদলার দিনে পাশের বাড়ির যুগল খুড়োদের ঢেঁকিশালে ভরত, নেড়া, ইন্দুদের খেলার জন্য জোটানো: কখনও বকুলতলায়, বিলবিলের ধারে বা যুগল বোষ্টমের কামরাঙাতলায় দৌড়-ঝাঁপ। এতে যখন মন লাগতো, সঙ্গীর অভাব হত না। তাই বলে সব কাজে কি সঙ্গী পায়?

'হাঁ রে বিভু, থামলি কেন? দেরি হয়ে যাবে যে!—গোপালনগর স্কুলের পথে যেতে যেতে সহপাঠীরা তাড়া দেয়।

বিভূতির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি যেন ভাবে, হাতের কঞ্চিটা দোলায়। তার পরেই উল্টো পথ।—তোমরা ইস্কুলে যাও, আমি যাবো না।

সে কি, কোথায় যাচ্ছিস?—ওরা অবাক।

যাবো এক জায়গায়, সে আমি ভেবে রেখেছি। রহস্যাচ্ছন্ন উত্তর বিভূতির।

সে রহস্য ওদের বোঝা হয়ে গিয়েছে। যাবে, চটকাতলার বাঁওড়ে, ইছামতীর পাড়। নয়তো, দেয়ারের মাঠ, চাইকি ওই ভূতুড়ে নীলকুঠীর মাঠে-জঙ্গলে। সেখানে গিয়ে টো-টো ঘুরবে, নয়তো হাঁ করে বসে থাকবে চৌপ'র দিন।—ওর মাথা খারাপ, বলে আর সবাই স্কুলের পথে এগিয়ে যায়।

স্কুলের পড়াতেও কি ওকে ছাড়িয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারে? মহানন্দ-পুত্রের খেয়ালের খবর হেডমাস্টার গগন পালের কানেও আসে। কিন্তু চোখে তিনি দেখেন—পরীক্ষার শ্লেট-খাতায় আশ্চর্য মেধার স্বাক্ষর। মৌখিক প্রশ্নের উত্তরে উজ্জ্বল বুদ্ধির দীপ্তি। প্রথম পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছে শাস্ত্রীমশায়ের ছেলে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে হেডমাস্টার বলেন, সবই ঠিক আছে, কেবল আপনি একটু নজর রাখবেন।

দশ ঝামেলায় ইচ্ছানুরূপ না পারলেও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না বাপ। বিভূতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র; সে নিবে গেলে সংসারটা তো অন্ধকার! মহানন্দর স্বাস্থ্যটা ক্রমে ভেঙে পড়ছে। মা, দুটি ছোট বোন, আবার এ বছর একটি ছোট ভাই হয়েছে বিভূতির, নুটু—নুটবিহারী। জন্ম তারিখটা মহানন্দর খাতায় লেখা—আট শ্রাবণ, সোমবার, তেরশ' বারো। এদের সবার দায় তো বড়কে, বিভূতিকেই নিতে হবে। বয়সটা হিসাব করে দেখলেন—... ... তাঁর বাবোতে পড়ল। এবার ব্রাহ্মণযোগ্য কতকগুলি দায়িত্ব চাপাতে হবে ওকে। দিনক্ষণ দেখে পুত্রের উপনয়নের আয়োজন করলেন তিনি।

বিভূতির সে কী রোমাঞ্চ! তার পৈতে হবে! সহপাঠী, সমবয়সী সবাইকে খবরটা জানিয়ে আমন্ত্রণ করে এলো। ইছামতীর পাড়ে বসে বাঁশের কঞ্চিটা দিয়ে জলে দাগ কেটে নদীকেও সে শুনিয়ে দিলে—জানো, আমার পৈতে হবে?

পুত্রের এ-জাতীয় উৎসাহে নিমন্ত্রিতের একটু সংখ্যাধিক্যই ঘটল। তাতে দরিদ্র বাপ যে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন না এমন নয়। তবু হোক না, খোকার মনে তিনি দুঃখ দিতে চান না। ক'দিন ধরে পুত্রকে তিনি ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্ম, আচার-বিচার, রীতি-করণাদি সম্পর্কে যথাবিহিত উপদেশ দিলেন। পুত্র তার দ্বিজত্ব পেল ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে। উপবীতানুষ্ঠান সম্পন্ন করে মহানন্দ তাঁর দিনলিপিতে লিখে রাখলেন—

'শুক্লপক্ষ চন্দ্র ফাল্গুন আমার পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীর উপনয়ন সন ১৩১৩ সাল ৫ই ফাল্গুন রবিবার পঞ্চমী তিথিতে দেওয়া গেল।—বারাকপুর, ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭।'

পৈতের পরে সূর্যাস্তের পূর্বে দ্বিজের একাধিকবার আহার নিষিদ্ধ। খিদে হয়ত লাগে বিভূতির, কিন্তু বোধ থাকে না। ব্যাপারটা ধরা পড়ল একদিন রায়বাড়ির ইন্দুদের ওখানে। আর তার যে করুণ পরিণাম, ইন্দু, বিভূতি বা মৃণালিনী কেউই তা জীবনে ভুলতে পারেননি।

স্কুল থেকে ফিরে চু খেলার জন্য ইন্দুদের উঠোনে অপেক্ষা করছে বিভূতি। ইন্দুর মা ঘরে ডেকে নিলেন, হাতে বই দেখছি, স্কুল থেকে বাড়ি যাওনি?

না, খেলা সেরে একবারে হাত-পা ধুয়েই ঘরে যাবো।

সে কি, সদ্য পৈতে হয়েছে, বিকালে কিছু না খেয়ে থাকবে কি করে!—ইন্দুর মা ওকে ঘরে ডেকে নিয়ে ইন্দুর পাশে চিড়ে, গুড়, নারকোলকোরা দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

বিভূতি সেদিন গোগ্রাসে খেতে খেতে আবিষ্কার করল, তারও খিদে পায়।

অবুঝ ছেলে রাতেই মাকে পাকড়াও করে, সেও রোজ স্কুল-ফেরত ইন্দুদের মতো জলখাবার খাবে। ছেলের বায়না শুনে মা মৃণালিনী দীর্ঘশ্বাস চাপেন।

পরের দিন স্কুল ফেরত ছেলে সটান বাড়ি হাজির। যেন কোন রাজসূয় যজ্ঞ হচ্ছে। বাড়িতে আজ জলখাবার হচ্ছে, এই বিরাট ঘটনার কথা বন্ধুদের কি না বলে থাকা যায়? ইন্দুকে নিয়েই হাজির বিভূতি।

লজ্জায় মরে গেলেন মৃণালিনী ইন্দুকে দেখে। ওরা জমিদার, সীতানাথ রায়ের ছেলে ইন্দু। বড়লোকের ছেলের হাতে বিভূতির জলখাবারের এই খুদভাজার ভাগ কি করে তুলে দেবেন তিনি! কিন্তু উপায় কি? ইন্দুও যে কোঁচড় পেতেছে বিভূতির পাশে! দুজনের কোঁচড়েই সস্নেহে সেই খুদভাজা ঢেলে দিলেন মা মৃণালিনী।

বিভূতি পরম আনন্দে খুদভাজা চিবোচ্ছে। কিন্তু ইন্দু চুপচাপ যে!

কি রে, খাচ্ছিস না?—বিভূতি প্রশ্ন করে ইন্দুকে।

তোরা বুঝি শুধুমুদু খুদভাজা খাস? রায়বাড়ির ইন্দু ঠোঁট বাঁকায়।

'ও,' বিভূতি বুঝে নেয়, 'দাঁড়া, তোকে তেল এনে দিচ্ছি।' বিভূতি লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢোকে। কিছুক্ষণ কেটে গেল। আর বেরোয় না কেন? দাঁড়িয়ে থেকে থেকে, বিভূতিকে ঘরের মধ্যে খুঁজতে গেল ইন্দু। দেখে, একটা ভাঙা তক্তপোশের কাছে দাঁড়িয়ে বিভূতি কাঁদছে। জল বুঝি ওর মার চোখেও।

মৃণালিনী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সস্নেহে ইন্দুকে কোলের কাছে নেন। আজ ঘরে তেল বাড়ন্ত বাবা। কাল এসো, তেল দিয়ে মেখে দেবো, কেমন? কিন্তু কতটুকুই বা বয়স ইন্দুর! ভদ্রতা-অভদ্রতা কাকে বলে জানেই না এখন পর্যন্ত।

'ছাইয়ের জলখাবার,' বলেই কোঁচড়ের খুদভাজা উঠোনে ছড়িয়ে দিল ইন্দু। তারপরেই হন হন করে বাড়ির দিকে চলে গেল।

বিভূতি হতবাক। মৃণালিনী কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

দারিদ্র্য যে কী দুঃসহ, কী অপরিসীম গ্লানিবহ, সে তো প্রতিক্ষণের ওঠা-বসায়, নিত্য দিনের কাজে-কর্মে হোঁচট মেরে বুঝিয়ে দেয় তাদের। এর দহন মুখ বুজে সব সহ্য করতেন মাতা মৃণালিনী। আর প্রার্থনা করতেন ঈশ্বরের কাছে, দারিদ্র্যের দুঃখ যেন তাঁর সন্তানদের চলার পথের কণ্টক হয়ে না দাঁড়ায়।

আর কেউ না বুঝুক, ওদের দুঃখ বোঝে এই প্রকৃতি। বারাকপুরের অরণ্য-জঙ্গল নানা ফলে তৃপ্তি দিয়েছে মৃণালিনীর সন্তানদের। নিজে বিভূতি ঘুরে ঘুরে তা সংগ্রহ করে, জাহ্নবী, মণিদেরও খাওয়ায়। আর ভাবে, নুটু বড় হলে সাকরেদ করে নেওয়া যাবে। জাহ্নবী একটু বড় হয়ে উঠলেও বড্ড ভীরু বেচারা। বনের দিকে পা' বাড়াবে না। পাড়ার সমবয়সীরা তো অনেকেই প্রায় ওকে পাগল ভেবে এড়িয়ে চলতে চায়। বিভূতিও এড়িয়ে চলে। স্কুল কোনরকমে ছুটি হলেই সে উধাও সেই বনাবৃত ইছামতীর জগতে।

তবু স্কুলেও বুঝি হঠাৎ ভালো লাগার লগ্ন আসে। গোপালনগরের পথের পাশে হঠাৎ দুলে ওঠা কোন সূর্যমণি ফুলের মত এক আশ্চর্য অনুভবের দোলা লাগে। হেডমাস্টার গগন পালের কণ্ঠে উচ্চারিত একটি কবিতা একদিন তার চিত্তলোকে তেমনি দোলা জাগালো। এক একটি শব্দের ধ্বনিবিস্তারে যেন একটি একটি করে পুষ্পবিকাশ ঘটে। রূপসাগরে মনকে ভাসায় তার ছন্দের হিন্দোল। এ কোন অশ্রুত-পূর্ব সংগীত! মন্ত্রমুগ্ধের মত বিভূতি শুনে যাচ্ছে—

আজি কী তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে!
পারে না বহিতে নদী জলভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক' আর—
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল তোমার কাননসভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী, শরৎকালের প্রভাতে।

দাশু রায়, নীলকণ্ঠ, শ্রীধর কথক, মধু কানের অনেক ছড়া বাবার মুখে শুনে শুনে তার মুখস্থ। কবি-জারি-যাত্রাগানও শুনেছে কিছু কিছু। গুরুজনদের রামায়ণ-মহাভারত পাঠও কানে আসে বইকি। পাঠ্য বইয়েও তো কবিতা আছে। দীনবন্ধু মিত্রর 'প্রভাত চিত্র' তার ভালোই লাগে। কিন্তু হাঁড়ি-বেচা মাস্টার এ কী শোনালেন আজ তাকে! এ কি কবিতা? না, গান? কলিগুলি যেন এক মায়ালোক সৃষ্টি করল তাকে ঘিরে। গগন পাল বললেন : কবিতাটির নাম 'বঙ্গে শরৎ', আর লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবীন্দ্রনাথ' নামটি জীবনে এই প্রথম শ্রবণ। সে কি শুধু শ্রবণ? সে এক সম্মোহন। সারাজীবনের জন্য ওই নামের সঙ্গে প্রাণ-মনের এক আলোক-বন্ধন ঘটল সেদিন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন হতে বিভূতিভূষণের বাল্য-মনের রঙে রাঙানো কল্পলোকের দেবতা হয়ে রইলেন।

সেদিন কি জানতো বিভূতি, সে যখন মাত্র দশ মাসের শিশু, সেদিন তারই ইছামতীর শান্ত ঢেউ তালে তরণী ভাসিয়ে গিয়েছিলেন তার এই কল্পলোকের দেবতা। ছোট নদীটির উপর সেদিন ছিল ঘন বর্ষার সমারোহ। 'বোটে' বসে তিনি লিখছেন —'এই আঁকা বাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোট খামখেয়ালি বর্ষা-কালের নদীটি—এই যে দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি-সারি গ্রাম—এ যেন একটি কবিতার কয়েকটা লাইন, আমি বারবার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং বারবারই ভালো লাগছে।'

সেদিন ছিল নয় জুলাই, আঠারশ' পঁচানব্বই। ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা ছিন্নপত্রের সেই স্মরণীয় চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার মনে যাচ্ছে।'

কেন এমন হল? বিভূতিরও আজ কেন মনে আপন মনে হয় সবুজমেখলা এই ইছামতীকে? হাওয়া সেদিন বার বার বাঁধন লেখা কাগজগুলি উড়িয়ে আনতে চাইছিল। আজ হলে বিভূতি তরণী বেয়ে তুলে ধরে ছোটে। হয়ত সেদিন তো সে নেহাৎ ছোট দশ মাসের মাত্র।

কিন্ত মা মৃণালিনী সেদিন অষ্টাদশী বধূটি। আরও আরও মেয়ে-বউয়ের মত বাসন মাজা, গা-ধোওয়া হাসি-গল্প নাওয়া-ওঠার-ঘাট তো তাঁরও এই ইছামতী। ঘাটে কার তরণীর ঢেউয়ের দোলা লাগে, কে তার খবর রাখে। ঘাটের খবরও নেয় না কোনো নেয়ে। শুধু যেতে যেতে আর এক মৃণালিনীর স্বামীর হাতে লেখা হয়—'স্নানের সময় মেয়েরা যেসব গল্পগুজব নিয়ে আসে, সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়।'

সে-সুরের দোলা ঘাট আর তরণীর মাঝখানে সেদিন হয়ত আন্দোলিত হয়েছিল কিছুক্ষণ।

ইউ পি স্কুলের পাঠ শেষ। বিভূতি এখন অরণ্যের মত অশাসিত, ইছামতীর ন্যায় উচ্ছল, পাখির মত মুক্ত।

বাপ তাকে কী দিয়ে বাঁধবেন। নিজে ঘোরেন অর্থের ধান্দায়। গাঁয়ে বা কাছে-পিঠেও আর বেশি লেখাপড়া শেখানোর মত স্কুল নেই। ইংরাজি বড় স্কুল আছে সেই সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে বনগাঁ শহরে। অতএব ঘরের দু'চারখানা পুরাণ-পাঁচালী, রামায়ণ-মহাভারত আর মাধবীকঙ্কণ, সীতার বনবাস জাতীয় কয়েকখানা বই ছাড়া ছেলেকে কী তিনি পড়তে বলবেন!

তা মোটামুটি তো হল। পৈতেটাও যখন দেওয়া গিয়েছে, এবার পুজো-আর্চা, যাজনিক কাজটা একটু ধরাতে পারলে হয়। তবে ক'টা দিন যাক। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সাবধানে থাকতে, বিশেষ করে বড়টিকে সামলে রাখতে বলে মহানন্দ বেরিয়ে পড়েন।

ছোটদের পারলেও বড়টিকে কি করে সামলাবেন মৃণালিনী? দরজায় খিল এঁটে? খিল তিনি এঁটেই দেন, ঘরে এবং বাইরে দুটো দরজাতেই। আর বলতে কী, বাইরের দরজাটা তো স্থায়ীভাবেই খিল দেওয়া। একদা তারিণী বাঁড়ুজ্যে ইঁট মাটি দিয়ে দেওয়াল তুলেছিলেন ভদ্রাসনের চারদিকে। শক্ত কাঠের দরজা লাগিয়ে ছিলেন সামনে। দ্বারিক কর্মকার ছিল পাকা মিস্ত্রি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঘোড়াগাড়ির চাকা তৈরি করত সে। তার ছেলে নফর, বাপের কাছে তালিম নিয়ে কুঠিয়ালদের কাজ করতে বারাকপুরে আসে। তার হাতে তৈরি দরজা। এখনও তার গায়ে লেখা—বঙ্গাব্দ ১২৭৮—নফরচন্দ্র কর্মকার। এসব ইতিহাসের সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে খিল আঁটা দরজাটা। যা বলছিলাম, এ দরজার খিল তো দেওয়াই থাকে। খোলার দায় কারো নেই। কারণ এতদিনে দু'পাশে ইঁট-মাটির দেয়াল খসে খসে বাইরে ভিতরে সদর-সড়ক হয়ে গিয়েছে। দরজার দু'পাশে যাতায়াতের প্রশস্ত পথ। সুতরাং দরজায় যেমন খিল, পথও তেমনি দরাজ খোলা।

আর সে পথ দিয়েই বিভূতি বেরিয়ে পড়ে ইছামতীর জগতে।

ঘেঁটকোল, ভাঁটুই, উলটি-বাঁচরা, বৈঁচির জগতে এসেই ওর মনটা ভরে যায়। ওরা যেন কথা কয়ে ওঠে—এই যে, এসেছো!

সে-কিশোর ওদের সঙ্গেই আপনমনে সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন-কল্পনাব কথা বলে চলে। জানতে চায়—গল্প শুনবে? কিন্তু যত সহজে শুরু করা যায়, ততো সোজা নয় শেষ করা। ধীরে ধীরে কখন গোধূলি আসে। ঘেঁটু ফুলের পাপড়ির মত জ্যোৎস্না ফোটে। দেখতে দেখতে বিভূতির গল্পও খেই হারায় আর এক রূপকথার রাজ্যে। আর একদিন হবে বলে উঠে পড়ে সে।

এমনি কিস্তিতে কিস্তিতে ওর গল্প এগোয় লতাপাতা, গাছ, ফুল, পাখিদের আর ইছামতীর সঙ্গে। আর সে গল্পের ভাষাও চমৎকার। যেমন—'সন্ধ্যা হল'র বদলে বলবে 'সন্ধ্যা সমাগত হইল' বা 'সূর্যদেব রক্তিমবর্ণ ধারণ করিলেন।' শব্দগুলি ঘরের মাধবীকঙ্কণ, কাদম্বরীর বঙ্গানুবাদ বা ভারত উপাখ্যান্-এর। পিতার পাঠ থেকে শোনা এবং শেখা।

ইছামতীর জল কখন বাড়ে, কখন নামে, কোন জংলা গাছের কী নাম, কোন ফুল কখন ফোটে, গন্ধ কেমন, সব যেন ওর জানা। পাখির কথা? এ-নিয়ে তর্ক চলবে না ওর সঙ্গে। কেবল লেজটা দেখতে পেলেই বলে দেবে, শ্যামা, শিকাঁল না বউ-কথা-কও। একদিনে কি আর চিনেছে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে তবে না জানা। ভরত বলে, বল্ দিকি গাঙশালিক কোথায় থাকে? ন্যাড়া বলে আকাশে। কালী বলে গাঙে।

ওরা কিসসু জানে না। বিভূতি আবিষ্কার করেছে, ওরা থাকে ইছামতীর পাড়ে গর্ত করে। দেখবি, আয়।

পুঁটিদির মা—সইমা বলে, বেলেডাঙা চিনিস? সেখানে এক রোজা আছে আইনদ্দি মণ্ডল? দু' মার বাবদে বিভূতিরও সইমা দু'জন। তবে এখানে সইমা বলতে মৃণালিনীর সই—পুঁটিদি ও ভরতের মা কাদম্বিনী। বেলেডাঙা চেনে বইকি, নীলকুঠির মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আইনদ্দিকে চেনে না বিভূতি। রোজা কাকে বলে তাই জানে না। তাতে কি, আজই জেনে নেবে। পুঁটিদির হাতের একটা ঘা কিছুতেই শুকোচ্ছে না। তার জন্য তেলপড়া আনতে হবে আইনদ্দি রোজার কাছ থেকে। এ-রকম একটা কাজে ও আগ বাড়িয়ে চলে। একাই হন হন করে মাঠ পেরিয়ে পেঁৗছে গেল বেলেডাঙা। আর কী আশ্চর্য, মাঠের পরে ঠিক গ্রাম শুরু হতেই আইনদ্দির বাড়িটা। বনফুলের সুবাসভরা পথ দিয়ে যেতে যেতে সবুজ মাঠ, তার পরেই ছবির মত এ-বাড়িটা যেন স্বপ্নকুটির। আর সেখানে যে থাকে, সেই আইনদ্দি যেন আরও আশ্চর্য মানুষ। সুতরাং তেলপড়া আনতেই একদিনে ওর যাতায়াত শেষ হতে পারে না। সুযোগ পেলেই ওই পথ দিয়ে সে আইনদ্দির বাড়ি যায়। সে-ও ওর চাচা হয়ে গিয়েছে। আর সেই সুবাদে আইনদ্দির ছেলে আহাদ ওর বন্ধু হয়ে গেল। ওরাও বিভূতির বাবা কথকঠাকুরকে চেনেন, শ্রদ্ধা করেন। বিভূতিরও কি শ্রদ্ধা কম আইনদ্দির প্রতি! হাঁ করে ওর গল্প শোনে।

আইনদ্দি ওকে গল্প শোনায়, বহুরূপী সেজেছি বাপু, কাটা মুণ্ডুর খেলা খেলেচি, নাগরদোলা ঘুরিয়েচি।

উফ্! গা শিউরে ওঠে বিভূতির। তোমাকে চাচা, অনেক অনেক দূরের লোক জানে? অনেক অনেক দূরে খেলা দেখাতে গিয়েছ?

এ-রকম প্রশ্নে আইনদ্দি বড খুশি হয়। বলে, শোনো তবে আমায় কত গাঁয়ের লোক চেনে। এই কাটকোমরা, ইছেপুর, মৌটারি, শুলকো, হানিভাঙা—তার তালিকা আর শেষ হয় না। বিভূতি ভাবে ওই পথে পথে সেও ঘুরে আসবে। তবে সে-ব্যাপারে চাচার চেলা হওয়াই সুবিধাজনক। তা তো অমনিতে হবে না। আগে একটু ভাব জমানো দরকার ওর সঙ্গে।

আইনদ্দি ওকে বলে, তা লাঠিতে বন্দুকে মরব না, আমার গুরুর কৃপায়। আগুন খাবো, শূন্যে উড়ে যাবো, মুণ্ডু কেটে আবার জোড়া দেবো।

বলো কি চাচা! ভয়ে বিস্ময়ে বিভূতি উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

হাঁ, আইনদ্দি দাড়ি দুলিয়ে হাসে। তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে গুণ ছেল শরীলে। ওই যেখানে চটকাতলার সায়ের, ওখানে এক সন্নিসি এসে আস্তানা বাঁধে আজ চল্লিশ বছর আগে। আমার তখন অনুরাগ বয়েস। তিনিই আমার ওস্তাদ।

শুনতে শুনতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। দূরে মেঘভরা আকাশের নিচে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের সারি কী এক রহস্য রূপ ধরে চোখের সামনে। ছমছম শরীরে কিশোর পথে নামে। কুঠির মাঠের জঙ্গলে তখন ঘন অন্ধকার। তার মাঝ দিয়ে আনমনা বিভূতি ঘরে ফেরে।

বাপ মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে বেরোন ওকে সামলাতে। ওদিকে চাকদা শিমুরালি, মনসাপোতা, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর পর্যন্ত। এদিকে, কলকাতা, আড়ংঘাটা, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা। কলকাতায় বউবাজারে বসুমতী ছাপাখানা দেখাও হয় ওইভাবে। কোথা থেকে নানা বই বেরোয় তা দেখার বায়না ধরেছিল ছেলে। মহানন্দ তা দেখান।

কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপেন। ছেলের হাতে ক'টা বই তিনি তুলে দিতে পারেন! পারেন না বলে বুঝি ছেলে বারাকপুর-আরণ্যক পাঠ করে, ইছামতীর স্রোত তাকে টানে।

সইমার ছেলে ভরত নৌকা চাপার লোভে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গ নেয়। খেয়া নৌকার পাটনীর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছে বিভূতির। তার কাছ থেকে বৈঠা ধরতে শিখেছে। হাটের দিন হাটুরেদের বইতে পাটনীর হাত যখন বিশ্রাম নিতে ব্যাকুল, ভরতকে নিয়ে বৈঠা ধরে বিভূতি, হাটুরেদের পারাপার করে। দিগম্বর পাড়ুই ছিল খেয়াদার। বিনে বকশিশে দু'দুটো মাল্লা পেয়ে সেও খুশি। হাটের দিন নৌকার গলুইয়ে বসে তামুক টানতো ক্লান্ত দিগম্বর। নৌকা বাইতো বিভূতি আর ভরত। আর হাট যেদিন না থাকতো, ওদের কিছুটা ফালতু বাইতে দিত সে। বেলেডাঙা, সাইলেপাড়া, সুন্দরপুরের দিকে, নয়ত চটকাতলার বাঁওড় ছাড়িয়ে সেই মরগাঙ বা চালতেপোতার দিকে চলে যেত। ইছামতীর প্রতিটি ঢেউ, তার জোয়ার-ভাটার মর্জির সঙ্গে ওর এভাবে মিতালি হয়ে যায়।

পাশের বাড়ি জামাই এসেছে। বিভূতি হাজির। দু' মিনিটে ভাব জমিয়ে নতুন জামাইকে বলে, আমাদের গাঁয়ে একটা ভারি সুন্দর দেখবার জিনিস আছে, যাবেন দেখতে?

ব্যাস, নতুন জামাইকে নিয়ে ইছামতীর পারে, কুঠির মাঠে। পুরানো দাঁতবারকরা দেয়ালের কিছু অবশিষ্ট, নীলকর সাহেবদের সেই ইঁট-পাথরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে এক পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার খুলে দেওয়ার ভঙ্গিতে বিভূতি বলে চলে বাবার কাছে শোনা নীলকুঠির ইতিহাস। এর প্রতিটি রঙের চৌবাচ্চা, প্রকাণ্ড কড়াগুলির ভাঙা মরচেপড়া লোহখণ্ডসমূহ, কুঠির বালাখানার থাম, সিঁড়ি, ভাঙা জানালা, শার্সি—প্রতিটির ইতিবৃত্ত যেন ওর নখদর্পণে। বাপের বাকবিভূতিরও কিছুটা পেয়েছে বিভূতি এরই মধ্যে। আগন্তুকরা মুগ্ধ ওর বর্ণনায়। তারা ওকে উৎসাহ দেয়, বাঃ, তুমি তো অনেক কিছু জানো দেখছি, তারপর? বলো!

বিভূতিরও উৎসাহ বেড়ে যায়। দূরে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই হল বাঁদিগ্রাম। বুনোরা থাকত ওখানে। মুঙ্গের থেকে সাহেবরা ওদের এখানে এনেছিল নীলের কাজ করাতে। সাহেবরা বুনো বলত না, বলত সরদার। ইয়া অসুরের মত চেহারা। দু'হাত ছড়িয়ে সেই চেহারার একটা ছক তুলে চোখ দুটি গোল গোল করে ফেলত কিশোর বক্তা। তারপর বলত, পাগলা সরদার ছিল না? পরে সে ডাকাতি করত। বনবন করে সড়কি ঘুরত হাতে আর হুটপুট মুণ্ড, ছিটকে পড়ত চারদিকে!

তাই নাকি, শ্রোতারাও চমকে ওঠে। জানতে চায়, পাগলা সরদার এখনও আছে কিনা।

না, না। ও আশ্বস্ত করে। সাহেবদের সাথে ওদের যে লড়াই হল, তাইতেই মরে গেল। কত লোক যে মরল। সরদার, সাহেব দু'পক্ষেই বহু লোক মারা যায়। সেই থেকে বাঁকিগ্রাম খালি। আর সাহেবদের যারা মরল, এখানেই কবর হল। বাকিরা হাওয়া।

দূরে সত্যিই কয়েকটি কবর আছে। নবাগতদের প্রশ্ন—ওই বুঝি তাদের কবর?

না। ওখানে যে তিনটে কবর, ওরা ভাল লোক ছিল, লালমোহন, ফালমোহন আর গয়ামেম। সাহেবদের অমনি নাম হয় নাকি? শ্রোতাদের হাসি পায়।

বক্তা বিজ্ঞের চালে বলে, না, ও নাম নয়। নাম লালমুর, তার ছেলে ফালমুর নাকি ফারমুর আর তার বউ গয়ামেম। গয়ার ভাল নাম সে জানে না। তবে ওরা খুব ভাল লোক ছিল। গাঁয়ের লোকদের ভালবাসত ওরা।

শ্রোতারা অবাক। এতটুকু বয়স, অথচ এত ওর জানা! এমন সুন্দর বলতে পারে! ইছামতীতে ওকে নিয়েই নাইতে আসে তারা। ও তাদের ডেকে আনবে বনসিমতলার ঘাটে। ঘাটের পাশের কেলেকোঁড়ার লতা, ঢোলকলমি, বন্যবুড়োর ঝোপ এমনভাবে দেখাবে যেন ওর নিজস্ব নারসারি। সবার উপরে ইছামতী, এ যেন ওর জন্ম-জন্মান্তরের। এমনভাবে ইছামতীর কথা বলবে, যেন এমন নদী কোথাও খুঁজে পাবেনাক তুমি। বেলা পড়লে ওদের নিয়ে দিগম্বর পাড়ুইয়ের নৌকো চড়াবে। এমনি করে মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন বেশ কাটে ওর। আর কয়েকটা দিন কেন, এরই মধ্যে পাকাপাকিভাবেই একটা বেশ ব্যাপার ঘটল ওর জীবনে। সেটা ধূম্রপান।

তখন মাত্র বছর চোদ্দ বয়স। খেলার সাথী পুঁটিদির বিয়ে হয়ে গেল। বরের নাম রামচন্দ্র। পুঁটিদির সূত্রেই রামচন্দ্রর সঙ্গে এক অসম বন্ধুত্ব গড়ে উঠল বিভূতির। তা শ্বশুরবাড়ি এলে একটু বিলাসিতা করতে হয়। রামচন্দ্রর পকেটে করে বারডশাই সিগারেট আনত। তার কাছেই সিগারেটের চেলাগিরি শুরু হল বিভূতির।

স্বাদটা অবশ্য অনেক আগেই পেয়েছিল, তবে সে মাত্র একবারের জন্য এবং সে অভিজ্ঞতাটাও সুখকর নয়। তখন আরও ছোট, বছর দশেক বয়স মাত্র। সীতানাথ রায়েদের বাড়িতে রাসের যাত্রা। কৃষ্ণ-সাজা ছোকরা ফণীকে ওর ভারি ভাল লাগে। গায়ে পড়ে ভাব সঙ্গে ভাব জমালো। বাড়ি নিয়ে এল। অভাবের ঘরে মা আমন্ত্রিতকে সাধ্যমত যত্ন করে খাওয়ালেন। শুধু কি তাই? ওর সঙ্গে বিভূতিও যাত্রাদলে যোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললে। বাপ বাড়ি নেই। মা মৃণালিনী এতে মত দিতে পারলেন না। যাত্রাদলে যাওয়া হল না বিভূতির। হল আর একটা কাণ্ড।

সেই কৃষ্ণ-সাজা ছোকরা সিগারেট খায়। না, তখনকার দিনে বিড়ির প্রচলন কোথায়? সেটা হুঁকো-যুগ। হয় হুঁকো, নয়ত বাইরে থেকে আমদানি বারডশাই জাতীয় সিগারেট! পথে-ঘাটে, লুকিয়ে খেতে, সিগারেটই সুবিধার। এক রাত্রে পারট করার ফাঁকে যাত্রাদলের শ্রীকৃষ্ণ সাজঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে বিভূতিকে তার আধ-খাওয়া সিগারেটটা দিলে, টান। বিভূতির ভয় ভয়। সখাকে শ্রীকৃষ্ণের অভয়—টান না, টান।

গোটা কয়েক টান দিতেই টান পড়ল কানে। পাড়ার মাতব্বর অমৃত কাকা দেখে ফেলেছেন। কান ধরে টেনে পাঁচজনের মধ্যে দাঁড় করালেন। যৎপরোনাস্তি গালাগাল করলেন। বাড়িতে নালিশ লাগালেন। বড় হলে এমন ছেলে যে কী ধরবে—তা তাঁর জানা হয়ে গেছে– ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওই একদিনের অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায় স্বাদ এবং তখনকার ম সেখানেই ইতি। কিন্তু এবার, তার চার-পাঁচ বছর পরে পাড়ার জামাই রামচন্দ্রর সিগারেট ওকে ধূম্রপানে দীক্ষা দিল।

থাক সে কথা। সব জামাই তো আর সিগারেট খাওয়াচ্ছে না। সবাই না হোক অন্তত কোন কোন জামাই বা নবাগত, ছেলেটির দুরন্তপনার মধ্যেই একটা অনন্য মননশীলতা, অনুভূতিপ্রবণতা উপলব্ধি করতে পারে। আত্মীয়বাড়ি উঠে হয়ত পাড়ার আর দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তুলনা করে ওর সম্পর্কে দু'চারটে সপ্রশংস উক্তিও করে ফেলে। এবং সে-সব শুনে লজ্জা পাওয়ার বয়স-বুদ্ধি হয়নি বিভূতির। বরং খুশিই হয়। আর তাতেই সব ভণ্ডুল। ওর সামনেই ওই বাড়ির লোক কুটুমের ভুল ভেঙে দেবে, হাঁ, তা যা বলেছ। ইছেমতীতে নৌকো বাওয়া, ভুতুড়ে নীলকুঠির জঙ্গলে ঘোরা, বনবাদাড়ে টোটো, এসবে বেরোসপতি। লেখাপড়াটাই ঢু ঢু।

অপমানে, দুঃখে মরে যায় বিভূতি। নবাগতরা প্রশ্ন করে—কেন, লেখাপড়া করে

না কেন?

এর উত্তর কেউই দেয় না। বাড়ির লোকও না, বিভূতিও না। ধীরে ধীরে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় বিভূতি, নিজেকে নিখোঁজ করে ইছামতীর জগতে।

সইমাদের বাড়ির পথের পাশে চারা আমগাছটার তলায় হেলান দিয়ে বসে। কখন একটি কলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—'তব আসন পাতা এ বনতলে'। নিজের সৃষ্টি। আশ্চর্য পুলক! মাধবীকঙ্কণ, কাদম্বরী, ভারতকথা পড়ে পড়ে ও-রকম ভাষাই রপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ও-রকম কয়েকখানা বই-ই আছে তার বাবার সংগ্রহে। বার বার পড়ে তাতেই ক্ষুধা মিটাতে হয় বিভূতির। আর আছে বাবার হাতের লেখা পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরি এবং সেই লম্বা লাল মলাটের 'সঙ্গীতসার' খাতাখানি। তাতে দাশরথি, দীনবন্ধু, মনোমোহন, মধু কান, নীলকণ্ঠ, শিবচন্দ্র, শ্রীধর কথক, ফকিরচাঁদ ফকির প্রমুখের গানের সঙ্গে আছে মহানন্দর স্বরচিত ছড়া, গান, দোঁহাবলি। তাই-ই পড়ে। গানের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পায়—'আমাশয়েব ঔষধ—সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তেলকুচোর পাতার রসের ফুট দুই চকে দুই ফোঁটা দিতে হয়। প্রায় একদিন প্রয়োজন, না হয় দু'দিন। আবার—'রক্তামাশয় মহৌষধ—আস-শেওড়া গাছের (গাছ ২/১ বছরের হইলে ভাল হয়) শিকড় আঙ্গুলের এক পর্ব পরিমাণ লইয়া আড়াইটি গোলমরিচ দিয়া চন্দনের মত বাঁটিয়া খাইতে হইবে। সকালে খালি পেটে একবার। জোর ২/৩ দিন। গরম হইলে মিছরির সরবৎ বা ডাবের জল খাইতে হইবে'। এমনি—'চেলার কামড়ে—ঝোলাগুড় দিলে তখনই ভাল হয়'। 'আগুনে পুড়িলে—গোল আলু বিনা জলে বাঁটিয়া লাগাইতে হয়'। 'ওলাউঠায়—হলুদের গুঁড়া সিকি পরিমাণ জলে গুলিয়া খাইতে হয়'। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ একই খাতায় কবি এবং কবিরাজ, পিতা ও পুত্রের স্বপ্ন এবং সাধনার সম্মিলন। কিন্তু কোনটাই কি পূর্ণ হয়েছে? নিজের ব্যর্থ সাধের কথা ভাবতে গিয়ে বাবার অবস্থাটায় মন আরও ভারাক্রান্ত হয় বিভূতির।

হাঁ, মহানন্দর শরীরটাও ভেঙে পড়ছে। বিশেষ করে শরৎকালটা এলেই শয্যা নিচ্ছেন। আশ্বিনের আকাশে যখন সাদা মেঘের আনাগোনা, রায়বাড়ির পূজামণ্ডপে ঢাকের সাজ বসছে, মহানন্দ তখন ঘরের মধ্যে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন। সন্ধ্যায় ধুনো দিয়ে মৃণালিনী স্বামীর শিয়রে বসেন। মণি, নুটু এখনও অবুঝ। জাফরি বড় হয়ে উঠছে। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশায় সব দেখেশুনে দুঃখ চাপে। বিভূতি এসব বুঝতে পারে। দাওয়ায় বসে জাহ্নবীকে দুঃখের কথা বলে, 'জানিস জাফরি, এবারও পুজোয় আমাদের নতুন জামা হল না'।

অতি দুঃখে এসব কথা বলে। গেল-বারও তো একই অবস্থা। মায়ের হাতে একদম টাকা-পয়সা থাকে না। বাবা কলকাতা না কোথায়। পূজার দিনেও একটা পয়সা পাঠাননি। সে কী কষ্ট! বিভূতির বেশ মনে আছে, মা তাকে তক্তপোশখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় অনেক উপদেশ দিলেন। সুতরাং, মনের দুঃখ মনেই চাপা ছাড়া উপায় নেই। এই অবস্থায় স্কুলে পড়ার খরচা জোগায় কে? অতএব, যতটুকু হয় ঘরে বসে বাবার পুঁথিপত্তর নেড়েচেড়ে। এবং বাকিটার ভার ইছামতীর জগতের উপর। সব দুঃখের বাইরে এ এক ভিন্ন জগত। কিন্তু সে তো মানুষ। এই মানুষের সমাজটাকে এড়াবে কি করে? সেখান থেকে যে বারেবারে ঘা খেতে হচ্ছে!

পাড়ার লোকদের সঙ্গে সে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে। সেকালে বরপক্ষ বনাম কন্যাপক্ষ তর্কযুদ্ধ চলত নানা প্রশ্নোত্তরের প্যাঁচে। বড়োরা বড়োদের সঙ্গে আর ছোটদের সঙ্গে ছোটরা। দু' তরফেরই লক্ষ্য—অপরকে জব্দ করা চাই। তা ছোট

মহলে বিভূতির সেদিন জয়জয়কার হচ্ছে। পাঠ্য বইয়ের বাইরে মুখ খুলবার সাধ্য কমই থাকে কম বয়সীদের। আর সেটিই বেশি আছে বিভূতির। ফলে ওর কাছে অনেকেই জব্দ হচ্ছে। কিন্তু তারপর?

কন্যাপক্ষের বয়স্ক একজন ওর সঙ্গে আলাপ করতে এলো। কী ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন্ ক্লাসে পড়ো?

কি বলবে বিভূতি? কোথাও পড়ে না? পড়ি বললেও বা কোন্ ক্লাস বলবে? বয়সটা তো তার পাঠশালা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পা মুড়ে বসে নেই। এতটা জিতে এসে এবার হেরে যাবে? না। বললে, সিকসথ ক্লাস—অর্থাৎ এখনকার ক্লাস সেভেন। উত্তরটা দিতে একটু দেরি করায় প্রশ্নকর্তার মনে বুঝি সন্দেহ দেখা দেয়। সে কৌণিক প্রশ্ন ছোঁড়ে—অ্যালজেবরা কোন্ একসারসাইজ কষাচ্ছে তোমাদের?

অ্যালজেবরা? শব্দটা ওর শোনা, কিন্তু বইটা ও চোখে দেখেনি কোনদিন। তখনকার দিনে ও-সব জায়গায় বীজগণিতের অনেক বই ছিল না। এক বই—এক রকম প্রশ্নমালা। সুতরাং, কিছু বলতে গেলেই যদি প্রশ্নমালার নম্বর ধরে, ফরমুলা না কী সব আছে, জিজ্ঞেস করে? অথচ বলে যখন ফেলেছে একটা কথা, এখন উপায় নেই। বিভূতি বললে—আমাদের ও-রকম একসারসাইজ ধরে কষায় না অ্যালজেবরা। মুখে মুখে অঙ্ক দিয়ে কষায়। বলেই উঠে গেল ওখান থেকে।

প্রশ্নকর্তা কি বুঝল সেই জানে। তবে বিভূতি আর কিছুতেই বোঝাতে পারে না নিজেকে। ছি ছি ছি—এই মিথ্যে দিয়ে ক'দিন চলবে তার? সেই রাতেই মনে মনে একটা সংকল্প করল সে।

চট করে মাকে সে-কথা বলতেও পারছে না। মনটাকে তৈরি করতে দুটো দিন গেল।

দুঃখ নিয়ে মহানন্দর ভিটেয় সন্ধ্যা নামে। নুটুকে ঘুম পাড়িয়ে, মণি আর জাফরিকে মৃণালিনী কাছে ডেকে নেন রান্নাঘরে। ডালপালা, খড়কুটো উনুনে ঠেলে দিতে দিতে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এমন সময় কণ্ঠহাতে জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রবেশ। মা অবাক হয়, কি রে, রাত এক প'র না হতেই ফিরলি যে আজ? এত সকাল করে ঘরে ফেরা একটা ব্যতিক্রম তাঁর বড় ছেলের।

একটা কথা বলব মা!

ছেলের কথা, মায়ের কাছে সে তো সুধার মত। তবু মৃণালিনী উদ্বিগ্ন হন, অভাবের ঘরে এই অবুঝ ছেলে আবার না কোন বায়না ধরে। শঙ্কিতভাবে মুখ তুলতেই বিভূতি বলে গেল, আমি বনগাঁর বড় স্কুলে পড়তে যাবো মা। পাড়ার সবাই যায়, আমি বসে থাকবো না।

কেন যে তার বাবা-মা এতদিন তাকে পাঠাতে পারেননি সেকথা বিভূতিও বোঝে। তবু বড় লজ্জাবোধ, বড় গ্লানিতে আজ সে অবুঝ, মরিয়া।

জাফরি আর মণি শুনেই খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু দাদার ধমক খেয়ে চুপ মেরে যায়—থাম, আগে ঠিক হোক। মা তো কিছুই বলছে না।

মায়ের দু'চোখ তখন জলে ভরা। দু'বেলা দুটো ভাত তিনি যাদের দিতে পারেন না ঠিকমত, তাদের অনেক ক্ষুধার মত লেখাপড়ার ক্ষুধাও মেটানো তাঁর সাধ্যের বাইরে যে! মৃণালিনী জানেন, স্বামীকেও বলার কিছু নেই। ও লেখাপড়া শিখে বড় হবে, এ-রকম কত সাধ তাঁরও ছিল। কিন্তু সংসার চলে না বলেই তিনি ওকে পৈতে দিয়ে পুজারি বামুন বানাতে চাইছেন। সামর্থ্যে কুলোয় না বলে বাপের বুকে সে ব্যর্থতার

জ্বালা কতখানি তা অজানা নেই মৃণালিনীর।

ছেলে বারবার তাড়া দিচ্ছে, কি মা, বলছ না যে?

সেটা জুলাই মাস। আর শিক্ষা-বর্ষ শুরু হয়েছে সেই জানুয়ারিতে। মা বললেন, তা বছরের মাঝখানে কি করে ভর্তি হবি! তোর বাবা দেশে ফিরুন। তাঁর সাথে কথা বলে দেখি, সামনের বারে ভর্তি করে যদি দেন।

না, সামনের বারে নয়, কালই আমি যাবো স্কুলে। তারপরে মাস্টারকে বলব, বাবা এলে টাকা যা লাগে দিয়ে দেবে।

বনগাঁর বড় স্কুলে যে তা হবার জো নেই, সে-কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন মৃণালিনী। অন্য সময় হলে হয়ত বিভূতিও বুঝত। কিন্তু আজ সে বুঝেও অবুঝ। অগত্যা মৃণালিনী তাকে আশ্বস্ত করলেন, আচ্ছা দেখি।

মায়ের মুখের ওইটুকু ভরসাকেই আশ্রয় মেনে পরম খুশিতে সে-রাতে ঘুমোতে গেল বিভূতি।

রাত গভীর হচ্ছে, কিন্তু ঘুম নেই মৃণালিনীর। কথা তিনি কী করে রাখবেন? কী ভেবে কেরোসিনের লণ্ঠনটা নিয়ে পুরানো তোরঙ্গটার কাছে গেলেন। তোরঙ্গে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, পুঁথি-পত্তরের তলায় একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলি। দারিদ্র্যের উপর্যুপরি আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা ন্যাকড়ার ভাঁজগুলি আজ খুলে ফেললেন। বেরিয়ে এলো বাপেরবাড়ির দেওয়া অলংকারের শেষ চিহ্ন রুপোর গোটটি। সেটি হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করতে চেষ্টা করলেন মৃণালিনী। কেমন একটা ভরসা পেলেন বুঝি। না, স্বামীকে আর জানাবার দরকার নেই। ও যদি পারে, এই গোটবাঁধাব টাকায় কোন রকমে ভর্তি হয়ে যাক। বইপত্তর ভগবান চাইলে ধীরে ধীরে হবে।

ওজন করে বাদসাদ দিয়ে পরদিন মৃণালিনীর হাতে যা তুলে দিল স্যাকরা, প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়। এদিকে সকালেই পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে দরকারের অঙ্কটা জেনে নিয়েছে বিভূতি। ছেলের কাছে শুনে মা হতাশ। কিন্তু তিনিও আজ কৃতসঙ্কল্প। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে হাত দিলেন। সিঁদুর পরানো টাকাটাও তুলে দিলেন ছেলের হাতে। কমলার ভান্ডার থেকে বাগ্‌দেবীর পদপ্রান্তে অঞ্জলি দিলেন জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য।

বিভূতি পাড়ায় ছোটে। বন্ধু-বান্ধব, জানাশোনা যাকে পায়, শুনিয়ে দেয় বড় গলা করে—আমিও এবার থেকে বনগাঁর বড় স্কুলে পড়বো, কাল থেকেই যাচ্ছি, দেখে নিও তোমরা।

কি করে বছরের মাঝখানে ভর্তি হবে, কেমন করে চালাবে, তা নিয়ে অবশ্য অনেকেরই সন্দেহ ছিল। মা বলেছিলেন, যুগল খুড়োর কাছে যা। তিনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান, একটা বিহিত হতে পারে। কিন্তু বিভূতি সে ছায়া মাড়াবে না। পাড়ার যুগলমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁ স্কুলে অঙ্কের মাস্টার। মহানন্দকে তিনি দাদা বলেন, সেই সুবাদে ওর খুড়ো। জ্ঞাতিসম্পর্ক নেই কিছু। মাতুলসম্পত্তি পেয়ে তাঁরাও এসেছেন এখানে ভিন গাঁ থেকে। কিন্তু অঙ্কের মাস্টার? বাপ্‌স! বিভূতি ওর ত্রিসীমানায় নেই। নিজেই সে যাবে।

পরদিন আড়াই ক্রোশ পথ পেরিয়ে বনগাঁ তো পৌঁছানো গেল। কিন্তু স্কুলের কাছে গিয়ে পা আর চলে না যে! এর নাম স্কুল? এ যে ইলাহি ব্যাপার! কোথায় প্রসন্ন গুরুমশাইর কাঁঠালতলা, হরিপোড়ার গোহাল, আর গগন পালের ইউ পি? এই বিরাট 'এল'-এর মত প্যাঁচমারা বাড়িটার কোন্ ঘরে যাবে? কার কাছে যাবে?

শুনেছে ভরতির জন্য আগে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি পরীক্ষা করবেন। উৎরোলে কেরানির কাছে যেতে হবে, তখন টাকা-পয়সা, হিসাব-নিকাশ, ভরতি। পাগল! ওর মধ্যে বিভূতি নেই। সারাদিন ধরে স্কুলবাড়িটার চারপাশে চক্কর খেয়ে বিকেলে গুটি গুটি বাড়ি ফিরে এলো।

কি রে, ভরতি হলি খোকা? কি বললেন হেডমাস্টার? কেমনতরো স্কুল, ক'জন পড়ে, তোর কেলাসে বারাকপুরের কে আছে, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান মৃণালিনী। জাফরি-মণিরাও দাদার কাছে বড় স্কুলের বড় গল্প শুনতে চায়। কিন্তু কি উত্তর দেবে বিভূতি। 'হুঁ' 'হাঁ' করে কোনও রকমে কাটিয়ে দেয় সে রাতটা। পর পর দুদিন স্কুলের সামনে দিয়ে ওইভাবে ঘুরে চলো সে। এক, দুই, তিন—ঠিক তৃতীয় দিনে স্কুলের সামনে পেঁছতেই ঝম ঝম বৃষ্টি। দুগ্‌গা বলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। বারান্দায় উঠে অবাকচোখে ইতিউতি চাইছে, ছাত্ররা সব ক্লাসে। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পাকড়াও করলেন ওকে, কি চাই এখানে? গম্ভীর প্রশ্ন।

হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব। ঢোঁক গিলে কথা কয়টা বলে ফেললে বিভূতি।

কেন, কি দরকার তাঁকে? ভদ্রলোক ভ্রুকুঞ্চিত।

স্কুলে ভরতি হওয়ার আগ্রহ-আয়োজনের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে তিনি বোধহয় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন বিভূতির প্রতি। প্রশ্ন করলেন, তা বছরের মাঝখানে ভরতি হয়ে কি চালাতে পারবে? তোমার সঙ্গে বড় কেউ আসেননি—বাবা, দাদা?

বাবা বাইরে। আর বড় কেউ নেই, আমিই বড়।

এসো। ভদ্রলোক তাকে একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। না, ওই ভদ্রলোকই যে মুহূর্তমধ্যে হেডমাস্টারের রূপ ধারণ করলেন, সে-কথা বিভূতি ভাবতেই পারেনি। ও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ভরসা দিলেন হেডমাস্টার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ওকে অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে করণিকের কাছে টাকা দিতে বললেন। চাদরের খুঁট থেকে সব টাকা রাখল বিভূতি।

করণিক টাকাটা দুবার করে গুণে চশমা তুললেন—আর কোথায়?

আর তো নেই! বিভূতির মুখ রক্তশূন্য।

কি ব্যাপার? চারুবাবু এগিয়ে এলেন। লক্ষ্মীর ঝাঁপি শূন্য করে আনা টাকা! বিচলিত চারুবাবু। বললেন, ঠিক আছে যা কম পড়েছে আমি দেখবো। তুমি আজ থেকেই ক্লাস শুরু করে দাও।

সরস্বতীর কমলবনে ভীরু পায়ে যে উৎসুক, উন্মুখ কিশোর সর্বস্ব সমর্পণ করে আজ প্রবেশ করতে চাইছে, আদর্শ শিক্ষক চারুচন্দ্র তাকে ফেরাতে পারেন না। বিভূতি তাঁকে প্রণাম করল, ঠিক প্রণামই নয়, যেন দেহমন তার লুটিয়ে পড়ল ওই প্রবীণ গুরুর পবিত্র চরণাশ্রয়ে।

বাইরে তখনও অঝোর বর্ষণ। দফতরির পিছন পিছন সে এসে দাঁড়ালো পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ তখনকার সেভেনথ ক্লাসের 'বি' সেকশনের সামনে।

সাজিমাটি দিয়ে কাচা লালচে ধুতি, বাবার ব্যবহার করা একখানা চাদর গায়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্ক এবং বছরের মাঝখানে অসাময়িক একটি গ্রাম্য আবির্ভাবে সশিক্ষক গোটা ক্লাস ওর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সচকিত হয়ে উঠেছিল। পিছনের দিকে একটা বেঞ্চির খালি আসনের সামনে সে যখন পেঁছল, সারা ক্লাস তখন সকৌতুকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনমুখো। ইংরাজির ক্লাস নিচ্ছিলেন সাহেবি-পোশাক সহকারী

প্রধানশিক্ষক হরিচরণ ঘোষ। ধমক ছাড়লেন—এও, অ্যাটেনশান। কয়েক ডজন ঘাড়-মুণ্ডু মুচড়ে যেন সামনে ফেরালেন মুহূর্তে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—টেক ডাউন।

বিভূতিও বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু টেক ডাউন মানে কি? বসা তো সিট ডাউন। তবে? কি করবে সে? পাশের ছেলের কাছে জানতে চাইল—এই, টেক ডাউন মানেটা কি রে? পাশে সেদিন ছিল আর এক বিভূতি—বিভূতি মুখোপাধ্যায়। সেদিনই দু'জনে মিতে হয়ে গেল।

দেখল ততক্ষণে সারা ক্লাস খসখস শব্দে খাতা খুলে পেনসিল বাগিয়ে মুহূর্ত গুণছে। সেও তো একটা খাতা, পেনসিল এনেছে, বার করল। আর ঠিক সেই সময়—ঢঙ, ঘন্টা। বিভূতির বনগাঁ স্কুলে প্রথম দিন, প্রথম ঘণ্টা, প্রথম অভিজ্ঞতা। তারিখটা—পাঁচ আগস্ট, উনিশশ' আট।

নতুন পরিবেশ, নতুন জগত. প্রহরে প্রহরে নব নব বিস্ময়। না-জানা, না-চেনা, কত শিক্ষক, কত ছাত্র সহপাঠী সমবয়সীর ভিড়। যুগল খুড়ো রবিবার ছাড়া বাড়ি থাকেন না। বনগাঁ শহরে থেকেই স্কুলে পড়ান। বিভূতিকেও তিনি চেনেন না ঠিক। তাই রক্ষে। তাছাড়া, ওদের ক্লাসে অঙ্ক কষান ডাঃ অমূল্য উকিলের কাকা অন্নদাচরণ উকিল। না বুঝলে একবারের কাজ পাঁচবার বোঝাবেন, মারধোর করেন কম। এটাতে বিভূতি স্বস্তি বোধ করে। তার চাইতেও ভালো ওয়ারড বুকের মাস্টার তারাপ্রসন্ন মুখারজি। স্কুলের এম ই-র আমলের প্রধানশিক্ষক, প্রবীণ এক স্নেহপ্রবণ গুরু।

ছাত্রদের মধ্যে সহপাঠী সুরেন, বাবার বন্ধু ডাঃ গিরীন চ্যাটার্জির ছেলে। ওদের গাঁয়েরই লোক। চালকির বিভূতি মুখুজ্যে। সেও তো লাগোয়া। বারাকপুর আর চালকি—মাঝখানে ব্যবধান কেবল একটা বড় পুকুরের—ঠাকুরঝি পুকুর। আজ আর সে পুকুরের চিহ্নও নেই—ভরাট জঙ্গল। কতদিন সে চালকি গিয়েছে ওর মধ্য দিয়ে। তবে মুখুজ্যে বিভূতিকে চিনত না। ওরা সবাই বনগাঁ বোরডিং-এ থেকেই স্কুলে পড়ছে। রোজ রোজ কি আর পাঁচ পাঁচ দশ মাইল হাঁটা যায়! বোরডিং-এ পয়সা লাগে। ওরা সম্পন্ন, অসুবিধে হয়না। এ-রকম সহপাঠী আশুতোষ রায়, প্রফুল্ল উকিল, গঙ্গাধর, কত ছাত্রের সঙ্গে সুরেন ওকে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারাও বনগাঁ বোরডিং-এ থাকাটাই সুবিধা মনে করে।

তা মহানন্দ-পুত্রেরই বা অসুবিধাটা কি আছে? সকাল সকাল স্নান খাওয়া সেরে পথে নামা। তখন অবশ্য ক্লাসের তাড়া থাকে। তবু সে পায় পথের পাশে সেঁওতার গন্ধ, ছাতিমের ছায়া, সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনের ইশারা, শেওড়া, ভাট, ওল আর কালকাসুন্দের নরম মিঠে বৈঠকের আমন্ত্রণ। ফেরার পথে হাতে অঢেল সময়। বন-জঙ্গল খুঁজে খুঁজে সে রচনা করে নেয় তার ঘরে ফেরার পথ। সে-পথ বকুল ঝরার, বনমালতীর সুরভি সুধার, পালতেমাদার, পলাশের হোলি খেলার, দ্রোণ-কুসুমের খই ছড়ানোর। গোটা বনগ্রামই তো বন-জঙ্গলের রাজ্য ছিল একটা। মাঝে মাঝে এমন গভীর বন ছিল যে, জনমানব ঢুকতে সাহস পেত না। তবে, এক শ্রেণীর মানুষ ঢুকতো, থাকতো। তারা সভ্য সমাজের বাইরের লোক—দস্যু, ডাকাত। বনগাঁ তখনও নদীয়া জেলার অন্তর্গত। এরা বাইরে গিয়ে লুঠতরাজ করে আবার এই সব জঙ্গলে এসে গা ঢাকা দিত। আঠারশ' আটান্ন। কবি নবীন সেন তখন যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর এলাকায় এই নদীয়ার বনগাঁর ডাকাতদের উৎপাত বন্ধ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়

তাঁর। সে কাহিনী তিনি তাঁর জীবনকথা—'আমার জীবন'-এ লিখেছেন। সে সব ডাকাত-দস্যু উধাও আজ। সে জঙ্গলের অনেকটাই আজ আবাদ হয়ে গিয়েছে। তবু যা আছে, তাও কি কম?

হাতের কঞ্চিখানা ঠিকই আছে। আর আছে সেই নোট বুক। তা লতা-ফুল, গাছ-গাছালি, পক্ষী-পাখালির নামে ভরা। শুধু কি নাম! চাষী, বুড়ো, টোটকা-হেকিমদের ধরে ধরে ও-সবের জন্ম-মৃত্যু, গোত্র, পরিচয়, সব জেনে টুকে রাখবে। নাটাকাঁটার ফুল ফুটবে শীতে, আতরের মত গন্ধ তার। ওই যে, আকন্দ, দাদুর নাকি ওষুধে লাগত, চোত-বোশেখে থোকা থোকা ফলে ভরে যাবে ওগুলি। আর ওই যে জলের ধারে ধারে কেলেকোঁড়ার লতা, ওগুলিতে ফুল ফুটবে পুজোর সময়—শরতে। বাবা বলেন, শরীরে রক্ত কমে গেলে কেলেকোঁড়ার লতা, পাতা, ফুল, কাঁটা, শেকড় সমেত বেটে রস খাইয়ে দাও, রক্ত টুপ টুপ করবে শরীরে। তাও চেনা হয়। শেখা হয় রড়াকুঁচ আর ধাতুপ ঝাড়ের ফারাক কি। কী পার্থক্য টুনটুনি আর কণ্টিকারি ফুলের।

কেবল কি তাই। সে লক্ষ্য করেছে ব্যাঙের ছাতা, উইয়ের ঢিবি, গাছের কানকো কেমন করে বড় হয়। কেমন করে জাল বোনে মাকড়সা। সে জেনে ফেলে, চিল আর ডাহুকের শিকার বাগানোর স্বতন্ত্র কৌশল। শ্যামা, হরিয়াল আর মানিক পাখির আলাদা আলাদা জীবনধারা।

তার জগতের পরিধি বাড়ে। সে জানে পাগলা জেলের বউ কোন্ বাগান থেকে এত আম কুড়োয়, জামির করাতি ছাগল চরায় কোন্ মাঠে। ইয়াসিন মিঞা রোজ ভিক্ষেয় কত পায়। দুখিরামের মা কি করে দিন কাটায়।

বনগাঁ স্কুলে ছেলের ভর্তি হওয়াটা ভালই লেগেছিল মহানন্দর। একটা অক্ষমতার তীব্র যন্ত্রণা থেকে এ তাঁর মুক্তি। যত কষ্টই হোক, তিনি চালিয়ে যাবেন। ছেলেটা মানুষ হোক। ওর 'পরেই তো সংসারের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এ কী নেশা ছেলের? এ-রকম বনচারী বাউণ্ডুলে হলে ভবিষ্যতের তো কোন আলোই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। চিন্তিত মহানন্দ বনগাঁ এসে প্রধানশিক্ষক চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। যাতায়াতের পথটাই যে ওকে বিপথে টানে। পথের নেশা না ঘুচালে স্কুলের পাঠে তো ওকে নিবিষ্ট করানো যাবে না!

কিন্তু প্রথম বছরই তো মাঝখানে ভর্তি হয়েও, পথে পথে ঘুরেও ক্লাসে প্রথম হয়েছে বিভূতি। চারুবাবু হেসে আশ্বস্ত করেন মহানন্দকে।

সে তো নীচের ক্লাস, ক্রমে উপরে উঠলে পড়ার চাপও বাড়বে তাছাড়া, শরীরেও কি কুলোবে রোজ এভাবে যাতায়াত? মহানন্দর উদ্বেগ কাটে না।

চারুবাবু কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, ওকে আপনি বোর্ডিং-এই দিয়ে যান।

বোর্ডিং ফি কত? মহানন্দ হিসেব করে দেখতে চান।

চারুবাবু তাঁকে সে ব্যাপারেও ভরসা দিলেন। বললেন, ফি পাঁচ টাকা। তবে তার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে না। তারপর সবিনয়ে মহানন্দর হাত দুটি ধরে বললেন, আপনার অবস্থা আমি জানি শাস্ত্রীমশায়। বিভূতি মেধাবী ছাত্র। ছাত্রে-পুত্রে তফাৎ নেই। ও আমার পুত্রের মত থাকবে। আমার ছেলে কৃষ্ণ আর বিভূতিকে আমি একসঙ্গে পালন করব এখানে।

বিপত্নীক চারুচন্দ্র পুত্র কৃষ্ণপ্রসন্নকে নিয়ে স্কুল বোর্ডিং-এই থাকেন। তিনি দায়িত্ব

নেওয়ায় মহানন্দর আর ভাবনা রইল না। ওই মহানুভব শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মহানন্দ ঘরে ফিরলেন।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মৃণালিনীকে নতুন ব্যবস্থার কথা বললেন মহানন্দ। খোকা কোথায়? মৃণালিনী জানালেন, খোকা গেছে বেহারী ঘোষের বাড়ি মানিকের গান শুনতে। মহানন্দ পঞ্জিকা নিয়ে বসলেন। কালকেই ভালো দিন ছোটবউ। আর দেরি নয়।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরে নতুন ব্যবস্থার কথা জানলো বিভূতি। সকালে মা দইয়ের ফোঁটা দিয়ে দিলেন কপালে। বাপের পিছন পিছন বিছানা-বোঁচকা নিয়ে বনগাঁ বোরডিং-এর উদ্দেশ্যে পথে নামলো বিভূতি। বারাকপুর, তার বাঁশ বন, বৈঁচি ঝোপ, ইছামতী, নীলকুঠি আর নীলকণ্ঠ পাখিদের নিয়ে ছায়া-ছবির মত সরে গেল চোখের সামনে থেকে।

শহর, স্কুল-বোরডিং এক অন্য জগত। প্রথমটা একটু মনমরা হয়ে গেল বিভূতি। বিকালে ছেলেরা যখন স্কুলের মাঠে খেলতে নামে, স্কুল লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে বসে বিভূতি। মাঝে মাঝে আবার সন্ধ্যা অবধি নিখোঁজ। পরদিন স্কুলে কোন ছাত্র হয়ত খবর নিয়ে আসে, তারা ওকে খয়ড়ামারির মাঠে একলা বসে থাকতে দেখেছে। কোনদিন বা খবর আসে বনগাঁর গিরজা থেকে বিকালে বেরোতে দেখা গিয়েছে বিভূতিকে। ছাত্রমহলে ওকে নিয়ে কৌতূহল।

ব্যাপার কি? চালকির বিভূতি, অর্থাৎ বিভূতি মুখুজ্যে জানতে চায় বারাকপুরের বিভূতিকে। গিরজা কেন? খেসটান হবি নাকি!

না, তা নয়। গিরজার দেয়ালে দেখলুম যীশুর ভালো ভালো উপদেশ লেখা থাকে ছাপানো কাগজে। ভাবলুম, মুখস্থ করব। তাই ক'দিন যাচ্ছিলুম। সেদিন এক ফাদার তা দেখতে পেয়ে গিরজার মধ্যে ডেকে নিলেন। তারপরে একখানা বাঙলা বাইবেল দিলেন আমাকে। বললেন, অমনি নাও। তাই।

এসব ব্যাপার জেনে ওদের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই যায়। কাছে এসে আরও আবিষ্কার করতে চায় ওকে। নামের যোটকমিলের দাবিতে চালকির বিভূতি নিজেকে বেশি ঘনিষ্ঠ করে নেয় ওর। দুজনেই দু'জনকে মিতে বলতে শুরু করল। এতদিন ক্লাসে বাঙলায়, সাহিত্য রচনায় অদ্বিতীয় ছিল মুখুজ্যে বিভূতি। কিন্তু 'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল'। বাঁড়ুজ্যে বিভূতি এসে বাদ সাধল তাতে। বলতে গেলে দুই কুলীনের লড়াই। লাগছে বেশি মুখুজ্যের। ঈর্ষা তার হয়েছিল বইকি। তবে প্রতিঘাত না পেয়ে তা ভিন্ন খাতে বইতে লাগলো। মধুর রূপ পেল মিত্রতা মোহানায় এসে। পরস্পরের মিতে হল তারা। বাঁড়ুজ্যেই তার উদ্যোক্তা। 'মিতে' বলে মহানন্দ-পুত্রই প্রথম মুখুজ্যেকে সম্বোধন করে।

মিতেও দেখল, সব কিছুতেই নবাগত বিভূতির এক বৈশিষ্ট্য। ভিড় এড়িয়ে চলা, খেলার বদলে বনে বনে ঘোরা বা বই নিয়ে পড়া, গল্প শুনতে চাইলে সুন্দর করে তা বলে যাওয়া, আবার ক্লাসেও প্রথম। কি করে হয়? কেমন করে ও পড়া তৈরি করে?

তারও রহস্য কিছু কিছু আবিষ্কার করে ওরা। একদিন শুনছে ইতিহাস পড়ছে ছড়া কেটে—

'ষোলশ' সাতাশ অব্দে জাহাঙ্গীর মল;
শাজাহান ভারতের বাদশাহ হল।'

মিতেরা ভিড় করে দেখতে এলো। ইতিহাস বইয়ে ছড়া কোথায়?

বিভূতি স্বীকার করল, ওটা তার সহজে মনে থাকে বলে বানিয়ে নেওয়া।

এ-রকম আরও ছড়া শুনল ওরা। অবাক, অবাক সবাই। সবাক তারা হল অবশ্য একটু পরেই। স্কুলময় রটিয়ে দিল বিভূতির কান্ড। শিক্ষকদের ঘরে ডাক পড়ে। অপরাধীর মত হাজির হয় বভূতি। কিন্তু উপায় নেই, শিক্ষকদের হুকুম, ভয়ে ভয়ে দু'একটা বয়ান শোনাল।

প্রশ্ন হল, কার কবিতা তুমি পড়েছ, কারটা তোমার ভাল লাগে?

অনেকের গান কবিতাই ওর মুখস্থ। কিন্তু বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম।

একটা আবৃত্তি কর দেখি।

স্কুল লাইব্রেরি থেকে বলাকা পড়েছে সে। তা থেকেই একটি কবিতা শুরু করল।

মাস্টার মশায়দের সামনে গলা কাঁপছে। তবু একটু একটু করে মহানন্দ-তনয়ের অপূর্ব কণ্ঠ উদাত্ত হল—'এবার আমার সিন্ধু তীরের কুঞ্জ বীথিকায়—'

সবাই খুশি। কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে চারুবাবুও এগিয়ে এসেছিলেন। বললেন, সামনে ইনসপেকটর আসচে। এই কবিতাটা তখন তোমায় আবৃত্তি করতে হবে।

শিক্ষকদের বায়না আছে। ছাত্রদের বায়না নেই? তাদের মধ্য থেকেও দু'একটা অনুরোধ আসতে লাগল, বাড়িতে বোনের বিয়ে, উপহার লিখে দিতে হবে। খ্যাতির বিড়ম্বনা সহ্য করতেই হয়। আমগাছতলায় বসে রচিত 'তব আসন পাতা এ বনতলে'র মত একটা দুটো কলির ব্যাপার নয়। আস্ত কবিতাই লিখে ফেললে দু'তিনখানা।

ইতিমধ্যে ওর ঘরেও একটা বিয়ের উৎসব হল। জাহ্নবীর বিবাহ দিলেন মহানন্দ চালকির [illegible] বাড়ির পঞ্চাননের সঙ্গে। উৎসব বলতে নেহাৎ কর্তব্যপালন। আগের দিন নেই মহানন্দর। সংসারে পরিজন বেড়েছে, খরচাও বেড়েছে। কমে আসছে কেবল মহানন্দর শক্তিসামর্থ্য। সুতরাং জাফরি যত আদরেরই বোন হোক বিভূতির, গরিবের সে বিয়েতে উপহার ছাপানোর প্রশ্নই ওঠেনি। বিভূতিরও একটু একটু করে অনেক কথা বোঝার বয়স হয়েছে।

তবু ক্লাসে প্রথম হতে পারছে বলে মাইনেটা দিতে হচ্ছে না। চারুবাবু ফ্রি করে দিয়েছেন। কলকাতায় আজকাল আর তেমন আয় নেই। শুধু নেশার টানে, অভাবের তাড়নায় পুঁথিপত্তর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন মহানন্দ। যাতায়াতের পথে খোকার মুখ না দেখলে তৃপ্তি নেই বাপের। স্কুল বোরডিং-এর মাঠের সেই কোণ থেকে শোনা যাবে 'খোকা' 'খোকা' ডাক। কণ্ঠস্বরটা এ তল্লাটের সকলেরই পরিচিত। [illegible]কুল, বোরডিং-এর আবাসিক সবাই জানে কাকে ডাকা হচ্ছে, কে ডাকছেন। এই সেদিনও তো রাত্রে বনগাঁর বিচালিঘাটে যখন গান হচ্ছিল, বোরডিং-এর ছাত্ররা বিভূতিকে বললে, ওই শোন তোর বাবার গান।

সাধারণত এ রকম কাছে-ভিতে হলে বিভূতি বাবার সঙ্গে যায়। তবে পড়ার চাপ থাকলে না। বাবারই বারণ। ঘরের জানলা খুলে বিভূতি কান পাতে। তার বাবা গাইছেন—দাশু রায়ের গান—

> হরি কান্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে
> ভবে পার করেন তিনি অভয় চরণ তরী দিয়ে।

অথবা গুরু উদ্ধবের গান—

> দারা সুত পরিবার দেখবে মন কেবা কার।
> আঁখি মুদলে অন্ধকার। বেঁধে লবে তোরে শমন॥

এমন বৈরাগ্যের গান যিনি গাইছেন, তিনি কিন্তু ক'দিনের অদর্শন ঘটলেই এবং সুযোগ পেলেই খোকা খোকা করে ছুটে আসবেন বনগাঁ বোর্ডিং-এ। বোর্ডিং-এর সহবাসীদেরও ব্যাপারটা জানা। পথে দেখলেই ও'কে দৌড়ে এসে আগেভাগেই বিভূতিকে খবর দেয়, তোর বাবা আসছেন। ছেলেও দৌড়। মাঠ পেরিয়ে পথের মোড়ে হাজির। নয়তো বাপই স্কুলের মাঠে পা দিয়ে খোকা খোকা বলে ডাকতে শুরু করেন। শ্যামবর্ণ, গোলগাল মানুষটি। কৃষ্ণমন্ত্রী মহানন্দর কণ্ঠে তুলসীর মালা। সদাহাস্যময়।

হাসির আদলটা মুখে লেগে থাকলেও শরীরে যেন ভাঙন ধরেছে ইদানীং। ছেলের চোখেও তা ধরা পড়ে। সে আজকাল 'ভবপার', 'শমন', 'আঁখি মুদলে' ইত্যাদি কথার অর্থ বোঝে। কেন জানি, খারাপ লাগে বাবার ওসব গান। বাবাকে সে বলে, ওসব গান গেয়ো না বাবা।

বাপ হাসেন। শোনো পাগল ছেলের কথা। ও তো নেহাৎ গানই।

গান তো আরও কত আছে।

তাও গাই। তবে যখন যেমন শুনতে চাইবে আসরে তাই গাইব ত। না হলে ওরা পয়সা দেবে কেন?

তাও তো বটে। আর কিছু বলে না ছেলে।

কিন্তু ক্রমে পয়সা রোজগারের ক্ষমতাও কমে আসছে মহানন্দর। শরীরটা দ্রুত ভেঙে পড়ছে। দারিদ্র্যপীড়িত রুগ্ন শরীরে বেশি দূর আর বের হতে পারেন না। খুব টানাটানি হলে খেয়া পাড়ি দিয়ে মাধবপুর পর্যন্ত পৌঁছান। এই কৃষক পল্লীটির সব ঘরই ভালবাসেন, ভক্তি করেন কথকঠাকুরকে। তাঁরা ও'র মুখে পুণ্য কথা শুনে তৃপ্ত হন। ভোজ্য-দক্ষিণা দেন। তাই নিয়ে দিনশেষে ঘরে ফেরা। ওইটুকুর আশায় পথ চেয়ে দিন কাটান মৃণালিনী। বিভূতি থাকে বনগাঁ বোর্ডিং-এ। শনিবার বাড়ি আসে, আর সেই সোমবার যায়। ঘরের হাল সে বোঝে। কিন্তু সবে নবম শ্রেণীর ছাত্র, কী করবে ভেবে পায় না।

দিশেহারা বুঝি মহানন্দও। কণ্ঠের গানও প্রায় শুকিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দীর্ঘশ্বাসের মতই দুঃখের সেই গান গুন গুন করেন—

হরি দুঃখ দাও যে জনারে
যার কপালে নাই সুখ
বিধাতা বৈমুখ
দুঃখের উপর দুঃখ
দাও যে তারে।

সেবার আড়ংঘাটা থেকে ধুমজ্বর নিয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরলেন মহানন্দ। দু'চোখ করমচার মত লাল। এক মুখ দাড়ি গোঁফ। পা দুটো টলছে। সাড়া পেয়ে মৃণালিনী ছুটে এলেন। এ কী! গা দিয়ে যে আগুন ছুটছে! স্ত্রীর হাত ধরে দাওয়ায় উঠে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে কাকে খুঁজলেন মহানন্দ। মৃণালিনী মাদুর পাততে পাততে জিজ্ঞেস করলেন, কী খুঁজচো?

খোকা। খোকা কই? বলতে বলতে দাওয়ার 'পরেই শুয়ে পড়লেন।

খোকা তো বোর্ডিং-এ। এ সময় যে সে বাড়ি থাকে না তা তো বাপেরও জানা। তবু খোকাকে খুঁজছেন! মৃণালিনীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। স্বামীর প্রায়-অচৈতন্য দেহের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন, অন্য বারের মত এবারকার জ্বর নয়। পরদিন নুটুকে ঘুম থেকে তুলেই বনগাঁ পাঠিয়ে দিলেন, দাদাকে আজই ছুটি নিয়ে চলে আসতে বলবি। খোকাকে দেখলেও উনি অনেকটা ভাল থাকেন।

ছোট ভাইয়ের সঙ্গে প্রায় পাঁচ মাইল পথ দৌড়ে বাড়ি এলো বিভূতি। কবিরাজ শরৎচন্দ্র দাঁ এবং ডাক্তার গিরীন চ্যাটার্জিকে ডেকে আনল। এঁরা দুজনেই মহানন্দর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শরৎ আবার কবিরাজ তারিণীচরণের ছাত্রও। যমের সঙ্গে পাঞ্জা কষা সেই তারিণী কবিরাজ আজ কোথায়? তাঁর ছাত্র শরৎ কবিরাজ অনেকক্ষণ তারিণী-তনয়ের নাড়ী ধরে থেকে ম্লান মুখে উঠে এলেন।

মেডিকেলে যদি কিছু হয়, দেখা যাক। ডাঃ চাটার্জি ওষুধে ইনজেকশনে তিন-চারদিন ধরে কোন চেষ্টা বাকি রাখলেন না। সঙ্গে শরৎ কবিরাজের শুশ্রূষা। কিন্তু সব ব্যর্থ। একটা অসহায় পরিবারকে হালভাঙা নৌকোর মত ইছামতীর চড়ায় ফেলে রেখে কাণ্ডারী মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় নিলেন। এটা বাংলা সাল তেরশ’ আঠার।

॥ তিন ॥

কথকঠাকুরের ভিটে শূন্য হল। মহানন্দকে কেন্দ্র করেই সুখে দুঃখে চলে যাচ্ছিল সংসারটা। মৃণালিনী এবার ছোটদের নিয়ে মুরাতিপুর বাপের বাড়ি চলে গেলেন।

বড় ছেলে বিভূতি কী করবে? পড়ার পাট তুলে দেবে? না, কিছুতেই না। বোরডিং-এর খরচা সহৃদয় প্রধান শিক্ষক চারুবাবু চালাচ্ছেন। চালাবেনও ঠিক। কিন্তু পড়া চালাতে হলে সেইটুকুই সব নয়।

ব্যবস্থা একটা হল। বনগ্রামের সরকারি ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাযের বাড়ি আশ্রয় জুটল। ডাঃ ব্যানারজির ছেলে কালো, অর্থাৎ যামিনীভূষণ এবং মেয়ে খিনু, ভাল নাম শিবরানী, ওদের দুজনকে পড়ানোর ভার। বিনিময়ে আহার, এবং বাসস্থান। ডাঃ বিধুভূষণ এ নিয়োগের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকেই বিভূতি সম্পর্কে সুপারিশ পেয়েছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ও'দের ঘরেব ছেলে হয়ে গেল বিভূতি।

দুজনকে পড়ানো আব সঙ্গে সঙ্গে নিজেব প্রবেশিকা পবীক্ষার প্রস্তুতি, এক সাথে দুটি কাজ, ওর কিন্তু তাতে কোন অসুবিধাই হয় না। আর শুধু কি তাই। এর মধ্যেই আবার সুযোগ করে বনজঙ্গলে ইছামতীর পাড়ে ঘুরে আসা, সবুজের হাওয়া লাগানো আছে। ও বরাবব লক্ষ্য কবে আসছে, গাছপালাব সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে না এলে ওর শরীর মন ভালো থাকে না। আর মন ভালো লাগে ইছামতীকে পেলে। তা ওর বারাকপুরের ইছামতী এই শহরটার বলতে গেলে মাঝ দিয়ে বইছে। সাঁতার কাটো, নৌকা বাও, ছিপ ফেল, যেমন করে চাই ইছামতী ওব বইলোই।

আরও একটা নতুন আকর্ষণ এখানকার লিচুতলা ক্লাব। ডাক্তারের বাড়ির কাছেই মন্মথ চ্যাটারজির বাড়ি। ভদ্রলোক পরবর্তী জীবনে বৃত্তিতে মোক্তার হলেও আসলে ছিলেন সাহিত্যসাধক। সে সাধনাব সতীর্থ ছিল মুখুজ্যে বিভূতি, অর্থাৎ সেই মিতে। মিতের উৎসাহেই মন্মথর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল বিভূতির। বয়সে মন্মথ ওর চাইতে কয়েক বছরের বড়। বিভূতি ডাকত মন্মথদা বলে। তবে আড্ডার সময় বয়স দিয়ে লঘু-গুরু বিচার হয় না, রসজ্ঞানে, নিষ্ঠায় সমতা থাকলেই জমে এবং মজে যাওয়া যায়। বিভূতি প্রথমেই দেখল, মন্মথদা নিজেই কেবল সাহিত্য রচনা করেন না, বালক এবং যমুনা নামক দুটি সাহিত্য পত্রিকারও তিনি নিয়মিত গ্রাহক। বিভূতি অবিলম্বে সেগুলির অনুগ্রাহক হয়ে গেল।

এক একটা সংখ্যা আসতেই গোগ্রাসে তার প্রতিটি লেখা পাঠ, আলোচনা, ভালো-মন্দ বিচার চলতে লাগলো পুরোদমে। বড়োরা সব সময় এগুলি বরদাস্ত করেন না। সুতরাং মন্মথদার বাড়ির সামনে একটি লিচুগাছের ছায়ায় বসে এসব জমত। লিচু-

তলার আসর বলেই নাম লিচুতলা ক্লাব। নামটা বিভূতিরই দেওয়া। এর সদস্য তিনজন —দুই মিতে এবং মন্মথদা।

এ আসর ওদের কারো জীবনেই ভুলবার নয়। বিশেষ করে বিভূতির। এই লিচুতলায় বসেই যমুনা পত্রিকায় বরমা-প্রবাসী জনৈক বাঙালী লেখকের একটি ধারা-বাহিক উপন্যাস পড়ে বিস্মিত হয়েছিল তরুণ বিভূতিভূষণ। এখানে বসেই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের, তাঁর রচনার প্রতি প্রথম অজানা আকর্ষণ অনুভব করে সে।

সে এক তীব্র উন্মাদনা। স্কুলের পড়া যতটা করা যেত, তা হয়ত কিছুটা কম হয়েছে এতে। তবে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের পক্ষে তাতে কোন বাধা হয়নি। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হল বিভূতি। পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি গিয়েছিল মায়ের কাছে। তার কাছে বসেই খবরটা পায়। এটা ইংরাজি উনিশ শ' চোদ্দ সাল। স্কুলের খাতায় উনিশ বছর ছ' মাস হলেও, বিভূতির আসল বয়স তখন একুশ।

মৃণালিনী অল্পেতেই খুশি। গরিবের ঘরে এর চেয়ে বেশি পড়াশুনো হয় না খোকা। তুই বরং একটা চাকরি খুঁজে নে।

চাকরি, টাকা, সংসারটাকে আবার দাঁড় করানো, এসব স্বপ্ন মায়ের বুঝতে পারে বিভূতি। কিন্তু সে তো রেলীর বাড়ির কলমপেষা কেরানী কিংবা চাঁপদানী বাঁশবেড়ের চটকলের টাইমবাবু হতে চায় না। জীবনের দিগন্ত যে খুলে খুলে যাচ্ছে তার সামনে। কলকাতা এসে রিপন কলেজে আই এ ক্লাসে ভরতি হয়ে গেল।

থাকা খাওয়া? হিন্দু হসটেলের কাছে ২৪।১ মদনমোহন সেন লেনের এক মেসবাড়িতে। সন্ধানটা দিয়েছিল বনগাঁর ক'জন পরিচিত পড়ুয়া। এদের মধ্যে পিতৃবন্ধু ডাঃ গিরীন চ্যাটারজির ছেলে সুরেনও ছিল। সে ভরতি হল আই এসসি ক্লাসে। টাকার ভাবনা তার ছিল না। কিন্তু বিভূতির দশা ওদের জানা। সবাই খোঁজাখুঁজি করে একটা ট্যুইশানি যোগাড় করে দিল। ভাবা গিয়েছিল এতেই চলবে। কিন্তু হিসাবে একটু ভুল হল। আর তার মাশুল গুনতে গিয়েই এক কাণ্ড!

বই কেনা, মাইনে গোনা, সব করে মেসের টাকা মেটানো দায় হয়ে উঠল। বাকির খাতায় নাম উঠল ক'মাসেই। খেতে বসলেই মেস ম্যানেজার চশমার ভিতর দিয়ে তুরীয় দৃষ্টিক্ষেপ করেন, ও-মশাই, খেয়ে উঠে একটু শুনবেন।

এই শুনতে ডাকার অর্থ অভিজ্ঞ আবাসিক মাত্রেই বোঝে। ইদানীং বিভূতিও বোঝে। কী করা যায়? কিছুতেই যে কুলোচ্ছে না। রুমমেট জুটেছিল এক মদ্রদেশীয় যুবক। পরামর্শ চাইতে গিয়ে দেখল ওর দশা তারও। দেশ থেকে টাকা আসছে না, কবে আসবে ঠিক নেই। তবু তো একটা সম্ভাবনা আছে ওর; কিন্তু বিভূতির? সুরেনরা আরও একটা ট্যুইশানির আশা দিয়েছিল, হল না অ্যাদ্দিনেও। কেবল রুমমেট বলেই নয়, একই সমস্যা দু'জনের, অতএব ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল হঠাৎ। রোজই পরামর্শ, কী করা যায়? একদিন একটা মুশকিল আসানের চমৎকার বুদ্ধি বার করল রুমমেট। মদ্রমেট বললে—গেট রেডি।

ঠিক দুপুর বেলা। সবাই খাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত। বিভূতি আস্তে আস্তে বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালো। দৃষ্টি মেসবাড়ির দোতলায় ওদের ঘরের জানলার দিকে। মদ্র যুবক লম্বা দড়ির একদিকে বিছানা, স্যুটকেস বেঁধে জানলা দিয়ে দিলে ঝুলিয়ে। রাস্তার উপরে তা খুলে নিল বিভূতি। টাকা যখন মেটানো দায়, তখন পালানো ছাড়া পথ কি? কিন্তু বেডিং নিয়ে সরে পড়তে দেবেন কেন ম্যানেজার! ওসব অজ্ঞাত-

কুলশীল বোরডারদের সম্পর্কে তিনি সদা-সন্দিগ্ধ। তাই সরে পড়ার ওই অভিনব অবলম্বন। একটি একটি করে তৃতীয় বার, অর্থাৎ শেষ বার যখন দড়ির ক্রেনে লাগেজ নামছে, পথচারীরা হৈ চৈ শুরু করল। চুরি হচ্ছে না তো? মেসসুদ্ধ লোক বাইরে এসে থ। লজ্জায়, অপমানে যেন মরে গেল বিভূতি।

কলেজের মাইনে দিলে না সে মাসে। বাকিটা সুরেনের কাছ থেকে ধার করে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে নাম কাটালো ক'দিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে আরও একটা ট্যুইশানির সন্ধান করেছে সুরেন। রুমমেটের পরামর্শ আর না নিয়ে সটান রিপন কলেজের ছাত্রাবাসে চলে এলো।

বুঝল, মহানগরীর এই বিচিত্র সঙ্গের মধ্যে সাবধান হয়ে না চললে পদে পদে ওরকম বিপদ আসতে পারে। ঘটতে পারে অধঃপতন। আত্মস্থ হতে হবে তাকে।

এমন সময় একদিন শুনল সেনট পলস কলেজ হসটেলে নাকি রবীন্দ্রনাথ আসবেন। রবি ঠাকুর! বাল্যকাল থেকে ওর কাছে ও-নামে ছিল ইন্দ্রজাল ছড়ানো। গগন পালের মুখে প্রথম শোনা নামটি সেদিন যে মায়ালোক সৃষ্টি করেছিল, বনগাঁ স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় কবির নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদে সেই মায়ালোক ভরে গিয়েছে রামধনুর বর্ণালীতে। নির্দিষ্ট দিনের আগের রাতে উত্তেজনায় আর যেন ঘুম আসে না ওর। কালকেই তো দেখবে তাঁকে সচক্ষে, সশরীরে!

কলেজ কামাই দিয়ে নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছু আগে সেনট পলস কলেজ হসটেলের সামনে হাজির। হসটেলের সামনের মাঠে কবির জন্য চেয়ার টেবিল পড়েছে। একটু একটু করে লোকে ভরে গেল জায়গাটা। টেবিলের কাছাকাছি নিজেকে দাঁড় করিয়ে নিল বিভূতি। তারপর মুহূর্ত গণনা।

পরম লগ্ন। চাঞ্চল্য জাগল। চিড় খেয়ে গেল জমাট ভিড়টা। কবি এগিয়ে এলেন তার মাঝখান দিয়ে। দীর্ঘ দেহ দীর্ঘ শ্মশ্রু সৌম্যসুন্দর মূর্তি। দু'চোখে কী এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টি! এগুলি বিভূতির নিজস্ব অনুভূতির কথা। ওর ভাষাতে বলি—"বক্তৃতা দিতে উঠলেন, কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে উঠলাম। মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনিনি। মনে হল অসাধারণ, জীবনে এমন কণ্ঠস্বর কানে গেল যা হাজার লোকের মধ্যে পৃথক করে চিনে নেওয়া চলবে। তিনি চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে একটা মুদ্রা করে বলছিলেন, 'কল্পলোক' কল্পলোক'। আর কিছু মনে নেই।"

কল্পলোকের দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবভোর বিভূতির আর কিছু মনে রাখতে পারেনি। শুধু সব মিলিয়ে এক অখণ্ড সত্তা তাকে আবিষ্ট করেছে। সম্মোহিতের মত সে ফিরে আসে।

রবীন্দ্রসুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর প্রেরণায় কলেজে তখন পুরো দমে চলছে বিতর্কসভা, সাহিত্যচক্র, সাহিত্যপত্র প্রকাশ প্রভৃতি। রবীন্দ্র-দর্শনের পর থেকে এসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে বিভূতি। উৎসাহে 'নতুনের আহ্বান' নামে একটা প্রবন্ধ লিখল, পাঠ করল সাহিত্যচক্রে। সবার সুখ্যাতি পেয়ে একটা কবিতাও লিখে ফেলল কলেজ ম্যাগাজিনে।

সভা, সাহিত্যচর্চা, ট্যুইশানি সব বজায় রেখে বই চেয়েচিন্তে কলেজের পাঠ সে এক সমস্যা বইকি!

সমস্যা কি একটা? টেস্টের পরই এলো ফি-র প্রশ্ন। মা নুটুরা আছে মামাদের গলগ্রহ হয়ে। সেখানে কিছু চাওয়া যাবে না। কী করা? কয়েকজন সহপাঠী একটা

নাম বাতলাল। যা না, অনেককেই তো সাহায্য করেন শুনেছি, তোর টেস্টের নম্বর ভালো, দেখাবি। তুই তাঁর কলেজের ছাত্র, গরিব, ফি দিতে পারছিস না। গেলে একটা বিহিত হবেই।

বিভূতিরও আর পথ নেই, পিছিয়েও যাবে না এতদূর এসে। সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে হাজির হল সেখানে। কিন্তু যাঁর কাছে গেল, তিনি এই কলেজ ও তার সঙ্গে গোটা দেশের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় একটি সাধারণ, সুপারিশবিহীন পল্লী-যুবকের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারলেন না। শূন্য হাতে ফিরে এলো বিভূতিভূষণ।

শূন্য মনে নয়। নিজের অজ্ঞাতেই আর একটি নাম তার মনের মধ্যে এসে হাজির। সে নাম যেন তাকে ভিতর থেকে ডাকছে, বলছে কি হয়েছে ওতে, আমার কাছে আয়। হসটেলে না ফিরে অমনি পা ঘুরিয়ে সটান বিজ্ঞান কলেজের সামনে চলে এলো। তারপর? নামটি মাত্র জানা, চোখে সে দেখেনি কোনদিন তাঁকে। শুনেছে বিজ্ঞান কলেজেই থাকেন ' এটাই তাঁর সংসার। কিন্তু অত বড় বাড়ির কোন ঘরে, কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে? একে-তাকে জিজ্ঞেস করে মোটামুটি একটা আন্দাজ করে এগিয়ে গেল একটা বড় ধরনের ঘরের সামনে। আর মুখোমুখি যাঁকে দেখল, অমনি মন বলে উঠলো—এই তো তিনি। কী এক বিশ্বাসে ভরে গেল মন। আর দ্বিধা করল না। সঙ্গে সঙ্গে আনত হল সেই ঋষিকল্প পুরুষের শ্রীচরণে। তারপর মাথায় একখানি শীর্ণ হাতের শান্ত স্পর্শ পেয়ে উঠতেই তিনি বললেন—বল।

বিভূতিও বলতেই এসেছে।

রুক্ষ কেশ, শীর্ণ কান্তি, আচার্যদেব ভালো করে ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন—আমার ঘরে এসো।

বিভূতি তাঁর সঙ্গে গেল। প্রশ্ন করলেন, কলেজে পড়ছ কেন?

একি প্রশ্ন? এখানে দেখছি পড়তেই বারণ করা। তবে তো হয়ে গেল! বিভূতির বুকের সব আশা ধূলিসাৎ। চলে যাবে? পা যেন আর সরছে না। তবু উঠে দাঁড়াতে হয়। উনি আবার বললেন, বসো, কলেজের পাঠ শেষ হলে কি করবে কিছু ভেবেছো?

আবার এ-কথা কেন? না বুঝতে পেরে এবারও বিভূতি নিরুত্তর রইলো।

আচার্যদেব ওর হতভম্ব ভাবটা বুঝতে পেরেই বোধহয় সহজভাবে বললেন—চাকরিজীবী হওয়ার জন্য বাপু তোমায় সাহায্য করতে পারবো না আমি। তবে যদি বল স্বাধীন বৃত্তির জন্য তৈরি হওয়ার সুযোগের আগে কিছুটা শিক্ষা অর্জন করে নিচ্ছ, আমার আপত্তি নেই।

বিভূতিভূষণ যেন স্বর্গ হাতে পেল। তাহলে একটা উপায় আছে। আপাতত ওরও আপত্তি নেই ওরকম একটা প্রতিশ্রুতি দিতে। ওসব তো ভবিষ্যতের কথা। বর্তমান তো আগে বাঁচুক। নগদ টাকাটা নিয়েই সেদিন হসটেলে ফিরল সে।

পরবর্তী জীবনে ব্যবসায়ী ঠিক হতে পারেনি, কিন্তু যা হয়েছিল, তাতে সেই মনীষীর, সেই আচার্যদেব পি সি রায়ের আশীর্বাদ ঝরে পড়েছিল অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। সে কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে পানিতর বেড়াতে গিয়েছিল বিভূতিভূষণ। সুযোগ পেলেই শহরের পুতু-পুতু পরিবেশ থেকে গাঁয়ে পালানোটা তার স্বভাব। তবে পানিতরের একটা বিশেষ আকর্ষণ, এ তার পিতামহর দেশ। এখনও ওর দুই জ্ঞাতি

কাকা এখানে রয়েছেন। পরিচয় পেয়ে ঘরের ছেলে বলে আদর করে নিলেন তাঁরা। ঘটনাটার তখনই সূত্রপাত।

দুপুরে স্নান করতে গিয়েছে বড় দীঘিতে। সঙ্গে খুড়তুতো ভাই। গাঁয়ের ছেলে বিভূতি। ইছামতীতে কতো ঝাঁপাই জুড়ে আসছে সেই ছোটবেলা থেকে। কলকাতার চৌবাচ্চা তার মন ভরাতে পারে না। বড়দীঘির কাকচক্ষু জল দেখেই খুশি। সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নামছে, হঠাৎ থামতে হল। শেষের ধাপ জুড়ে আছে একদল ছেলে-মেয়ে। স্বাভাবিক সংকোচে ও সরে এলো। লজ্জা ভাঙলো খুড়তুতো ভাই, আরে ধেৎ, ও তো আমাদের কালীখুড়োর বাড়ির সব। লজ্জা কিরে, চল নামি।

সে হাত ধরে টান দিয়ে হাঁকলো, এই গৌরী, সরে দাঁড়া।

বিভূতিভূষণ দেখল, চমকে লজ্জা পাওয়া এক কিশোরী দৌড়ে উপরে চলে যাচ্ছে। বিভূতি জলে নামলো।

ভিন গাঁয়ের অচেনা যুবক, এমন দামাল মেজাজে সাঁতার কাটা, ডুব সাঁতারে প্রায় পারাপার করা এসব ওরা ঘাটের ওপর থেকে অবাক হয়ে দেখছিল। দেখল তাকিয়ে বিভূতিও। ওদের সামনে লজ্জা পেয়ে বসল, এভাবে হই-হুল্লোড় করতে।

কি রে, মিইয়ে গেলি কেন? জল থেকে উঠবি না বলছিলি যে। খুড়তুতো ভাই উসকাতে চায়।

না, আজ আর নয়। বিভূতি সত্যিই উঠে পড়লো।

ওই ছেলেমেয়ের দল ততক্ষণে চলে গিয়েছে। ভাইটি বলল, কি ভেবে এত চটপট উঠে পড়লি রে।

বিভূতি বললে, এমনিই। ক'মাস পরে পুকুরে নামছি তো, তাই ভাবলাম আজ আর থাক।

সে পর্যন্ত হয়ত এর বেশি ভাবনা কিছু সত্যিই ছিল না। রাতে সেই কালীভূষণ মুখারজির বাড়িতেই নিমন্ত্রণ। খুড়ো বললেন, কালীদা অনেক করে বলে গিয়েছেন, না গেলে অন্যায় হবে। আর সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে বিভূতি যখন দেখল, বড়দীঘির সেই মেয়েটির হাতেই ভাতের থালা, ভাব না হোক, ভাবনাটা তখন থেকেই শুরু।

আরে সঙ্কোচ কিসের! আবহাওয়াটা ঘরোয়া করতে চান কালীভূষণ। তুমি তো আমাদের মহানন্দদার ছেলে হে। ঘরের ছেলেই বলতে পারি। শুনেছি তোমার কথা, তোমার খুড়োদের কাছে। খুব ভালো এনট্রানস পাশ করেছো। এবার নাকি এফ এ দিলে। তুমি তো আমাদের গৌরব হে।

প্রবীণেরা তখন আই এ-কে এফ এ-ই বলতেন। এবং গ্রাম-গাঁয়ে তা গন্ডায় গন্ডায় পাওয়াও যেত না। সুতরাং বিভূতিকে নিজেদের মধ্যে সহজভাবে পেয়ে তাঁরা খুশি। একটু একটু করে কথক মহানন্দর পুত্রও মুখ খুলল। সবাই খুশি ওর সহজ আলাপ-চারিতে। কলকাতায় থাকে, কলেজে পড়ে, অথচ কী দেখ এতটুকু দেমাক নেই, অহংকার নেই।

আবার ভাত দিতে এলো সেই মিষ্টি মিষ্টি মেয়েটি।

এটি আমার মেঝো মেয়ে, গৌরী। কালীভূষণ জানালেন।

ঝিঁঝি-ডাকা পল্লীপথে হ্যারিকেনের মৃদুকম্পিত আলোয় অন্ধকারকে রহস্যময় করে কালীভূষণের বাড়ি থেকে ফিরছিল খুড়তুতো ভাই আর বিভূতি। খুড়তুতো ভাই জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি কেমন রে।

ঠিক ওই মুহূর্তে ওই কথাটিই বোধহয় ভাবছিল বিভূতি। সেও প্রশ্নের ভঙ্গীতে তাকালো ওর দিকে।

খুড়তুতো ভাইও যৌবনে পা দিয়েছে। কিছু কিছু কথা সে না বলতেই বোঝে—এই তার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে ভর করেই বলে ফেলল, বিভূতিভূষণ আর গৌরী—হর-গৌরী, ব্যাস। একটা যোটক মিল পেয়ে গিয়েছে যেন সে।

কিন্তু বিয়ের চাইতেও বিভূতিভূষণকে তখন বি এ পড়ার চিন্তাটা বেশি পেয়ে বসেছে। কিছুদিনের মধ্যেই মামাবাড়ি মুরাতিপুরে বসে খবর পেল—সে প্রথম বিভাগে আই এ পাশ করেছে।

এবারে, আরও বেশি পড়ার চাপ, টাকার চাহিদা। আর কত দিনই বা মা এমনি ওর 'মানুষ হওয়ার' পথ চেয়ে মামাবাড়ি কাটাবে। পাশের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এসব অনেক চিন্তা এসে বিব্রত করে তুলল বিভূতিভূষণকে। চিন্তাটা মা মৃণালিনীরও।

আর এই সময়ই পানিতর থেকে মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মুরাতিপুর উপস্থিত।

তাঁর কথা শুনে বোঝা গেল, খুড়তুতো ভাইটি এর মধ্যেই প্রজাপতি কোমপানির শুভ মহরতের আয়োজন সেরে ফেলেছে প্রায়। কালীভূষণের বড় ছেলে মারফৎ গৌরীর সঙ্গে বিভূতির বিয়ে ঘটাবার একটা ইঙ্গিতের ঢিল মুখুজ্যে বাড়ির অন্দরে টুপ করে ফেলতেই তরঙ্গ জেগেছে সেখানে।

দারিদ্র্য একটা বাধা বটে। পাত্র যত ভালোই হোক. আপাতত মাতুলাশ্রয়ী বলে দু'চারজন মাথাও নেড়েছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী কালীভূষণ মোক্তার একটা সম্ভাবনার আশা পেয়েছিলেন এই বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের মধ্যে। এমন সুপাত্র তিনি হাতছাড়া করবেন না।

বিয়ের প্রস্তাবে মাথা নাড়লেন মৃণালিনী। বড় ছেলেকে সংসারী করার স্বপ্ন তাঁর চাইতে কার বেশি? কিন্তু তিনি জানেন, এখনই ও-সব ঝামেলার মধ্যে ওকে জড়ানো যাবে না। আর ঠিকও হবে না তা।

কিন্তু কালীভূষণ একে জমিদার তায় মোক্তার। প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। বললেন, আপনার চিন্তার কারণটা আমি বুঝি। আপনি সম্বন্ধ করুন। ওর পড়াশুনার দায় আমার রইল।

মনে ধরল কথাটা মৃণালিনীর। শ্বশুর সম্পন্ন হলে আপদে-বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবেন। তার চাইতেও বড় কথা. পড়াশুনাটা বন্ধ হবে না খোকার। মৃণালিনী রাজি হলেন। তবে মেয়ে দেখা, দিনক্ষণ স্থির করা. এসবে সময় নেবে। বারাকপুরের ভদ্রাসনটা ঠিক করতে হবে। সুতরাং দেরি একটু হবেই শুভকর্মে।

তা হোক না দেরি দু'চার মাস। কালীভূষণ কথা চান। এবং তা পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

এদিকে বি এ-তে ভরতি হয়ে গিয়েছে বিভূতি। পাঠ্য অর্থনীতি ও ইতিহাস। 'এ' 'বি' দুই সেকশন মিলিয়ে শ'দেড়েক ছাত্র তখন রিপনে। বিভূতির সেকশন 'এ'। সহপাঠীদের মধ্যে আছে ননী চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় লাহিড়ী, গোলাম মোস্তাফা, কৃষ্ণধন দে প্রমুখ। বি এ পড়ার ব্যাপারে ছেলে যেমন মায়ের মতামতের অপেক্ষা না করেই এগিয়েছে, বিয়ের ব্যাপারেও মা বসে থাকেননি ছেলের মতামত নিতে। বাপের বাড়ির লোক দিয়ে কনে দেখা থেকে শুরু করে সব দিক গুছিয়ে দিনাবধারণ পাকা হল। তারিখটা বত্রিশ শ্রাবণ, বাঙলা সন তেরশ' চব্বিশ, ইংরাজি উনিশশ' সতের।

শুভবিবাহ।

মামাবাড়ি মুরাতিপুর থেকে বরযাত্রা পানিতর পেঁছুতে সন্ধ্যা উৎরে গেল। আয়োজনে খুঁত রাখেননি কালীভূষণ। সমৃদ্ধ গ্রাম পানিতরের অন্যতম সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। রূপবতী মেয়ে তাঁর, জামাইও আনলেন গাঁয়ের সেরা, বাছাই করা। বাদ্য-বাজনা, চর্ব্যচোষ্যের মহাধুমধাম লেগেছে। বারাকপুর থেকে বেশ বরযাত্রী এসেছে। কিন্তু বরের মন পথের দিকে। কলকাতার মেস-সঙ্গীরা কই? বিয়ে চুকলো অনেক রাতে। বরকে বাসরঘরে টেনে নিয়ে আক্রমণ করল মেয়েরা—গান।

সর্বনাশ! বাবার গুণ কিছু পেয়েছে নুটু। সে গাইলে চলবে?

না, নিতবরের গান পরে। এখন বরের গান।

আবৃত্তি চলবে?

না, ওসব কথা ছাড়ুন। গানই গাইতে হবে। মেয়েরা নাছোড়।

এখন উপায়! অকূলে তলিয়ে যাচ্ছিল বর। এমন সময় একটা খবরের খড় ভেসে এলো। বাইরে কোলাহল। কি ব্যাপার? কলকাতা থেকে বরের বন্ধুরা এসে পেঁছেছে। বাসরঘরের প্রমীলারাজ্য থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বিভূতি। এত দেরি? ট্রেন লেট। কৃষ্ণধন, পরবর্তী কালে যিনি কবি কৃষ্ণধন দে বলে পরিচিত, যাঁর লেখা 'সন্যাসীর প্রেম'ই প্রথম বাংলা সবাকচিত্র, সেই কৃষ্ণধন, ননী, জ্যোতির্ময়, বৃন্দাবন সিংহ রায়—সবাই হোটেলের ঘ্যাঁট ছেড়ে চর্ব্যচোষ্যের লোভে হাজির। চোষ্য যথেষ্টই ছিল। শেষ শ্রাবণেও বেশ আমের আয়োজন করেছিলেন কালীভূষণ। আপ্যায়নের ত্রুটি রইল না।

ওদের কাছে সঙ্গীত-সঙ্কটের কথাটা জানালো বিভূতি। কিন্তু আশ্চর্য, এতগুলি বন্ধুর একজনও তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। বরং যেন মজা দেখতে লাগল। 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শোনাতে লাগল, তবু কাজ হল না। আজ যে সবাই শত্রু—সবাই?

মেয়ের দল ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাসরঘরের বন্দীশালায়। তারপর সেই এক দাবি, গান? কে যেন ওদের বলে দিয়েছে, বাপ বড় গাইয়ে ছিলেন। ছেলেও ভাল গান জানে। বর যত বোঝায় গান সে জানে না, ওরা তত ভাবে বরের কথা সব ঠকানোর ফিকির।

ঠিক আছে। আর্তনাদের মত গান ধরল বর, রবীন্দ্রনাথের একটা শ্রাবণের গান।

হাঁ-হাঁ করে মেয়েরা থামিয়ে দিল। ও-সব কান্নাকাটির গান বাসরঘরে চলবে না।

কান্নাই বুঝি পাচ্ছিল বরের। চোখ দিয়ে জল ঝরার দশা। চোখের জল নয়, গভীর জলের ব্যাপার ধরল—দেহতত্ত্বের গান। পঞ্চভূত ষড়েন্দ্রিয়, আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণন।

বিরক্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল বাসরবঙ্গিণীর দল। বাসর-কপাট ভিতর থেকে বন্ধ হল।

গৌরীর বড়দি আশা, বোন হেমলতা এবং আর মেয়েরা বাইরে তখন উৎকর্ণ। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাসর ভরতি চাঁপা ফুলের গন্ধ, যা বাইরে আসছে মাঝে মাঝে। কী জানি কী করছে বেচারা গৌরী। আশা উদ্বিগ্ন। শিখিয়ে দিয়েছিল, নিজের চুল দিয়ে ওর পা মুছিয়ে প্রণাম করবি, বুঝলি? হয়ত তাই করছে এখন। হঠাৎ কথার আভাস ভিতর থেকে—

তোমার নাম কি?

বারে, আপনি বুঝি শোনেননি।

তবু তোমার মুখ থেকে শুনব, বল।

কুমারী গৌরীরানী মুখোপাধ্যায়।

বাইরে তখন ফুলের মত কয়েক গুচ্ছ মেয়ে-বউয়ের খিল-খিল হাসি। বাসরেও বুঝি দোলা লাগে। ক'মিনিট আর কথা নেই। আবার সাড়া জাগে—শোনো।...কী ভাবছো?

কী যেন আমি ভুল বলেছি—তাই না?

হাঁ, আজ থেকে আর তুমি মুখোপাধ্যায় নও, বন্দ্যোপাধ্যায় হলে।

ইশ...। আর ভুল হবে না। বলছি—কুমারী গৌরীরানী—

উঁ হু হু। বরের জোর হাসি।...আর কুমারীও নও তুমি।

তারপরে সে ভুল শুধরে দেয় বর। কিন্তু কী বলে, কী করে, বাইরে তার আভাস মেলে না।

বাসরঘরের মৃদু সলজ্জ পরিচয়ে যে নবজীবনের যবনিকা উঠল, অনুরাগে তা নিবিড়তর হল দ্বিরাগমনের কালে, পানিতর যেতে। বিভূতির তখন তেইশ বছরের পূর্ণ যৌবন। আর গৌরী—চোদ্দ বছরের উনযৌবনা। বিয়ে করতে গিয়েছিলেন মামা-বাড়ি মুরাতিপুর থেকে। সেখানে ফিরেই বউভাত। আবার দ্বিরাগমন। নৌকো করে গিয়ে উঠতে হয় মার্টিনের ছোট্ট রেলে। তারপর পানিতর।

দিগম্বরের ছাউনি টানা নৌকোয় ওরা দু'জন। সেই খুব ভোরে বেরিয়ে দুপুর নাগাদ নৌকো ভিড়ল বেলেঘাটার ঘাটে। এ বেলেঘাটা কলকাতার নয়, চব্বিশ পরগনার ছোট্ট রেলের স্টেশন বেলেঘাটা। এখান থেকেই ট্রেনে উঠতে হবে। তা তো হবে, কিন্তু ট্রেন কোথায়? গাড়ি নেই প্লাটফরমে। বহু লোক বসে আছে প্রতীক্ষায়। আর এ এমন ট্রেন, একবার লেট হলে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই কখন আসবে।

এদিক-ওদিক লটবহর নামিয়ে কয়েক দঙগল যাত্রী রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। জানা গেল, একটু আগেই গাড়ি ছেড়ে গিয়েছে। ফের সেই সন্ধ্যায়।

নৌকো করে বা পায়ে হেঁটে গাড়ির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না গাঁয়ের লোক।

এখন উপায়? বিভূতিভূষণ চিন্তিত।

গৌরী বলে, বেশ হল, আসুন, রান্না করে খাই।

প্রস্তাবটা বিভূতিরও পছন্দসই হল। হাতে অনেক সময়। বেশ রান্না-রান্না খেলা হবে।

খেলা নয় মশাই, খাঁটি। একদম সত্যিকারের রান্না দেখবেন।

তাই হল। পথের পাশেই পথিক-জীবনের ঘরকন্নার শুভ মহরৎ।

শেষ মিনিটের দোষে গাড়ি-ফেল-করা যাত্রীদের ভিড় এখানে রোজকারের ব্যাপার। কয়েকটি যাত্রিনিবাস গড়ে উঠেছে। হাঁড়ি-কড়া, কয়লা-উনুন, কাঠ-পাতা সব মিলবে। কাছেই মুদিখানা। ফেলো কড়ি—মাখো তেল।

গৌরীকে একটা যাত্রিনিবাসে রেখে দোকানে সওদা করতে গেল বিভূতিভূষণ। এদিকে গৌরী সব গোছগাছ করবে এই কথা। ছোট ছোট ঘরের যাত্রিনিবাস। মাঝে কেবল দরমার বেড়া। সওদা নিয়ে ফিরে বিভূতিভূষণ দেখে, পাশের খুপরির দরমায় কান পেতে আছে গৌরী।

কী করছ? জিজ্ঞেস করতেই মুখে আঙুল ঠেকিয়ে ওকে চুপ করার ইশারা করল গৌরী। কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, কলের গান। যেন বিনা টিকিটে সিনেমা দেখছে এমনি একটা ভাব। আবেগে স্বামীকে হাত ধরে টানতে টানতে দরমার কাছে নিয়ে গেল।

বিভূতিভূষণ দেখল, পাশের ঘরের যাত্রীরা একটা মস্ত চোঙওয়ালা গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।

গান ওরও ভালো লাগে। কিন্তু এভাবে লুকিয়ে শোনায় অভ্যস্ত নয়। অস্বস্তি হচ্ছিল। তবু গৌরীর আবেগকে সে আঘাত দিল না। দু'জনেই অনেকক্ষণ শুনল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গৌরী বললে, বেশ মজা হচ্ছে কিন্তু।

মজা আরও হল। নৌকো, রেলগাড়ি, পানিতরে দ্বিরাগমনের স্মৃতি দুটি হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতার উত্তাপে সজীব হয়ে রইল। সব ছাপিয়ে বুঝি একটি স্মৃতি, একটি ছবি, একটি অনুভূতি।

সদ্যঃস্নাতা গৌরী। পিঠের 'পরে ভিজে চুলগুলি মেলে দেওয়া। দেহের রহস্য ঘিরে লালপাড় শাড়ি। ডাল-পাতার ধোঁয়াটে উনুনটা ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধরাতে চেষ্টা করছে গৌরী। লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে দুটি. গাল।

এ কাকে দেখছে বিভূতিভূষণ? গাল নয়, শাড়ি নয়, উনযৌবনা বধূ নয়। সে-মূর্তি সংসারের স্নেহ-প্রীতি-মমতায় অভিসিঞ্চিত চিরকালের নারীর। নববধূ গৌরীর মধ্যে পূর্ণযৌবন বিভূতিভূষণ দেখল মাতৃপ্রতিমার অনির্বচনীয় প্রকাশ। হঠাৎ ওর মা মৃণালিনীকে মনে পড়ে গেল।

কলেজের তাগিদে কলকাতা চলে আসতে হল বিভূতিভূষণকে। আস্তানা তখন আট-এর এক, স্বর্ণময়ী রোডের মেস। এসেই প্রণাম করতে গেল আচার্য রায়কে। নব-জীবনের প্রভাতে তাঁর একটা আশীর্বাদ চায়। কিন্তু বিয়ের কথা কি বলা যায় এই জ্ঞানতপস্বী চিরকুমারকে? শুধু কাছে কাছেই ঘোরে। বলা আব হল না।

বিকেলে আচার্যদেব প্রায়ই প্রিনসেপ ঘাটের দিকে বেড়াতে যেতেন। পথের পাশে লরড রবার্টস-এর প্রতিমূর্তির নিচে চাদর বিছিয়ে বসে থাকতেন গিরিশচন্দ্র বসু। চাদরটা একটু বড় করেই পাততেন তিনি। আচার্য রায় দেখতে পেলে হয়ত একটু বসবেন, এজন্যেই আসনপাতা।

তা বসতেন বইকি তিনি। আর তখন সেখানে যে দুর্লভ আড্ডাটি জমত তার স্বাদ গ্রহণ করাকে শহরের অনেক বিশিষ্ট লোকই পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। সে ভিড়ে নাক গলাত বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ বিভূতিভূষণ। নানা জ্ঞানের কথা, চরিত্র, জীবন-গঠন, সেবাব্রত, স্বজাতিপ্রেম, বাঙালীর ভবিষ্যৎ, কত প্রসঙ্গ। সে-সব শুনতে শুনতে বিভূতিভূষণের মধ্যেও একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর উপদেশেই সে ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট ও ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির সভ্য হল। জীবনসংগ্রামে অপরাজিত থাকার এক বলিষ্ঠ সংকল্পে ও কর্মোদ্যমে কলকাতার দিন কাটে।

বারাকপুরের ভদ্রাসন ঠিক হয়ে গেছে। মৃণালিনী বউ নিয়ে স্বামীর ভিটায় সংসার পাতলেন।

বারাকপুরে মৃণালিনীর ঘরে নাকে নোলক দুলিয়ে ঘুরঘুর করছে একটি বালিকা বধূ। কখনও ঘুরছে মৃণালিনীর আঁচল ধরে, কখনও প্রাণের গোপন গল্প মইির সঙ্গে। কখনও বা পুতুল খেলছে পুঁটিদির সাত বছরের মেয়ে পাঁচির সঙ্গে। পুঁটিদির মেয়ে? হাঁ, বিভূতির দেড় বছরের বড় পুঁটিদির বিয়ে হয়েছে অনেক দিন আগে, গোপালনগরের এক স্টেশন পরে, সেই মাঝেরগ্রামে। ভাল নাম সুনয়নী। কতবার বিভূতি গিয়েছে মাঝেরগ্রাম, পুঁটিদিকে আনতে, পেঁছে দিতে। বিভূতির থাকলেও খেলার বয়স আজ আর নেই পুঁটিদির। সে এখন দুই সন্তানের মা. প্রথম ছেলে গোষ্ঠ, তারপর মেয়ে অন্নপূর্ণা। ডাক নাম পাঁচি। মা বাপেরবাড়ি এলেই সঙ্গে আসে গোষ্ঠ-পাঁচি। বিভূতিকে ডাকে মামা। গৌরী ওদের মামীমা। সেই পাঁচির সঙ্গে

খেলছে আর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখছে। কনেপুতুল, বরপুতুল সব সাজিয়ে-গুছিয়ে বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা। এমন সময় দেবর নুটু কোত্থেকে ধূমকেতুর মত হাজির। 'জয় মা-কালী' বলে একটা লাঠি দিয়ে বা পা দিয়েই সব আয়োজন তচনচ করে দিল সে। মেয়ে মণি এসে বউদির হয়ে ধমকায় ছোট ভাইকে। এদিকে ছোট মেয়ের মত গৌরী কাঁদতে কাঁদতে মৃণালিনীর কাছে নালিশ লাগায়। ননদ মণিকে সাক্ষী মানে। মনে মনে হাসেন মৃণালিনী। তবু সামলে নিয়ে নুটুকে ধমকান। তারপরে নিজেই তিনি বউয়ের খেলাঘর গুছিয়ে দেন। ভাব করিয়ে দেন বউদি-দেবরে।

পুতুল খেললে কি হবে, যে লোকটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার ধ্যান কিন্তু ওইটুকুন বয়সেই চলছে। সুন্দর কণ্ঠি পেলেই কুড়িয়ে রাখবে, লুকিয়ে রাখবে, স্বামী এলে দেবে এই আশায়। হাঁ, স্বামীর কণ্ঠি-বাতিকটা এরই মধ্যে ওর জানা হয়ে গিয়েছে। আর জানা হয়ে গিয়েছে মণিদেরও বউদির এসব গোপন কাণ্ডরহস্য। স্বামীকে হাওয়া দেবে বলে একখানা তালপাখায় ঝালর বুনে লাগিয়ে রেখেছে, সরিয়ে। মৃণালিনী আড়ালে হাসেন। ছেলেমানুষ বউকে দিয়ে খাটুনি করানোর ইচ্ছে নয় তাঁর। তবু একটু-আধটু কাজের মহড়া দিয়ে রাখেন। তাঁর খোকার সংসার তো ওকেই ধরতে হবে একদিন। গৌরীরও আপত্তি নেই। হয়ত উঠোন নিকোতে লেগে গেছে সে। কাছে-ভিতে কেউ কোথাও নেই। আঙুলের ডগা দিয়ে আলতোভাবে মাটিতে দাগ কেটে লিখছে শ্বশুরের নাম, শাশুড়ীর নাম। লিখছে আর মুছছে। একবার বড় বড় করে লিখল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিউতি চোখ চালিয়ে নিল। কেউ নেই; ব্যস। ওর তলায় এবার গোটা গোটা করে বসিয়ে দিল নিজের নামটি। লিখে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে সেদিকে। পিছনে খিলখিল হাসি। ওমা, পুঁটিদি! দ্রুত মুছতে গিয়ে নিজের নামটাই মোছা হল, স্বামীর নামটা আর সামলাতে পারলো না।

সুনয়নী হেসেই অস্থির। কিরে, নাম লিখে ধ্যান হচ্ছিল বুঝি! গৌরী ততক্ষণে ডুবে গিয়েছে একগলা ঘোমটার মধ্যে। নোলকের দোলনটুকু শুধু বাইরে থেকে দেখা যায়।

মৃণালিনী ভাবেন, কবে যে খোকার কলেজ ছুটি হবে! নানা সমস্যার সংসারে বউমাকে তিনি বুকের স্নেহ-আদরে অন্তত হাসিখুশি রাখতে চান। ননদ মণি বছর দেড়েকের বড় মাত্র। দুই সখিতে হেসেখেলে কাটছে ওদের দিন।

কিন্তু অমন আবেগের সহজ রাস্তায় সংসারের সব কিছু কি চলে? মণিকেও বউমার খেলার সাথী করে রাখা যাবে না চিরকাল। বয়স প্রায় ষোলয় পড়ল। পার করতেই হবে এবার। ভাটপাড়ায় ভাইদের এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে বলে রেখেছিলেন। এবং খবর এল, সেখানকার চাটুজ্যেবাড়ির মেয়ে-পুরুষ সকলেই মামাবাড়িতে মণিকে দেখেছেন। একটু উদ্যোগ করতেই প্রস্তাবটা উৎরে গেল সেখানে। মামারাই উদ্যোগ করে মণির বিয়ে দিয়ে দিলেন—বনোয়ারিলালের সঙ্গে। মেয়ে মণি শ্বশুরের ঘর করতে গেল। মৃণালিনীর দিন কাটে বউকে নিয়ে। কিন্তু তাঁর অভাবের সংসার বলে বেয়াই কালীভূষণ নানা অছিলায় নিজের কাছেই রাখতে চাইতেন মেয়েকে। এ নিয়ে মনে দুঃখ ছিল মৃণালিনীর। তবু ছেলের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকতেন। কালীভূষণ অবশ্য মেয়েকে পাঠাতেন, কলেজের ছুটিছাটায় জামাই বাড়ি এলে।

সে আর ক'বার, কদিনের জন্য! স্মৃতির মাধুর্যে তবু তা রইল চিরদিনের হয়ে।

কলেজ ছুটি, বাড়ি এসেছে বিভূতিভূষণ। কিন্তু সে কোথায়? সামনে দিয়ে দু'একবার সরে সরে যাচ্ছে ত্রস্ত পদে, মুখ দেখাচ্ছে না কিছুতেই। এক

বিঘৎ বউয়ের সে প্রায় দেড় গজ ঘোমটা! একটা সুযোগ পেয়ে শাড়ির আঁচল ধরে টান দিল বিভূতিভূষণ। ব্যাস, সেই যে বউ ঘরে ঢুকল, একবারে রান্নাঘরে।

যে দু'একটা দিনের জন্য ছেলে বাড়িতে আসে মা তার বেশিটা সময়ই পাশের বাড়িতে সই কাদম্বিনীর কাছে কাটান। এ দুটো দিন ছেলে-বউয়ের মধুময় হয়ে উঠুক।

কিন্তু বৃথা। বিভূতি ঘরে এলে, গৌরী বাইরে ছুট। বাইরে এলে ঘরে লুকিয়ে দরজা দেয়।

রাতের শয্যায়ও বৃথাই স্বামী রাত জাগে। সবাই শুতে না গেলে গৌরী বিছানায় আসবে না। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হয় বিভূতিভূষণকে। বালিকা বধূ এসেই ধরা পড়ে যায়। কেন দেরি করলে এতো?

মা, ঠাকুরপো না ঘুমোলে আসতে লজ্জা করে।

সবতাতেই লজ্জা! তা দিনে তো মা, নুটু কেউ বাড়ি ছিল না, ঘরে দরজা দিয়ে থাকলে কেন? আমি এলেই পালিয়ে গেলে!

ছি, ছি, বউমানুষকে কি দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে আছে?

বেশ, মোট আটচল্লিশ ঘণ্টার মেয়াদে এসেছি, তার চব্বিশ ঘণ্টা তো এভাবেই লুকোচুরিতে কাটলো। কাল সকালের ট্রেনেই চলে যবো। তখন আর পালাতে হবে না।

এবার চপল বধূটি চুপ, চোখ ছলছল।

তা গৌরী বারাকপুরেই থাক, আর বাপ তাকে পানিতরেই নিয়ে যান, মন কিন্তু তার পড়ে থাকে পতিদেবতারই কাছে। সে খবর বিভূতিভূষণের কাছেও পৌঁছায় মেসের ঠিকানায় লেখা গৌরীর কাঁচাহাতের লেখা দু'একখানা চিঠিতে। এ-রকম এক চিঠির আমন্ত্রণ পেয়ে কলেজ কামাই দিয়েই একবার তাকে পানিতর অবধি ছুটতে হয় গৌরীর কাছে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসে বারাকপুরের বাড়িতে। দু'দিন কাটিয়ে কলকাতা ফেরা। তারিখটা বিশ আষাঢ়, উনিশ শ' আঠার।

শাস্ত্রী মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে নেই; তবু এসব তথ্য পেতে কষ্ট নেই। কারণ পিতার অভ্যাসটি পুত্রে বর্তেছে। বিভূতিভূষণও জীবনের স্মরণীয় সব কথা টুকে রাখে দিনলিপিতে। হীরের টুকরো যেন—'সে উনিশ শ আঠার-র আষাঢ় মাসে তাকে নিয়ে এলুম বারাকপুরে। রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে সেই অধীরভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে বাঁশবনে। মাটির প্রদীপের আলোয় আমি ও গৌরী। তখন সে মাত্র চোদ্দ বছরের বালিকা।'

কতো কথারই সাক্ষী রইল সে-রাতের সেই মাটির প্রদীপ। গৌরী বলে, এখন আমি এখানেই থাকবো। আপনি কিন্তু শনিবার কলেজ ছুটির সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন।

কিন্তু বাড়ি এলে যে আর পড়াশুনোই হয় না। বি. এ. পাশ করব কি করে?

খুব ভাল পাশ করবেন আপনি।

কী করে জানলে?

জানি না, দেখবেন ঠিক।

স্বপ্ন সত্যি হল গৌরীর। বিভূতিভূষণ ডিসটিংশনে বি. এ. পাশ করলেন। আনন্দবার্তা নিয়ে ঘরে ফিরলেন। 'বারই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল। গৌরী আমায় বললে, এসো, এসো।'

গৌরী এবার 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে আসছে একটু একটু করে। সহজ হচ্ছে

অনেক। সেই আনন্দ-রজনীতে গৌরীকে একটা উপহার দিতে চাইল বিভূতিভূষণ—বল কী নেবে তুমি?

গৌরী অনেক ভেবে বলল—একটা শাড়ি।

শুধু শাড়ি? আর কিছু না?

না। শাড়ি। কেন জানো? আমার বড় লজ্জা করে না হলে। বাড়ি গেলে সবাই কেবল জিজ্ঞেস করে, তোর বর তোকে কী দিয়েছে রে? একটা শাড়িও না? আমি কিছুই বলতে পারি না।

কেন, যা দিই তা বুঝি বলা যায় না?

যাও, দুষ্টু কোথাকার!

এর পর হয়ত দুষ্টুমিতেই দু'জনের বর্ষারাত্রি মদির হয়। সে-রাত বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। জীবন এগিয়ে চলে। এম. এ ক্লাসের পাঠ শুরু হল। বিষয়—দর্শন। সেই সঙ্গে প্রধানত মোক্তার শ্বশুরের ইচ্ছানুযায়ী আর এক উপসর্গ—ল' ক্লাস। এ-ব্যাপারে উৎসাহের যোগানদার আর একজন—মেস-সঙ্গী বৃন্দাবন সিংহ রায়। এ বছরই তিনি আইনের পরীক্ষা দিয়েছেন। নিজের বইগুলি ঢেলে দিলেন বন্ধুকে—নে, লেগে যা। পূর্ণোদ্যমেই পাঠনিবিষ্ট হল বিভূতি।

পুজোর ছুটি। বারাকপুরের আকাশে নীল তুলির টান চলছে। বীথিতলে শিউলির আলপনা। ঝোপে-ঝাড়ে তিৎপল্লার হলদে বাহার, গন্ধ-মউমউ কেলেকোঁড়ার লতা-বিতান। ইছামতীর কোলে কাশফুল, বাশফুল। বাড়ি ফিরল বিভূতিভূষণ। সঙ্গে একখানি শাড়ি লুকানো। গৌরীর বেদনা ভোলেনি সে। কলেজ থেকে বেরিয়েই কলেজ স্ট্রিটের কমলালয়। চওড়া কালোপেড়ে একখানি শাড়ি কিনে রসিদ পকেটে পুরে যাত্রা। তারিখটা পঁচিশ আশ্বিন। ট্রেন লেট কবায বেশ রাত হল। যখন বাড়ি পৌঁছল, গৌরী তখন মৃণালিনীর কোলের কাছে শুয়ে আছে। ছেলের সাড়া পেয়ে মা ছুটে এলেন, খেতে দিলেন, বিছানা করে দিলেন। কিন্তু গৌরী? তার কত ঘুম? নাকি জেগে? সে যাই হোক, ওই রাতে আর শয্যা বদল সম্ভব হয়নি বউর।

দু'জনে দেখা হল পরদিন—রাতে, মধ্যযামিনীতে। হাঁ শাড়িখানা লুকিয়েই দিতে হল গৌরীকে। জানলে মৃণালিনী যে কম খুশি হবেন না, তা ওরা দু'জনেই জানে। তবু এ তো আটপৌরে শাড়ি নয়, এ যে প্রীতি-উপহার—তাই শরমে বাধে দু'জনারই।

শাড়ি পেয়ে খুশি যেন আর ধরে না গৌরীর। বিভূতিভূষণেরও প্রাণে পূর্ণ তৃপ্তি ওকে দিয়ে, ওকে পেয়ে। শরৎ এবার দুটি জীবনকে কূলে কূলে ভরে তুলছে যেন ইছামতীর মতই।

এমন সময় পানিতর থেকে লোক হাজির। মেয়েকে, মেয়ে-জামাইকে নিতে পাঠিয়েছেন কালীভূষণ মুখারজি।

মৃণালিনীর আপত্তি নেই। যা খোকা, বউমাকে নিয়ে বেয়াইকে প্রণাম করে আয়।

কিন্তু আসার কথাটায় পানিতরের লোক প্রাঞ্জল করল বক্তব্যটা। অর্থাৎ পুজোর ক'টা দিন কাটিয়েই আবার মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন মোক্তারমশায়।

সে কি, পুজো মাথায় করে ঘরের বউ চলে যাবে? বড়লোক বেয়াইয়ের আচরণে মর্মাহত মৃণালিনী।

কুটুম্ববাড়ির লোক শুনিয়ে দিলে, বারাকপুরে আর কি পুজো। পুজো বলতে পানিতোরে, মুখুজ্যেবাড়ির নিজস্ব পুজো, সে-বাড়ির ঢাকে কাঠি পড়তেই সারা গাঁয়ের লোক ছুটে আসবে। মোক্তারমশায়ের সব মেয়ে, আত্মীয়, কুটুম্বে তখন ভরা। আর এখানে

তো আপনাদের নিজেদের কিছু নেই, পরের বাড়ির পুজো দেখা।

স্তম্ভিত হয়ে কথাগুলি শুনছিল বিভূতিভূষণ। যেন চাবুক এসে পড়ছে এক-একটা। মায়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর অবস্থাটাও সে বুঝতে পারছে। মৃণালিনীও ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে। যেন একটা জবাব চাইছেন।

যাক, যেতে দাও। ক্ষুব্ধ চিত্তে মাকে বললে বিভূতিভূষণ।

সে কি বাবা, আমার বাড়ির বউ, আমার কোন কথাই খাটবে না এখানে?

মৃণালিনীর মর্যাদায় এ যেন এক কল্পনাতীত আঘাত।

তোমার ছেলেকে নিয়েই খুশি থাকো মা।—বেদনাহত বিভূতিভূষণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

বেচারী গৌরী, নিতান্তই বালিকা। তার মতামত কেই বা চায়, কে নেয় তার মনের খবর। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের আড়ালে গোপন রইল তার বুকের ভাষা, চোখের জল।

বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে পানিতরের উদ্দেশে গৌরীর নৌকো ভাসলো ইছা-মতীর নীরে। পিছনে শাশুড়ীর থমথমে মুখ, স্বামী উদাস-গম্ভীর। একখানা কালো মেঘ বুঝি শরতের আকাশটাকে ঢেকে ঢেকে ইছামতীর উপর দিয়ে ওর নৌকার পিছু পিছু চলে।

জামাই এলো না বলে কালীভূষণ একটু ক্ষুণ্ন হলেন বটে, তবে মেয়েকে দেখে খুশি। বড় মেয়ে আশালতাও এসে গিয়েছে।

বোনেরা সবাই ঘিরে ধরল গৌরীকে। তারা জানে, গৌরীর বর বিদ্বান কিন্তু বিত্তবান নয় ওদের মত। অনেক রকম অলংকরণে অঙ্গ ওদের ঝলমল। তাই বলে এবার গৌরী হার মানবে না। স্বামীর দেওয়া শাড়িখানি মেলে ধরল ওদের সামনে।

ওমা! তোর বর তোকে অ্যাদ্দিনে দিলে কিনা একটা কালোপেড়ে শাড়ি? বোনেরা হেসেই হদ্দ। কলেজে পড়ে এই ছাই বুদ্ধি!

দিয়েছেই তো। বেশ করেছে। আমিই তো কালোপাড় চেয়েছিলাম।

একটানা কথাগুলি শুনিয়ে রাগে সেখান থেকে উঠে গেল গৌরী। তারপর দোতলার ঘরে খিল এ'টে চিঠি লিখতে বসল স্বামীকে। 'শ্রীচরণেষু, আপনি এসে আমাকে নিয়ে যান।' চিঠিতে আপনিই লিখত গৌরী।

চিঠি, গৌরী লিখেছে! বিভূতিভূষণ না গিয়ে পারল না পানিতরে। খাতির-আত্তিরও অভাব হল না শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু মেয়েকে দিলেন না কালীভূষণ। আত্মীয়-স্বজন, ভাইবোনেরা সবাই মিলে বছরের এই ক'টা দিন একটু আনন্দ করবে। মাঝখানে গৌরী না থাকলে তার মা কামিনী দেবীও কষ্ট পাবেন, বোনেরাও ছাড়বে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা, বেয়ান যেন কিছু মনে না করেন, পুজোর পরে কালীভূষণই মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন বারাকপুর।

জামাইকেও কয়েকটা দিন থেকে যেতে অনুরোধ করল সবাই। শাশুড়ী কামিনী দেবীও অনেক বোঝালেন। জামাকাপড় লুকিয়ে যাত্রা ভণ্ডুল করার ছলাকলাও বাদ গেল না শালিকাদের। কিন্তু ওর পথ কেউ আগলাতে পারে না। বারাকপুরে মায়ের কাছে ফিরে এলো বিভূতিভূষণ।

ছেলেকে একলা ফিরতে দেখে মৃণালিনী সবই বুঝলেন। শুধু বললেন, বউমা ছেলেমানুষ, অন্যদের কথায় ওর 'পরে তুই অভিমান করিসনে খোকা।

পুজো শেষ হয়ে লক্ষ্মীপুজো এলো, চলেও গেল। মনের দুঃখ মনে চেপে মৃণালিনী নিজেই কোজাগরীর আলপনা দিলেন সারা দাওয়ায়। গৌরীকে ও'রা দিয়ে গেলেন

না, না কোন চিঠিপত্তর।

ধৈর্য ধরে ধরে মৃণালিনী ক্লান্ত। ও'রা তো কই বউমাকে দিয়ে যাওয়ার নামটি করেন না। তুই আমার নামে একটা চিঠি দে বরং।

কী দরকার মা, বাইরের লোক দিয়ে।—অভিমানাহত বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গটা ভুলে থাকতে চায়।—তুমি আছ, আমি আছি, এই তো বেশ।

মৃণালিনীও আর কথা বাড়ান না।

খবর আসে না, আসে না, যখন এলো, এলো ঝড়ের মত। পানিতর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে লোক এসে উঠোনে হাজির।—বিভূতিভূষণের শাশুড়ীর বড় অসুখ। বাড়াবাড়ি অবস্থা।

সে কি! কথা বলতে গিয়ে মৃণালিনীর গলা আটকে আসে। বউমা, গৌরী! গৌরী কেমন আছে? তোমাদের মোক্তারবাবুর মেয়ে?

আগত লোকটি, কালীভূষণের সেরেস্তার কর্মচারী মানুষ। অতো কথা সে জানে না। তাকে যা বলা হয়েছে তার বেশি সে বলবে কি করে। তবে জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছে।

বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত একটা নতুন রোগ দেখা দিয়েছে মহামারীর আকারে। যাকে ধরছে আর ছাড়ছে না শেষ না করে।

খোকা, দেরি করিসনে আর। মৃণালিনী যেন কী বলতে গিয়ে বুকে চেপে ধরলেন কথাটা। পানিতরের লোকটির সঙ্গে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল বিভূতিভূষণ।

সেই বড়দীঘি। যার কাকচক্ষু জলে নাইতে এসে গৌরীর সঙ্গে প্রথম দেখা। কিন্তু বড়দীঘির পারে অতো লোক কেন? একটা চাপা কান্নার রোল ভেসে আসছে না কোথা থেকে? পা দুটো কেন ভারি হয়ে উঠছে? কেন রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে বুকের নিঃশ্বাস? ওরা ওখানে কী করছে সবাই?

একটা মর্মভাঙা চিৎকারে থমকে দাঁড়ালো বিভূতিভূষণ। বড় শ্যালক ভবানীপ্রসাদ আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এলো। সারা মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে। চোখ দুটো জবার মত লাল। বিভূতিভূষণের হাত দুটো চেপে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো, বড় দেরি করে এলে ভাই।

ভিড় সরে গেল। বিভূতিভূষণ চেয়ে দেখল, পাশাপাশি দুটি দেহ—প্রাণহীন, নিস্পন্দ, নির্বাপিত। মা আর মেয়ে। বিভূতিভূষণের শাশুড়ী কামিনী দেবী আর—আর—গৌরী!

ডাক্তারেরা বলেন ওই মৃত্যুজ্বর—ইনফ্লুয়েঞ্জা। একই রাত্রে হানা দিয়ে আগে মাকে ও পরে মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ছয় অগ্রহায়ণ, বাংলা তের শ' পঁচিশ সন।

তার দেওয়া সেই কালোপাড় শাড়িখানা পরে আছে গৌরী! সে নিয়ে যাবে বলে পথ চেয়ে চেয়ে যেন অভিমানে ক্লান্ত কিশোরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

॥ চার ॥

শূন্যতার তিমিরগর্ভে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাওয়া। মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণার কশাঘাতে একটি যৌবনের ভালোবাসা, তার স্বপ্নকে ক্ষতবিক্ষত করা, রক্তাক্ত করে তোলা। কতো দিন? আর কতকাল এ-পালা বইবে বিভূতিভূষণ? একটু একটু করে আমূল বদলে

খাচ্ছে যেন মানুষটা।

সারাদিন অসহ্য উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে বয়ে যায়। আবার সেই ইছামতীর পাড়ে গিয়ে বসে। নীলকুঠির মাঠে শুয়ে থাকে। কাশফুলের ঝাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে ভুলে থাকতে চায় দুঃসহ স্মৃতির এই দুরন্ত সহচরীকে।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার আঘাত। ভাটপাড়া থেকে খবর এলো, মণি নেই। সন্তান হতে গিয়েই হঠাৎ মৃত্যু। সেই ছোট বোনটা! গৌরীর খেলার সাথী, সেও! অসহ্য, অসহ্য। প্রায় পাগল হয়ে গেল বিভূতি। পর পর দুটো আঘাতে মা মৃণালিনীও ভেঙে পড়লেন। ছোট ছেলে নুটুকে নিয়ে বারাকপুরের বাড়িতে তিনি কেঁদে কেঁদে সারা। আবাসিক বন্ধুরা বিভূতিকে কলকাতায় এনে মাঝে মাঝে বইয়ের সামনে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। তা একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কিছুতেই সে এক জায়গায় বসে থাকতে পারছে না। সুযোগ পেলেই শহর ছাড়িয়ে উপকণ্ঠের নির্জনতায় নিজেকে যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেয়, উড়িয়ে দেয়।

এ-সময় একদিন টালিগঞ্জ খালের পুলটা পেরিয়ে পুটিয়ারির দিকে হাঁটতে হাঁটতে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসল বিভূতিভূষণ। এখানেও কি দু-দণ্ড শান্তি মিলবে না?

কথায় কথায় সন্ন্যাসী ওকে প্রশ্ন করলেন, তোর মরে যাওয়া বউকে তুই দেখতে চাস?

দেখা যায়? আবেগ যেন বাঁধ মানছে না বিভূতিভূষণের।

যাবে না কেন? বামুনের ছেলে, গীতা তো পড়েছিস। তাতে দেখিসনি ভগবান বলছেন আত্মা অবিনাশী?

সন্ন্যাসী হাসলেন। তারপর বললেন, উপনিষদের ঋষির উক্তি—অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্'—সর্বত্র বিরাজমান তিনি। জীবাত্মা তো তাঁরই খণ্ডিত প্রকাশমাত্র।

বিভূতিভূষণ অবাক হযে শুনতে থাকে। বৃহদারণ্যকে জনকসভায় মহর্ষি আত্মা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা কীভাবে করেছেন। অশরীরী আত্মার বিচরণ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্রের কতো কথা।

সন্ন্যাসী বললেন, এসব অনেক উঁচুস্তরের তত্ত্বকথা ভাবছিস, না?

বিভূতিভূষণ ক্রমাগত আকৃষ্ট হচ্ছে সন্ন্যাসীর কথায। আশ্চর্য তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান। কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে সাহস হয না। সে শুধু চায় শুনতে, জানতে, জীবনের অজ্ঞাত রহস্য অধিগত হতে। সেজন্যও তো পড়াশুনা চাই। মনকে স্থির করে কে পারবে তা? পর পর ক'দিন ওই সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে মনের অবস্থা একদিন বলেই ফেললে— আমি গৌরীকে দেখতে চাই।

সন্ন্যাসী বললেন, তার একমাত্র সহজ পন্থা মণ্ডল,— অর্থাৎ প্লানচেটে আত্মা-আবাহন। তোকে তা শিখিয়ে দিতে পারি। তবে তাই নিয়ে মেতে থাকিসনে। মনে রাখবি শাস্ত্রজ্ঞান আর সাধনা ভিন্ন এ-পথে যথার্থ সাফল্য নেই।

বিভূতিভূষণ তখনকার মত তাতেই রাজি হল। সেই সন্ন্যাসীই তাকে প্লানচেটে আত্মা-আনয়ন পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন।

মেতে উঠল বিভূতিভূষণ। শৈশবে, কৈশোরে যেমন নাম-না-জানা গাছ, ফুল কিংবা পাখি দেখতে পেলে মেতে উঠতো, ঠিক তেমনি পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগের এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে ক'দিনেই স্নানাহার ভুলে গেল। সন্ন্যাসীর প্রতি সে অশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু কে এই সন্ন্যাসী? বিভূতিভূষণ তা জানে না। কয়েকদিন পরে

পুটিয়ারিতে খুঁজতে গিয়ে আর পেল না তাঁকে। লোকের কাছে শুনল তিনি তীর্থ-ভ্রমণে গিয়েছেন। কোথা থেকে কেন এসে এ'রা আবার কোথায় কেন যান—সংসারী পাঁচজন তার কোনদিনই খবর রাখে না।

এবার? খুঁজে খুঁজে কলেজ স্কোয়ারেই একটা আস্তানার সন্ধান পেল—থিওসফিক্যাল সোসাইটি। অল্প দিনেই সেখানকার সভ্য হয়ে গেল সে। অ্যানি বেসান্ত এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এর সভাপতি প্যারিচাঁদ মিত্র। তিনিও স্ত্রীর মৃত্যুর পরে এ-পথ ধরেন। কেবল তাই নয়, স্ত্রীর আত্মা ইচ্ছেমত কাছে আনবার শক্তিও আয়ত্ত করেন নাকি।

বহু শাস্ত্রজ্ঞানী মহাজনের আনাগোনা এখানে। দেশ-বিদেশের নানা গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা আসে এখানে—আত্মা এবং পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কিত। নানা আলোচনা তা নিয়ে। এমন কি প্লানচেট-মিডিয়মেরও আসর বসে মাঝে মাঝে। বিভূতিভূষণও বসতে লাগলো, নানা পত্র-পত্রিকা পড়তে লাগল ওই বিষয় নিয়ে। 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকায় দেখল, দীনবন্ধু মিত্র, সেই চৌবেড়ের নীলদর্পণের দীনবন্ধুও প্লানচেটে আত্মা আনতেন; চক্রাধিবেশনে বসতেন। তিনি একলা নন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর শিবচন্দ্র বিদ্যারত্নও বসতেন দীনবন্ধুর সঙ্গে। মাঝে মাঝে এসে জুটতেন শিশিরকুমার ঘোষ। আব সে চক্রে কত অশরীরীর আবির্ভাব ঘটত—তার সব কাহিনী পড়ে রোমাঞ্চিত হয় বিভূতিভূষণ। বিশেষ করে টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা 'অন দি সোল' গ্রন্থখানি যেন মৃত্যু আঁধারে এক জ্যোতিশিখা মনে হয় তার।

এই সোসাইটি ভবনে বসেই সে জানতে পারে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্লানচেটে, মিডিয়মে বসেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের আত্মা এনেছেন।

এ-সব জেনে উৎসাহ বেড়ে যায় বিভূতির। প্লানচেটে সে আত্মা আনবেই। তার চাইতেও বড় কাজ আত্মার পরমতত্ত্ব সন্ধান, তা সে করবে। কত বিস্ময়কর, বলা যায় অবিশ্বাস্য ঘটনা যে ঘটছে এই সাধারণ দৃষ্টির আড়ালে সে কথা যত জানা তত সম্মোহন। স্বামী বিবেকানন্দকে একবার এক অশরীরী আত্মা এসে নাকি তার হয়ে পিণ্ডদানের অনুরোধ করে। এ-কথা সে জানল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির ম্যাগাজিনে। শুধু কি তাই? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন বৃন্দাবনে। আকাশের দিকে চেয়ে হঠাৎ একদিন দেখলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চলে যাচ্ছেন। শিষ্যদের তিনি বললেন সে-কথা। শিষ্যগণ খোঁজ নিলেন—হাঁ, ঠিক ওই সময়েই নাকি বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এসব তথ্য যেন এক নতুন জগতের দুয়ারে এনে পেঁছে দিল বিভূতিভূষণকে।

এ-রকম এক আচ্ছন্ন মানসিকতা নিযে দর্শনের ক্লাসে যাওয়া, ল' ক্লাসে হাজিরা দেওয়া—এ-সব নেহাত বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে।

আবার যে-কে-সেই। টুইশানি বন্ধ। কী করে নিজের মেস-খরচা চলবে, কেমন করে চালাবেন মা নুটুকে নিয়ে বারাকপুরে, সব বিস্মরণ হয়ে গেল। মৃণালিনী পথ চেয়ে চেয়ে বারাকপুরের সংসারের হাল ধরে রাখতে পারেন না। মুরাতিপুর চলে গেলেন নুটুকে নিয়ে।

বড়ছেলে তখন সঙ্গ পেয়েছে থিওসফিকাল সোসাইটির। প্রজ্ঞার আলোকে মৃত্যুর তিমিররাত্রি চূর্ণ করবার চেষ্টা চলছে সেখানে। মানবজীবনের সীমিত পরিধির পরপারে সরসিজাসনে সন্নিবিষ্ট হিরন্ময় মহাজীবনের স্বরূপ অধিগমনের

প্রাণপাত সাধনা। অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' সেই অজ্ঞের আত্মার আবাহনযজ্ঞ। সে যজ্ঞের অন্যতম সাগ্নিক হোতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতি-ভূষণ। এর কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ এই বিশ্ববিদ্যালয়।

খুঁজতে খুঁজতে বন্ধুরা একদিন ওকে পেল দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তর বাড়িতে। তারা চাপ দিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চালাতে হবে। ওরা যেন জবরদস্তি করতে চাইছে, লেগে যা বিভূতি।

লেগে-যাওয়া মানেই সেই কলেজি ফিলসফির কতকগুলি খেলো কেতাবের মধ্যে কুঁকড়ে থাকা এবং আইন নামক নীতিহীন কথা গেলা, জুরিসপ্রুডেনসের কটমটানিতে ক্লান্ত হওয়া। কী লাভ তার এতে? কী পাবে সে এর মধ্যে? বন্ধুদের দাবিতে তবু কিছুদিন তা করল, কিন্তু কিছুতেই বাইরের উদ্‌ভ্রান্তি থেকে কেন্দ্রীভূত করতে পারছে না নিজেকে কলেজি কেতাবে। এর মধ্যেই মায়ের চিঠি—হাতে একটা পয়সা নেই। নিজে নাহয় এক রকম চালাচ্ছেন, কিন্তু নুটুর কী হবে? এভাবে কতদিন ভাইয়ের ঘরে থাকবেন। বাড়ির ভিটে অন্ধকার পড়ে রইল। তুই বরং একটা চাকরি নে খোকা।

চোখে জল এলো বিভূতিভূষণের। তাই-ই হোক. চাকরিই চাই একটা।

আইন পরীক্ষা দিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন মেস-বন্ধু বৃন্দাবন সিংহ রায়। কী কাজে কলকাতা এসেছেন। সব শুনে বিভূতিকে বললেন, মাস্টারি করবি?

জাঙ্গিপাড়া। হুগলী জেলার একটি গ্রাম। বৃন্দাবনবাবুদের বাড়ি সেখানে। কিছুদিন আগে স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী মাখনলাল দে-র দানে, তাঁর বাবার নামে সেখানে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন ওঁরা। তখনও দশম শ্রেণী হয়নি। স্কুলটা গড়ে তুলতে আপাতত বৃন্দাবনবাবুই অস্থায়িভাবে প্রধানশিক্ষকের ভার নিয়েছেন। অতএব বন্ধু বিভূতির নিয়োগ নিশ্চিত। রাজি হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণও।

॥ পাঁচ ॥

যাত্রা শুরু স্বপ্নের ভুবন থেকে সংগ্রামের মুখোমুখি। হাওড়া ময়দান থেকে মারটিনের ছোট্ট রেলগাড়ি বাঁশি বাজিয়ে চলে ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্ করে। তাল চলা ঝিলের জলে কাঁপুনি লাগিয়ে, পুকুরঘাট সাড়া জাগিয়ে, বাঁশবনের কাণ্ড স্পর্শ করে, কলাবনে দোলা দিয়ে, বাঁকে বাঁকে, গাঁয়ের মোড়ে, হাটের মাঝে থেমে থেমে, দশ গাঁয়ের খবরে মাখা-মাখি করে। বিভূতিভূষণ আর তাঁর সঙ্গী বন্ধু ননীমাধব, দুজনের বেশ লাগছে। জগৎবল্লভপুর, সীতাপুর, ইছানগরী, ডোমজুড়, প্রসাদপুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায় জাঙ্গিপাড়া পেঁছিানো গেল।

ঝিকঝিক শব্দে হাটের মধ্যেই লোকজন একটু সরিয়ে ট্রেনটা দাঁড়ালো। স্কুল কমিটির সভাপতি শ্রীশশিভূষণ দীর্ঘাঙ্গীকে নিয়ে বৃন্দাবনবাবু আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। প্লাটফরম নেই। গাড়ি থেকে নেমেই জাঙ্গিপাড়ার মাটি।

ননীমাধব ভাবছিলেন, গাছপালা-পাগল বিভূতির ভালোই লাগবে এ জায়গাটা। তা হল না। প্রথম দর্শনেই কেন জানি গ্রামটাকে খারাপ লাগল বিভূতিভূষণের। আজকাল ওঁর এ-রকম হয়। কোথাও গেলে, কোন-কিছু দেখলে যেন অমনিই ওঁর মন এমন অনেক কিছু দেখিয়ে দেয়, বলে দেয় যা আর সবাই দেখে না, শোনে না।

কখনো-সখনো সে-সব কথা প্রকাশ করলে বন্ধুরা হাসে। তাই বলতে চান না, লিখে রাখেন নিজের অভিজ্ঞতার পাতায়, দিনলিপির খাতায়। জাঙ্গিপাড়ার কথা লিখলেন —'মনে হচ্ছে ধ্বংসের দেবতা যেন গ্রামখানার উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারাগ্রাম যেন অন্ধকার হয়ে আসচে।' গ্রামে পা দিয়েই এ-রকম একটা ধারণা হওয়ার পিছনে যে অদৃশ্য কারণ ছিল তা কেবল বিভূতি-ভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপেই ধরা পড়ত।

স্কুলের সভাপতি দীর্ঘাঙ্গীমশায়ের ঘরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আগেই ঠিক হয়েছিল। সেখানে বন্ধুকে রেখে ননী পরদিন কলকাতা চলে এলেন। ওই দিনই স্কুলে যোগ দিলেন বিভূতিভূষণ।

জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ হাই স্কুল। অস্থায়ী প্রধানশিক্ষক বৃন্দাবন সিংহ রায়। সহকারী প্রধানশিক্ষকরূপে খাতায় নাম স্বাক্ষর করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেতন পঞ্চাশ টাকা। তারিখটা ছিল, সাত ফেবরুয়ারি, উনিশ শ' উনিশ। মাত্র ক'দিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্কুলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে গেছেন।

স্কুলে পড়ানো ছাড়াও স্কুল-সভাপতির বাড়ি পড়ানোর একটা দায়িত্ব আছে। সভাপতি শশী দীর্ঘাঙ্গীর ছেলে সমরেন্দ্রকে পড়িয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা।

তা বাসস্থানের দরকার ততটা নয়, যতটা আহারের। স্কুল থেকে শশীবাবুর বাড়ি প্রায় এক মাইল পথ। এক মাইলের জায়গায় দু' মাইল হলেও আপত্তি নেই। আপত্তিটা সংসারী জীবদের একটা বদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকায়। বিশেষ করে রাত্রের দিকে। স্কুল ছুটির পরে পথে নামতেই কে যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, সেই ছোটবেলার মত—এসো, চলে এসো। ঘুরতে ঘুরতে বা কোনও বন-জঙ্গলের ধারে বসে থেকে রাত কত হয় জানেন না তিনি। মনে থাকে না দীর্ঘাঙ্গী-বাড়ি ফেরার কথা। এভাবে চলে না। অন্য ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

ছোট হাট। রেল লাইনটা গিয়েছে তার মধ্য দিয়ে। হাটের জন্য স্টেশন বা স্টেশনের জন্য হাট বলা দায়। অদূরে দ্বারকানাথ হাই স্কুল। সব নিয়ে জায়গাটা জমে উঠেছে। সকাল-সন্ধ্যায় দু'চারজন লোকের ওঠানামায় এই নিভৃত গ্রামজীবনে যা চাঞ্চল্য। মওকা বুঝে এখানেই ডিসপেনসারি খুলে বসেছেন নৃসিংহ ডাক্তার। ডাক্তার, মাস্টার, স্টেশন মাস্টার এ'রাই গাঁয়ের গণ্যমান্য। অতএব, শহরাগত নতুন মাস্টারকে নিজেই ডেকে নিলেন নৃসিংহ ডাক্তার। এখানেই থাকুন না। আমার ডাক্তার-খানার পাশের ঘরটাতে।

ডাক্তারখানারই একটা অংশ, 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা। রোগীর বিশেষ পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত। যদিচ সে প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। সুতরাং বদান্য হতে বাধল না নৃসিংহ ডাক্তারের। তা ছাড়া শহরের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক তাঁর আবাসিক হলে মর্যাদাও বাড়বে কিছুটা।

পথের পাশেই ঘর। নানা পাড়া থেকে নানা রোগে-দুঃখে কাতর নরনারী আসে। পরিবেশটার এই একটা আকর্ষণ। কেবল ওষুধের গন্ধটাই যা উৎপাত। তা হোক, পথের পাশের বন্ধনহীন আস্তানাই ভালো। রাজি হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ।

স্কুল ছুটির পরে বিশ্রামের প্রশ্ন নেই। সামনে এক প্রকাণ্ড দীঘি, রেল লাইনের ঠিক ওপারে। নাম পদ্মপুকুর। শাপলার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে পদ্ম এখনও ফোটে। দীর্ঘ প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। তার উপরে বসে থাকা বেশ লাগে। অকারণ চেয়ে

থাকা, স্মৃতির আনন্দবেদনায় মনে মনে হেসে ওঠা, কেঁদে ওঠা। বারাকপুর, বনগাঁর কথা, মুরাতিপুর, পানিতর, শাগঞ্জ-কেওটা, কলকাতার কথা, পথে পথে ছড়িয়ে থাকা, জড়িয়ে থাকা অজস্র চেতনার নীরব পদসঞ্চার মনের ভুবনে।

ঘাটের বিপরীত দিক থেকে দূর কোন্ অজানা পল্লীবধূরা জলে নামে, কলসী ভরে জলে, তারপরে ওই তালশ্রেণীর মধ্য দিয়ে দূর-ধূসর পথে যেতে যেতে আড়াল হয়ে যায়। দেখতে দেখতে কখন কল্পনায় ইছামতী ভেসে ওঠে। বারাকপুর কত দূর? যেন যোজন যোজন দূরে চলে এসেছে ইছামতী ছেড়ে, এমন একটা বেদনা পেয়ে বসে। আর বসে থাকতে পারেন না তখন। পথে পা বাড়ান। জাঙ্গিপাড়া স্টেশন ছাড়িয়ে, হাট পেরিয়ে চন্দনপুর, তারাজোলের মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চলেন। যে-পথের পাশে পাশে গাছপালা, বন-ঝোপ আর ঘন সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য, কাঁচা মাটির মাঠে মাঠে অবিরল শ্যাম প্রসার। তার মাঝখান দিয়ে 'সে পথ যেন চলেছে আপন মনে গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হতে দূরে'।

পথচলতি দু'চারজন চেনাজানার সঙ্গে দেখা হয়। কেউবা কথা বলতে গিয়ে সাড়া না পেয়ে সরে পড়েন। কেউবা আর কথাই বলতে ভরসা পান না। মোটকথা নতুন মাস্টারের হাবভাবটা একটু কেমন-কেমন তাতে অনেকেই প্রায় একমত।

হাটের ফকির মোদক ময়রা মানুষ। মিষ্টি নিয়ে কারবার। বিভূতি মাস্টারের কথায়-বার্তায়, ব্যবহারে কী এক রসের সন্ধান পেয়েছিল সে। বুঝেছিল বোধহয়, বিধাতাপুরুষ এক অন্য জাতের ভিয়েনে রসায়িত করে এই মানুষটিকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়। তার একটা বাড়তি ঘর ছিল পাশেই, ঠিক রেল লাইনের গা ঘেঁষে। সে একটু একটু করে আলাপ জমিয়ে একদিন বিভূতিভূষণকে বললে, আরে ধ্যেৎ, ওষুধের গন্ধে ঘুম আসে? ও ডাক্তারখানা ছেড়ে আপনি আমার ঘরে এসে থাকুন। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। বিশ্রাম করুন, ধ্যান করুন, কাঁচিটান হয়ে ঘুমোন, যখন যেমন ইচ্ছে।

বিভূতিভূষণও ভাবছিলেন, প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

আর ভাবনার সুযোগ না দিয়ে ফকির মোদক নিজেই একদিন বিভূতি মাস্টারের বিছানাপত্তর নিয়ে এলো নৃসিংহ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে।

এতে সুবিধা একটু বেশিই হল বিভূতিভূষণের। বিশ্রাম আর নানা ভাবনা এক সঙ্গে চলে। কলকাতা থেকে ননীর পাঠানো দু'চারখানা পত্র-পুস্তকও পড়া যায়। আর যায় নির্ভাবনায় যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে বেড়ানো। সকালের দিকে দীর্ঘাঙ্গী-বাড়িতে সমরেন্দ্রকে পড়াতে গিয়ে খাওয়াটা ঠিক সময় সেরে স্কুলে আসা যায়। কিন্তু ঠিকঠিকানা নেই কিছু বিকালের। এক একদিন বেশি রাত্রে এসে আর খেতে যান না। বামুনের ছেলে, একদম হরিবাসর দেখে ফকির ময়রাই কখনো-সখনো গরম দুধ-মুড়ি দিয়ে যায়।

বৃন্দাবনবাবুও ভুলে নেই বন্ধুকে। মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। বাঁশবন, তালবীথি, ঘেঁটুর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ধানের ক্ষেতে পড়া। তার পরে বৃন্দাবন সিংহ রায়ের বাড়ি, সে প্রায় দেড় মাইলের বেশি পথ। পথটা যেমন আকর্ষণীয়, পথের প্রান্তটা তার চাইতে কম নয়। বৃন্দাবনবাবুরা সম্পন্ন গৃহস্থ। ঘরে চিঁড়ে-মুড়ি মজুত। গেলেই তার সঙ্গে গুড়-নারকেল মাখিয়ে সদ্ব্যবহার করা যেত। গরিব ঘরের মানুষ বিভূতিভূষণ, এ জিনিসটায় প্রতি টান সব সময়েই একটু বেশি। নিঃসংকোচে খেতেন। বৃন্দাবনবাবুর ঘরের লোকেরাও তৃপ্ত হত ওঁকে

খাইয়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলেকে তাঁরা ইচ্ছা থাকলেও ভাত রেঁধে তো আর খাওয়াতে পারেন না! সুতরাং অসুবিধা একটা থেকেই যাচ্ছিল।

এমন সময় জুটল দু'জন ভক্ত ছাত্র। গজেন মুখার্জি আর সতীশ চক্রবর্তী। তারা ও'র কাছে কাছে ঘোরে। সুযোগ পেলেই নানা কথা জেনে নেয়, বই খুলে ধরে। এদের মধ্যে গজেন আসত কয়েক মাইল দূরের সেই ভাণ্ডারহাটি থেকে। নিজের স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ে বিভূতিভূষণের। তিনিও এমনি বনগাঁ আসতেন বারাকপুর থেকে, ক'মাইল হেঁটে। গজেন আর সতীশ দুজনেই মেধাবী ছাত্র, নবম শ্রেণীতে পড়ে। সতীশের বাড়িও কিছুটা দূরে। দুজনেই স্কুলের কাছে, বিভূতিভূষণের কাছাকাছি থাকতে চায়।

ফকির মোদকের মধ্যস্থতায় একদা ওরা দুজনে এসে বই-বিছানা নামালো সেখানে। শুধু তাই নয়, আধক্রোশ ঠেঙিয়ে রাত-বিরেতে খেতে যাওয়ার ঝক্কিও তারা ঘুচিয়ে দিল বিভূতিভূষণের। না, অমন পরমভক্ত ছাত্রযুগল থাকতে হাত পুড়িয়েও খেতে হবে না মাস্টারমশাইকে। ওদের লাভ, বেশি করে মাস্টারমশাইয়ের সান্নিধ্য পাওয়া। লাভটা বিভূতিভূষণেরও, এবার তিনি বিমুক্তপ্রায়।

হাতে এখন অঢেল সময়। অফুরন্ত অবসর ঘুরবার, বেড়াবার।

ছুটির সকালে রেল লাইনের ধারে চেয়ার পেতে তেল মাখতে বসেন। বহিরাগত, শিক্ষিত যুবক—সহজ, অনাড়ম্বর, সদালাপী, তায় আবার হেডমাস্টারের বন্ধু। সুতরাং খাতির করতে কিছু লোক ঘেঁষবে বই কি! জামবাটি ভরে চাল-কড়াই ভাজা নিয়ে আসতেন চক্রবর্তীমশায়, চলুক মাস্টার।

সেই সঙ্গে হাত বাড়াতেন আরও কয়েকজন, বিনয়বাবু, রাখালবাবু, ত্রিপুরাবাবু—কত নাম, কত চরিত্র।

সেই ত্রিপুরাবাবুই একদিন সন্ধ্যাবেলায় অযোধ্যার পুলের কাছে আঁতকে উঠলেন বিভূতি মাস্টারকে দেখে।—বলি ওহে মাস্টার, তোমার কি ভয়-ডর নেই কিছু? ভর সন্ধ্যেয় এই আঘাটায় এসে বসে আছো?

প্রবীণ লোক ত্রিপুরাবাবু। এ তল্লাটের সব খবর রাখেন। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ধূ-ধূ মাঠ। তার মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা সড়ক—গিয়েছে অযোধ্যা পুলের দিকে। সেচের একটা ছোট খাল তরতর করে চলেছে কোল বেয়ে। তার উপরে এই অযোধ্যার পুল। জায়গাটা এতই নির্জন যে, নিতান্ত না ঠেকলে কেউ আর সন্ধ্যায় এ-পথ দিয়ে একলা যাতায়াত করে না। এই নির্জনতাই টানে বিভূতিভূষণকে। ত্রিপুরাবাবুর দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন—জায়গাটা অপনাদের ভালো লাগে না?

ত্রিপুরাবাবু তীক্ষ্ণ জবাব দিলেন তা মন্দ কিসে? ঠ্যাঙারে, ডাকাত, ভূতপেত্নী, সাপখোপ যে কোন প্রভুর দর্শন পেতে পারো এখানেই।

তখনকার দিনে, মাঝে মাঝে ঠ্যাঙারে-ডাকাতের কবলে পড়ত অনেকে এ-রকম নির্জন জায়গায়। আর মাছ ধরতে এসে এই পুলের কাছে ওই 'ও'নাদের' পাল্লায়ও দু'চারজন যে না পড়ে এমন নয়। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি আর কি! অথচ ত্রিপুরাবাবু শুনেছেন, বিভূতি মাস্টারকে আরও নাকি দু'চারজন এ-রকম একলা-আঁধারে বসে থাকতে দেখেছে। আজ কি না নিজেকেই দেখতে হল ত্রিপুরাবাবুর। বয়স কম, বাইরের লোক, কোন অভিজ্ঞতাই তো নেই। তিনি হাত ধরে টেনে তুললেন বিভূতিভূষণকে। উঁহু, এভাবে বসবে না আর কখনো।

এ নিয়ে তর্ক করা পছন্দ করেন না বিভূতিভূষণ। ধ্যান যখন ভাঙলই অযথা

চেঁচানো তাঁর ইচ্ছে নয়। কিন্তু ত্রিপুরাবাবু ও'র ভিতরের রহস্যে উঁকি দিতে চান। পথে নানা কথার মধ্যে শুধু একটি প্রশ্ন—তা রোজ রোজ কী কর এভাবে মাঠে, বনে, পথের পাশে একলা বসে?

এক সময় নিজের অজান্তেই বুঝি বলে ফেলেন বিভূতিভূষণ—'যিনি অগ্নিতে, যিনি বায়ুতে, শোভন ক্ষিতিতলেতে' তাঁকেই পাওয়া যায় নির্জনতার মাঝে, নিজেকে একলা করে আনলে।

কথাগুলি কোত্থেকে বলছ? ত্রিপুরাবাবু উৎসুক হলেন।

উপনিষদ।

তুমি ওসব পড়েছ বুঝি?

লজ্জা পেলেন বিভূতিভূষণ। সামান্য কিছু পড়েছি। আর কিছু শোনা—মহাপুরুষদের কাছে।

মহাপুরুষ! চমকে উঠলেন ত্রিপুরাবাবু। মহাপুরুষ কোথায় পেলে হে?

একটু একটু করে বিভূতিভূষণের কাছে সন্ন্যাসী, থিওসফিকাল সোসাইটি, ইত্যাদির সব কথা, আত্মার সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা, প্রকৃতির রহস্য—নানা কথা শুনলেন ত্রিপুরাবাবু। ব্রহ্ম বা প্রকৃতি-ফ্রকৃতির ব্যাপারে অত দ্রুত ব্যস্ত হওয়ার মত লোক তিনি নন। তবে আত্মা, বিশেষ করে মৃত্যুর ওপারে তাদের অস্তিত্বই শুধু নয়, এ জগতে তাদের আনাগোনার ব্যাপারে যে রহস্যাবেশ আছে ত্রিপুরাবাবুকে তা আকৃষ্ট করে।

ত্রিপুরাবাবুর আগ্রহ দেখে বিভূতিভূষণও প্রাণ খুলে দেন। পরলোকতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য ত্রিপুরাবাবু বুঝলেন কিনা বলা মুশকিল, তবে প্রসঙ্গত প্লানচেটের কথা আসতেই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন—আত্মা আসে, বলো কি? তুমি আনতে পারো?

পারি। বিভূতিভূষণের দৃঢ় উত্তর।

ব্যাস, আর যায় কোথায়। পরদিনই কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তিনি লেগে গেলেন বিভূতিভূষণকে ঘিরে। প্লানচেটে বসতে হবে।

যেন একটি পান, এমনি ত্রিকোণ করে কাঠের পাত কাটা। নিচে দু'পাশে দুটি চাকা হলে ভালো, আর এক পাশে ফুটো করে পেনসিল গলানো। তার ডগা থাকবে কাগজের 'পরে। উপরে দুটো আঙুল দিয়ে আলতোভাবে পেনসিলটি ছুঁয়ে থাকা। আত্মা এসে হাতে ভর করলে পেনসিল চলবে, লেখা পড়বে। এই হল প্লানচেটপদ্ধতি।

আর আছে চক্রাধিবেশন। টেবিল ঘিরে বা গোল হয়ে একাসনে বসবেন ক'জন। তাঁরা ছুঁয়ে থাকবেন পরস্পরকে। মন রাখবেন পবিত্র, প্রফুল্ল। পরিবেশ চাই নির্জন। ধূপ-ধুনা, পুষ্প-চন্দনের সুবাসে ভরা থাকবে স্থানটি। মৃদু আলো। সময় এবং আবহাওয়া মৃদু-নরমই উপযোগী। অতিবিক্ত শীত-গ্রীষ্ম বা ঝড়-বাদলের চড়া পরিমণ্ডলে যেমন বিঘ্ন ঘটে, তেমনি প্রখর দ্বিপ্রহরে বা গভীর রাত্রিও চক্রাধিবেশনের যোগ্য কাল নয়। সন্ধ্যাই সর্বোত্তম সময়।

ত্রিপুরাবাবুদের কৌতূহল বাড়ে। কেন? দুপুরে, বেশি রাতে কী হয়?

বিভূতিভূষণ বলেন, ওসব সময় সাধারণত নিম্নস্তরের আত্মা আসে। তখন মিডিয়ম, অর্থাৎ যার 'পরে আত্মা ভর করে, তাঁকে অবশ করে ফেলে এবং জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে চায়।

শুনতে শুনতে ও'দের গা শিরশির করে। সর্বনাশ তখন উপায়?

বিভূতিভূষণ আশ্বস্ত করেন, উপায় আছে। নামগান, ভগবানকে স্মরণ, তাতেই নিম্নস্তরের আত্মা বিতাড়িত হয়। মন্ত্রাঙ্গনে এনে মিডিয়মের চোখে-মুখে জল দিন,

হাওয়া করুন, সুস্থ হবে সে। তবে, তার চাইতে প্লানচেট নিরাপদ, অবশ হবে শুধু হাত। গোটা মানুষটিকে নিয়ে কোন ভাবনা নেই। সর্বোত্তম হল, ধ্যানে আত্মা আবাহন। তাতে উচ্চস্তরের আত্মাই আসবেন। কোন বিপদ নেই। সমগ্র দেহ-মনে দিব্যানন্দ বিরাজ করবে। জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে প্রায়ান্ধকার ধ্যানগৃহ। সে ধ্যানের জন্য পবিত্রতম মানসিকতা চাই অবশ্য।

ত্রিপুরাবাবুরা অবশ্যই ধ্যানট্যানে নেই। চক্রাধিবেশনের ডাহা বিপদের ঝুঁকিও তাঁরা নিতে চান না। তবে হাঁ, প্লানচেট, কেবল হাত নিয়ে যা-দায়। প্লানচেটই তাঁদের পছন্দ। তাঁরা একমত হয়ে বললেন, ওই প্লানচেটই হোক মাস্টার।

স্কুলবাড়িটা হাটের ভিড়ের বাইরে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে-বাড়ি ঘিরে নির্জনতা ঝরে। সাব্যস্ত হল, প্লানচেট-বৈঠকের পক্ষে সেটাই মোক্ষম জায়গা। পর পর কয়েকটা বৈঠক হল সেখানে। ওপারের লোকজনদের সঙ্গে বলতে কি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অনুভব করে বৈঠকের সবাই রোমাঞ্চিত। কেবল তাই-ই নয়, বৈঠকের সদস্যও বাড়তে লাগল দু'একজন করে। বৃন্দাবনবাবুও বাদ গেলেন না।

প্লানচেট বা চক্রাধিবেশনের সদস্যসংখ্যা ঊর্ধ্বে দশ হতে পারবে। তার বেশি হলে হবে না। আর চাই যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা। সুতরাং উদ্যোক্তারা সাবধান হয়ে গেলেন। তবু সে নতুন পুলক-শিহরণ বুঝি অজান্তেই প্রকাশ করে ফেলেন কেউ কেউ। ফলে 'টু' শব্দটা 'টা' হতে শুরু করল, কানের কথা হাটে এলো।

একটা কথা ওরা ভুলেছিলেন। এ-দেশে, বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে স্কুল নিয়ে যত পলিটিকস চলে, কোন দেশে পার্লামেণ্ট নিয়েও বুঝি ততোটা হয় না। জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ হাই স্কুল তার ব্যতিক্রম না হলে দোষ ধরবার কিছু নেই। বৃন্দাবনবাবু বি. এ. পাশ করবার পর আইন পড়েছিলেন ওকালতি করবার উদ্দেশ্যে। তিনি যে প্রধানশিক্ষক হন, সেটা নেহাৎ অস্থায়িভাবে, গ্রামের নতুন স্কুলটার প্রাথমিক ভিত গড়তে। তা এক রকম হয়ে গিয়েছে। এদিকে এম. এ পাশ করে এসেছেন ওই এলাকারই কৃষ্ণনগর পল্লীর রাজকুমার ভড়। তাঁকেই ওই প্রধানশিক্ষকের পদে স্থায়িভাবে বসাতে ইতিমধ্যেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন এক দল।

বৃন্দাবনবাবুও নিজে আগলে থাকতে চান না পদ। তবে আটকাচ্ছে কোথায়? আটকাচ্ছে বৃন্দাবনবাবুর বন্ধুপ্রীতি। তাঁর ইচ্ছে বিভূতিভূষণকেই ওই পদটিতে বসিয়ে তিনি আইনব্যবসায়ে চলে যাবেন। তার মানে? গ্রামের লোক রাজকুমার, তার উপর এম. এ., তিনি কিনা মার খাবেন বাইবের বি. এ. বিভূতিভূষণের জন্য? অল্প দিনেই দুটি দল গড়ে উঠলো এ নিয়ে। পরিবেশটা ঘোরালো হতে পারলো অতি সহজেই। আর ঠিক এ রকম সময়েই প্লানচেট প্রসঙ্গটা একটা তুরুপের তাসের মত যেন এসে গেল প্রতিপক্ষের হাতে।

কী? স্কুলবাড়িতে ভূত নামানো? মা সরস্বতীর কমলবনে প্রেতনৃত্য চলছে? আর তা চালাচ্ছেন কে? না কি—ওই বৃন্দাবনের বন্ধু বিভূতি মাস্টার! ঝড় উঠলো গ্রামে—এই প্লানচেট কাণ্ড নিয়ে।

বিক্ষোভটা কেবল হাওয়ায় ভেসেই বেড়ালো না। সারা জাঙ্গিপাড়া তোলপাড়। এমন কি শ্রীরামপুরের সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কাছে গিয়ে পেঁছিল কথাটা।—এখন মহানুভব সরকার বাহাদুর এবং তস্য প্রতিভূ এস. ডি. ও মহোদয় যদি আশু হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে গরীবদের এই ইস্কুলটাই বুঝি গোল্লায় যায়!

ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করতে আসতে হল এক সরকারি কর্তাকে। আসামীর

তলব হল। এক নম্বর আসামী, বলা বাহুল্য—বিভূতিভূষণ। প্রথমে সৌজন্যমূলক দু'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন সেরে নিলেন পরিদর্শক। তারপরে পাড়লেন তাঁর এই পরিদর্শনে আসার গূঢ় উদ্দেশ্যটি। বিভূতিভূষণকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, আপনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবক, এ-ধরনের কুসংস্কার মানেন?

কুসংস্কার? বিভূতিভূষণ হাসলেন। আত্মা অবিনাশী—এই বিশ্বাসকে আপনি কুসংস্কার বলতে চান? সব ধর্মশাস্ত্রই তো আত্মার অমরত্ব স্বীকার করে।

ধর্মগ্রন্থে অনেক কথাই আছে। তাই বলে বিদেহী আত্মা মৃত্যুর ওপার থেকে প্লানচেটে নেমে আসে এ-ধরনের কথা কোথায় লেখা বলুন? পরিদর্শক শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

এ দেশ কেন, ওই বস্তুতান্ত্রিকতার দেশেও অলকট, অলিভার লজ, বারনস প্রমুখের বইয়ে এ-রকম অনেক নিদর্শন আছে যা পড়লে আপনিও বিশ্বাস করবেন, ও-সব আজগুবি নয়। লণ্ডন শহর থেকে প্রকাশিত 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' ম্যাগাজিন তো প্রতি মাসে এ-নিয়ে মনীষীদের লেখা বার করছে।

আপনি ও-সব পড়েন বুঝি? সরকারি কর্তার কথায় বিদ্রুপের আঁচ। আমাকে মাফ করবেন, ওসব আমি পড়ি না। তবে, ওসব বইয়ে আজগুবি অনেক কিছুই লেখা থাকতে পারে।—তিনি নস্যাৎ করে দেন বিভূতিভূষণকে।

লেখার কথা নয়, দেখার কথা বলছি। বিভূতিভূষণও অবিচল।

তর্ক করে লাভ নেই মিঃ ব্যানারজি। আপনি আমাকে দেখাতে পারেন? আপনার সঙ্গে প্লানচেটে বসব আমি।—যেন চ্যালেঞ্জ জানালেন বিভূতিভূষণকে।

তারপর কোন এক রাত্রি। ভিতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ, স্কুলবাড়ির এক নিভৃত কক্ষে ক'টি লোক, মধ্যে বিভূতিভূষণ আর ওই আগন্তুক। ধূপ-ধুনার গন্ধে ঘর ভরপুর। দূরে এক কোণে মোমের মৃদু কম্পিত আলোছায়ায় যেন কিসের ইশারা। একটা অবিশ্বাসের নিশান হাতে ঢুকেছিলেন পরিদর্শক। কিন্তু ধীরে ধীরে কে যেন সে নিশান সরিয়ে নিল হাত থেকে। নড়তে শুরু করল মিডিয়ামের প্লান-চেটে ধরা পেনসিল। হাতই নয়, মনও দোদুল্যমান। ছায়া-ছায়া এক রহস্যের পরি-মণ্ডলে অশরীরী আত্মার আবির্ভাব অনুভব করলেন আগন্তুক। সম্মোহিত তিনি যখন স্কুলবাড়ির বাইরের মাঠে এসে দাঁড়ালেন রজনী তখন মধ্যযামে গাঢ়-গভীর রূপ ধারণ করেছে। আবেগে তিনি বিভূতিভূষণের দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, হার মেনেছি মিঃ ব্যানার্জি।

প্রতিপক্ষ ভড়কে গেলেন কাণ্ড দেখে। সর্ষের মধ্যেই ভূত? রোজার ঘাড়ে বেম্মদত্যি! এবার তাঁরা অন্যভাবে আসরে নামলেন। কিছুদিনেব মধ্যে জরুরি বৈঠক বসল স্কুল কমিটির। স্কুলের কল্যাণার্থে মাননীয় সদস্যদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হল, বাবু শ্রীরাজকুমার ভড়, এম. এ. মহোদয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের স্থায়ী পদে বৃত হবেন। প্রধানশিক্ষক পদে অস্থায়িভাবে কার্যরত শ্রীবৃন্দাবন সিংহরায় আরও কিছুদিন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে ইচ্ছুক হলে, সে স্থলে তিনি সহকারী প্রধানশিক্ষকের কাজ করবেন। এবং ওই পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত বাবু শ্রীবিভূতিভূষণ ব্যানারজি অতঃপর সাধারণ শিক্ষকরূপে গণ্য হবেন। সে নিয়োগও আপাতত অস্থায়ী বিবেচিত হবে।

কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে বৃন্দাবনবাবু আদ্যোপান্ত আপত্তি করা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি যখন পাশ হল, তখন তিনি সদস্যপদ এবং শিক্ষকতা দুটি দায় থেকেই পদত্যাগপত্র পেশ করলেন।

রাজকুমার ভড় প্রধানশিক্ষক হলেন। বৃন্দাবনবাবু পদত্যাগ করায় পদোন্নতি ঘটল না আর বিভূতিভূষণের।

এই রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় আর থাকা উচিত কিনা ভাবছিলেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু অন্য কোথাও কিছু না পাওয়া পর্যন্ত কী করে ছাড়বেন! বাড়িতে মা, নুটু যে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। বৃন্দাবনবাবুও বন্ধুকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—ধৈর্য ধর একটু।

বিভূতিভূষণ যাই করুন, অপর দিকের ধৈর্য বুঝি মানছিল না। প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েই ক'দিনের মধ্যে রাজকুমার ভড় স্কুলের উন্নতির জন্য এক দীর্ঘ রিপোরট তৈরি করলেন। রিপোরটটি তিনি দিলেন স্কুলের সেকরেটারির কাছে। সেকরেটারি তখন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমাখনলাল দে। প্রধানশিক্ষক যেগুলি আশু করণীয় বলে রিপোরটে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি অবিলম্বে কার্যকব হওয়া উচিত বলে অনুমোদন করলেন তিনি।

স্বীয় সুপারিশযুক্ত ওই রিপোরট তিনি কমিটির সামনে রাখলেন। কমিটি সেকরেটারি এবং প্রধানশিক্ষকের সুপারিশ গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত হল, অবিলম্বে কমিটির বক্তব্য জানিয়ে দেওয়া হবে বিভূতিভূষণকে।

হায় অদৃষ্ট! উনিশ শ' উনিশের এক ফেবরুয়ারিতে এই জাঙ্গিপাড়া যাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছিল, আজ এক বছর পরে সেই জাঙ্গিপাড়া তাঁকে চলে যেতে বলছে!

তারিখটা বিশ ফেবরুয়াবি, উনিশ শ' বিশ। সেদিন স্কুল কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল, 'বিভূতিভূষণ আনসেটিসফেকটরি অ্যাজ এ টিচার, সো, হি শুড বি রিমুভড ফ্রম দ্য টিচিং স্টাফ।'

পরম কারুণিক স্কুল কমিটি অবশ্য এর সঙ্গে একটি 'দো' শব্দ যোগ করে এক ছিটে কৃপাও ছিটিয়ে দিলেন। তাতে 'দো' বলে লেখা হল—'হি ইজ অ্যালাউড এ রিজনেবল পিরিয়ড অব টাইম ফর এ স্যুটেবল জব এলসহোয়ার।'

পরদিন ছুটির পর স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন বিভূতিভূষণ। বেয়ারা খামে আঁটা বিদায় সম্বর্ধনা পত্রটি তাঁর হাতে তুলে দিল। প্রস্তুত ছিলেন তিনি। ফিরে এসে দাঁড়ালেন রাজকুমার ভড়—প্রধানশিক্ষকের সামনে। কী যেন বলবেন মনে হল। আগেই আত্মরক্ষা করলেন রাজকুমাব, না না, এক্ষুনি কেন যাবেন। একটা ভালো কাজ যদ্দিন না হয়—বিভূতিভূষণ তখনও হতবাক্। সময় পেয়ে সামলে নিলেন রাজকুমার, তা আপনার কেরিয়ার ভালো, দেখবেন, এর চাইতে ভালো স্কুলেই কাজ পেয়ে যাবেন হয়ত।

হয়ত?—ধন্যবাদ। একটি মাত্র কথা, একটু সকরুণ হাসি। মা এখন কী করছেন কে জানে। হযত সইমার কাছে বসে বড় ছেলের কথা, তার চাকরির কথা, উন্নতির স্বপ্ন, সংসারে একটু সচ্ছলতার আশা—কত কী নিযে কল্পনার জাল বুনছেন। নুটু এখন স্কুল ছুটির আনন্দে ঘরে ফিরছে বই নিয়ে। ইছামতীর ঢেউ-খেলানো জলস্রোত কি একটু কালের জন্য থেমে যায়? একটি অঙ্কুর কি হঠাৎ শুকিয়ে যায় নীলকুঠির মাঠে? একটি কুঁড়ি কি ঝরে পড়ে বনশিমতলার ঘাটে?

হেডমাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রথম যাঁর সঙ্গে দেখা হল বিভূতি-ভূষণের, তিনি বৃন্দাবন সিংহ রায়। কিন্তু এ কী. লোকটাকে যেন চেনাই যাচ্ছে ওই গৌরকান্তি উন্নত চেহারার মানুষটির সারা মুখে কে যেন কালি ঢেলে

দিয়েছে। চোখ দুটি জবাফুল। স্কুলের ফরমানটি তাঁর হাতে দিলেন বিভূতিভূষণ। বৃন্দাবনবাবুর জানা সে ফরমান। ঘৃণায় খামখানা তিনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন মাঠে।

সাদা কাগজের টুকরোগুলো মাঠের মধ্যে পড়ে রইলো বটে, কিন্তু সেই মাঠের মধ্য থেকেই এগিয়ে এলো টুকরো টুকরো এক দল শুভ্র-সজীব প্রাণ। খবরটা আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ছেলের দল ঘিরে ধরল বিভূতিভূষণকে। তিনি তো ওদের স্কুলের বেল-পেটানো-পিরিয়ডে-বাঁধা সম্পর্কের শিক্ষক নন, সকাল, দুপুর, বিকালের নির্বেতন সান্নিধ্যে বাঁধা তারা অনেকেই এই স্যারের সঙ্গে। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি প্লানচেট প্রসঙ্গ তোলেন না। সেখানে পড়ার কথা, পাঠ্যের মধ্যে সত্যের মাধুর্য প্রকাশ। তিনি ওদের কাঁচ-পাপড়ি মেলা চোখে দৃষ্টির কাজল পরিয়ে দেন। ওরা তাই সম্মোহিত। ওরা ছাড়বে না বিভূতি মাস্টারকে।

আপনাকে যেতে দেবো না স্যার।

আমরাও কাল থেকে এ স্কুলে আসবো না তাহলে।

না, কমিটি-টমিটি মানি না আমরা।

আঃ, এতো মায়া, এতো মমতা? কাঁচ কাঁচ ভালোবাসার মুখগুলি এত সুন্দর? চোখ জলে ভরে গেল বিভূতিভূষণের। জাঙ্গিপাড়ার কালো ডানায় ঢাকা কুটিল অন্ধকারের মধ্যে এক সার আলোর প্রদীপ কে জেলে দিলে! ঝাপসা চোখ। আবেগে প্রায় আটকে আসে কণ্ঠ। কোনক্রমে দু'একটা কথা বলে তিনি ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, শান্ত করতে চাইলেন।

না, না, না। অবুঝ ছাত্রের দল পথ আগলে রইলো।

সত্যিই বন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ হাই স্কুল। ক'দিন ধরে চলল এক অশান্তির আবহাওয়া।

গতিক দেখে স্কুল-কর্তারা ছুটলেন বৃন্দাবনবাবুর কাছে। হাজার হোক, তিনি এ গাঁয়েরই শ্রীরামপুর পল্লীর লোক, স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও। না হয় একটা ভুল হয়েই গিয়েছে। সেটা শোধরানোর কথা ভাবা যাবে। তাই বলে স্কুলটা উঠে যাবে, এ কি তিনি চুপ করে দেখতে পারবেন?

বৃন্দাবনবাবু বিভূতিভূষণের কাছে এলেন। কিন্তু ছেলেদের প্রীতির পসরা নিয়ে এ স্কুলকে তিনি নমস্কার করবেন। তাঁর মনস্থির। তবু একটি বিদ্যায়তনের অকাল-মৃত্যুর দায় কেমন করে কাঁধে নেবেন তিনি? নিজের অপমান? পথে। মানুষের ধুলোয় কোন অপমান নেই। কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে একটা চুক্তি করে দুই বন্ধুতে আবার স্কুলে প্রবেশ করলেন ছাত্রদের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে। কিন্তু ক'দিনের জন্যই।

দু'মাস পর, আট মে, উনিশ শ' বিশ, হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ার দ্বারকানাথ হাইস্কুলকে নমস্কার জানিয়ে আবার পথে নামলেন বিভূতিভূষণ।

॥ ছয় ॥

আবার সেই মিরজাপুরের মুসাফিরখানা। গৃহলক্ষ্মীর আমন্ত্রণে কেউ কেউ যখন মেস-বোরডিং ছাড়েন, বন্ধুদের উদ্দেশে তাঁদের স্বগত বাণী—'ন পুনর্ভবিষ্যামি'। লেখক

কিছু কিছু মেস-পালিত মানুষ থাকেন, যাঁরা বন্ধুদের বিদায়-অভিনন্দন জানান 'পুনরাগমনায়চ' বলে। ননীরা ক'জন তাঁদের সগোত্র। তাঁরা শতরঞ্জি বিছিয়েই আছেন এই একচল্লিশ নম্বর মিরজাপুর স্ট্রিটে। বিভূতিভূষণকে ফিরে আসতে দেখে এগিয়ে স্বাগত জানালেন পুরনো বোরডাররা।

আরও দায়িত্ব আছে তাঁদের। বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়া, খবরের কাগজে কর্মখালি খোঁজ করা, বাড়ি থেকে দু'চার পয়সা ম্যানেজ করে বান্ধব ভাণ্ডারে চাঁদা দেওয়া আর বন্ধুর স্বপ্নের সলতেটিকে উস্কে রাখা। বিভূতিভূষণের কিন্তু দম ফুরিয়ে আসার দশা।

এ-অবস্থায় কি বাড়ি ফেরা যায়? তবু কতদিন দেখেননি মাকে, বারাকপুরকে, ইছামতীকে। চলেই গেলেন। ইতিবৃত্তান্ত শুনে আঘাত পেলেন মৃণালিনী। তবু তিনি মা, খোকাকে ভরসা দেন, মুক্‌খু তো নও. একটা কিছু হবেই দেখবে।

আবার আড়ালে প্রার্থনা করেন, দোহাই ঠাকুর, বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও। ওরা এতো অবুঝ, সংসারের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই বোঝে না। তুমি দেখো ঠাকুর।

বিভূতিভূষণ ইছামতীর পাড়ে, নীলকুঠির মাঠে বসে-শুয়ে-গড়িয়ে সময় কাটান; কত কথা ভাবেন, মনে বল পেতে চান। ঘরে এসে হয়ত দেখতে পান, মা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছেন পরবার জন্য, দারিদ্র্যের সর্বাত্মক আক্রমণ থেকে মান-ইজ্জত বাঁচানোর জন্য। সারাটা জীবন কি মা এই করেই শেষ হয়ে যাবেন? না। আবার কলকাতা।

এসেই দেখা করলেন বিপদে যাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়, সেই আচার্য রায়ের সঙ্গে। প্রণাম করতে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন তিনি। কিন্তু ব্যথিত হলেন ওর অবস্থা শুনে। তরুণ শিক্ষাব্রতী, প্রথমেই এমন নির্মম অভিজ্ঞতা! সেই একই গ্রাম্যব্যাধির বলি এক আদর্শবাদী প্রাণ! শিখাটি নিবতে দিলেন না আচার্যদেব। বললেন, ভেঙে পড়িসনে। শিক্ষকতা একটা বড় কাজ, সবাইকে দিয়ে হয় না। তোদের মত যুবকদেরই বড় বেশি দরকার রে।

বিভূতিভূষণের মনে পড়ে, বাবাও বলতেন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন—এই ব্রাহ্মণের আদর্শ। ভেঙে তিনিও পড়বেন না। কিন্তু মাস্টারিটা মোয়ার মত হাতে তুলে দিচ্ছে কে?

আচার্য রায়ও যে সে কথা ভাবছিলেন না তা নয়। তিনি ওকে দু'একটা দিন পরে আবার আসতে বললেন।

একদিন বললেন, হরিনাভি যাবি? ওখানে চারুদের একটা স্কুল আছে, আমি বলে দেখতে পারি।

আচার্য পি. সি. রায়ের প্রিয় ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন স্ব-গ্রাম হরিনাভির অ্যাঙলো স্যানসক্রিট ইনসটিটিউশনের সেকরেটারি। তাঁর কাছে আচার্য রায়ের কথা, গুরুবাক্য—শিরোধার্য। স্কুল কমিটির সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলেন চারুবাবু।

আচার্য রায়ের সুপারিশ! এ নিয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কেবল একটা আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব চাই, এই যা।

কথামতো বিভূতিভূষণ দরখাস্ত করলেন। স্কুল কমিটির বৈঠক বসল বিশ জুন, উনিশ শ' বিশ। সিদ্ধান্ত হল, জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী শিক্ষকরূপে যোগদান করবেন। বেতন প্রারম্ভিক পঞ্চাশ টাকা, বছরে দু'টাকা করে বেড়ে ষাট টাকা অবধি দাঁড়াবে। নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিলেন স্কুল কমিটি।

রাজপুর-হরিনাভির সেই বিখ্যাত দোলদার-ছক্কর গাড়ি আর নেই একালে। একদা এ-তল্লাটের যাত্রী নিয়ে শহর কলকাতা পর্যন্ত চলাচল করত ওই বিচিত্র দোলা। শিয়ালদা সাউথ থেকে বিভূতিভূষণ ট্রেনেই এসে নামলেন সোনারপুরে। ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। কিন্তু তিনি রাজপুরের মধ্য দিয়ে দেড় ক্রোশ পথ হেঁটেই হরিনাভি হাজির। জুলাইয়ের পয়লা, শুক্রবার, ঠিক সময়েই তিনি এলেন। ক্লাস তখনো বসেনি।

প্রধানশিক্ষক কিশোরীলাল ভাদুড়ী স্বাগত জানালেন নবাগতকে। প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষ। ইংরাজিতে নাম স্বাক্ষর করলেন, বিভূতি বিএইচ. ব্যানারজি।

একটি ভূগোলের ক্লাসে হাজির করে দিলেন ওঁকে প্রধানশিক্ষক। ঠিক হয়েছে, বাঙলা, ইংরাজি ও ভূগোল—প্রধানত এই তিনটে বিষয় পড়াবেন। ভাষা দুটিতে ওঁর বরাবর উৎসাহ। ভূগোলে ঝোঁকটা বেড়েছে ইদানীং। মেস-ঘরে বসে বসেই উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত মানচিত্রে কালো দাগ যত পোকা সব বেছে সাফ। অতএব বেশ পছন্দসই হল অধ্যাপনার বিষয়গুলি।

তবে আজ আর নয়। প্রথম ঘণ্টা পড়তেই সহকারী প্রধানশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র লাহিড়ী এসে হাত ধরলেন, চলুন, অপাতত এই গরিবের বাড়িতেই একটু কষ্ট করে।

জ্ঞানবাবুর বাড়ি ক্রোশখানেক দূর—রাজপুর। এখনকার মত সেখানেই থাকা-খাওয়া। সেখান থেকেই আসা-যাওয়া।

সুপ্রাচীন বিদ্যায়তন এই হরিনাভি অ্যাঙলো স্যানস্‌ক্রিট, সংক্ষেপে এ. এস ইন্‌স-টিটিউশন। প্রতিষ্ঠা, আঠারো শ' ছেষট্টি। পণ্ডিত দ্বারকানাথ এর প্রতিষ্ঠাতা। পরে শত-বার্ষিকী উপলক্ষে দ্বারকানাথ-এর নামও এই বিদ্যায়তনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়—নতুন নাম হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাঙলো স্যানস্‌ক্রিট ইন্‌স্টিটিউশন, সংক্ষেপে ডি. ভি. এ. এস. ইন্‌স্টিটিউন।

আবার দ্বারকানাথ! জাঙ্গিপাড়াও তো ছিল দ্বারকানাথের স্কুল! এ দ্বারকানাথ অন্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনিই ছিলেন সম্পাদক, তিনিই প্রধানশিক্ষক। ইতিহাসের সে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। দেবতার দীপ হাতে আরও অনেকে এখানে এসেছেন সেই ধারাকে আলোকিত, অম্লান রাখতে।

এসেছিলেন শিবনাথ। মাতুল দ্বারকানাথ কাশীবাসী হওয়ার আগে ভাগনেকে তাঁর সোমপ্রকাশ ও বিদ্যালয়ের ভার দিয়ে যান। সেটা আঠারো শ তেয়াত্তর। স্কুলের সম্পাদক ও প্রধানশিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথের ভাষায় এই 'সংস্কৃত ইংরাজি স্কুলে'র উন্নতির জন্য প্রাণ সংশয় করে পর্যন্ত তাঁকে কাজ চালাতে হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হয়েছেন। 'কী, এত বড় আস্পর্ধা! আমাদের গ্রামে চাকুরি করতে এসে আমাদের কাজের উপর হাত!' এই বলে তাঁরা লোক পাঠিয়ে স্কুলবাড়ির মধ্যে শিবনাথের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন, তাঁর সঙ্গীর মাথা ফাটিয়েছেন। মজিলপুরের লোক শিবনাথ তখন এই স্কুলবাড়ির মধ্যেই থাকতেন সপরিবারে। সঙ্গে থাকতেন তাঁর বন্ধু, সহকারী প্রধানশিক্ষক ডাঃ বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় স্ত্রী অঘোরকামিনীকে নিয়ে। দমেননি তাঁরা কেউই।

শিবনাথ ছিলেন সেই হেডমাস্টার, যিনি নিজ বেতন একশ' টাকা নিতেন হেড-মাস্টার হিসাবে, আবার সেকরেটারি হিসাবে কম মাইনের শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য

প্রায় পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে যেত নিজের পকেট থেকেই।

স্কুলের ছেলেরা ম্যালেরিয়ায় ভুগছে দেখে হরিনাভিতে দাতব্য হাসপাতাল করালেন এই মজিলপুরের শিবনাথ। পৃথক মিউনিসিপ্যালিটির পত্তন করেছেন সোমপ্রকাশে আন্দোলন সৃষ্টি করে। ধর্মসভা করেছেন। তাঁরই আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র। এখানে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেছেন দত্ত উমেশ-চন্দ্র। সে আলোকে উজ্জীবিত হবে না কি ছাত্রকুল? এককালে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন নেতাজী সুভাষের পিতা জানকীনাথ বসু।

উনিশ শ' পাঁচ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বন্যায় উত্তাল হল হরিনাভি এ. এস ইন্‌সটি-টিউশন। ছাত্ররাই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে এলো এখানে। ঘোড়ার গাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ। ঘোড়া ছেড়ে ছাত্ররা নিজেরাই গাড়ি টেনে হরিনাভি হাজির।

সারা স্কুল হয়ে উঠল স্বদেশী আন্দোলনের, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শিবির। সেই শিবিরের অন্যতম সৈনিক ছিল ছাত্র নরেন আর হরিকুমার, দুই চক্রবর্তী-তনয়। এই নরেন—নরেন্দ্রনাথই পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়, সংক্ষেপে এম.-এন. রায়।

জেনেশুনে নতশির নবাগত শিক্ষক বিভূতিভূষণ। কতো পুণ্যশ্লোক নামের মালায় শোভিত, কত পূতচরণধূলিধন্য, কী মহান আদর্শের সাধনযজ্ঞের হোমাগ্নিতে পবিত্র এই বিদ্যামন্দির! সত্যিই তাঁর বিস্ময় লাগে।

তাই বলে স্কুলে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে ছাত্রদের চাইতে বেশি খুশি শিক্ষক বিভূতি-ভূষণ। রাজপুর নিশ্চিন্দিপুর, সোনারপুর, বারুইপুর বোড়াল, মালঞ্চের জল-জঙ্গল, পথ-প্রান্তর হাতছানি দিয়ে ডাকে বারাকপুরের কাঁচহাতে ঘুরে বেড়ানো চিরসবুজ সত্তাটিকে। কখনও আনমনা হেঁটে চলেন বর্ষাজলে চিহ্ন আঁকা ইতিহাসের আদিগঙ্গার তীর ধরে, নিশ্চিন্দিপুরের বেণুবনছায়ায় হারিয়ে, বারুইপুরের পেয়ারাবনের পাশ দিয়ে, লিচুবাগানের নিচে দিয়ে। কখনও বা বসেন বোসপুকুরের পাড়ে, ছ'আনি চৌধুরীদের ভাঙাবাড়ির সামনে, খোঁড়াগুরুর পাঠশালার ভিটেয়, নয়ত দুর্গারাম করের ভাঙা মন্দিরের গা-বেয়ে-ওঠা অশ্বত্থের শিকড়ে।

যতক্ষণ ইচ্ছে কাটাও, কোন অসুবিধা নেই। ইতিমধ্যেই জ্ঞান লাহিড়ীর গৃহাশ্রিত সংসারী পরিবেশের বাইরে চলে এসেছেন। হেডমাস্টার কিশোরীবাবু রাজপুরে তাঁর শ্বশুর নগেন বাগচীর খালি বাড়িটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ক'দিনের মধ্যেই সেখানে উঠে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ। রাঁধতে কোনকালেই শেখেননি। তবে মিরজাপুর মেসের অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে একটা কমন প্রেসক্রিপশন নিয়েছেন। দু'একটা সিদ্ধ, ভাতে-ভাত, আর দুধ, ইত্যাদি—রান্না-খাওয়ায় অসুবিধা নেই কোন।

বরং সুবিধে। কারো তোয়াক্কা না রেখে খাও, না-খাও, যখন ইচ্ছে ঘরে ফেরো, যত ইচ্ছে ঘোরো। কল্পনার চোখ মেলে দিয়ে ভেবে ভেবে ভোর করো না, কেউ তোমায় পিছু ডাকবে না। এই-ই তো চান তিনি। ছোট ছোট পল্লী, কতো নাম, কতো কাহিনী এর অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো, যতো জানেন ততো যেন আবেশে ভাসেন।

রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে
গঙ্গার নয়ননীরে গঙ্গা ঘরে ঘরে

চৌবেড়ে গ্রামের সেই দীনবন্ধু মিত্র, এ তাঁর সুরধুনী কাব্যের কথা। ঢালু ধান-পাতার মধ্য দিয়ে বর্ষার এই জলরেখাই আদিগঙ্গার গতিপথ। গোটা অঞ্চলের গ্রামগুলি দু'পাশে পবিত্র হ'ত তারই নীরে। সে এক পুরোনো কাব্য-কাহিনীর স্রোতধারা, ইতিহাসের

ধারাপথ। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত এ-পথেই সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। এই তো মহাপ্রভু চৈতন্যের নীলাচল যাত্রার পথ। কতদূর যাওয়া যায় এ-পথ ধরে? হাঁটতে হাঁটতে রাত গভীর হয়, আবার রাজপুরের নীড়ে ফেরে পাখি।

রাতে ফিরতে ফিরতে মনে হয়, পাশের কোন ঘর থেকে অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। অমন জলদগম্ভীর অথচ ললিতকণ্ঠ কার? ঋষি বঙ্কিম না? একটু পিছন ফিরে তাকালেই যেন এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখা যায়। বঙ্কিম কথা বলছেন এক গোয়ালিনীর সঙ্গে। এই সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী। বঙ্কিমচন্দ্র রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে আসতেন এই রাজপুরে তাঁর বন্ধুগৃহে। প্রসন্ন গোয়ালিনী চরিত্রটি নাকি এখানেই পাওয়া। রাজপুরের গোয়ালিনীও অমর হল বঙ্কিমের সঙ্গে।

না, রোজ আসা যায় না কাঁঠালপাড়ার বাড়ি থেকে। আসতেন বঙ্কিম পাশের গ্রাম বারুইপুর থেকে। সেখানকার আদালতে তিনি তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ওঃ, সে কী দিন গিয়েছে এখানে! আদালতে বিচারকের আসনে বসে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জটিল মামলা, লোকারণ্য আদালত-প্রাঙ্গণ। শহর কলকাতা থেকে জাঁদরেল ব্যারিস্টার এসেছেন সওয়াল করতে। আদালত-গৃহে ভেঙে পড়ছে লোক মামলার বিচার দেখতে। বিচারক বঙ্কিমের সামনে সওয়াল করতে দাঁড়িয়েছেন ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত!

এমন দুর্লভ দৃশ্য! ভাবতে ভাবতে সারা শরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এলাকাটিই এমনি, এর পথে-প্রান্তরে বনে-জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের কতো উজ্জ্বল পাতা। পথ চলতে যে-কোন বাঁকে আসন পাতলে পুরনো পাতাগুলি হাওয়ায় উড়ে উড়ে চোখের সামনে আসবে। তার তন্ময় পাঠক বিভূতিভূষণ।

পথের পাশে একটা বন-জঙ্গলে ঘেরা পড়ো ভিটে। কত স্মৃতি, কত ইতিহাস। ঋষি রাজনারায়ণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এখানে। বড় হয়েছেন এখানে। কতো মনীষী মহাপুরুষ তাঁর কাছে এসেছেন এ বাড়িতে। সাড়া কি দেবে না আজ রাজনারায়ণের আত্মা? এ তাঁর শুধু নিজের বিশ্বাস নয়, রাজনারায়ণ নিজেই তো আত্মার অস্তিত্বের কথা বলে গিয়েছেন। স্বীয় পুত্রের বিদেহী বন্ধুর আনাগোনার ঘটনা স্বচক্ষে দেখে তার বিবরণী নিজেই তিনি লিখে গিয়েছেন 'মীরর'-এ। রাজনারায়ণের আত্মাকে তিনি প্লান-চেটে ধরবেন। ভাবতে ভাবতে ঘরে ফেরেন। বাইরে থেকে দরজা-জানালা বন্ধ। ভিতরে ধূপের গন্ধ। বনমালতীর সুরভি ছড়ানো। আত্মার সাধনায় বসেন বিভূতিভূষণ। রাত কাটে, কেবল রাজনারায়ণ নয় আরও অনেকের স্পর্শ পান তাতে। স্পর্শ পান আরও একটি একান্ত প্রাণের। সে স্পর্শ প্রিয়তমা গৌরীর। এমনি করেই প্রহর যায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েন। সে-রাতে হয়ত কিছু খাওয়াই হয় না তাঁর।

স্কুলে যাওয়া-আসার একটা নতুন পথ আবিষ্কার হয়েছে। বনবিহারী চিরসত্তা ওঁর মেতে উঠল আনন্দে। হাট-বাজার, ব্যাপারির দঙ্গল, চা-বিড়ির ফোতো আড্ডার পরিবেশ দিয়ে চলায় যেন দম আটকায়। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পাওয়া গেল আম-বাগান, জামবাগান, পুকুর, পানা-শেওলা, কলমিদাম, কচুরিফুলের একটা পথ। মন ভোলে। ভালো লাগে হাতের কঞ্চি দিয়ে গুলঞ্চের সরু ডালের ঝাড়ে সাড়া জাগানো। ভালো লাগে গ্রীষ্মদিনে ফোটা থোলো থোলো সাদা আকন্দের শোভা, ঘেঁটুবনের রূপ-বিতান, গোঁড়ালেবুর গন্ধমাতাল বনপথ। পুকুরে 'পানা শেওলার পিঁড়িতে বসে আহ্নিক করছে একটা জলপিপি'। ঢঙ দ্যাখো। মাথার 'পরে জিয়ল গাছটায় আবার কী পাখি ডাকছে? এত সব দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে পথ ফুরিয়ে যায়। স্কুলের দেউড়িতে পা দিতেই ঘণ্টা পড়ে—ঢং।

এই পথে যেতে যেতেই তাঁর সঙ্গে দেখা। আমবাগানের পাশের পুকুর থেকে, আনারসের আলপথে কলসী কাঁখে উঠে আসছিলেন একটি বউ। ছবিটা বড় পরিচিত। অসতর্ক চোখ। ধরা পড়তেই লজ্জা পেলেন। মহিলাও চেয়ে আছেন ও'র দিকে। পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। পথের গায়ে ভিজে পায়ের চিহ্ন এঁকে আম-কাঁঠালের বাঁকে আড়াল হলেন গ্রাম্যবধূ। এ কাকে দেখলেন বিভূতিভূষণ? ভাবনা-শেষের আগেই কিমবারলি বা জোহেনসবার্গে পৌঁছে দেয় তাঁকে ভূগোলের পাতা।

প্রায়ই এ-পথে দেখা। দু'জনে পথ ছেড়ে দেন দু'জনাকেই। বিভূতিভূষণ ভাবেন, বউটি তাঁর চেনা। কিন্তু কোথায়, কেমন করে সে পরিচয় তা তিনি বুঝতে পারেন না।

বধূটিরও সেই ভাবনা। তবে হদিস তিনি পেয়েছেন এই ভিনদেশী যুবকের। না, আর অচেনা নয়—তবু অজানা, সন্দেহ নেই। দু'দিন মাত্র দেখেছেন। সামনে ভাত দিয়েছেন, যদিও ঘোমটা টেনে। কিন্তু কেন তিনি নিরামিষাশী, কেন অভিলাষী নির্জন-নিঃসঙ্গের, কেন তিনি মানুষ পালিয়ে বনে ঘোরেন, ঘর পালিয়ে পথে, সে রহস্যের নানা প্রশ্ন ততোদিনে পাড়ার দশমুখ ঘুরে তাঁর কানেও পৌঁছেচে, উত্তর তিনিও জানেন না।

কেমন আছেন বউদি? সহজভাবেই একদিন ডাকলেন বিভূতিভূষণ। জ্ঞানবাবুর ভাইয়ের বউ। ফুলি, আর তেঁতুলের মা, যিনি তাঁকে রাজপুরের প্রথম ক'দিন পঞ্চ-ব্যঞ্জনে যত্ন করে খাইয়েছেন, তাঁকে চিনতে ভুল করেননি বিভূতিভূষণ।

ভুল করেননি নিভাননীও। সহজ-সরল বউদি-ডাকে ঘোমটা সরে গেল, কই. আর তো আসেন না আমাদের বাড়ি, কেমন আছি জানতে?

এই যাঃ, উল্টো নালিশ। বিভূতিভূষণ আত্মরক্ষা করেন,—কেন, জ্ঞানবাবুর সঙ্গে রোজই স্কুলে দেখা হয়। আপনাদের খবর পাই।

আর আমাদের সঙ্গে তো দেখা হলেও পাশ কাটিয়ে যান।

এবার আত্মসমর্পণ। লাজুকমুখে বলেন, সে কথা আর তুলবেন না। দেখবেন, এবার, সময় পেলেই হাজির হয়ে যাবো।

তা বনবাদাড়ে, পথে পথে ঘুরে ঘুরে কি আর সময় করে উঠতে পারবেন। দেখবেন, আবার ভুলে যাবেন।

উত্তর দিতে গিয়ে চুপ। কী ভাবেন। বলেন, ঠিকই বলেছেন বউদি, কত যে ভুল হয়, এই পথই আমায় ভোলায় বউদি। বলতে বলতেই আবার কেমন আনমনা।

নিভাননীও আর কথা বাড়ান না। যাওয়ার সময় হাতে ঘোমটা টেনে শুধু বলে যান, যাবেন কিন্তু।

বিভূতিভূষণ মাথা কাত করেন।

সেদিন বিকালে আর কোথাও যাওয়া হয় না। সটান রাজপুর—জ্ঞানবাবুদের বাড়ি। নিভাননীর তের বছরের মেয়ে ফুলি, আট বছরের ছেলে তেঁতুল কাকু-কাকু করে যেন লুফে নিতে চায় ওকে। একটা প্রাণের স্পর্শ লাগে এই পরিবেশে। ফলে মাঝে মাঝেই ঘুরপাক খেয়ে জ্ঞানবাবুদের বৈঠকখানায় পৌঁছে যান। ও'রই আকর্ষণে আরও কয়েক জন সহশিক্ষকের একটা সান্ধ্য মজলিশ জমে ওঠে লাহিড়ীদের বাইরের ঘরে। কথক মহানন্দের পুত্র পিতার প্রসাদগুণে জমাট গল্প-বলিয়ে। বৈঠকখানা মশগুল।

উঠে গেলে সবাই বলেন, চমৎকার, চমৎকার লোকটা। কেউ মন্তব্য জুড়ে দেন, আরে সাধে কি আর পি. সি. রায়ের মতন লোক সুপারিশ করেছেন।

তবু যেন বিচিত্র মনে হয় মানুষটিকে। প্রশ্ন জাগে কেন একলা থাকতে চান? কেন

হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে (পিছনে বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়) ১৯২০।

বারাকপুরের বাড়ি। বাঁ পাশে শানবাঁধানো বেঞ্চ—দিনের বেলায় লেখার জায়গা।

ঘুরে বেড়ান পথে-প্রান্তরে, বনবাদাড়ে, অন্ধকারে।

কৌতূহল নিভাননীরও হয়। মেয়ে অন্নপূর্ণা অর্থাৎ ফুলির দাবি, সে কিছু কিছু খবর রাখে। ও-পাড়ার সত্যবাবুর বউ বলেছে, রোজ আর ঘুরে বেড়ান না। সন্ধ্যার পরে কে কে নাকি ও'কে ঘরে দরজা দিয়ে প্রদীপ জেবলে ধ্যান করতে দেখেছে। তেঁতুলকে নিয়ে সেদিন সে ডাকতে গিয়েছিল মাস্টারকাকুকে, তখন স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। জামা পালটে নেওয়ার সময়, কতকগুলি পুরনো কাগজ পকেট থেকে বার করে দুটো ফুলের পাপড়ি সমেত কপালে ঠেকালেন, তারপরে গায়ের জামার বুকপকেটে নিলেন। বাক্স থেকে একখানা তালপাখা বার করেও বুকে চেপে ধরে আবার রেখে দেন। নিজের চোখে সে দেখেছে এসব। বলেই 'মা কালী' বলে দিব্যি কাটল ফুলি।

দিদির কথার মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠল তেঁতুল। জানো মা, রাঁধতে জানেন না একদম। পুলিনদার সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখি, ফ্যানসুদ্ধ ভাত ঢালেন, আর সেদ্ধ খান।

কেন এসব? এ-রহস্য জানতে না পারা অবধি নিভাননীর নারীচিত্ত যেন স্বস্তি পায় না। কিন্তু উপায় কি? জ্ঞানবাবু ও'র সহকর্মী। তিনিও কিছু বলতে পারেন না। কিছুতে কিছু বলবেন না লোকটি। নিভাননী ফন্দি আঁটেন, ক'টা দিন যাক। একদিন তিনি দিব্যি কেটে সব কথা জানতে চাইবেন, দেখি কী করেন।

আর একটা নাম অবশ্য নিভাননীর মনে আসে, সে জ্যোতু। দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত তাকে লাগিয়ে কিছু বার করা যায় কিনা।

জ্যোতু? সে আর এক ব্যাপার।

সেই যে মেসবন্ধু ননী, ননীমাধব তিনিও বিভূতিভূষণের বাবদে এক মাস্টারি জুটিয়ে এসেছেন এখানে। কেবল কি আসা? একেবারে শ্বশুরবাড়ি বানিয়ে নেওয়া পর্যন্ত। অল্প দিনের মধ্যেই যোগাযোগ সম্পূর্ণ, কথা পাকা। তারপর শুভক্ষণে শুভ-রজনীতে শিক্ষক ননীমাধব এই রাজপুরেরই এক ছাদনাতলায় টোপর মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন। না, টোপর মাথায় থাকলেও কানে মাকড়ি ছিল না তাঁর। দিনকাল বদলে না গেলে কেবল মাকড়ি পরাই নয়, মাস্টারি ঘুচে যেত ননীর। পড়া ধরত শিক্ষককেই, কানমলা-নাকডলা খেতে হত ছাত্রীদের হাতেই।

ওই তো পাশের বাড়ির নবীন চক্রবর্তীর মেয়ে প্রসন্নময়ীকে বিয়ে করতে এসে ধরেকে পড়তে হয় তেমনি দশায়। বর ছিলেন শিবনাথ। না, তখন তিনি শাস্ত্রী উপাধির অধিকারী নন। বয়স মাত্র বছর বার। ফুটফুটে কিশোর বিয়ে করতে এসেছেন, কানে মাকড়ি, গলায় হার, হাতে বাজু আর বালা। বিয়ের পিঁড়িতে ছেলেরা পড়া ধরছে, মেয়েরা কলরোল তুলে কান মলছে, নাক ডলছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর নিজের ভাষায়—সে অবস্থায় তিনি 'ভ্যাবাচ্যাকা'।

তবে দিনের বদল হয়েছে বলেই সেই রাজপুরে আজ নির্ঝঞ্ঝাটে জ্যোতু অর্থাৎ জ্যোতিপ্রভার গলায় মালা পরালেন ননীমাধব চক্রবর্তী। এবং জীবনযাত্রা নির্ঝঞ্ঝাট করলেন সংসার পাতিয়ে।

তা চাকুরি, রোজগার—এ সবের ব্যবস্থা যখন আছে সংসার তাঁরা পাতবেন বইকি! তবু জীবনের এ-ধারায় মেস-বন্ধুর সঙ্গী হতে পারলেন না বাউল বিভূতিভূষণ। ননী যখন ঘরে ফেরেন—বিভূতির তখন পথের দিকে পা।

এই পা নিয়েই এক দুর্ঘটনা। বিকালের দিকে ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে কী একটা অনুষ্ঠান। তাতে যোগ দিতে কলকাতা আসছিলেন বিভূতিভূষণ। সেই ট্রেনে জ্ঞান লাহিড়ীও আসছিলেন অন্য কাজে। একসঙ্গেই নামলেন দুজনে শিয়ালদা সাউথ

স্টেশনে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে কখন দু'জনে আলাদা হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারা যায়নি। হঠাৎ আর্তরব। প্লাটফরমের উপরে একটা বিন্দু লক্ষ্য করে বহুযাত্রী ছুটছে। প্রায় সংজ্ঞাহীন লোকটাকে কেউ চেনে না। এক মুটের বোঝা আস্ত ওর পায়ে পড়ে ওই অবস্থা। ভিড় দেখতে এসে জ্ঞানবাবু শনাক্ত করলেন বন্ধুকে। পায়ের অবস্থাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে জলহাওয়া দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা গিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স এনে, জ্ঞানবাবু বন্ধুকে ক্যামপবেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করে বাড়ি ফিরলেন। হাঁটু মচকানি নয়, ডাক্তার বললেন একেবারে লিগামেণ্ট ছিঁড়ে গিয়েছে।

প্রায় দু' সপ্তাহ হাসপতালে কাটিয়ে ছাড়া পেলেন বিভূতিভূষণ। ননী ও জ্ঞানবাবুর সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্ররা ধরাধরি করে রাজপুরে ও'র থাকার ঘর সেই বাগচীবাড়িতে নিয়ে এলেন। বউদি নিভাননী, জ্যোতু, ফুলি—ওরা সব খবর পেয়ে ছুটে আসে দেখতে। বিভূতিভূষণের মন স্নিগ্ধতায় ভরে যায়। কতো মমতা! কতো সমব্যথা।

বিছানার পাশে বিষণ্ণমুখে বসে থাকে পুলিন, বিনোদ, এরসাদ—ভক্ত ছাত্রের দল। মেস-বন্ধু ননী তো আছেই। ওদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে। পাশের ঘরে চুড়ির রিনঝিন। শুয়ে থেকে দেখতে পারছেন না, তবে বোঝা যায় বউদি, নয়তো জ্যোতু এসেছে। ননীর বউ জ্যোতিপ্রভাকে জ্যোতু বলেই ডাকেন বিভূতিভূষণ। রান্নাঘর নিকিয়ে এখন হযত ওরা কেউ রান্না চাপাবে। স্কুলের ঘণ্টা পড়বে আর কিছুক্ষণ পরেই। ছাত্রের দলও উঠে যাবে। যাবে ননীও। হেডমাস্টার কিশোরীবাবু স্নেহের শাসন করে গিয়েছেন, এখন স্কুল কেন, কোথাও পা বাড়াবেন না কিছুদিন, কমপ্লিট রেস্ট।

দুপুরে বউদিরা কেউ কাঁসার থালায় অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে ও'র সামনে এসে বসবেন, বসে থেকে খাওয়াবেন। না, নিরামিষ নয়। আমিষ। হার মেনেছেন ক'দিনেই তিনি ও'দের কাছে।

বিকালে স্কুল ছুটির পরই আবার অবধারিত আগমন—ননী, জ্ঞানবাবু, অক্ষয়বাবু, কিশোরীবাবুর।

মা সেই বারাকপুরে। নুটু আছে বনগাঁ বোর্ডিং-এ। ওরা কিছু জানে না, জানানিনি। হয়ত দুঃখ পাবে, উদ্বেগ পোহাবে। অযথা তা করা কেন? সবই তো পেয়ে যাচ্ছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু এত তো তিনি চান না।

কথায়-বার্তায়, আচারে-আচরণে জীবনের পরম বেদনার হয়ত ছায়াপাত ঘটে; বাইরে, চোখের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকেন তিনি।

তবু ধরা পড়ে যেতে হয়। ও'কে লুকিয়েই ও'র বাসি কাপড়-জামা কাচতে নিয়েছিল ফুলি। জামার পকেট থেকে সে-ই আবিষ্কার করল, দু'টি চিঠি, কাপড়ের দোকানের একখানি রসিদ আর গুটিকয়েক শুকনো ফুলের পাপড়ি। মেয়েলি কৌতূহল, একটু চোখ না বুলিয়ে বুঝি পারে না।

মাস্টারকাকু! কার চিঠি এগুলি?

ফুলির প্রশ্নে চমকে উঠলেন বিভূতিভূষণ। পুরনো ক্ষতটা আবার বুঝি যন্ত্রণা দিয়ে উঠল। স্মৃতি...দুঃসহ স্মৃতির পাতাগুলি উড়তে আরম্ভ করল এলোমেলো দুরন্ত হাওয়ায়।

গৌরী কার নাম কাকু? কিশোরীর কৌতূহল বাড়ে।

কাগজ ক'খানি তুলে নিলেন ওর কাছ থেকে নীরবে, কপালে ঠেকালেন, তারপর

গায়ের জামার বুকপকেটে রেখে বুকের উপর চেপে ধরলেন হাত দুটি আলতো করে।

তেঁতুলের সঙ্গে লুকিয়ে লক্ষ্য করা ঘটনাটা যেন আজ পরিষ্কার ফুলির কাছে। মাস্টারকাকুর দিকে চেয়ে দেখল তাঁর চোখ দুটি ঝাপসা। ফুলির চোখও ছলছল করে ওঠে। কিছু কি বোঝে না তার কিশোরী হৃদয়? মাকে সেদিন বলল সে ব্যাপারটা।

জ্যোতিপ্রভাকে চেপে ধরলেন নিভাননী। তোর বর তো ওঁর প্রাণের বন্ধু, নিশ্চয় সব জানে। ব্যাপারটা কী বল দিখিনি জ্যোতু।

মেস-বন্ধু ননীমাধবের কাছে কিছু গোপন নেই বিভূতিভূষণের। জ্যোতিপ্রভা অতএব জানবেন না কেন। কিন্তু সে-জানা কতোটা? ননীবাবুই কি জানেন ওর জীবনের অতল গভীর রহস্যের সবটা? জানা যায় শুধু উপরের তরঙ্গ-বুদ্বুদ। আপাত-ঘটনাসঙ্ঘাতের আলোড়ন। তাতে যতটুকু কল্পনার রঙ চড়ানো সম্ভব তা দিয়ে খানিকটা দাঁড় করিয়ে জ্যোতিপ্রভা একটু একটু করে নিভাননীকে বলেন সবটা। পকেটে রাখা স্ত্রীর চিঠি, শিয়রে রাখা ঝালর বোনা তালপাখার স্মৃতিযাপন থেকে স্ত্রীর আত্মা আনা পর্যন্ত।

চোখে জল আসতে আসতে চমকে বুঝি শুকিয়ে গেল। ঘাবড়ে গেলেন নিভাননী, বলিস কিরে! আত্মা এনে তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়? তারপর মাথা দোলাতে থাকলেন, না, না, এ তো ভালো কথা নয়, কবে কী অঘটন ঘটবে শেষে!

দুপুরে ভাত দিয়ে কাছে বসে কথাটা তোলেন নিভাননী,—ওসব করবেন না ঠাকুরপো, ওতে ক্ষতি হতে পারে।

বিভূতিভূষণের বুঝতে দেরি হল না, কিভাবে কথাটা জেনেছেন নিভাননী। বউদি বলে ডাকলেও মায়ের মত স্নেহ দিয়ে যিনি তাঁকে বেঁধেছেন, তাঁর প্রশ্ন মানেই শাসন। তর্ক করবেন না। একটু ভেবে বউদি আবার বললেন, মাকে নিয়ে আসুন ঠাকুরপো।

তিনি তো ভিটে খালি রেখে যেতে চান না কোথাও বউদি।

কিন্তু এভাবেও তো চলে না। স্বগতোক্তিতে একটু যেন আভাস দিতে চান, যে গিয়েছে, তার কথা ভেবে কি পুরুষমানুষের চলে! নিভাননী ওঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, এবার ঘরের হাল বদলান, একটু হাওয়া লাগুক ঘর দুয়ারে।

আপনাদের স্নেহযত্নে সে তো কিছু কম হচ্ছে না বউদি।

আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আমরা বাইরের লোক, আজ আসছি কাল নাও আসতে পারি।

ও কথা বলছেন কেন? হঠাৎ যেন ধাক্কা খেলেন বিভূতিভূষণ। আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

সে কথা নয়। যেন ঢোক গেলেন নিভাননী। কি জানেন ঠাকুরপো, পরের ঘরের বউ-ঝিদের এমনিতেই নানা বাধা গাঁ-ঘরে। তাই—আর বলা হয় না। যেন মনের ভাষা বোঝাতে চান আভাসে।

নিভাননী লক্ষ্য করলেন, যা বলা হয়েছে তাতেই অনেকখানি আঘাত দেওয়া হয়েছে ওই সরল মানুষটিকে। নিজেরই তাঁর দুঃখ হয়। বাড়ি চলে গেলন ধীরে ধীরে।

ছেলের চিঠি চলে গেল মায়ের কাছে। উনুনে কড়া চাপা দিয়ে নুটুকে নিয়ে বড় ছেলের সঙ্গে রাজপুর চলে এলেন মৃণালিনী।

পায়ের অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে এসেছে বিভূতিভূষণের। লাঠি ভর করে স্কুলে যেতে শুরু করেছেন। সামনে স্কুলের পুরস্কার বিতরণ। তোড়জোড় চলছে।

স্কুলের সেকরেটারি চারুবাবু গ্রামে এসেছেন ব্যবস্থাদি করতে।—নতুন কী করা যায় মাস্টার? বিভূতিভূষণের দিকে তাকালেন চারুচন্দ্র। অনেক মনীষীর আগমন ঘটেছে এই বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণীতে। ওই নামের মালার মধ্যে পেলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, স্যার সি. ভি. রমণেরও নাম। এবার আচার্য রায়কে আনলে কেমন হয়?

প্রশ্ন করতেই পাশ। তাঁর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের নামপ্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই চারুচন্দ্র সম্মতি জানালেন সানন্দে।

কেবল তাই নয়। আরও একটি প্রস্তাব করলেন বিভূতিভূষণ। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার আর অগ্রগতি সম্বন্ধে শহরের লোক কত জানে। সে-সব নিয়ে একটা বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায় না এ গাঁয়ে?

কেন যাবে না! সাহিত্যের শিক্ষকের কাছ থেকে এ রকম প্রস্তাবে ভারী খুশি বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারচন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠিক হল, জিনিসপত্তর, সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করবেন চারুবাবু কলকাতা থেকে। সে-সব সাজিয়ে-বুঝিয়ে গোটা প্রদর্শনী পরিচালনের ভার বিভূতিভূষণের।

প্রবল উৎসাহে ছাত্রদের নিয়ে মেতে গেলেন তিনি। বিজ্ঞানের পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে, নকশা এঁকে, নানা নির্দেশিকা তৈরি করলেন। ভলানটিয়ার ছাত্রদের তা প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্কুলের শিক্ষকরা তো বটেই, চারুবাবু পর্যন্ত তাজ্জব! সকাল-সন্ধ্যা দূরে দূরে গাঁয়ের অত লোক যে বিজ্ঞানের ব্যাপারে অত উৎসাহ নিয়ে প্রদর্শনীতে ভিড় করবে এ-কথা কেউ ভাবতেই পারেননি আগে। লোকের সে উৎসাহে উৎসাহ বেড়ে গিয়েছে উদ্যোক্তারও। ছাত্রদেব সঙ্গে করে তিনি সবাইকে ডেকে ডেকে সব দেখাচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন।

চারুবাবু আচার্য রায়কে বললেন, আপনার বিভূতির কাণ্ড এসব। স্মিত হাসি আচার্য রায়ের। হেডমাস্টার কিশোবীবাবুর অভিমত, ভাবুক-ভাবুক ভাবটা যদি না থাকতো. একেবারে সোনায় সোহাগা হতো। কোথায় দু'টো পয়সা রোজগারের চিন্তা করবেন, তা নয়। কেবল কঁহা কঁহা মুল্লুক না ঘুরে, গাছ, ফুল আর পথের বৃত্তান্ত না নিয়ে দু'টো ট্যুইশানি করলেও তো হয়।

তা হয় না। এবং কেন যে হয় না তা জানার শরিক কেউ বুঝি নেই।

এদিকে জ্যোতুদের নিয়ে নিভাননী লেগে গিয়েছিলেন। মাকে দিয়ে যদি একটা হিল্লে হয়। কিন্তু জুত করতে পাবা যাচ্ছে না। মা নিজেই কি চেষ্টা কম করছেন। প্রায়ই বলতেন, এবার বাড়ি গিয়ে ছেলের বিয়ে দেবো। বিয়ে করতে না চাওয়ায় সংসারটা উল্টে গেল—এই ভেবে মার কান্না আর কথা বিভূতির স্মৃতির রেখায় আজও জ্বল জ্বল করছে। তবে ওই পর্যন্তই। বাগে কেউই আনতে পারেন না বিভূতিকে। কেন অমন হল, কীভাবে, কোথায় ঘোরে, কী চায়—কে জানে। ভেবে ভেবে হাল ছেড়েছেন অনেকেই। এমন সময় তার আবির্ভাব।

বছর ষোল বয়স, হাতে একখানা বই। ও'র ঘরের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল সে। বিকালে ঘরের সামনে আনমনা বসে ছিলেন বিভূতিভূষণ। ওকে দেখে ডাকলেন, এই শোনো।

কাছে এসে দাঁড়ালো সে। চোখে হাসি। খুশি খুশি ভাব।

বিভূতিভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

বালক কবি। বেশ গম্ভীর চালের উত্তর।

অবাক বিভূতিভূষণ। একটু ভেবে বললেন, কবি! কবি পদবী তো শোনা নেই!

শুনবেন কী করে? নাম তো যতীন, যতীন্দ্রমোহন রায়। তবে কবিতা লিখি কিনা, গাঁয়ের লোক তাই ওই নাম দিয়েছে।—জলের মত প্রাঞ্জল হল সে।

এত বড় একটা ব্যক্তির সঙ্গে এ-পর্যন্ত তাঁর আলাপই ছিল না! এভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়ায় বিভূতিভূষণ চমৎকৃত। শুনলেন, বালক কবির গন্তব্যস্থল রিপন লাইব্রেরি, চাঁদা মাসিক মাত্র দু' আনা। বই জমা দিয়ে, আবার আনতে হবে বই। হাতে বেশি সময় নেই। লাইব্রেরির উদ্দেশে চলে গেল সে। বিভূতিভূষণও ওর সময় নষ্ট করলেন না। কেবল বলে দিলেন, সময় পেলে মাঝে মাঝে এসো। আসলে হল, ওর কবিতা লেখার কথায় কিশোর আর যুবক বিভূতি একসঙ্গে যেন মুখোমুখি দাঁড়ালো।

যতীনও অপেক্ষা করছিল এমনি একটা আমন্ত্রণের। আগানে-বাগানে উদাসীন ঘুরে-বেড়ানো এই লোকটি সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল ছিল কবি যতীনের। পরদিনই লাইব্রেরি থেকে একখানি ছাপানো পত্রিকা নিয়ে সে বিভূতিভূষণের কাছে হাজির। পত্রিকাটির নাম 'বিশ্ব' এবং তার প্রথম পদ্যটির নাম 'মানুব', লেখক যতীন। জ্বল জ্বল করে ছাপানো নিজের নামটা প্রায় নাকের ডগায় তুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিভূতি-ভূষণকে। পদ্যটি যতীনই নানা ছাঁদে দুলে দুলে আবৃত্তি করে শোনালো—বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়, ইত্যাদি। পত্রিকাখানা মাসিক পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক কিছু নয়, লেখকবাতিকগ্রস্ত ছেলে-ছোকরাদের চাঁদা-উৎসাহে একটিবার প্রকাশিত হওয়ার পরই যে দম ফুরিয়ে যায় এ সে-ধরনের 'ঐকিক' পত্রিকা। কিন্তু লেখক-কবি যতীনকেও ঐকিক, অনন্য মনে হল বিভূতিভূষণের। চেহারাটা কালো-কালো নাদুস-নুদুস। কী মনে করে বিভূতিভূষণ ওর নাম দিলেন পাঁচু—পাঁচুগোপাল। বি. এ. পাশ মাস্টারের এ-আদরে পাঁচুতে পরিবর্তিত যতীন খুশিই হল।

সেই থেকে নিয়মিত যাতায়াত পাঁচুর। বিভূতিভূষণকে বলে দাদা। মৃণালিনীকে মাসিমা। মৃণালিনীও স্নেহ করেন ছেলেটিকে। নুটুর সঙ্গে খেলা করে বিকালে। ঘরে ভালোমন্দ কিছু রান্না হলে পাঁচুকে ডেকে নুটুর সঙ্গে খেতে বসান মৃণালিনী।

ঘটনাটা এর মধ্যেই ঘটে। জীবনের সে অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা একদিন সারা আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। ঘরে ঘরে পৌঁছেছে সেদিনের সে 'আকাশ-বাণী'। পাঁচু মুখ খোলেনি। তার কথা, কানে কানে, ঘনিষ্ঠদের কাছে। সবার জানা যা, তা নয়, না-জানা কথা, পাঁচুর গোপন কাহিনী দিয়েই শুরু হোক।

সেদিন ছিল বিভূতিভূষণের জন্মদিন। খোকার জন্মদিনে ভক্ত পাঁচুগোপালকে নিমন্ত্রণ করেছেন মৃণালিনী। পাঁচু সেদিন সকাল সকাল উঠে দাদ প্রিয় কিছু বনফুল সংগ্রহ করল। তারপরে স্নান সেরে চলে এলো দাদাকে উপহার দিতে। পাঁচুর রুচি দেখে খুব খুশি বিভূতিভূষণ। ওকে ঘরে বসিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেলেন। স্নানে, তা যদি আবার নদী পুকুর খাল বিল হয় চিরদিনই একটু বেশি সময় লাগে। এদিকে মৃণালিনী রান্নায় ব্যস্ত। নুটু দোকানে না কোথায় গিয়েছে, ফিরছে না অনেকক্ষণ। পাঁচু কী করে! চুপচাপ তো আর বসে থাকা যায় না। তাছাড়া একটা কৌতূহলও অনেকদিন যাবৎ পূর্ণ হচ্ছে না বলে অস্বস্তি ছিল। আজকের মওকাটা সে হাতছাড়া করবে না। বিভূতিভূষণের খাতাপত্র হাতড়াতে লাগল, যদি কিছু সত্যিই পাওয়া যায়!

হুঁ, যা ভেবেছে তাই। বালক কবি কি আর কবি-সাহিত্যিক চিনতে পারবে না। উচ্ছ্বসিত পাঁচুগোপাল পুকুরের দিকের পথটায় চোখ চালিয়ে নিল একবারটি। তারপরই খাতা খুলে বসা। দেখছে, পাতার পর পাতা লেখা! এত কী লিখেছেন দাদা? গল্প না উপন্যাস?

গল্প বলেই মনে হচ্ছে যেন। প্রথমে খাতার প্রান্তিক চিহ্নের উপরে গোটা গোটা করে লেখা, 'পূজনীয়া'। গল্পের নাম। তারপরে শুরু—'পথে যেতে যেতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়।'

পথের কবির কাহিনী 'পথ' দিয়েই শুরু, 'পথে যেতে যেতেই' কাহিনী সঞ্চয়ন।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়তে লাগল সে। বাপের বয়সেও এসব কথা শোনেনি পাঁচু, এমন এমন ভাষা—ব্যাখ্যান। অর্থই বা কী সে-সবের, কে জানে! দেখল লেখা আছে—'জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখির গানে ভরা অপরাহ্ণের সমষ্টি।'

ওরে ব্বাস, কতোমতো কথায় কায়দা! অর্থ না বুঝুক, পাঁচুগোপাল আবেগের জোয়ারে ভাসতে থাকে। আর ভাসতে ভাসতে দেখলো সে কোথায়, সেই সুদূর আরব সমুদ্রে চলে এসেছে। সেখানে লেখা—'আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনও হয়নি।'

ব্যস, ওই সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনী শেষ। কিন্তু চোখ তুলতেই সামনে মূর্ত উদয়সূর্য। পাঁচু চিৎকার করে উঠল, দাদা!

কি হল বালক কবি?

আপনি একটা—। ভাষাহারা পাঁচুগোপাল ঢিপ করে ও'র পায়ের 'পরে কপাল ঠেকালো।

ধরা পড়ায় বিভূতিভূষণ অপ্রস্তুত।—যতো সব ফোতো, ফোতোদের কাণ্ড! খাতাখানি তিনি পাঁচুর সামনে থেকে সরিয়ে রাখলেন।

পাঁচু কিন্তু না-ছোড়। গল্প ছাপা থেকে পাবলিশিং হাউস খোলা পর্যন্ত বিস্তর পরামর্শ দিল। শিশির পাবলিশিং হাউস সেই সময়ে ছ' আনা সিরিজের বই বার করছিল। তের শ' সাতাশ, বৈশাখে তাদের প্রথম বই বেরোল রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নমবর'। পাঁচুর ইচ্ছে, দাদা সহযোগিতা করলে তেমনি একটা কিছু করা যাবে। কিন্তু দাদার মতিগতিতে পূর্ণ আস্থা না রাখতে পেরে মাসিমাকে ধরল পাঁচু। এখন মাসিমা একটু চাপ দিলেই হয।

পাঁচুর কথায় মৃণালিনীর চোখে জল আসে। খোকা ভালো লিখতে পারে! কতো পাঁচালী, কতো ছড়া-নাটক লিখেছিলেন ওব বাবা। লোকে কত প্রশংসা করতো। বিদ্যাসাগর মশাই নিজে ডেকে একবার ভাল বলেছিলেন। অথচ কোথায় গেল সে সব। কোন কাজেই লাগলো না। মানুষটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন নয়ছয় হয়ে গেল! যদি ছাপানো থাকতো! মৃণালিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুছলেন। কতো সাধ ছিল খোকার বাবার! খোকার মধ্য দিয়ে পূর্ণ হবে কি তার বাবার সাধনা? কী আর বলবেন মৃণালিনী। পাঁচুকে বললেন, তোমরা যা হয় বুঝিয়ে বলো বাবা।

তা পাঁচুগোপালকে আর বলতে হবে না সে ব্যাপারে। কিন্তু অমন করিতকর্মা পাঁচুও যেন জুত করে উঠতে পারছে না। হাল অবশ্য ছাড়েনি তাই বলে। সকাল-সন্ধ্যা, ভ্রমণে-বিশ্রামে, আসরে-আড্ডায় ফেউ হয়ে লেগে আছে সে দাদার পিছনে। বিব্রত, উত্ত্যক্ত করে তুলেছে তাঁকে।

কী করবেন বিভূতিভূষণ? নিভৃত সাধনাব যে ভীরু পাখিটিকে তিনি মনের খাঁচায় লালন করেছেন, তাকে কি করে হাটের মাঝে পণ্যের মত রেখে জর্জর করবেন? বালক কবির দাবি আর নির্জন কবির দ্বিধার এই টানা-পোড়েনের মধ্যেই কোন এক রাত্রে ঘরে ফিরে দেখলেন, মা জ্বরে কাঁপছেন। ক'দিন আগে পাশের বাড়ির এক টাইফয়েড রোগীর সেবা করেছেন তিনি। রোগী বাঁচেনি। কী সব ভাবনা আসে।

তবু প্রথমে ভাবা গিয়েছিল অল্পেতেই সেরে উঠবেন। দু'তিন দিন স্কুলে গেলেন বিভূতিভূষণ। নুটু আর রোগীর সেবা কতটুকু বুঝে করতে পারে! নিভাননী এসে শুশ্রূষা করে যাচ্ছিলেন। এবার স্কুল কামাই করতে হচ্ছে। ডাক্তারও উদ্বিগ্ন। হাঁ, টাইফয়েড তখনকার একটি অন্যতম কঠিন রোগ।

ওষুধে কাজ হয় না। সারাদিন প্রায় আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকেন মৃণালিনী। মাঝে যখন চোখ খোলেন, নুটুকে কাছে ডাকেন। এই তাঁর কোলের ছেলে। যেন কোলে রাখতে চান আজ। একবারের কাজ পাঁচবার জানতে চাইবেন, খেলি আজ কিছু। এঃ মুখ শুকিয়ে গেছে। বলবেন, গায়ে জামা দিয়ে থাকবি, ঠান্ডা লাগবে। আবার বড় ছেলেকে ডেকে সে কতো কথা, পরামর্শ দেওয়া, যেন অবুঝ ছেলেকে সংসারের সব হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দুধের দরুন দীনু দু'টাকা পাবে, তুই গিয়েই তা মিটিয়ে দিস খোকা। হরি রায়ের সঙ্গে জমিটার বন্দোবস্ত ঠিক করে নিবি, নাহলে কিছুই দেবে না সে। জামির করাতির বউ, বুড়ি একখানা ছেঁড়া কাপড় চেয়েছিল,...।

সে সব হবে মা, তার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? অত যে কথা বলছ, কষ্ট হচ্ছে না? পরে সব শুনব।

ছেলে যতো বলেন, মৃণালিনী মাথা নাড়েন, আর কষ্ট কতক্ষণ! এর পরে 'জব' বন্ধ হলে—বলেই কাসতে কাসতে হাঁপিয়ে পড়েন। নিভাননীও ছুটে এসে বিভূতির সঙ্গে তাঁর মার বুকে পিঠে হাত বুলোন। তারই ফাঁকে ফাঁকে থেমে থেমে কতো টুকরো কথা, ব্যর্থ-আশার ইশারা। ঘরের কোণে যে সজনে গাছটা পোঁতা হয়েছে, তাতে ফুল ধরতে শুরু করেছে। এবার সজনে ফলবে। বারভূতে খেয়ে যাবে। উনুনের 'পরে কড়া চাপা দিয়ে এসেছি। গিয়ে তুলব। আর হল না।—

বিভূতিভূষণ জানেন, মা-র এখানে আসার ইচ্ছা ছিল না। আজ কিনা এভাবে চলে যাবেন! কী পেয়ে গেলেন জীবনে? 'মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী। গরিব ঘরে বিয়ে হওয়ার পর থেকে সারাজীবন শুধু দুঃখ, অপমান আর ব্যর্থ আশা নিয়ে কাটিয়ে গেলেন'। ছেলে চাকরিতে একটু দাঁড়াতেই বুঝি আলো দেখলেন। সংসার-খরচা থেকে কিছু বাঁচিয়ে একটু জমিও কিনেছেন হালে। হায়, আজ সেই মূর্তিমতী লক্ষ্মী বিদায় নিচ্ছেন! মায়ের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে ওঁর দু'চোখ জলে ভরে যায়। নুটু অসহায়ের মত দাদার কোলের কাছে সরে আসে।

সপ্তম দিন। সারাদিন একেবারে বাক্ বন্ধ মৃণালিনীর। ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে কাঁপছিল। সন্ধ্যার দিকে তাও বন্ধ হযে গেল। ডাক্তারও উঠে গেলেন অসহায়ের মত।

রাত এখন ক'টা? ন'টা-দশটা বোধহয়। রাজপুর গ্রামটা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু মায়ের আসন্ন মৃত্যুর সামনে দু'টি ভিন গাঁয়ের সন্তান আর নিভাননী। তিনিই মৃণালিনীকে স্বামীর ভিটে থেকে এখানে আনিয়েছিলেন। ওঁর নাকি ইচ্ছে ছিল না ভিটে খালি রেখে আসতে। এসেও যে মনটা সেই বারাকপুরেই পড়ে ছিল সে-কথা বুঝতেন নিভাননী। নিজেকে তাঁর অপরাধী মনে হয়। নিজের সমগ্র নারী-হৃদয় ঢেলে দিয়েও কি তিনি পারবেন ওদের সান্ত্বনা দিতে?

হ্যারিকেনের আলোটা জ্বলছিল ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ। চিমনিতে কালি ছড়াচ্ছে। তার মধ্যে দপ্ দপ্ করে আগুনের শিখাটা জিভ বার করছে বার বার। মৃত্যু আসছে, আসছে—দ্রুততর, সব শেষ। সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' একুশ।

॥ সাত ॥

দিদির মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বিভূতিভূষণের ছোটমামা বসন্ত চট্টোপাধ্যায় এসে ওঁদের দু'জনকেই ভাটপাড়ার নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে জাহ্নবী, মৃণালিনীর সেই জার্ফারিও কাঁদতে কাঁদতে মামাবাড়ি পৌঁছুল। মামীমা নির্মলা দেবী, বিভূতিভূষণের দু'এক বছরের কম বয়সী তিনি। কী সান্ত্বনা দেবেন বুঝে পান না।

মায়ের কাজটা আর মামাদের কাঁধে চাপাতে চান না বিভূতিভূষণ। কালীঘাটে গিয়ে সারলেন শ্রাদ্ধ।

বাবা-মা, ভাই-বোনে ভরা ঘর যেন ছারখার হয়ে গেল। নুটু দাদার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের কাছে নিয়ে যাবেন রাজপুর? না, ভেবে দেখলেন, ম্যাট্রিকের মুখে স্কুল বদলানো ঠিক হবে না। ছোট ভাইকে সঙ্গে করে অনেক বুঝিয়ে বনগাঁ বোরডিং-এ রেখে এলেন। বলেন, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো তোকে। বনগাঁ এসেও বারাকপুর যাওয়া হল না এবার। মায়ের কথা মনে হতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মায়ের শেষ কথাগুলি স্মরণ করে দীনুকে তার টাকাটা ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। আবার সেই রাজপুর, সেই হরিনাভি এ. এস. ইন্সটিটিউশন।

নগেন বাগচীর ওই পুরানো বাড়িটা অসহ্য লাগে। মায়ের শেষ নিঃশ্বাস থমথমে করে রেখেছে এ-বাড়ির আবহাওয়া। শূন্য ঘরটার একান্ত নির্জন-নিঃসঙ্গতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বিভূতিভূষণ। জীবনের এই পালা কি ঘুচবে না কোনদিন? যতবার ঘর সাজাতে চাইবেন ততবার তা ভেঙে যাবে?

থাক খাতাগুলো অমনি পড়ে। ধুলো জমুক মলাটের ললাটে, পাতাগুলো বিবর্ণ হোক জীবনের পৃষ্ঠার মতো। পাণ্ডুর হোক লেখাগুলি, যথার্থই ওগুলি পাণ্ডুলিপি হোক। হারিয়ে যাক, উড়িয়ে দিক ঝড় সবকিছুকে নিরুদ্দেশের পথে, যে পথে চলে গিয়েছে ইন্দু, মণি, গৌরী, মহানন্দ, মৃণালিনী। না, জীবনের কোন উদ্দেশ্য, কোন উৎসাহ আজ আর নেই তাঁর।

বাড়িটা বদল করলেন বিভূতিভূষণ। নগেন বাগচীর বাড়ি ছেড়ে উঠলেন গিয়ে পাশের সত্য মজুমদারদের পড়ো বাড়িটার বাইরের ঘরে। বাড়ি বদল নয় কেবল, লোকটিই যেন বদলে গিয়েছেন।

বদলায়নি কেবল পাঁচুগোপাল। বিভূতিভূষণকে একলা পেলে সঙ্গ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। নিভাননী-ফুলিরাও সাধ্যমত ওকে সান্নিধ্য দেয়। কাছে ডেকে, কাছে এসে ওঁকে আবার সহজ করার চেষ্টা। কখনও তা ভালো লাগে বিভূতিভূষণের, কখনও কিছুই ভালো লাগে না। সব ঠেলে উদাস হযে বনে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে ঘুরে বেড়ান। হাল ধরে রাখতে পারেন না নিভাননীরা। হতাশ হয়ে পড়েন।

তবে পাঁচু, দাদাকে লেখার মধ্যে ফিরিয়ে আনতেই হবে, এই তার সংকল্প। বেশ কিছুদিন চেষ্টার পর এক কাণ্ড করে বসল অগত্যা।

রাজপুর, নিশ্চিন্দিপুর, হরিনাভির লোক ঘুম থেকে উঠে অবাক। আমগাছ, জামগাছ, টিনের বেড়া, ভাঙা দেয়াল, স্কুলবাড়ি, ক্লাস বোরড—সব হাতে লেখা পোস্টারে ছয়লাপ—বাহির হইল! বাহির হইল!! এক টাকা সিরিজের প্রথম উপন্যাস—চঞ্চলা। লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়!

কাণ্ড যে কার, তা আর কেউ না বুঝুক বিভূতিভূষণের বুঝতে অসুবিধা হল না। দুটো শক্ত কথা বলে দিতে হবে ভেবে পাঁচুকে তিনি ডাকলেন। কিন্তু কা কস্য

পরিবেদনা। কিছুক্ষণ চুপ করে সব ভর্ৎসনা হজম করল পাঁচু, তারপর বললে—নাম ফাটিয়ে দিলেম দাদা। পানরাঙা দাঁতগুলি বার করে নির্বিকার পাঁচুগোপাল হাসতে লাগল।

এই সাধারণ ঘটনা যে কী অসাধারণ কাণ্ড ঘটালো সেদিন একটি মানুষের জীবনে, বাঙলাদেশের ইতিহাসে, দীর্ঘদিন তা কেউ জানেনি। জানা গেল উনিশ শ' ন রত।।ভলেশ নয় জুলাই, ঘটনার তেইশ বছর পরে এক রাত্রিতে। নিজেই বিভূতিভূষণ সে কাহিনী বলেন আকাশবাণীতে।

পাঁচু কিন্তু সেদিনও মুখ খোলেনি। দাদা তার পৈতৃক যতীন নামটাই বেমালুম বাতিল করে দিলেন! সে পাঁচু হয়েই থাকবে। তবু তো একটা স্বপ্ন তার সার্থক হল। উনিশ জুলাই রাত্রে সেও বারুইপুরের এক লিচুগাছের তলায় দাঁড়িয়ে শুনল পাশের বাড়ির রেডিওতে তার দাদার কণ্ঠ! তিনি বলছেন—'বালক কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই এক রকম জোর করে আমাকে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।' ব্যাস, আর কী চাই। পাঁচু আনন্দে আত্মহারা। দাদা যা যা বলছেন, সবটা কি তাতে বলা হচ্ছে? না। পাঁচুর ইচ্ছে হচ্ছে, সেও ওখানে গিয়ে বাকীটা বলে দেয় অমনি চেঁচিয়ে। তবে তা সম্ভব হয়নি। শুধু শুনেছে আর খুশিতে দুলে দুলে উঠেছে।

পাঁচুগোপালের পোস্টারকীর্তির বর্ণনা করে দাদা বলছেন, পাঁচুর বিশ্বাস, দাদা যখন বি. এ. পাশ, তখন একটু চেষ্টা করলেই লিখতে পারবেন। বি. এ. পাশ লোকদের উপর পাঁচুগোপালের এই শ্রদ্ধা ভেঙে দিতে মন চাইলো না। কিন্তু লেখা ছাপাচ্ছে কে? পাঁচু আশ্বাস দিল স্থানীয় জুবিলী প্রেস তো আছে, সেখানে ছাপবার ব্যবস্থা করবই। এদিকে পোস্টারকাণ্ডের ফলে পথে-ঘাটে লোক প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করে তুলছে—'আপনি লেখক তা তো জানতাম না মশাই! বেশ বেশ, তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? হেড-মাস্টার বললেন, স্কুল লাইব্রেবির জন্য একখানা বই দিতে হবে কিন্তু।' এ রকম বিপদাপন্ন হয়েই লেখা। প্লট? বিভূতিভূষণের ভাষায়—'সেই পল্লীগ্রামের একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্যবধূকে দেখি পথিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন।'—এই থেকেই গল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই বধূটিকে নায়িকা করে 'আমি' এই উত্তমপুরুষটি স্কুল শিক্ষক, তাঁকে নায়করূপে দাঁড় করালেন।

সেই গ্রাম্য বধূ নিভাননীর পরিচয় তিনি দেননি। তাঁর গল্পের উপাদানও যে দানা বেঁধে ছিল ওই উপেক্ষিতা বধূটির জীবনকাহিনী নিয়ে সে-কথাও তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। লুকিয়ে রেখেছিলেন বুঝি নিজের কথাও অনেকটা, অন্তত পাঁচুর মতে।

পাঁচু আজও আছে। বারুইপুর স্টেশনে নেমে কাঠবিড়ালি-চরা, পাখিডাকা পেয়ারা আর লিচুবনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হবে একটানা আধ মাইল। তারপর বাঁশবন আর আম-কাঁঠালে ঘেরা একটি বাগানের মধ্যে ভাঙা চাল, মাটির দেয়ালের কুটির। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বালক কবি পাঁচুগোপাল বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আজও স্বপ্ন দেখে কবিতার। একটি গ্রাম্য পাঠশালার সে পণ্ডিত, এই তার বৃত্তি। যে কাহিনীর কথা বলা হচ্ছিল তার না-বলা কথা অনেক জানে পাঁচুগোপাল। দাদার কথা সবার শোনা। তাই বলে কি পাঁচুর কথা শুনবে না কেউ?

দাদার সঙ্গে সেদিন পাঁচুও গিয়েছিল শহরে, দাদার লেখা নিয়ে। প্ল্যান ছিল ভারতবর্ষ পত্রিকায় জমা দেওয়া হবে গল্পটা। কিন্তু দু'জনের কেউই চেনেনু না

ভারতবর্ষের অফিস। সহজে সন্ধান পাওয়া গেল প্রবাসী পত্রিকার অফিস। শিয়ালদায় নেমে ঘুরতে ঘুরতে কিছু সময় পরই পথের পাশে দেখেন, জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা, 'প্রবাসী'। সেখানেই ঢুকে পড়া গেল। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত চোখে চশমা এ'টে বসেছিলেন। গল্পটি হাতে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, আর কোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল?

বিভূতিভূষণ বললেন, না, এই প্রথম লেখা।

আচ্ছা রেখে যান। মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন।

প্যারীমোহন অন্য কী একটা লেখার দিকে মন দিলেন। ও'রা দু'জন আগন্তুক দ্রুত নমস্কার সেরে সরে পড়লেন ঘর থেকে।

ফিরে এসে পাঁচুগোপাল গ্রামময় রটিয়ে দিয়েছে, দাদার লেখা ছাপা হচ্ছে প্রবাসীতে। বিভূতিভূষণ এ-জাতীয় প্রচারে প্রমাদ গনলেন। ডাকঘরে বলে এলেন, তাঁর নামে বুক-পোস্ট বা ওই রকম কিছু এলে যেন স্কুলে বিলি না করে বাড়িতে দেওয়া হয়। না হয় তিনি নিয়ে আসবেন। লেখা অমনোনীত হয়ে যদি ফেরত আসে, জানাজানির আশঙ্কা।

লেখাটা সত্যিই একদিন ফেরত এলো। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল বিভূতিভূষণের। সঙ্গে প্রবাসীর পক্ষ থেকে শ্রীসুধীর চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এক পত্র। এ কী? তিনি জানিয়েছেন লেখাটি ছাপা হবে! তবে ফেরত কেন? একটু-আধটু অদল-বদল করার জন্য লেখকের কাছে পাঠানো হয়েছে মনোনীত লেখাটি।

ক'দিনের মধ্যে তা করে পাঠালেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু কী অদল-বদল, বিভূতিভূষণ তা বলেননি। বলছে পাঁচুগোপাল। পাঁচুর কথা, নায়িকাকে 'দিদি'র বদলে করা হল 'বউদি'। এবং তার আনুষঙ্গিক সামান্য অদল-বদল। আর, 'পূজনীয়া' নামে যে গল্পটি তিনি দাদার জন্মদিনে আবিষ্কার করেছিল খাতায়, এ সেই গল্প। নাম বদলে হয় 'উপেক্ষিতা'।

বাঙলা তের শ' আঠাশ, মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়। বঙ্গ-ভারতীর দেউল-সোপানে উৎকীর্ণ হল আর একটি নামের ফলক। আর এক সাধক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজি তারিখ অনুসারে প্রবাসীর সেই মাঘ সংখ্যার প্রকাশকাল চোদ্দ জানুয়ারি, উনিশ শ' বাইশ। সংখ্যাটির শুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'শিশু ভোলানাথ' দিয়ে। আর ছিল অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ, সীতা দেবীর উপন্যাস, ইত্যাদি।

জীবনের প্রথম গল্প। তবু অনাদ্যন্ত এ-কাহিনীর সুর। কিশোর জীবন থেকে এ যাত্রার সূচনা। পিতার কথকতা ও কাব্যরচনার প্রসাদগুণ নিয়ে তার জন্ম। ইছামতী গাছ ফুল লতা পাখির সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া, মুখে মুখে কবিতা রচনা করা, খাতায় গুরুগম্ভীর ভাষায় কাহিনী মকশ করা—সব যেন রূপ পেল স্নেহ-বেদনা সিক্ত মাতৃপ্রতিমা বউদি—নিভাননীকে সামনে রেখে লেখা উপেক্ষিতায়।

না। কড়া রঙ চড়িয়ে, কল্প ক্লাইম্যাকসের চূড়ান্ত বিন্দুতে পাঠকচিত্তকে ধাক্কা মেরে, জলসে দিয়ে বাহবা কুড়োবার চেষ্টা তিনি করেননি। এর তুচ্ছতম টানটিও তাঁর নিজ জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসে গড়া। সেই দারিদ্র্যের বেদনা, সংসারের বঞ্চনা, গোকুলপিঠের স্বাদ, সব আছে, আর সবার উপরে আছে সেই শুভ্র শুচিতাবোধ, যা ও'র চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। লেখার মধ্যে ধরা পড়ে যান বিভূতিভূষণ। ধরা পড়ে তাঁর আত্মা, পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস। আজকের পাঠক আর সে অধ্যায়টি

খ‌ুঁজে পাবেন না ও গল্পে। কিন্তু পুরানো প্রবাসীর পাঁচ শ' সাঁইত্রিশ পাতা থেকে শুরু করলে আজো দেখা যাবে লেখা রয়েছে—

'এ আমি কাকে দেখলুম বলব? আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রাঙন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভার-সমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মতো তাদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা-বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াবেন—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বউদিদিতে দেখতে পেলুম।'

সহপাঠী, মেসবাসী অনেকেই প্রবাসীটা পড়ে চমকে উঠলো। এতদিনে তাহলে হল? প্রবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে দশটি টাকা দক্ষিণা পাঠালেন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। বিদগ্ধজনের পত্রিকা প্রবাসী আচার্য রায়ও পড়েন। আনন্দ হল তাঁরও—বিভূতির লেখা পড়ে। আশীর্বাদ জানিয়ে একটি প্রশংসাপত্র পাঠালেন রাজপুরের ঠিকানায়—'তোমার গল্পটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। রচনা যেমন সুললিত তেমনি প্রাঞ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখ হয় যে শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। রুচিও সুমার্জিত। তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে পারিবে।'

২৫ জানুয়ারি, ১৯২২ আঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সত্যিই আজ আনন্দের দিন বিভূতিভূষণের।

আর পাঁচুগোপালের? দাদার লেখা প্রবাসীতে? বলে কিনা, সেই রবি ঠাকুর যাতে লেখেন, সেই পত্রিকায় পাশাপাশি দাদার নাম ছাপা! প্রবাসী বগলে গ্রামময় চক্কর কাটছে পাঁচুগোপাল। তার আনন্দের সীমা নেই।

জীবনের এমন একটা লগ্নে কী করবেন বিভূতিভূষণ? হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ আসছেন ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে। সটান হাজির, দেখতেই নয়, যে জগতে আজ প্রবেশ করলেন, তার অধিদেবতার আশীর্বাদ পেতে। এসব দিন কি ভুলবার? দিনলিপিতে লেখা হল—'কৌতূহলী জনতার চাপে দরজা রেলিঙ সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। বক্তৃতাশেষে ঠেলাঠেলি করে পায়ের ধুলি নিলাম। পায়ে তাঁর চকচকে বাদামি জুতো ছিল—সে-কথা আজও ভুলিনি। কখ‌ু মনে করতে পারিনি ইনি আমাদের পাঁচজনের মত মানুষ। কল্পলোকের দেবতা হয়ে তিনি চিরদিন রইলেন আমার কাছে।'

এদিকে কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটছিল বিভূতিভূষণের অজান্তে। তাঁর উপেক্ষিতা গল্পটি নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজপুর হরিনাভিতে। এর উদ্যোক্তা প্রধানত স্থানীয় কতিপয় কবিযশঃপ্রার্থী। বুড়ো-বুড়িদের তাঁরা সহজেই বাগে আনতে পারলেন। ফলে চণ্ডীমণ্ডপে, পঞ্চাননতলায়, দাবার আড্ডায়, এখানে-ওখানে উপেক্ষিতার নায়িকা সম্পর্কে নানা গবেষণা চলতে লাগল। নায়ক শিক্ষক এবং আমি এই উত্তমপুরুষ যে লেখক নিজেই তাতে কারো সন্দেহ রইলো না

মাস্টার তো ভালোই লিখেছে হে। তা এই বউদিটি কে? বড় চেনা চেনা লাগছে

যেন! কথার ভাঁজে প্রশ্নকর্তা নিজেই যেন একটা উত্তর উসকে দেন।

খেই ধরেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। চেনা চেনা লাগবে না কেন। ফুলির মা, আমাদের—দা'র গিন্নী অচেনা হবে শেষে?

ছিঃ ছিঃ, ঘরের বউকে টেনে গল্প! তা আবার ছাপিয়ে প্রচার? ফোড়ন কাটেন কেউ—তাঁর বোড়ের চাল দিতে দিতে।

বিবেচক কোন বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। তাতে আর ও মাস্টারের কী এলো গেল, বল? একটা কথা তোমরা বুঝতে পারছো না যে নিজেও লোকটা সংসারী নয়, আর বাইরের লোক, আমাদের সমাজেরও কেউ নয়। অতএব দায় দায়িত্বের তোয়াক্কা নেই। লিখেছেন, উনি বোম্বাই না কোথায় গেলেন, আর অমনি নায়িকা-বিরহ পর্ব শুরু। হুঃ!

কারো বা দিনকালের উপরই ঘেন্না ধরে যায়। না, এখন আর সে সমাজপতিরাও নেই, শাসন-শৃঙ্খলাও নেই। কে কার কথা শোনে! নইলে—

চড়া দমের পরে হুঁকো হস্তান্তর করে কেউ মুখ খোলেন। কেন, তা কেন? আমরা কি মরে গেছি সবাই? বিহিত একটা করতেই হবে এর।

এভাবে রাজপুর-হরিনাভির মানসম্ভ্রম রক্ষার নামে একটা তৎপরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ঢেউটা লাগল লাহিড়ী-বাড়িতেও। ফুলির বাবা বাইরে থাকেন। বাড়ি আসেন মাঝেমধ্যে। গ্রামের সব খবর তিনি রাখেন না। বাড়ি এসে কথাটা শুনে বিব্রত বোধ করলেন। প্রথম ভেবেছিলেন স্ত্রীকে আর জানতে দেবেন না এসব। কিন্তু গ্রামের হাওয়া আন্দাজ করে বাধ্য হযে জানাতে হল। ভদ্রলোক সরল মানুষ। নিতান্ত ঘাবড়ে গিয়েছেন।

মেয়েমহলের আলোচনাটা ছিল তীব্রতর, তীক্ষ্ণতব। সুতরাং নিভাননীর অজানা ছিল না কথাটা। এবং মনকেও তিনি যথাসাধ্য শক্ত করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীও সেই প্রসঙ্গ তুলছেন দেখে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, গল্পটা তুমি নিজে পড়েছো?

না, স্বামী তাঁর শুনেছেন। অনেকে কী সব বলছে।

কে বলছে? কী বলছে?

আমি তোমার সন্তানের মা। তোমাকেই সত্যি-মিথ্যে ঠিক করতে হবে। তারপর পুকুর আছে, জল আছে, দড়ি-কলসীরও অভাব হবে না।

কী সব বলছ ফুলির মা? তিনি স্ত্রীকে শান্ত কবতে চান।—তোমাকে কে বলছে। কথাটা হচ্ছে বিভূতিকে নিয়ে।

কেন? সহায়সম্বলহীন বাইরের মানুষ বলে? তাই না? তুমি জানো কতো মহৎ চরিত্রের সে?

থাক। থাক। স্বামী সন্ধিপ্রস্তাব আনেন। ও যেন জানতে না পায এসব কথা।

জানুক। নিভাননী সন্ধি করবেন না। একটা মানুষ, কারো সাতে-পাঁচে নেই। স্কুল করে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কেবল আমরা বলেছি বলেই দু'মুঠো খেতে আসে আজকাল। তাও রোজ বেচারার খাওয়াই হয় না। আসেই না।

নিভাননী ও'র মাকে আনিয়েছিলেন। সেই মা এখানেই চলে গেলেন। সে রাতের কথা জীবনে ভুলতে পারবেন না নিভাননী। সেদিন থেকে তিনি ও'কে নিজ সন্তানের মত স্নেহ দিয়ে আপন অপরাধবোধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সংকল্প নিয়েছেন। আজ তাঁকে মন্দ লোকের মিছে কথায় পথে বার করে দেবেন? কিছুতেই না।

ঠিক। নিভাননীর স্বামী কথা প্রত্যাহার করলেন। শক্ত হলেন। গ্রাম্য অপবাদের

বিরুদ্ধে লড়তে পিছপা হবেন না বারেন্দ্রসন্তান।

আর যাঁকে নিয়ে এতো হচ্ছে তিনি আছেন অন্য জগতে। স্কুল করেন, গ্রামের বাইরে মাঠে বনে ঘোরেন। কোনদিন বা কলকাতায় কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা বা কোন সভা শুনতে যাওয়া। স্কুল যেদিন বন্ধ থাকে সেদিন যাবেন বনগাঁ। বোর্ডিং-এ নুটুকে দেখে আসবেন। গ্রামে যাবেন—বারাকপুর আর ইছামতীর কোলে। মা আজ বেঁচে নেই। এই গ্রামে, এই ইছামতীর তীরে মাতৃস্নেহ মাখানো। পাড়ার কেউ হয়ত দেখতে পেয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে যান। কোনদিন বা নিজেই গিয়ে ওঠেন সইমাদের ঘরে। তাঁরা ওকে পেয়ে খুশি। সুযোগ পেলে আবার ভিটেয় আলো-জ্বালাবার উপদেশ দেন। আহা, কথকঠাকুরের অমন ভিটেটা খালি পড়ে আছে কতোদিন! কিন্তু কাকে বলা? তাঁরাও বোঝেন, লোকটি যেন ভিন্ন জগতের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে সেদিন ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগীশ্বরী বক্তৃতামালার প্রথম দিন। স্কুল থেকে সটান সেখানে হাজির। ভালো আলোচনা, বক্তৃতা—এসব শোনায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। সারাক্ষণ সেই বক্তৃতা শুনে হলঘর থেকে বেরোচ্ছেন। পিছন থেকে এক বন্ধুর ডাক। ফিরে দাঁড়াতে বন্ধুটি হাত ধরে এক প্রবীণ ব্যক্তির কাছে টেনে নিলেন। বললেন, উনি প্রবাসীর চারুবাবু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তোর কথাই বলছিলেন উনি।

বিভূতিভূষণ প্রণাম করলেন। চারুচন্দ্র হেসে বললেন, কেবল প্রণামে কী হবে, প্রণামী কোথায়?

কী ... যায় ঠিক বুঝতে পারছিলেন না বিভূতিভূষণ। চারুবাবুই বুঝিয়ে বললেন—গল্প কোথায়? আরও গল্প চাই তোমার কাছ থেকে।

কথাটা শুনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন বিভূতিভূষণ। আমার আরও গল্প ছাপবে এরা? খুশির দোলায় ভেসে ভেসেই যেন বাজপুর পৌঁছে গেলেন। মে মাসে দ্বিতীয় গল্প 'উমারানী' ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন প্রবাসীতে।

কথাটা তিনি পাঁচুকে জানিয়েছিলেন। তবে নিষেধ করেছিলেন তক্ষুনি প্রচার করতে। কিন্তু মুখে ক'দিন কুলুপ এঁটে পাঁচুর পেট যেন ফুলে উঠল। লেখাটা ডাকে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারে বেরিয়ে পড়ল সে।—বাহির হইতেছে, বাহির হইতেছে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গল্প—'উমারানী'।

কে উমারানী? আবার কাকে নিয়ে গল্প ফেঁদেছে মাস্টার? কে আবার! প্রথম গল্প মাকে নিয়ে, এবার মেয়েকে নিয়ে নিশ্চয়!

ছি, ছি, কেলেঙ্কারির আর সীমা-সরহদ্দ রইলো না।

গাঁয়ের নিরামিষ পরিবেশে আবার আমিষের ফোড়ন পড়ে' তবে সবাই তার অংশীদার নয়। প্রথমবারেব কুৎসাটা কিন্তু গ্রামের শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা উপেক্ষিতা পড়েছেন, তাঁদের মনে উল্টো প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। এমন একটা শুচিতা জড়ানো সে-কাহিনীর সর্বাঙ্গে যা মনকে সহজে অন্য ভুবনে নিয়ে যায়। প্রচারে পাঠকসংখ্যাও বেড়ে ছিল, বেড়ে ছিল বিভূতিভূষণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবানদের সংখ্যাও। সুতরাং এবার তাঁরা সহজে টোপ গিলছেন না।

হাওয়ার লক্ষণ দেখে প্রতিপক্ষ একটু জোট বেঁধেই নামলে : এক কল্পিত-কাহিনী রটাতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, গল্পটা তাঁদের জানা হয়ে গিয়েছে। যতদিনে না বেরোচ্ছে লেখাটা, এ-রকম একটা কুৎসা প্রচ ... দম রাখা তাঁদের ইচ্ছে। নিভাননীর এগারো-বারো বছরের মেয়ে অন্নপূর্ণা—ফুলি, তাকে জড়িয়ে ওই 'উমারানী' কাহিনীর

একটা ছক কেটে তাঁরা তা উচ্ছিষ্টের মত নানা মহলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

সরাসরি কেউ কথাটা মাস্টারভক্ত পাঁচুগোপালকে না বললেও কানে তার পৌঁছায়।

ইশ, দাদা জানলে কী ভাববেন! এ গ্রাম তো ছাড়বেনই, আর হয়ত লিখবেনই না কোনদিন। অমন গুণী, অমন ভালো মানুষটাকে নিয়ে এসব কী হচ্ছে! পাঁচু তর্ক করে, কিন্তু থই পায় না। ওদের ষড়যন্ত্র আরও গভীর।

এ রকম অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন অন্নপূর্ণা এসে হাজির সত্য মজুমদারের বাইরের ঘরে। বিভূতিভূষণকে আর সে মাস্টারকাকু বা কাকা বলে না। মা বলেছেন, ও তোদের দাদা। আগের জন্মে ভাই ছিল।

কী একটা বই পড়ছেন সকালে। প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যা। ওকে দেখে মুখ তুলতেই আর বসতে বলা হল না। আগেই ফুলি বলল—ঝগড়া করতে এলাম দাদা।

কেন রে? তখনও হাসছিলেন বিভূতিভূষণ।

আপনি কাকে নিয়ে গল্প লিখেছেন?

ওর প্রশ্নে অবাক লাগে বিভূতিভূষণের।

কাকে নিয়ে আবার? কাউকে নিযেই নয়, যা মনে আসে, ভালো লাগে।

ফুলি তখনও গম্ভীর। ওকে খুশি করতে বলেন, ও, বুঝেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে নিয়েই লিখব একটা এর পর। আবার হাসি।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা অন্য রকম হল। ফুলির চোখে জলের ছায়া।

কী হল?

আপনি ভীষণ ভাল মানুষ দাদা। আপনি তো কিছুই খবর রাখেন না। গ্রামের সবাই কী সব বলছে!

কী বলছে ফুলি? খারাপ কিছু?

আপনি বুঝতে পারেন না? অন্নপূর্ণা মুখ তোলে। আপনি নাকি মাকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। এবার নাকি আমাকে নিযেও—। আর বলতে পারে না। কিশোরী অন্নপূর্ণার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, তার কথা কান্না হযে ঝরে।

এক অতর্কিত নিষ্ঠুর আঘাতে স্তব্ধ বিভূতিভূষণ। পাথর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। গল্পটা কি পাড়ার চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িযে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বেন? না ফুলির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন—তাহলে আর তোমবা এখানে এসো না অন্নপূর্ণা।

স্নেহ-প্রীতি-মাধুর্যে রঞ্জিত একটি সম্পর্কের অপমৃত্যু! সারাজীবনই কি এই পালা চলবে? হাসতে গিযে চোখের জল গডিযে পড়ে। তবু আব এখানে নয়। দূরের হাতছানি এসেছে যাত্রীর কাছে। এবার যাত্রা কব, যাত্রা কর যাত্রী, শেষ হল বন্দরে বন্ধনকাল।

একদা এই বিদ্যায়তনেরই শিক্ষক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি কেবল সংবাদ-প্রভাকরের লেখক বলেই খ্যাত নন, বাঙলা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান, নবীন লেখকদের উৎসাহের জন্য পুরস্কার দেওয়া। বেঁচে থাকলে এই স্কুলে বসেই তাঁর হাত থেকে হয়ত পুরস্কার পেতেন বিভূতিভূষণ। আর আজ? এও এক পুরস্কার পাওয়া বইকি?

বেলা বয়ে গেল। নিভাননী বৃথাই বসে রইলেন বিভূতির খাবার থালা সাজিয়ে।

স্কুলের ঘণ্টা পড়ল, ক্লাস বসল, ছুটিও হল। ক্লান্ত বিভূতিভূষণ এসে দাঁড়ালেন প্রধানশিক্ষকের ঘরের সামনে। স্নান করেননি, খাওয়া হয়নি।

ছুটির পরে এ-রকম পাওয়া যায় না ওঁকে। কিশোরীবাবু বললেন, বসুন।

গ্রামের আলোচনা তাঁর কানেও এসেছে। প্রসঙ্গটা অপ্রিয়, হয়ত বা সম্পূর্ণ অসত্য,

তবু সহকর্মীর ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন না তিনি। আজ তুলবেন কি কথাটা? কিন্তু রুক্ষ কেশ, শরীরটাও যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে! বললেন, কী ব্যাপার, চান খাওয়া হয়নি নাকি?

উত্তরটা এড়িয়ে তাঁর সামনে একখানা কাগজ রাখলেন বিভূতিভূষণ।—রেজিগনেশন!

এ কী? কী হল আপনার?

কিছু নয়। কোন অভিমান নেই তাঁর রাজপুর-হরিনাভির উপর। সোনারপুর, রাজপুর, বারুইপুর, বোড়াল, হরিনাভি, নিশ্চিন্দিপুরের দানে পূর্ণ তাঁর জীবনপাত্র। এই তো তাঁর স্বপ্ন-সাফল্যের তীর্থভূমি। তিনি কিশোরীবাবুর পদধূলি নিয়ে উঠলেন। হাতে করেই এনেছিলেন প্রবাসীর ওই শ্রাবণ সংখ্যাটি। ইচ্ছে ছিল স্কুলকে ওটা দিয়ে যাবেন। আগেই কিশোরীবাবুর নজর পড়েছে পত্রিকাটির দিকে। ওটা কী জিনিস? এবার আর সতর্কতার দরকার ছিল না। প্রবাসী, শ্রাবণ, তের শ' উনত্রিশ।

কিশোরীবাবুও তো ওই জিনিসটির কথা ভাবছিলেন ক'দিন ধরে। হাত পাতলেন, দেখতে পারি?

নিশ্চয়। কিশোরীবাবুর হাতে তুলে দিলেন পত্রিকাটি। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পাঁচ শ' চোদ্দ পাতায় পৌঁছে, পেয়ে গেলেন সেই লেখা—'উমারানী'—লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বসন্ত পড়ে গিয়েছে না?'—বলে শুরু। একনাগাড়ে পড়তে পারছেন না। ভাবছেন, তা কোথায়, যা তিনি শুনেছেন? এ যে, নায়কের অকালে ঝরে পড়া ছোট্ট বোনের স্মৃতি-বেদনা দিয়ে একটি দুঃখিনী বালিকাবধূর স্নেহাভিষেকের করুণ কাহিনী।

দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন বিভূতিভূষণ।

বসুন, বসুন, লেখাটা শেষ না করে যে পারছিনে বিভূতিবাবু।

ওটা রেখে দিন আপনার কাছে। প্রধানশিক্ষকের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিজের নাম স্বাক্ষর সেরেই পথে নামলেন পথের কবি। ও'র পিছন পিছন মাঠ অবধি ছুটে এলেন কিশোরীলাল ভাদুড়ী। 'প্রবাসী'খানা হাতে। শুরুতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা 'আসা-যাওয়ার মাঝখানে' দিয়ে শেষ। হাঁ, এই মানুষটিকেও আচার্য পি সি রায় পাঠিয়েছিলেন। হরিনাভি এ এস. ইনস্টিটিউশনের উজ্জ্বল নামের মালায়, 'আসা-যাওয়ার মাঝখানে' আর একটি নাম রেখে গেলেন বিভূতিভূষণ। দ্রুতপদে হাঁটছিলেন তিনি। ও'র পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গল্পের শেষ লাইনটিই বারে বারে আবৃত্তি করছেন কিশোরীবাবু। কী আশ্চর্য শেষ লাইনটি,—'হঠাৎ যেন চোখের জল এসে পড়ে..।' কিশোরীবাবুরও চশমার কাচ বুঝি ঝাপসা হয়ে আসে চোখের জলে। তিনিও কি তখন বিভূতিভূষণের শৈশব-পাঠ্য মাধবীকঙ্কণ-এর পরিচ্ছেদ শিরোনামে মুরের কলিটি মনে মনে আবৃত্তি করছিলেন—'গো হোয়ার গ্লোরি ওয়েইটস দী'!

বিদায়! সতের জুলাই, উনিশ শ' বাইশ।

জ্ঞানবাবু যখন খবরটা দিলেন বাড়িতে এসে, ট্রেন তার আগেই সোনারপুর স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মিরজাপুরের মেসবাড়ির সিঁড়ির উপর দুই বনগ্রাম হঠাৎ মুখোমুখি। নীরদ

চৌধুরীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বিভূতিভূষণ। কতো কাল পড়ে দেখা! রিপনে আই. এ. পড়বার সময় দুই সহপাঠীতে ঘনিষ্ঠতা হয়। বিভূতিভূষণের বাড়ি যশোহরের বনগ্রাম। নীরদের বাড়িও বনগ্রাম, ময়মনসিং-কিশোরগঞ্জের বনগ্রাম। আকর্ষণের এটাই প্রথম সূত্র।

বয়সে নীরদ ও'র চাইতে বছর তিনের ছোট, চেহারায় আরও ছোট। কিন্তু ও'র জ্ঞানের দীর্ঘ বহরে অভিভূত বিভূতিভূষণ। ওই বয়সেই ইংরাজিতে চোস্ত নীরদ সি. চৌধুরী। তালিম নিচ্ছেন ফরাসির, চষে বেড়াচ্ছেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি।

নীরদ চৌধুরীও সশ্রদ্ধ, কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা বিভূতিভূষণের কবিতা, প্রবন্ধ পাঠে, বিতর্কসভার ভাষণে।

আই এ.-র পর নীরদ গেলেন স্কটিশে। দেখাশুনা কম। বি. এ -তে নীরদের ইতিহাস অনায়াসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার খবর শুনেছিলেন বিভূতিভূষণ। দু'জনেই এম. এ ক্লাসে ভরতি হন। কিন্তু বিভূতি ছাড়লেন মানসিক অস্থৈর্যে ও অর্থদৈন্যে। নীরদ ছাড়লেন পরীক্ষাজাতীয় ব্যাপারের সীমাবদ্ধ পঠনপ্রণালীর প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধায়। চাকরি বিভূতিরও ভাগ্যে টিকছে না। টিকে থাকতে পারছেন না নীরদও কোথাও বনিয়ে। ঘটনাচক্রে আজ কিনা এতদিন পরে দু'জনেই এক মেস-এ। উপরের ঘরে গিয়ে বসলেন দু'জনে। মডারন রিভিউতে নীরদের লেখা পড়ে কী আনন্দ হয়েছিল বিভূতির, সেই কথা। নীরদও বিভূতিভূষণের উপেক্ষিতার কথা বললেন। কিশোরগঞ্জে বসে লেখাটা পড়েছেন তিনি। চমৎকার হয়েছে।

চমৎকার! জানো নীরদ, তারই দক্ষিণা দিলুম চাকরিটা। হরিনাভির ব্যাপার সবিস্তারে বন্ধুর কাছে বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল বিভূতিভূষণের। ও'র শুকনো চেহারার দিকে এতক্ষণে নজর পড়ল নীরদের। ছি, ছি, কী করেছেন। ও রকম মিথ্যের কাছে হার মেনে নিজেকে কষ্ট দিলেন? জ্যেষ্ঠ বলে বিভূতিভূষণকে নীরদ বিভূতিবাবুই বলতেন বরাবর। তিনি জোর করে স্নান করিয়ে পাশে বসে খাওয়ালেন ও'কে। তারপর দীর্ঘ রাত ধরে দুই বন্ধুতে ভবিষ্যতের অনেক পরামর্শ। দায়িত্ব আছে। আছে নুটুর খরচাও। স্কুলের কাছে কিছুই কি পাওনা নেই তাঁর? যদি কিছু থাকে! নীরদ চৌধুরীর পরামর্শে ছাব্বিশ জুলাই জ্ঞানচন্দ্র লাহিড়ীর নামে একটা অথরাইজেশন লেটার পাঠিয়ে দিলেন।

করণিক হিসাব করে দেখলেন, বেতন বাবদ আঠাশ টাকা আট আনা তিন পাই পাওনা। আর প্রভিডেন্ট ফানডে একশত বারো টাকা হয়, অবশ্য যদি স্কুল কনট্রিবিউশনটা বাদ না দেন কর্তৃপক্ষ। স্বেচ্ছায় পদত্যাগে সে অধিকার স্কুলের আছে। কিন্তু তা চান না ও'রা। সব নিয়ে মোট একশত চল্লিশ টাকা সাড়ে আট আনা মেস-এর ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দিলেন জ্ঞানবাবু।

॥ আট ॥

স্পিচ, ভাষণ দেনা আতা হ্যায় আপকো? ভাষণ?

খুউব, বহুৎ। বিভূতিভূষণ আশ্বস্ত করলেন কেশোরামজীকে। দুঃসহ বেকারির যে করেই হোক তিনি অবসান চান। কিন্তু বক্তৃতা কেন? ভাড়াটে নেতা চাই? না কি যাত্রার দল খুলছেন কেশোরাম পোদ্দার।

না। ধীরে ধীরে প্রাঞ্জল হলেন কেশোরাম। দেশমে গো-মাতাকী হালৎ বহুৎ খারাব হ্যয়। শির্‌ফ ধরম কে লিয়েহি নেহি, দেশ কী আর্থিক সম্বন্ধ ভী ইস পর নির্ভর। গোধন হিন্দুস্তান কী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। সুতরাং ইনকী রক্ষা করনা চাহিয়ে। এইজন্যই তাঁর গো-রক্ষিণী সভা—কাউ প্রোটেকশন লীগ। পড়া-লিখাওয়ালা বাঙালীকো বেশি কুছ্ সমঝাতে হবে না। কেশোরামজী তাঁর ভ্রাম্যমাণ প্রচারক চান। এই নোকড়ি লিলে জিলা-জিলা পর হর জগহমে ঘুমতে হবে, বোলতে হবে, সমঝাতে হবে। ছ' মাসের জন্য কাজ। খাওয়া থাকার জন্য তাঁরাই চিট্‌ঠি দিয়ে দেবেন, ব্যবস্থা হবে। দু'-এক জায়গায় কেবল নিজেকে করে নিতে হবে এন্তেজামটা। খরচা দেবেন গো-রক্ষিণী সভা তার উপর বেতন। সব মিলিয়ে মাসিক প্রায় পঞ্চাশ টাকা।

নীরদের উৎসাহেই ইনটারভিউ দিতে আসা। ফিরে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে।

ঘোরো, খাও—নিখরচায়। তার উপর আবার মাইনে! এর চেয়ে কোন ভালো প্রস্তাব তিনি কল্পনা করতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ক'দিনের মধ্যে নীরদের কাছে বিদায় চেয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিভূতিভূষণ। সে এক বিচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'অভিযাত্রিক'-এর।

ঠিক পুজার ক'দিন আগেই বেরিযে পড়া। কুষ্ঠিয়া, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাদারি-পুর, বরিশাল। আবার চট্টগ্রাম, কক্‌সবাজার, মগুডু, সিঙজু এবং আকিয়াব রোড হয়ে প্রোম-এর পথ ঘুরে ফেণী, আগরতলা, নোয়াখালি, ঢাকা—এখানে ওখানে সেখানে—নতুন নাম নতুন জায়গা, নবতর নিসর্গরূপ। এ কেবল কাজ করা আর পথ চলা নয়, এ যে মৃন্ময়ী মায়ের অঙ্গ জড়িয়ে আদর লুটে বেড়ানো।

ও'র মনে হয় সত্যিকারের এই তো জীবন শুরু। পূর্ববঙ্গের খাল বিল নদীর তীরে তীরে গ্রাম, ঘাটে ঘাটে গঞ্জ—শহর। দেখে দেখে উপলব্ধি করেন, যথার্থ নদী-মাতৃক বাঙলাদেশ। পানসি বেয়ে মাল্লা চলে দূবপাল্লায। সারি-জারি—ভাটিয়ালির সুরে নদী মদির, আকাশ উদাস। আর তীরে তীবে দ্যাখো, সুপারি নারিকেলেব বীথি-ছায়ায় সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা গৃহাঙ্গন। সেখান থেকে মৃদঙ্গ-কীর্তনের সুর ভেসে আসে এই খোলা হাওয়ায। নদীব জলতানে মিলেমিশে সে সুর, সে মুক্তির বাণী, কত দূরে-দূরে যায়, কে জানে। আঃ, এই তো মুক্তি। এর মধ্যে দিগন্তবিধৃত আপনাকে মেলে ধরো—ভেসে চলো।

সেই একই নদী। আবার একী রূপ তার, উত্তাল, ভয়, ' মাদারিপুর থেকে বরিশালের পথে স্টিমারযাত্রা। না, এ তাব ইছামতী নয় আড়িয়াল খাঁ। পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, আগুনমুখো পায়রা—এসব পূর্ববঙ্গের দুরন্ত নদী। এর কোনটিই ইছামতীর মত 'একটি কবিতার লাইন' নয়, এব এক একটি নদী—এক একখানি মহাকাব্য।

আড়িযাল খাঁ, যেখানে এসে মিশেছে আগুনমুখো, সেই ফে'সোতলীর ভয়ঙ্কর বাঁকে নৌকামাঝি পীব-বদরের নাম স্মবণ করছে আতঙ্কে, কম্পিত স্টিমার চলছে একদিকে কাত হয়ে। চাকায়-ঢেউয়ে দুর্জয় সংগ্রাম। যাত্রীরা জপছে দুর্গানাম। এ অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চ কি কম?

সবটাই রোমাঞ্চকর নয়—আতঙ্কও হয় ভাবতে, এমন ঘটনা। সন্দ্বীপেব কাছে একদিন তো আদিগন্ত জলরাশির ফেনিল উন্মত্ততা' দিকহারা হয়ে ভেসে যান তীরচ্ছিন্ন সাম্পানে। এ নদী নয়, সফেন সমুদ্রের প্রলয়মাতন। মাল্লাদের সাহায্যে পাড়ে উঠে মনে

হয়, 'জীবনে প্রথম সমুদ্র-পরিচয় এমনটাই ভাল'।

ঝুঁকি তো আছেই। পথে পথে, পদে পদে পরীক্ষা করে নেন প্রকৃতি তার পূজারীকে। এই তো সেদিন ট্রেনে রাজবাড়ি যাওয়ার সময় ভুল করে এক মিলিটারি-কামরায় উঠে পড়তে তাঁরা তো ওকে চলতি গাড়ি থেকে ঠেলেই ফেলে দেবে। এ যেন খামোকা হত্যা করার চেষ্টা। আশ্চর্য, ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল, প্রাণরক্ষা পেল।

ক্রমে ক্রমে ভয় যেন কেটে যাচ্ছে। নেহাৎ বন-অরণ্যের বিশালতা, বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে চলে গেলেন আরাকানের নিবিড় অরণ্যে। রাত্রি যাপন ব্যাঘ্রগর্জনে কেঁপে ওঠা ছোট জলটুঙ্গি মাচাঘরে এক ডাকপিয়াদার সঙ্গে।

আবার অরণ্য ঘেরা উত্তুঙ্গ শৈলশীর্ষে ধ্যানে বসার বাসনা চরিতার্থ করতে কাটালেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাশে পাণ্ডাদের বর্ণিত ভূতপেত্নী দৈত্যদানা-অধ্যুষিত গা-ছমছম নিশীথ-অরণ্যে। কই, কিছু তো হল না! বরং লাভ হল অনেক, অনেক উপলব্ধি। উৎসাহ বেড়ে যায়।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরে বিরূপাক্ষের মন্দির। সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন চন্দ্রনাথ। বাড়বকুণ্ডের নির্জন অরণ্য পথ, বাড়িয়াডাল গিরিবর্ত, সহস্রধারা জলপ্রপাত, পথের মোড়ে মোড়ে শুধু হাতছানি। থেকে, থেমে যেতে হয়। যেতে যেতে সূর্য ডোবে। সকল মানুষ ঘরে ফিরুক, সব পাখি, তিনি ফিরবেন না। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পাদদেশ থেকে ধাপে ধাপে গাছপালা ও বনঝোপের মাথা নেমে গিয়েছে কত নিচে। তারপর নৈশ কুয়াশায় বিলীন। মন্দির সোপানে বসে বসে মন হয় 'আমি একা বসে আছি, আমার পায়ের তলায় সারা বনময় পৃথিবীটা, জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র, শৈলশ্রেণী—সব নিয়ে এক মায়ালোক।'

চাঁদও অস্ত গেল, পায়ের তলায় বনভূমি গভীর অন্ধকারে ডুবল। বিভূতিভূষণের ভাষায় 'এমন গম্ভীর দৃশ্য জীবনে আর দেখিনি আগে। মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষ যেন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে আরণ্যপ্রকৃতির অন্ধকারের রূপ কোন উত্তুঙ্গ শৈল শিখরে বসে দেখে। নতুবা সে বুঝতে পারবে না বিশ্বপ্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্য।'

তা বেশ, কিন্তু আসল ঐশ্বর্যের কী হল, সেই গো-মাতাকী হালৎ! তাতেও ফাঁকি দিচ্ছেন না বিভূতিভূষণ। কেবল জলে পানসি ভাসিয়ে, বা পাহাড় চূড়ায় বসে বনান্ত শোভা দেখেই দিন কাটাচ্ছেন না। হাটে, গঞ্জে, শহরে ঢেঁবিল পড়ছে, গোরক্ষিণী সভা বসছে সেখানে। ভাষণ দিচ্ছেন বিভূতিভূষণ—সপ্ত মাতার পুণ্য শ্লোক গাভী ধাত্রী তথা পৃথ্বী...। তার পরে তার ব্যাখ্যা—গোধনের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ধর্মীয় নানা মূল্যায়ণ চলত ওজস্বিনী ভাষায়। বক্তার আশ্চর্য বাচনভঙ্গী মুগ্ধ করত শ্রোতাদের। কৃষক থেকে শিক্ষক—সবাইকে আকর্ষণ করার এ যেন এক দেবদত্ত দক্ষতা। বক্তৃতা শেষে কত লোক আসত আলাপ করতে। ফেণী শহরের এক সভা থেকে উঠে এসেছিলেন এমনি এক মুগ্ধ শ্রোতা আলাপ করলেন, বন্ধু হলেন। এ এক অস্বাভাবিক মিলন বলা চলে। লোকটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাসের। তবু সারাজীবন বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত নিজ প্রীতিদানে ঋণী করে রাখলেন বিভূতিভূষণকে। সে কাহিনী পরে। এখানে শুধু বলা যায় সে বন্ধুটির নাম—গোপাল হালদার।

এমনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল চাটগাঁর একটি পরিবার। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্নদা দত্ত চৌধুরী সভা শেষে ডেকে নিলেন নিজ বাড়িতে। সেই যে একবেলার জন্য নেওয়া, পুরো তিন দিন। কেশোরামের নোকরি বাঁচাতে বাঁধন ছিন্ন করতে হয়।

সত্যি কি পারলেন ছিঁড়তে সে বাঁধন? অন্নদা দত্তর মেয়ে রেণু, কী করে চিরদিনের রেণুমা হয়ে রইল? সে মধুর কাহিনীও এখানে নয়। এখানে শুধু 'অভিযাত্রিক'-এর কাহিনীপর্বের ইশারা থাক।

এক কথায়, মানুষকেও তিনি তুচ্ছ করেননি। তাঁর নিজের এ সময়কার ডায়েরিতে লেখা 'দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষই না দেখলুম তবে কী দেখতে বেরিয়েছি?'

বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কীর্ত্তনখোলা নদী। বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কীর্ত্তনখোলার অপরাহ্নের তটপথে ঝাউবনের শাঁ-শাঁ আওয়াজ, তীরে আছড়ে পড়া জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, দূরাগত স্টিমারের বংশীধ্বনি। আর তার মধ্যে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হওয়া সেই লোকটি। লেখাপড়া করা লোক বলে বিভূতিভূষণকে আন্দাজ করে সে শেকসপীয়রের নিন্দা জুড়ে দিল। সে যেন বিদ্রোহ করতে চায় ওই মহাকবির বিরুদ্ধে। না, হাসতে গিয়েও বিস্মিত বিভূতিভূষণ। মফস্বল শহরের ওই পাগলা অমূল্যবাবু শেকসপীয়রের বিরুদ্ধে বকতে বকতে সেই একই কণ্ঠে অনর্গল ওথেলো, হ্যামলেট, রোমিও-জুলিয়েট যদৃচ্ছ আবৃত্তি করে যাচ্ছেন উদাত্ত কণ্ঠে। এ কি কম অভিজ্ঞতা?

আবার আগরতলার রাজ-অতিথিশালা সেখানে এক বাউন্ডুলে ভূতাত্ত্বিক। পোশাকে-পরিচ্ছদে মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা। সারাদিন সে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘোরে। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে দু'পকেট পাথরে বোঝাই করে ঘরে ফেরে। তারপরে রাত যখন গভীর হয়, লণ্ঠন জেলে বসে টেবিলে। না, ওই পাথর নুড়ি নয়, কোন ভূতত্ত্বের জার্নালও নয়। সে খুলে বসে মহাকবি গ্যয়টের 'ফাউস্ট'। পৃথিবীর প্রস্তরের স্তর ছাড়িয়ে এক অপার্থিব প্রণয়লোকে উত্তরণ! মানুষই কত বিচিত্র!

ব্রাহ্মণবেড়ের সেই অব্রাহ্মণ ভদ্রলোক। সভা থেকে এক রকম জোর করে ঘরে নিয়ে গেলেন অপরিচিত আগন্তুককে। সমস্যা খাওয়ানো নিয়ে। ব্রাহ্মণসন্তানকে নিজেদের রান্না খাইয়ে পাপ বাড়াতে গররাজি ঘরের লোক। ঘরে তো আনা হল, এখন উপায়? বিভূতিভূষণ ওদের আশ্বস্ত করলেন, তিনি ভালই রাঁধতে পারেন নিজে, চিন্তা করবার কিছু নেই। ক'দিনের রান্নার অভিজ্ঞতা থাকলেও সেটা যে কেবল ভাতেভাত বা আলুসিদ্ধ ঢ্যাঁড়সচচ্চড়ির বেশি নয় তা অবশ্য বলেননি। ফলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনটা ব্যাপক হল। অত পদ রান্না করতে বসে বচনপটু মানুষটির সে কী শোচনীয় অবস্থা! শেষ পর্যন্ত গৃহকর্ত্তার মেয়ের ধমক খেতে হল—আপনি কিছু জানেন না। তারপরে কাছে দাঁড়িয়ে কোমরে শাড়ি জড়ানো মেয়েটির তদারকি, সব জিনিস রান্নার জন্য কতো পরামর্শ, অনুরোধ, শাসন। শাসন না মাতৃস্নেহ? মেয়েরা যে আসলে মায়ের জাত, আবার তা মনে মানেন বিভূতিভূষণ।

ঢাকায় গিয়ে দেখা কলেজ-বন্ধু জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে। ইংরাজিতে তুখোর সেই জ্যোতির্ময় লাহিড়ী এখানে হেডমাস্টার এক স্কুলে। প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক। বন্ধুর লেখা পড়ে তাঁরও গর্ববোধ হয়েছিল। বিভূতিকে পেয়ে তিনি তো উৎসব পাতিয়ে দিলেন স্কুলে। ওঁকে নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক মিলে নৈশভোজ হল।

সেই স্কুলের ড্রয়িং-শিক্ষক তাঁর বউকে কলকাতার লোক দেখাতে বাড়ি নিয়ে গেলেন বিভূতিভূষণকে। বাড়ির দরজায় পৌঁছেই হাঁক দিলেন কই গো, কোথায় গেলে। কলকাতার লোক দেখতে চেয়েছিলে, দেখে নাও প্রাণ ভরে।

মেসের সেই সত্যবাবু। তাঁকে সবচাইতে ক[illegible] বলে মনে হত। কোনদিন মিশতে চাননি কারো সঙ্গে। সেই মানুষ হঠাৎ ফরিদপুরের রাস্তায় পিছন থেকে জড়িয়ে

ধরলেন এসে। নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখলেন একটানা তিনদিন। ছাড়তেই তিনি চান না। শেষ অবধি একরকম পালিয়ে আসা। সূর্য তখন অস্তগামী। ঘরে পুরুষমানুষ কেউ ছিল না। সত্যবাবুর বিধবা মেয়েটিকেই বললেন, চলি। মেয়েটি কিছুই বলল না। শুধু নীরবে তাকিয়ে রইল ও'র দিকে। সে চোখ কেন ছলোছলো?

ছলোছলো এমনি জলেই বুঝি মুক্তো মেলে জীবনের। মুক্তোর ঝাঁপি নিয়েই ফিরলেন অভিযাত্রিক মিরজাপুরের মেসে।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ পাহাড় ঘুরে কুতুবদিয়ার আলোকস্তম্ভ, আদিনাথ পাহাড়। তারপরে কক্সবাজার, সেখান থেকে মংডু।

যেমন নাম, তেমনি পরিবেশ। বাঙলাদেশের মধ্যে যেন আর এক বঙ্গদেশ। অপূর্ব সুন্দর চকচকে লুঙ্গি পরে দীর্ঘদেহ তামাটে পুরুষেরা ঘুরে বেড়ায়। তাদের ঈষৎ চাপা নাক, শমশ্রুগুম্ফহীন মুখে বিচিত্র সংলাপ, যেন বর্মা মুলুক। মেয়েরা সুন্দরী। চলনে-বলনে এখানকার আরণ্যরূপের মত উদ্দাম। দুর্বার উচ্ছলিত সমুদ্রতরঙ্গের ছন্দ এদের আচরণে। আবাব গগনচুম্বী গিরিশ্রেণীর মতই তারা উদ্যতা, অনতিক্রমণীয়া।

মোংপে, ব্রহ্মদেশীয় সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি। ইংরাজিনবিশ এক বাঙালী বাবু এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলেন।—ক'দিন থাকবেন তো?

দেখি, ইচ্ছে তো আছে। জবাব দিলেন বিভূতিভূষণ। আসলে কাজের জন্য পাঁচ-সাতদিনই যথেষ্ট। কিন্তু নতুন ধরনের জায়গাটা বেশ আকর্ষণ করছে তাঁকে।

মোংপে বললেন, তাহলে একটু সাহায্য চাইবো মিঃ ব্যানারজি।

সাহায্য? কী তাঁর ক্ষমতা আছে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মোংপেকে যা দিয়ে তিনি ধন্য করতে পারেন? আছে বলেই তো চাইছি। মোংপে জানালেন, একজন লোক ছিল—তাঁর ব্যবসায়ের হিসাব তৈরি করে দিত আর অবসর সময়ে তাঁর মেয়েদের ইংরাজি শেখাতো। সামনে ওদের পরীক্ষা। অথচ লোকটি ডুব দিয়েছে।

সাহায্যের প্রস্তাবটা শুনে হাসি পেল বিভূতিভূষণের। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তবু ভেবে দেখলেন এই পাহাড়-অবণ্যের অজ্ঞাত রাজ্যে এমনি একজন বিত্তশালীর সঙ্গে সম্পর্কটা মন্দ নয়। রাজি হলেন। মোংপের ঘবেই থাকা-খাওযা, তার মেয়ে মোংকেটকে পড়ানো, কাছেভিতে গাছপালা-পাহাড় ঘুবে আসা, আর দূর অরণ্য পর্বতের দিকে চেয়ে থাকা। এ সময়েব নিজ দিনলিপিতেই লিখছেন বিভূতিভূষণ—'তখনকার দিনে আমার একটা বাতিক ছিল, নতুন জাযগায নতুন কি কি গাছ জন্মায় তাই লক্ষ্য করা।'

যেমন সন্দ্বীপে দেখে এলেন নারকেল পাতার ধরনের, তার চাইতেও লম্বা পাতার গাছ—নাম গোলপাতা। তা দিয়ে লোক ঘরেব চালা ছায পূর্ববঙ্গে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে শালগাছ তো আছেই। আর আছে মুলিবাঁশ, মৌল বন। গোপালনগরেও তিনি মুলিবাঁশ দেখেছেন, তবে তা জন্মায় কোথায় জানতেন না। জানতেন না যেমন এত মোটা বেতের লাঠি বুড়োরা পায় কোত্থেকে। গোল মাথা মোটা বেতের লাঠি তো দূরের কথা, সেই যে হরিপোড়ার হাতের সরু কঞ্চির মত বেত, তাই বা কোন্ বন থেকে আসে? বারাকপুরের দিকে অত বন, কিন্তু বেতসবন নেই কোথাও। পূর্ববঙ্গের বন-বাদাড়ে দেখলেন লতানে বেতের ছড়াছড়ি। আর লাঠির মত গরিষ্ঠগঠন বেতসকুঞ্জ ভরে আছে গোটা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সানুদেশে।

মংডুর গাছ-গাছালি আরও বিচিত্র। দূর-দুর্গম পাহাড়ে বুঝি আরও কত কী

আছে। পায়ে হেঁটে কত দূর যাওয়া যায়? মৌংপের বারান্দায় বসে, দূরের অরণ্য-পর্বতের দিকে চেয়ে চেয়ে দু'চোখ তাঁর স্বপ্নিল হয়ে আসে। ও'র অবস্থা দেখে দেখে অস্থায়ী ছাত্রী মৌংকেট একদিন বললে, প্রকৃতিকে তুমি বড় ভালোবাস, তাই না?

ঠিকই বলেছ। ভারি খুশি বিভূতিভূষণ! ইচ্ছে করে ওই ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে হাঁটি। আর হেঁটে হেঁটে আরাকান-ইয়োমা পাহাড়ের ওপাশে কী কী আছে সব দেখে আসি।

যাবে? মৌংকেট উৎসাহ দেয়।—বাবাকে বলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ডাক-পিওন হপ্তায় একবার করে সিংজু আকিয়াবের পথ ধরে প্রোম হয়ে আবার মংডু ফেরে। ওর সঙ্গে দিব্যি ঘুরে আসতে পারো।

চমৎকার! বিভূতিভূষণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ও'র ব্যস্ততা দেখে মৌংপেও ব্যবস্থা করে দিল।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আরণ্য পর্বত-চারণের। অরণ্য এখানে আদিম। শাল, সেগুন, বাওয়াব আর রবার গাছের সমারোহ। এরা যেন সৃষ্টির প্রথম ঊষার স্পর্শ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পর্বত এখানে দুর্বিনীত, দুরধিগম্য। মাঝে মাঝে মগ বসতি, বিচিত্র তাদের জলটুঙ্গি ঘর। এই নিবিড় ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে ডাক-পিযাদা ঘণ্টি বাজিয়ে ছোটে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার পথ ছেড়ে আড়ালে লুকোয। আর তারই মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ভেসে ওঠে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত ভগবান অমিতাভর দেউল।

অরণ্য যেখানে আদিম, মানুষ যেখানে বন্য, সেই তৃণসাচ্ছন্ন শৈলসানু থেকেই শান্তি, প্রজ্ঞা, অহিংসার অনিন্দ্য দীপালোক প্রজ্বলিত। আবাল্য নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি বিভূতিভূষণের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসীর প্রতি। মন ভরে যায় দেখে দেখে। সারাজীবন এমনি ঘুরে বেড়াও আর ক্লান্ত হলে এসে বসো এই দেউল-সোপানে, সব ক্লান্তি, সব বেদনা দূর হবে। আবার চলো পৃথিবীর পথে।

কিন্তু তিনি যে নোকরি নিয়ে এসেছেন। আবার ফিবতে হয়। মংডুতে এসে ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তার পরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা।

মৌংকেট ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসে হাজির।—চলে যাচ্ছো?

কী বলবেন ওকে বিভূতিভূষণ। যেতে তো তাঁকে হবেই।

মৌংকেটও তা জানে। বেঁধে রাখা যায় না। একটা চন্দনকাঠের পেটিকা তুলে দিল ও'র হাতে।

ট্রেন চলতে শুরু করল। অপসিয়মান প্লাটফরমে মৌংকেটে. রুমাল তখনও আন্দোলিত হচ্ছে। তাও যখন আব দেখা যায় না তখন পেটিকাটি খুললেন। মুক্তোর মত চকচক করছে অনেকগুলি সুন্দর ঝিনুক। প্রাণের সাগর থেকে তুলে আনা আশ্চর্য অনুরাগের ঝিনুক।

॥ নয় ॥

ছ' মাসের চাকুরি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়িয়ে আবার সেই অশ্বিনীবাবুর অতিথি-শালায় উঠলেন বিভূতিভূষণ। হাসিমুখে এগিয়ে এসে স্বাগত জানালেন নীরদ চৌধুরী।

গো-রক্ষার দায় নামল বটে, আত্মরক্ষার কী করা? না, ধার্মিক লোক হয়েও একুই

সঙ্গে 'গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ' কোন স্থায়ী কোম্পানী করেননি কেশোরামজী। অর্থাৎ পুনর্মূষিকঃ।

অতঃপর সকালে উঠে দুবন্ধুর কাজ খবরের কাগজে 'কর্মখালি' খোঁজা। দুপুরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। সন্ধ্যায় আর মন টেকে না। গোলদীঘির বা কারজন পারকের ওই এক মুঠো মুক্তি। তারপর ডিসেম্বরের সন্ধ্যা সেখানে কুয়াশা ছড়ায়। আবার মেস। নীরদেরও ইতিমধ্যে তিনটে চাকরিতে ইস্তফা হয়েছে। তাহলেও ওঁর তাগিদ কম।

ইতিমধ্যে তৃতীয় গল্প ছেড়েছিলেন প্রবাসীতে—'মৌরীফুল'। সে বছরের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে গল্পটি শুধু ছাপাই হল না, প্রবাসী কর্তৃপক্ষের বিঘোষিত পুরস্কারও অর্জন করল। সালটা বাঙলা তের শ' ত্রিশ। মর্যাদার দিক থেকে এটা বিরাট ব্যাপার হলেও মুদ্রার হিসাবে নগদ মাত্র পঁচিশ টাকার ব্যাপার। ক'দিন চলবে এতে? অথচ চট করে একটা চাকরি দিচ্ছে কে। দু'একটা টুইশানি হলেও হয়।

এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটা দেখলেন। গৃহশিক্ষক চাই। পঞ্চম মানের একটি মা-বাপ-হারা দুরন্ত বালককে স্নেহের শাসনে বাগ মানিযে পড়াতে হবে। বেতন ভালো।

জাত-শিক্ষকের কাছে এ একটা চ্যালেঞ্জ। তবে তা গ্রহণ করতে চাইলেও সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। বিজ্ঞাপন দিযে যাঁরা মাস্টার বাখবেন তাঁরা সাহেবসুবো, বিলেত-ফেরতের খোঁজ করবেন। কী আছে তাঁর?

আছে যা তা হল মনের বিশ্বাস আর প্রয়োজনের তাগিদ। দরখাস্ত একটা ঠুকে দিলেন। যোগ্যতার পরিচয় দিলেন, বি. এ. অভিজ্ঞ শিক্ষক, আর প্রবাসী-পুরস্কার-প্রাপ্ত 'মৌরীফুল' গল্পের লেখক বলে। মাস্টারির ব্যাপারে ওই গুণ জরুরি নয় নিশ্চয়। তবু ভাবলেন 'অধিকন্তু ন দোষায়'।

বি. এ. এম. এ. সাহেবসুবোর অনেক দরখাস্ত পেলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। পাথুরে-ঘাটার বিখ্যাত জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের পুত্র রমানাথ তস্য পুত্র সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। কী ভেবে অতগুলির মধ্যে বাছাই করে দু'জনকে তিনি ইন্টারভিউতে ডাকলেন। একজন, শিক্ষিত স্পোরটসম্যান মোহনবাগানের তখনকার নামকরা খেলোয়াড় রবি গাঙ্গুলি। অপরজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা নয়, নগণ্য একটি নাম 'মৌরীফুল'—তাঁর গল্প।

ইতিমধ্যে গল্পটা পড়লেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। গ্রামের মেয়ে ও শহরের মেয়ের সাক্ষাৎ-কারের ঘটনা। নায়িকা একটি গ্রামের মেয়ে। শ্বশুরবাড়িতে সে ছিল সামান্য স্নেহের কাঙাল। যা না পেয়ে হল একগুঁয়ে, ঝগড়াটে। কিন্তু ওই স্নেহটুকু পেলে সে যে কী হতে পারত তা সে প্রমাণ করে গেল একটি দিনের নৌকাযাত্রায়। শ্বশুরবাড়িতে সে পরিচয় রয়ে গেল অজ্ঞাত। তাদের কাছে সেই মৌরীফুলের মত মেয়েটির পরিচয় অলক্ষ্য। এই ট্র্যাজেডিই গল্পটির মূল। মুগ্ধ হলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু গল্পটি পড়ে।

বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়িতে জ্ঞানী-গুণী-শিল্পীদের আসর বসে। সারা ভারত থেকে আসেন ওস্তাদ গাইয়ের দল। সাহিত্য-বাসর বসে প্রাসাদের শ্বেতমর্মরের উপর ফরাস বিছিয়ে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সাহিত্যের মহড়া দেয় হাতের লেখা ম্যাগাজিন বার করে। সুতরাং মৌরীফুলের লেখকই মনোনীত হলেন।

উনিশ শ' তেইশ, জানুয়ারির প্রথম দিন বিভূতিভূষণ গৃহশিক্ষকরূপে খেলাতচন্দ্র ঘোষের পাথুরেঘাটার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

ফটকে বন্দুকধারী নেপালি সান্ত্রী। সুউচ্চ নহবতখানা পেরিয়ে অট্টালিকার শ্বেত-মর্মরমণ্ডিত দীর্ঘ সোপানশ্রেণী। গ্রীক ধাঁচের নেপচুন, জুপিটার আদি নানা ঢঙের মর্মরমূর্তি দু'পাশে শোভা পাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে কর্মচারীদের ব্যস্ত আনাগোনা, সব মস্ত মস্ত ব্যাপার। ওপাশে ঘোড়াশালে তাজা আরবি ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করা হচ্ছে। প্রায় হাজার পায়রা উড়ছে ঘুরছে বাড়িতে। তাজ্জব কাণ্ড!

বিভূতিভূষণ সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠছেন। উপর থেকে তরতর করে নেমে এলো দশ বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে।—আপনিই তো মিতে মাস্টার?

মিতে মাস্টার! সব কিছুই চমকে উঠবার মত। বিভূতিভূষণ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কিশোরটি ঠিক লোক ধরে ফেলেছে এমনি ঢঙে ওঁকে হাত ধরে উপরে নিয়ে চলল।

কাকে খুঁজতে কাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। আস্তে টেনে পা তুলতে হচ্ছে বিভূতিভূষণকে। ছেলেটিরও বোধহয় খটকা লাগল। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, আপনার নাম তো বিভূতি ব্যানারজি? হাঁ, হাঁ, এ-বাড়ির নতুন মাস্টার। তুমিই কি—?

হাঁ, আমাকেই তো পড়াবেন। আমার নামও বিভূতি, বিভূতি বোস। মামা বলছিলেন, তোর মিতে মাস্টার। তাই তো বললুম।

বাঃ, সত্যিই তাহলে মিতে হলাম দু'জনে। বেশ হল।—বিভূতিভূষণ আদর করতে গিয়ে করকম্প করে বসলেন ছেলেটির সঙ্গে।

উপর থেকে এগিয়ে আসছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। বললেন, হাঁ, মিতেই এবার আনলেম। মাস্টার তো অনেক হল, এবার মিতে। তাই বলে, মানতে হবে কিন্তু।—ভাগনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন। তারপর শিক্ষককে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করলেন। প্রণত হল কিশোর।

বাগবাজারে বলরাম বসুর ঘরে বিয়ে হয়েছিল সিদ্ধেশ্বরবাবুর বোনের। একটি পুত্রসন্তান রেখে সে বিদায় নিল পৃথিবী থেকে। কিছুদিন পরে পিতাও। সেই হতভাগ্য বালক বিভূতি। মামাবাড়িতে সেই থেকে সে আছে মামা-মামীর স্নেহচ্ছায়ায়। অসম্ভব দুরন্ত। কিন্তু পিতৃমাতৃহারা এই হতভাগ্য শিশুকে শাসন করতেও হাত ওঠে না কারো। সিদ্ধেশ্বরবাবু বোঝেন, শাসন দরকার। কড়াও হন মাঝে মাঝে। আবার হারানো বোনের মুখটা মনে ভেসে ওঠে, ওর মুখে যেন তারই ছাপ; হাতটা আস্তে আস্তে নেমে যায়। ওই কাজটা তিনি মাস্টারকে দিয়েই সারতে চান। এ পর্যন্ত অনেক মাস্টার এলেন, চলেও গেলেন। কাজ হয়নি কিছুই। একে একে সকলে হাল ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু যেন প্রার্থনার সুরে বললেন আপনি আমায় হতাশ করে ছেড়ে যাবেন না মিঃ ব্যানারজি।

সেই শুরু দুই বিভূতির পালা। একজন অবুঝ, দুরন্ত, অভিমানী কিশোর; অন্যজন বয়সে বড় হলেও, মনে শিশুর সারল্য, হৃদয়ে আবেগের বন্যা। মিললও বেশ দু'জনে। দেখেশুনে সবাই থ। প্রায় ডজনখানেক মাস্টার পার করা ছেলে এই নতুন মাস্টারের এমন নেওটা হয়ে পড়ল কোন্ মন্ত্রে, কে জানে!

মন্ত্রই জানেন বিভূতিভূষণ। নীরস বস্তুতে রসের ভিয়েন দিতে জন্মগত দক্ষতা মহানন্দ-তনয়ের। কিশোর মিতেটিও তাতেই মজে' খেয়ালির কাছে ধরা পড়ে তার খামখেয়ালিপনা। এখন সে নিয়মিত পড়তে বসে। মুহূর্ত গোনে, কখন মিতে মাস্টার আসবেন। তিনি এলে উজ্জ্বল মুখে বইখাতা নিয়ে হাজির ছাত্র। পড়ার মজা পেয়ে

গেছে সে।

আর মজে গিয়েছেন বুঝি মাস্টারও। সেকেন্ড-মিনিটের ঢেউ পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা একটি ঘন্টার বন্দর ছুঁয়ে আর এক বন্দরের দিকে পাড়ি জমায়—শিক্ষক-ছাত্র খেয়াল থাকে না কারও। সময়ের সাগরে দুটি প্রাণপদ্ম ভাসে।

ঠিকানাটা মিরজাপুরের মেস-এ থাকলেও, থাকাটা এখানেই হচ্ছে প্রায়। পাঠ্য তো আছেই, মাঝে মাঝে গল্প। বাইরে যখন ঘোরেন তো জানার আর সীমা নেই। কলকাতার জীবনে জানার সীমা বাড়াতে বই-ম্যাগাজিন পড়াটা এক প্রবল নেশা হয়েছে বিভূতি-ভূষণের। তা থেকে সহজ করে গল্প বলেন মিতেকে—পক্ষিম্বীপ, সাগরতলার নতুন জগত, কোমোতো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি, আমেরিকার কাঠবিড়ালীর আশ্চর্য ঘুম, এনজিনবিহীন এরোপ্লেন, কতো কতো ভূগোল-বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী।

আবার কোন কোন দিন রাত নেমে এলে, কলকাতার আকাশে যখন অনেক তারার সমারোহ ছাতের 'পরে তখন দুই বিভূতির অসীম-রহস্য উন্মাটনের আসর। স্টারস অ্যান্ড প্লানেটস বইখানা কিনে নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মিলেয়ে তারালোক চেনা হয। খুলে দেন রূপকের অবগুণ্ঠন।

বৈশাখী সন্ধ্যায় উত্তর আকাশে জ্বলজ্বল করছে ধ্রুবতারা, দক্ষিণে দ্যাখো কুশ-মণ্ডল, পুবে বসে আছেন দেবতাদের গুরুমশাই বৃহস্পতি, খুব জ্ঞান কিনা তাই অতো দূর।

খুব জ্ঞান কী রকম? ছাত্রের উৎসুক প্রশ্ন।

মাস্টার অমনি বৃহস্পতি-শুক্রের গুরুগৃহে লেখাপড়ার কাহিনী বলবেন। বলবেন, পশ্চিম আকাশে ওই যে লাল টকটকে—ওই হল মঙ্গল। ওখানে মানুষ যেতে চেষ্টা করছে।

মানুষ যাবে? কী করে? উত্তেজিত ছাত্র।

শিক্ষকও আবার বিজ্ঞানবিচিত্রার কথা পাড়েন।

এমনি করে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম—আকাশের চতুর্দিকে তারার মালা বেয়ে ঘুরে বেড়ানো।

এ-রকম রোমাঞ্চময় আসর আর নিভৃত রাখা যায় না। সিদ্ধেশ্বরবাবুর ভাইপো মন্মথ, আর এক ভাগনে শীতল, সিদ্ধেশ্বরবাবুর ভাই অক্ষয়বাবুর মেয়ে ছোট বুড়ি, যার পোশাকি নাম স্মৃতি—সেও পা টিপে টিপে সে-আসরে হাজির হয়ে যায়। ওদের সেদিকে খেয়াল নেই। ধনুর্বান হাতে বিরাট কালপুরুষ, পাখামেলা প্রজাপতি, লাঙলের ফলার মত সপ্তর্ষি। মুনিদের নাম মুখস্থ করে নাও—ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, মরীচি আর বশিষ্ঠ।

ছাত্র যদি বলে মুখস্থটা পরে হবে, শিক্ষক অমনি গল্পের টোপ ফেলবেন। বলবেন, ওই যে বশিষ্ঠ, তার পাশেই কে আছে জানো, তার বউ অরুন্ধতী। সে কী করে ওখানে গেল?

কী করে? সমস্বরে গোপনে আসা সদস্যরাও প্রশ্ন করে ফেলে। শিক্ষক বলেন, নামগুলি মুখস্থ না হলে সে গল্প শোনা বারণ। অগত্যা সবাই মিলে নামগুলি মুখস্থ করে। তারপরে শোনে বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর গল্প।

গল্প আছে কতো তারার। স্বাতী তারা সারা রাত কাঁদে, আর তার চোখের জলই ঘাসে পড়ে শিশির, ঝিনুকে মুক্তো—বলেই স্মৃতির গলার মুক্তোমালাটা নেড়ে দেন।

তা তো জানতুম না, সবাই বিস্মিত। কিন্তু ও কাঁদে কেন সারারাত?

তাও জানো না, ও তো খুব ছোট, মাকে হারিয়ে কাঁদে।

সে করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে সবার চোখেই জল আসে, বক্তার চোখেও।

স্মৃতি বলবে, চাঁদের গল্প বলুন।

প্রশ্ন হবে, চাঁদ ছেলে না মেয়ে, আগে বল।

মেয়ে। একবাক্যে সবার উত্তর।

না, অত্রি ঋষির ছেলে হল চাঁদ। ওর বউ সাতাশ জন।

সব্বোনাশ, অতগুলো বউ পেলো কোথায়?

সবাই ওরা দক্ষরাজের মেয়ে—রোহিণী, বিশাখা, ভরণী, আর্দ্রা, উত্তরফল্গুনী—নাম বলে যেতে থাকেন।

স্মৃতির কৌতূহল, কাকে বেশি ভালোবাসে চাঁদ!

রোহিণীকে। তাকেই পাটরানী করে রাখল। দেখবে, চাঁদের পাশেই সেই তারাটি।

আর বউরা রাগ করে না?

তা আবার করে না। বাপের কাছে নালিশ লাগালো। তা নিয়ে কতো কাণ্ড! বলেই সেই সূত্র ধরে বিজ্ঞানের তত্ত্বে আসেন বিভূতিভূষণ। রাহুগ্রাসের রূপকরহস্য প্রাঞ্জল হয় ওদের কাছে।

কিন্তু ওরা সবাই যে মিতের এতো কাছে ঘেঁষে, এত মজা পায়, এটা কিশোর মিতের মোটেই পছন্দ নয়। তার মাস্টার—তার একলার। সেখানে ওদের নাক গলানো কেন?

ওদের জন্য বানিয়ে বানিয়ে এমন গল্প বলেন বিভূতিভূষণ যা পরে লিখে প্রবাসীতে পাঠান। তের শ' একত্রিশের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীর 'পুঁইমাচা' এমনি একটি গল্প। আগের মাসে বেরিয়েছে 'নাস্তিক'। পরের আষাঢ়ে 'অভিশপ্ত'। এগুলির প্রাথমিক রচনার অনেকটাই ওদের সামনে মুখে মুখে।

মন্মথরা এসে বায়না ধরে পারিবারিক হাতের লেখা পত্রিকা 'অবসরিকা'র জন্য গল্প নিয়ে যায়। প্রবাসীতে বেরোবার আগে পুঁইমাচা তাতেই প্রকাশিত হয়। ইশ, এ-রকম ভালো লেখা মিতে ওদের দেন কেন? ছাত্রের ভারি আপত্তি। মিতের গল্প নিতে, প্রথম কথা, স্মৃতি-শীতল-মন্মথরা ওর মাধ্যমে আবেদন করে না। দ্বিতীয় কথা, মিতের লেখা কিনা ছাপার অক্ষরে বেরোচ্ছে, তিনি কেন ওদের হাতেব লেখা পত্রিকায় গল্প দিতে যাবেন? এ নিয়ে স্মৃতিদের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, মাস্টার তাব একলার। তারপরে মিতেকেই বারণ করে—ওদের লেখা দিতে পারবেন না।

তাই হবে। বিভূতিভূষণও কথা দেন তার মিতে-ছাত্রটিকে। না কথা দিলে যে অনর্থ হবে তা তিনি জানেন। আর পড়তে বসবে না তো বটেই, অভিমানে হয়ত কথাই বলবে না। তখন কেমন করে মান ভাঙাবেন, মন পাবেন?

এ-কোন আশ্চর্য মায়া? কেন এমন হয়? কত মুখ, কত দুঃখ-সুখ, ভালোবাসা, ভালো লাগা, মনের আকাশে ভেসে ওঠে। তারপর স্মৃতির চন্দ্রাতপ থেকে কতকগুলি অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল মুহূর্তের তারা ও'র চারদিকে খসে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে মুঠো মুঠো ছাইয়ের মত। সেই বেদনাবিধুর লগ্নে মনে মনে হয়ত শপথ নেন, না, আর নয় এ পালা। কিন্তু মনের মালিক কেউ একা নয়। তাই বেলাশেষে পুরবীর করুণমূর্ছনা জেনেও, ভোরের বাঁশি আশাবরী বাজায়। এমন করে কে বাজায়, কে জানে!

আর পড়ব না আজ, এবার গল্প। বই গুছিয়ে বসল ছাত্র।

না, গল্প নয়, পড়ো। শিক্ষক শক্ত হতে চেষ্টা করেন।

না, না, না। ছাত্র মাথা নাড়ে। আজ পড়তে তার ঘোরতর আপত্তি।

তাহলে আমি ভীষণ রাগ করব কিন্তু। রাগত ভাব শিক্ষকের।

ঈ-শ্-শ্। ছাত্র বিভূতিভূষণের হৃদয়কে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে।

এ-জিদ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। হাতটা তোলেন ওর কানের কাছে।

অমনিই হয়ে গেল। টসটস করে জল ঝরতে শুরু করে ছাত্রের চোখ দিয়ে। মাস্টারের হাতও অজানতে নেমে আসে অপরাধীর মত।

নায়েব-গোমস্তারা কাণ্ড দেখে তাজ্জব। ওই ছেলেকে মানুষ করবেন এই মাস্টার? তাহলেই হয়েছে! আগের মাস্টারগুলো গিয়েছে ওর বজ্জাতিতে। এ যাবে দেখছি চোখের জলে ভেসে!

সিদ্ধেশ্বরবাবুর কানেও এসব কথা ওঠে। মাঝে মাঝে তিনি বলেন, আমরা তো হদ্দ হয়ে গেলাম বিভূতিবাবু। আপনি একটু ধমক-ধামাক লাগান দেখি।

কষেই ধমক দিলেন বিভূতিভূষণ। ছাত্র গুম মেরে রইল। মনে হল ওষুধ ধরেছে। পরদিন পড়াতে এসে শুনলেন, গতকাল থেকে ছাত্রের প্রায়োপবেশন চলছে। জলস্পর্শ পর্যন্ত বন্ধ। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও যখন ছাত্রের মুখ ফেরানো গেল না, তখন উঠে দাঁড়ালেন, চললাম, আর আসবো না, বকবোও না কোনদিন।

ব্যাস, ওই একটি কথায় মন্ত্রের মত কাজ হল। কেঁদে ফেললে ছাত্র,—তবে আপনি ওদের কথায় আমাকে বকেন কেন? আপনি চলে গেলেই ওরা দাঁত বার করে হাসে।

ও, তাই বলো। অতঃপর সন্ধি। এর পর যা হবে, তা কেবল দুই মিতের মধ্যেই বোঝাপড়া। তৃতীয় ব্যক্তিকে আমল দেওয়া হবে না।

কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যাকরণে ইংরাজির থারড পারসন অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষই যে প্রথম পুরুষ! সিদ্ধেশ্বরবাবুকে কিছুই গোপন রাখতে পারেন না তিনি। সমস্যাটা তাঁকে জানালেন বিভূতিভূষণ। চিন্তিত হলেন সিদ্ধেশ্বরবাবুও। শাসনটা যে একান্তই দরকার। ও ছেলের লগুড় প্রয়োজন. সেই নির্মম কাজটা নিজেরা না পেরে এই সাহিত্যিক মাস্টারটির কাঁধে চাপানোর অর্থ বেচারিকে কষ্ট দেওয়া। অথচ এ-রকম দরদী ও সৎলোককে হাতছাড়াও করতে চান না তিনি।

বিভূতিভূষণের অন্তর্লীন শিক্ষক এবং সাহিত্যিক দুই সত্তাও দ্বন্দ্বের মুখো-মুখি উপনীত। কী করা যায়?

উপায় একটা হল শেষ পর্যন্ত। নরেন্দ্রনাথ সিংহ নামে এক কড়া মাস্টার ধরে আনা হল ওকে শাসন করতে। তিনি যতটা সম্ভব পড়াবেন। আর বিভূতিভূষণ তো রইলেনই। তবে তাঁর মুখ্য কাজ হল অন্য। বিশ্বাসী লোকের দরকার ছিল জমিদারি সেরেস্তায়। সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর সেকরেটারি করলেন বিভূতিভূষণকে। বেতনও বাড়লো। ত্রিশের জায়গায় চল্লিশ। ভাগনেকে বোঝানো হল—তোর মিতে-মাস্টার তো রয়েই গেলেন! বিভূতিভূষণও সেই কথা বোঝালেন মিতেকে।

কাছারিতে রোকড় খতিয়ান কবুলিয়ত পাট্টা পরচা দলিল দস্তাবেজের ভিড়ের মধ্যে কাজ করছেন বিভূতিভূষণ। হঠাৎ কিশোরকণ্ঠের সাড়া জাগে— মিতে, গল্প!

হাতের কাগজ ফেলে বিভূতিভূষণ হেসে বলেন, ভয়ানক ব্যস্ত এখন। মস্ত মস্ত সব হিসাব। একটু এদিক-সেদিক হয়ে গেলে সব্বোনাশ হয়ে যাবে। আজ বরং নতুন মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ো গিয়ে, যাও।

নতুন মাস্টার? কিশোর ঠোঁট উল্টায়, সে তো সেংগো।

নরেন সিংহকে আড়ালে 'সেংগো'ই বলে ও।

ছিঃ, কতো ভালো মাস্টার উনি। বলে উঠতেই হয় বিভূতিভূষণকে।

অন্য কর্মচারীরা মুখ তুলে তির্যক হয়ে তাকায়, হাসে, হয়ে গেল এই আজকের মত। এর পরে মহালের হিসেবের খাতায় রূপকথার গল্প শুরু না হয়।

পেসাদ, রামপেসাদ।—টিপ্পনী কাটেন কোন প্রবীণ।

কথাটা মিথ্যে নয়। সেরেস্তার কাজের ফাঁকে ফাঁকেই বেশ কয়েককটা গল্প তৈরি হয়ে গিয়েছে ও'র।

আবার কাণ্ড দ্যাখো। ওই শিং ভাঙা ছাত্তর, বই ছুঁতে বিছুটি পড়ে। কিন্তু মিতে-মাস্টারের গল্প আস্ত মুখস্থ করে বাড়িময় শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। যেন ওরই লেখা!

কাজে বসে খাতা-পত্র দেখছেন বিভূতিভূষণ। কানে গেল, কে যেন বলছে, ওঃ ছেলেটাকে যা পেটান পেটাচ্ছে নতুন মাস্টার।

আহা, ননীর শরীর। খাতাপত্র রেখে ছুটে উপরে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ। দেখেন, সব মিথ্যে! নরেনবাবু হেসে বললেন, না মশাই, কেউ মারছে না। নেহাৎ মজা দেখতে কেউ হয়ত ওই কথা বলেছে।

ছি ছি। ভারি লজ্জা হল বিভূতিভূষণের এভাবে ধরা পড়ায়। তিনিও তো শিক্ষক, অথচ একবার মনে হল না, এভাবে ছুটে আসা অশোভন। এটা অন্য শিক্ষকের এখতিয়ারে অনধিকার প্রবেশ! না। এ বন্ধন ছিন্ন করো, দূরে কোথাও পালাতে হবে তাঁকে।

জমিদারির নথিপত্রের মধ্যেই দূরেব হাতছানি পান মাঝে মাঝে। নিবিড় অরণ্য, দিগন্ত বিস্তৃত শৈলমালা, ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ী দেহাত, দেহাতী মানুষ—সে বুঝি অন্য ভুবন। কিন্তু ভ্রমণকাহিনীও উসকে দিচ্ছিল এই দিকটাকে। তার অন্যতম শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। দিনলিপি তৃণাঙ্কুরে আছে—এই বইখানার কথা—'সেই পুরনো বইখানা সিদ্ধেশ্বরবাবুর অফিসে কাজ করার সময় টেবিলের ড্রয়াবে যেখানা লুকনো থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে 'নযে পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম।'

সিদ্ধেশ্বরবাবুও কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন একটা কথা। সুপারিনটেনডেনট সারদাকান্ত চক্রবর্তীর চিঠিগুলি ইদানীং তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ক্রমাগত আয় হ্রাস পাচ্ছে। কোথায় যেন পুকুরচুরি হচ্ছে মহালে। সুপারিনটেনডেনট সারদাবাবু একজন বিশ্বস্ত সহকারী চান। যোগ্য বেতন দিতে সিদ্ধেশ্বরবাবু রাজি। তাই বলে যোগ্য আর সৎ লোক তো চাইলেই জোটে না। মাঝে মাঝে মনে হয়. যেতে রাজি হবেন কি বিভূতিভূষণ? অতি সাবধানে প্রস্তাবটা করতেই যেন তা ল্ফ নিলেন তিনি। মাইনে আরও বেশি—পঞ্চাশ টাকা। সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আপনি আমাদের ভাগল-পুর জঙ্গল মহালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাব হযে গেলে আমার একটা মুশকিল আসান হয়। মুশকিল আসান মাস্টারেরও।

ইংরাজি উনিশ শ' চব্বিশের জানুয়ারির শেষে. শীত-সন্ধ্যায় ভাগলপুরে এসে নামলেন বিভূতিভূষণ জঙ্গল মহালের কাজ নিয়ে।

প্রথমে এসে উঠলেন ভাগলপুর শহরে রমানাথ ঘোষের সদর কাছারি 'বড়বাসা'য়। শহরের একপ্রান্তে মোগসর পল্লী, সেখানকার বুড়ানাথ রোডের উপর জঙ্গল মহালের সদর কাছারি দোতলা পাকাবাড়ি এই 'বড়বাসা'।

নগরীর এই প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিনী গঙ্গা। ওপারে দিগন্তব্যাপী বালুচর। দিকে দিকে তালবন, সেখানে চারদিক পাহাড়ে ঘেরা সাজুঙ্গী জলাশয়, তাকে বেষ্টন করে আছে নিবিড় অরণ্যানী। আনন্দে ভরে গেল নবাগতের মন। ক'দিন ধরে কেবল ঘোরেন

আর দেখেন।

পশ্চিমে একটু গেলেই মহাবীর কর্ণের রাজধানী 'চম্পানগর' তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে বর্তমান। কোন অপরাহ্নে সেখানে বসলে যেন মহাভারতের যুগে চলে যাওয়া যায়।

তবে সেজন্য তাঁকে পাঠাননি সিদ্ধেশ্বরবাবু। তাঁকে যেতে হবে নগরী ছাড়িয়ে প্রায় পনের ক্রোশ দূর থেকে যে জঙ্গল মহাল শুরু, সেইখানে। বুড়ানাথ রোডের দোতলা পাকাবাড়ি নয়, সেখানে জঙ্গলের অভ্যন্তরে খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়ালের কাছারিতে থাকতে হবে।

উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষেণপুর, পূবে ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহার আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত এই জঙ্গল মহাল। দিক্-দিশে-হারা অরণ্য-প্রান্তর, দূর-বিসর্পী শৈলশ্রেণী, জনাই ক্ষেত, মকাই ক্ষেত, চিনাঘাসের দানাভোজী সাঁওতাল আর নানা দেহাতী মানুষ। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে। ডাক আসে হপ্তায় একবার মাত্র। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। জাহ্নবীর শরীরটা ভালো নয়। ভগ্নীপতিকে চিঠি দিয়ে বোনকে ক'দিনের জন্য নিয়ে এলেন এখানে তার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। ওর সঙ্গে একটি কোলের মেয়ে, উমা। জাহ্নবীর শরীরটা ভালোই হল ক'দিনে। বোনকে কাছে পেয়ে ভাল লাগলো বিভূতিভূষণেরও। কিন্তু সংসারী মানুষ জাহ্নবী ক'দিন আর থাকতে পারে। তাছাড়া পাড়াপ্রতিবেশীর সেই পরিচিত পরিবেশ কোথায় পাবে সে এখানে? মাসখানেক পরে চলে যেতে হল। ছোট ভাই নুটুও আসত মাঝে মাঝে। দুভাইয়ে ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে বের হতেন। কলেজ খুললে নুটুকে চলে যেতে হতো।

জঙ্গল আবাদ, জমির বিলি বন্দোবস্ত, তহসিলের তহবিল ঠিক রাখা, মাইলের পর মাইল ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে মহালের তদারকি এই সব কাজ। শহুরেদের বেশি দিন এ-সব ভালো লাগার কথা নয়, দু'দিনেই দুত্তোর বলে হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু বিভূতিভূষণকে নেশায় পেয়ে বসল। ইসমাইলপুরে কাছারির আমলা রামজোড় আর ছোটু সিং-এর গলদঘর্ম সহকারিতায় ধীরে ধীরে কোনক্রমে কিছুটা ঘোড়ায় চড়া শিখে নিলেন। নতুন শেখার উন্মাদনায় কারণে-অকারণে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। শুধু রামজোড় আর ছোটু সিংই নয় সরণপ্রসাদ, যুগলপ্রসাদ, কাছারির এমনি আমলারা সবাই এই নতুন বাবুর উৎসাহ দেখে অবাক। মোটেই দিশে পাচ্ছেন না সওয়ার হতে, তবু ঘোয়ার নেশাতেই ঘোড়ায় চাপা। অবাক কাছারির সুপারিন-টেনডেনট সারদাকান্ত চক্রবর্তীও, নবাগত সহকারীটির বন-পাগলামি দেখে। বুঝলেন, জঙ্গল একে পেয়ে বসেছে। তবু ঘোড়া নিয়ে চড়াই-উৎরাই করতে সাবধান করে দিলেন।

কে শোনে সে কথা। বনগ্রামের বারাকপুরের ছোট ছোট বনঝোপে তাঁর কৈশোর লালিত, তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবনকে উদ্দীপিত করে তুলছে এই উদ্দাম অরণ্য; উদার প্রান্তর, উদ্ধত পর্বতমালা। মরুম ছড়ানো রাঙা মাটির উপর দিয়ে তাঁর ঘোড়া ছোটে। কখনও কলবলিয়া বা কোশী নদীর তীরে তীরে, কলাই ক্ষেত, খেরি খামারের আর হলুদ-রঙের বন্যাঢালা রাইচি জমির আল বেয়ে চলা। মাঝে মাঝে ঢালু দূর্বাঘাসের মাঠ, ফুলে ফুলে ভরা কাশবন, উলুখড় ধুতরার ঝাড়, জরদা রঙের সন্ধ্যামণি ফুলমেলার মধ্য দিয়ে অপূর্ব রূপের ভুবনে মনটা যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। ভালো লাগে কেঁদবন, শালবন, পলাশ-বনের মধ্য দিয়ে, সুখাটিয়া কুলবনে ডুব মেরে আবার এগোনো। অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, মহালিখারূপের অনুচ্চ শৈলমালায় অস্তসূর্যের আগুন জ্বলে, বটেশ্বরের নীল পাহাড়ের

চূড়ায় আবির ছড়ানো—আহা, মরি, মরি, প্রকৃতির এত রূপ! এত রঙের রামধনু, ক'জনে দেখতে পায়। কতরূপে অপরূপ এই নয়নবিমোহন ছবি। এক কথায়, ইসমাইলপুর, নাঢ়া বইহারের নিবিড় অরণ্যমায়া ধীরে ধীরে তাঁর সামনে ঘোমটা খুলতে লাগল। তার 'বনচূড়ারঞ্জিত প্রত্যূষ, বৈরাগ্য-বাউল দ্বিপ্রহর, বৃশ্চিক রাশি ওঠা গহন সন্ধ্যা-কাশ, গভীর রাত্রির অভেদ্য অন্ধকার কিংবা অসহ্য আলোকপ্লাবন', আর তাকে বেষ্টন করে আছে আদিম অসম্বৃত অরণ্যানী। মাঝখানে বিহ্বল বিভূতিভূষণ। এ রূপ যেমন সুন্দর, শৌর্যময়, তেমনি ভয়াল, ভীষণ মনে হয়। মনে হয় প্রকৃতি যেন অতিপ্রাকৃত হয়ে ওঠে কখনো কখনো। এমনও তার মনে হয়, 'ঘর দুয়ার বেঁধে যাকে সংসার করতে হবে এ রূপ তার না দেখাই ভালো। প্রকৃতির সে মোহিনী রূপের মায়া মানুষকে ঘর-ছাড়া করে।' সে রূপের নেশায় তবু পাগল হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ান তিনি নির্জন নিশীথ প্রান্তরে। স্বরচিত কবিতার ব্যঞ্জনায় রূপ পায় তাঁর অভিজ্ঞতা—

'রজনীর অন্ধকারে
অগণিত তারকার দ্যুতি
গগন অঙ্গনে,
কী বিস্ময়ে হেরিয়াছি
পুলকিত একা সারা রাতি
মুগ্ধ শিহরনে।'

শিহরনের কথা বলছেন বটে, আনাড়ী, অনভিজ্ঞদের সাবধানও করে দিচ্ছেন।

'গভীর রাত্রে খরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ ধূ জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়। একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না, আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা তাহাদের পক্ষে সে রূপ না দেখাই ভালো, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।'

সেই অরণ্যপ্রান্তে একটি জায়গা ছিল আশ্চর্য মায়াবৃত। বিহঙ্গ কাকলীমুখর, লতাপুষ্প-সুরভিত একটি বনকুঞ্জের মধ্যে ছোট সরোবর, নাম—সরস্বতীকুণ্ডী। 'পুরাষত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্'। কোশী নদীর প্রাচীন খাদ মজে নাকি এই সরোবর সৃষ্টি। সরোবর ঘিরে গাছে গাছে শ্যামা, শালিক, কুলো সিল্লি, বনটিয়া, বাজ বউরি, হরটিট—শত পাখির কলরোল। নিথর জলে স্পাইডার-লিলির ফাঁকে ফাঁকে মানিক পাখি, রাজহাঁস রেখা টেনে চলে। বিভূতিভূষণও একটি হংসলতা লাগিয়ে ছিলেন সেখানে। আর কী এক অলক্ষ্য আকর্ষণ যেন তাঁকে সব কাজ ছাড়িয়ে ওইখানে টেনে নিত।

সেরেস্তার প্রবীণ কর্মচারী আস্রফি টিনডেল একদিন সাবধান করল তাঁকে, হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, যাবেন না, রাত্রে ওখানে হুরী-পরী নামে।

হুরী-পরী! বিভূতিভূষণের কৌতূহল।

আস্রফি বোঝায়, ও এক ধরনের জীন-পরী। এ দেশে ওনাদের বলে ডামাবাণু। বোমাইবুরু জঙ্গল দিয়ে জ্যোৎস্নারাতে ঘোড়ায় করে ফিরবার সময় আস্রফি নিজের চোখে দেখেছে, বটগাছতলায় ওরা হাতে হাত মিলিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে।

তাই নাকি? এ-রকম পরিবেশে আস্রফির গল্প ভালোই লাগে শুনতে। আরও উসকে দেন; তা সরস্বতীকুণ্ডীর জলেও ওরা নামে নাকি?

নামে না হুজুর? ওখানেই তো ওনাদের আড্ডা। আস্রফির চোখ চকচক করে।—জ্যোৎস্নায় ওরা কাপড় খুলে রাখে পাথরের উপর, তারপর জলে নামে। আর, সে সময়

যে ওদের দেখতে পায় তাকে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে।

আস্রাফির কথাটা একবার যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে হয় বিভূতিভূষণের। একদিন গভীর রাত্রে ফিনকি-ফোটা জ্যোৎস্নায় সরস্বতীকুণ্ডীর পারে হাজির। কী দেখলেন? হুরী-পরী-ডামাবাণুদের? না। তবে সেই দিগন্তব্যাপী থৈ-থৈ জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবদের অবতরণের কথা মনে হল তাঁর। ফিরে এলেন ঘোরা ছুটিয়ে।

ছোটু সিং বলে বুনো মোষের দেবতা টাঁড়বারোর কাহিনী। গহিন রাতে বুনো মোষের জেরা অর্থাৎ দল একটা জায়গায় জল খেতে আসে। মোষ ধরবার জন্য সেখানে খানা কেটে ফাঁদ তৈরি হল। রাত গভীর। ওরা মুহূর্ত গুনছে কখন আসবে মোষ। হঠাৎ সাড়া, আসছে...এগোচ্ছে। এবার—এবার নির্ঘাত গর্তে পড়বে। কিন্তু এ কী! গর্তের সামনে এক বিরাট দীর্ঘাকৃতি কালোমতো পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে মূর্তি যে মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকছে। বুনো মোষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক পালালো।

ঘটনা যাই হোক, কিন্তু এ-রকম কাহিনী ওই পরিবেশে নিঃসন্দেহে শিহরন জাগায়। বিভূতিভূষণের কথা 'সত্যি মিথ্যে জানি না, এ কাহিনী শুনতে শুনতে আমি অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ময় খড়্গধারী কালপুরুষের দিকে চাইতাম।'

বনের আদিবাসী গণু মাহাতো কাঁচা শালপাতার একটি লম্বা পিকা বা চুরুট সসম্ভ্রমে ও'র হাতে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গল্প করে উড়ুক্কু সাপের, জীবন্ত পাথরের। তারই সঙ্গে বলে বাঘের গল্প, মহালিখারূপ পাহাড়ের বনাকীর্ণ এলাকায় শঙ্খচূড় সাপের আড্ডার কথা। সেই সঙ্গে বলবে নিজেদের দরিদ্র জীবনের কতো কাহিনী। পার্থিবে-অপার্থিবে, প্রাকৃতে-অতিপ্রাকৃতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

বাইরের সভ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এ জগত। 'এখানকার আদিম অরণ্য-পর্বতের সঙ্গে মানুষগুলিও অভিন্ন। যীশুখৃষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন সেদিনও এখানকার এই লোকগুলি মহুয়া বীজ ভেঙে তেল বার করত, আজও তাই করছে। কতো সরল এরা, কতো গরিব, অথচ কী আনন্দময় উচ্ছলিত জীবনধারা।'

প্রথমেই গিয়ে দেখলেন দেশে অজন্মা, অভাবে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে একদল নেচে-গেয়ে—'রাজা লিজিয়ে সেলাম, ময় পরদেশিয়া।'

কী গান তারা গাইলো? কী তার মানে?

শিশুকালে বেশ ছিলাম। গ্রামের পিছনে পাহাড়েব কেঁদবনে পাকা ফল কুড়োতেম, মালা গাঁথতেম পিয়ালফুলের। জানতেম না ভালোবাসা কি।

একদিন কররাপাখি মারতে গেলাম পাঁচলহরী ঝরনার ধারে। হাতে বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি সেখানে এলে কুসুম-ছোপানো শাড়ি পরে, জল ভরতে। দেখে বললে, ছিঃ, পুরুষমানুষ কি সাতনলি দিয়ে বনের পাখি মারে।

লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, আঠা-কাঠি। বনের পাখি উড়ে গেল। মনপাখি কিন্তু বাঁধা পড়ল তোমার প্রেমে।

সাতনলি চেলে পাখি মারতে বারণ করে এ কী করলে তুমি আমার সখি?'

ওরা না খেতে পেয়ে নাচে গায়, সামান্য কিছু পেলেই খুশিতে গড়ায়, আনন্দে ভেসে বেড়ায়।

সব ছবির মধ্যে আর এক ছবি চমক দিয়ে ওঠে। 'বারাকপুরের ছায়াগহন বনকুঞ্জে এখুনি হয়ত কাকজঙ্ঘার থোলো থোলো রাঙা ফল দুলছে'। 'এমনি দিনে তিনি একদিন

কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে গিয়েছিলেন। লোটাইটোলার ব্রততী-বিতানে ফুলের মত জ্যোৎস্না দেখে ও'র মনে পড়ে, বারাকপুরের বনশিমতলাও এখন হয়ত জ্যোৎস্না ঝলমল। কাছারীতে বসে রাতে দিনলিপি লেখেন 'স্মৃতির রেখায়'। তখন মনে পড়ে 'কোথায় সেই মায়ের সাজানো ঘরখানি আর কোথায় এই আমলাকুন্ডী কাছারি!' ভেসে ওঠে আরও টুকরো টুকরো কথা 'কলকাতায় আমার ছাত্র বিভূতি এখন কী করছে? সেই ছাত্র বিভূতি, তার মামা জুতো মেরেছে বলে কান্না। সেই নয় বৎসরের বালককে কী ভালোবাসি।' মনে পড়ে আচার্য রায়কে 'জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি সে আচার্য পি সি রায়'। পিছনকে তিনি ভুলতে পারেন না। তারা তাঁর সহচর। সবার পিছনে সেই বারাকপুর তাঁর চেতনাকে মোহময় হাতছানি দেয়। গোলগোলি, ভোমরালতা, স্পাইডার, পলাশ আর শালমঞ্জরীতে সজ্জিতা বসন্তের লবটুলিয়ায় বসে 'স্মৃতির রেখায়' লেখেন 'বাংলাদেশে এখন বসন্ত পড়েছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবিলেবু ফুলের সুগন্ধ, সজনেফুল পড়ে আছে। আমের বউল, কচিপাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণ হাওয়া বইছে, কোকিল ডাকতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গলসন্ধ্যায়, শান্ত চোখে গৃহলক্ষ্মীদের আনা সন্ধ্যাদীপ...জানালায় ধূপগন্ধ...দেবতার মন্দিরে আরতি।'

মনে পড়ে 'দূরে আমাদের বাড়ি। মা'র সঞ্চিত হাঁড়ি কলসীগুলো পড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মা'র হাতের সজনেগাছটা এই ফাগুনদিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভরতি হয়ে উঠেছে।'

সুদূর ইছামতীর কোলে তাঁর মন চলে আসে। সেখানে তিনি আবিষ্কার করেন বনঝোপের মধ্যে কঞ্চিহাতে এক কিশোরকে। সে ওই শ্যামলের প্রতীক। আশ্চর্য, সে যেন তাঁরই সত্তা তবু, যতবার তাকে ধরতে যান সে যেন আড়ালে আড়ালে, পালিয়ে পালিয়ে, হারিয়ে যায়! কেন? কেন? আপন সত্তাকে তিনি আঘাত করছেন? ভাবতে ভাবতে চমকে ওঠেন। একটি গাছকে কেউ কাটবে, একটি লতা বা পাতা ছিঁড়বে কেউ, এ যার সহ্য হত না, সেই মানুষ, বৃত্তির জন্য, ক্ষুন্নিবৃত্তির দায়ে এ কী করছেন আজ? বন কেটে আবাদ! তাঁরই হাতে শ্যামলের হত্যা-কুঠার! বনের দেবতা কি তাঁকে ক্ষমা করবেন? বেদনাহত হৃদয়ের একটি ক্ষমা প্রার্থনা লিপিবদ্ধ হয় 'হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।'

বিভূতিভূষণ ভাবেন, বারাকপুরের সেই সত্তাটিকে ধরতে হবে, প্রকাশ করতে হবে সেই সত্যস্বরূপকে।

লেখার অভ্যাসটা ঠিক রয়েছে। ডায়েরি লিখছেন 'স্মৃতির রেখায়'। গল্পও দু'একটা লিখেছেন, ছাপিয়েছেন প্রবাসীতে। ছাত্র বিভূতিকে মুখে মুখে বলা পুঁইমাচার পর অভিশপ্ত এখানে বসেই কালি-কলমে রূপ দিয়েছেন। তবু সে তো ছোট গল্প। এপিকের মত তাঁর এ ইচ্ছাকে রূপ দেওয়া কি সহজ হবে!

ভাবনাটাকে উদ্দীপনা যোগানোর মত পরিবেশও পাওয়া গেল। পেলেন সদর কাছারি ভাগলপুর শহরে এসে।

শহরের এক প্রান্তে আদমপুরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবাসভবন। বাড়িটি শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-জড়ানো। উপেন্দ্রনাথ নিজেও সাহিত্যিক। সাহিত্যনেশাগ্রস্তদের নিয়মিত একটি আড্ডার শতরঞ্জি পড়ে তাঁর বৈঠকখানায়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথের প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী রায়বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস, তাঁর কনিষ্ঠ, কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গোপেন্দ্রনাথ দাস, সাহিত্যিক সুরেন্দ্র-

নাথ রায়, স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রমুখ। জায়গাটা বিভূতি-ভূষণের ভাগলপুর সদর কাছারির আস্তানা মোগশরপল্লী থেকে এক মাইলের কিছু বেশি দূরে। শহরে এসে ক'দিনের মধ্যে তিনি খুঁজে বার করলেন পীঠস্থানটি। সাহিত্য-রোগের ওই এক লক্ষণ, খুঁজেপেতে রোগী আরও পাঁচজন ব্যামোগ্রস্ত জুটিয়ে নেবেন।

উপেন্দ্রনাথও সাহিত্যব্যাধিগ্রস্ত এবং সমঝদার ব্যক্তি। রত্নটিকে আড্ডাধারীরূপে গ্রহণ করতে তিলমাত্র দ্বিধা করলেন না। তাঁর নিজস্ব একটি স্বীকৃতি—'একটি খাঁটি সাহিত্যানুরাগীর শিশুর মত সরল মন দেখে মুগ্ধ হলাম। এক বৈঠকেই আলাপ ঘনীভূত হল। তার ফলে অবিলম্বে তাঁকে আমাদের দলে ভরতি করে নিলাম।'

যে ক'দিন শহরে থাকেন, রোজ সন্ধ্যায় মোগশরপল্লীর 'বড়বাসা' থেকে মাইলটাক পায়দল করে আদমপুরের আড্ডায় হাজিরা দেন, আর রাত গভীরে ফেরেন। আড্ডাটির প্রধান আকর্ষণ সাহিত্যচর্চা। আর সে চর্চায় উৎসাহ যোগাতো উপেন্দ্রনাথের একটি স্বপ্ন—সাহিত্যের একটি মাসিক পত্রিকা বার করবেন তিনি। মাঝে মাঝে তার পরি-কল্পনাও চলে। তখন আসরটা বেশ সিরিয়স মেজাজ পায়।

গান ছিল আসরটির দ্বিতীয় আকর্ষণ। ভালো গাইতে পারতেন উপেন্দ্রনাথ। গান ভালো লাগে সকলেরই। বিভূতিভূষণের তো কথাই নেই। সারারাত বসিয়ে মজিয়ে রাখা যাবে গান দিয়ে। বাড়ির ভিতর থেকে উপেন্দ্রনাথের স্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় আনু-ষঙ্গিক আহার্য যোগানেরও ব্যতিক্রম ঘটত না। অতএব রাত কাটাতেও আর আপত্তির কারণ নেই।

কিন্তু এই গানের সূত্রে এমন একটি ব্যাপার ঘটে এই আদমপুরের আড্ডায়, যে রহস্যের কিনারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন বিভূতিভূষণ সারাজীবন।

স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ছিলেন আড্ডার অন্যতম সদস্য। একদিন দুর্ঘটনা ঘটল। টমটমে যাচ্ছিলেন, ঘোড়া বিগড়ে যায় হঠাৎ। গাড়ি সমেত উল্টে পড়লেন ভদ্রলোক এবং ওই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু।

ক'দিন ধরে তাঁর প্রসঙ্গই আলোচনা হচ্ছিল আসরে। ভদ্রলোক গানপাগল ছিলেন। তাঁর একটি প্রিয়গান ছিল 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি। বিশেষ করে এই গানটি তিনি প্রায়ই উপেন্দ্রনাথকে গাইতে বলতেন।

সেদিন আলোচনার মাঝখানে প্রস্তাব উঠলো, ওই গানটি দিয়েই এই সন্ধ্যায় ক্ষিতীশবাবুকে স্মরণ করা হোক। উপেন্দ্রনাথ গানটি শুরু করলেন। কণ্ঠ সেদিন তাঁর আবেগে ভরা, বেদনার স্পর্শে সুরের এক আশ্চর্য মূর্ছনা। সমগ্র আসরে সুহৃৎ স্মরণের এক শুদ্ধ পরিমণ্ডল। বৈঠকখানা ঘরটির নৈর্ঋত কোণে একটি বেতের চেয়ার। ক্ষিতীশবাবু সাধারণত ওইটিতে এসে বসতেন। উপেন্দ্রনাথ গান গাইতে গাইতে ওই আসনটির দিকে তাকিয়ে একটা ব্যাপার দেখতে পেলেন। গলা কেঁপে গেল তাঁর। গান থেমে গেল। পাশে বসা অমরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সেদিকে। কেবল অমরেন্দ্র-নাথই নয়, সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন হুঁ। অর্থাৎ তাঁরাও দেখছেন। সবাই দেখছেন, ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর যথাস্থানে ওই বেতের চেয়ারটিতে বসে গান শুনছেন, আর আনন্দে ঠিক আগেকার মতই মৃদু হাসছেন। কিন্তু উপেনবাবুর ডাকে, সবাই সচকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

উপেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় এ ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, 'যা দেখলাম, তা ছায়া নয়, মায়া নয়, সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটোল ক্ষিতীশবাবু।'

আরও অনেক কথা-কাহিনীর পীঠভূমি এই বাড়ি। শরৎচন্দ্র তাঁর এই মামা-

বাড়িতে বসেই একদা লেখার মকশ করেছেন। তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তি রচিত হয়েছে এখানে বসেই। পরলোকতত্ত্বের চাইতে এই তত্ত্ব কম মাতায় না বিভূতিভূষণকে। এ বাড়ি তো বটেই, শরৎ-স্মৃতি তাঁকে আরও একটি জায়গায় টানে।

আসরের অন্যতম সদস্য অমরেন্দ্রনাথ দাস মাঝে মাঝে ও'দের নিয়ে যান শহরপ্রান্তে গঙ্গাতীরবর্তী নিজ বাড়িতে। চর্ব্যচোষ্যের আয়োজন সেখানেও প্রচুর, তবে তার চাইতেও একটি বড় আকর্ষণ অমরেন্দ্রনাথের বাড়ির সামনে থেকে গঙ্গার জলসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত দূর্বা-সবুজ উঠোনটি।

শুধু কি সবুজ দূর্বা আর স্রোতবতী গঙ্গা? ঢালু উঠোনটার সীমায় গঙ্গার কূলে হেলে আছে একটি ঐতিহাসিক অশ্বত্থগাছ। ইতিহাসটা সাহিত্যের। ভাগলপুর প্রবাসী আড্ডা-দোসরদের কাছে শুনলেন বিভূতিভূষণ, এই সেই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বর্ণিত অশ্বত্থ বৃক্ষ। ওই হেলান গাছটির শিকড়ে বাঁধা ডিঙি খুললেই বর্ষার উত্তাল গঙ্গায় পাড়ি জমাতো ইন্দ্রনাথ।

একটি অশ্বত্থগাছও অমরত্ব পায় শরৎ-সাহিত্যের গৌরবে। আর তিনি কী করছেন?

মহালে ফিরে আসেন বিভূতিভূষণ। ভাবেন, লিখতেই হবে একটা কিছু; কিন্তু কী লিখবেন? এই জঙ্গলের ব্রাত্যজীবনের মহাকাব্য? জীব-জীবনে অপার্থিবের আনা-গোনার উপন্যাস, না অন্য কিছু?

ঘন অরণ্যের জানালায় সকৌতুক সূর্যের মত স্মৃতির কণকদ্যুতি তাঁর চেতনায় ঝিলমিলিয়ে ওঠে। মনের বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাবনার তরণী ভেড়ে ইছামতীর ঘাটে। ইসমাইলপুরের কাছারিতে বসে দেখতে পান সুদূর বাঙলার শ্যামলপ্রান্তে 'সবুজের সমুদ্রে ডোবা' একটি গ্রাম। সেখানে কঞ্চিহাতে ঘুরে বেড়ায় এক কিশোর। চোখের বাইরে যখন ইসমাইলপুর, তখন অন্তরে তাঁর উদ্ভাসিত বনগ্রাম-বারাকপুর। এ কোন্ স্মৃতির বীণা হৃদয়তন্ত্রে বারে বারে বাজে! সেই কবে কিশোর বয়সে, এক রাত্রে মানিকের গান শুনলেন বেহারী ঘোষের বাড়ি। সারারাত ধরে গান। পরদিন সকালেই ঘুম-জড়ানো চোখে বাড়ি থেকে বেরোলেন. সেই থেকেই তো ভ্রাম্যমাণ। তারপরে কতো পথ পার হওয়া, কত ধুলোয় চরণ ধূসর হওয়া। তবু সেই বারাকপুরের স্মৃতি পথে পথে বেণু বাজায়। যে পথে তিনি নেমেছেন, তারও বুঝি শেষ নেই। ক্লান্তিহীন বুঝি সে বেণু-ধ্বনিও। ভাবতে ভাবতে চোখে জল আসে। সেই বারাকপুর!—'বড় ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি। কেউ জানে না কত ভালোবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওড়াঝোপ. সোঁদালি ফুল, ছাতিমফুল, বাবলাবনকে। সে ছায়া, সে স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহ আমার গ্রামের, সে-সব অপরাহ্ণ আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে! তারাই যে আমার ঐশ্বর্য।'

বারাকপুরে কথকঠাকুরের ভিটেয় রেড়ির তেলের মৃদু আলোতে শীর্ণ শ্যামকান্তি এক দরিদ্র পাঁচালীকার খসখস করে পুঁথি লিখে চলেছেন। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে এক কিশোর। দূরে. দু'হাঁটুতে মুখ বেখে বসে আছেন আর একজন। পিতা মহানন্দ, কিশোর বিভূতি, জননী মৃণালিনী।

অনেকক্ষণ স্মৃতির অতলে ডুবে থেকে এক সময় উঠে দাঁড়ালেন বিভূতিভূষণ। সেই ছোটবেলায় স্কুল পালিয়ে সইমাদের বকুলগাছটার হেলান গুঁড়িতে শুয়ে শুয়ে যখন বাবার লেখা 'পশ্চিমের ডায়েরি' পড়তেন তখন থেকেই মনের মধ্যে একটি কল্পনার কাকলীমুখর পাখি বাসা বেঁধেছিল। এ-পর্যন্ত তা সামান্য ডানা ঝাপটেছে। এবার বুঝি চঞ্চল সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়।

ইসমাইলপুরের কাছারির বাইরে কাশবনের কুয়াশার সঙ্গে জ্যোৎস্নালোক তখন অপূর্ব মায়া ছড়িয়েছে। অদ্ভুত নির্জন নিস্তব্ধ চারদিক। বাবার লেখা পশ্চিমের ডায়েরিটা নিয়ে এলেন বাকস খুলে। পুজোর পিঁড়ি আনলেন। আনলেন ফুলচন্দন। তারপর—'বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরিটা ঠাকুরের পিঁড়িতে রেখে ফুলচন্দন মাখালেম। তিনি কি জানতেন তাঁর মৃত্যুর প্রায় পনের বছর পরে প্রথম যৌবনে তাঁর ছেঁড়া-খোঁড়া লেখা খাতাখানি বিহারের এক নির্জন কাশবনের চরের মধ্যে ফুলচন্দনে অর্চিত হবে?'

উত্তরসাধক আজ পিতৃঅর্চনায় বসেছেন তাঁর সাধনসিদ্ধির আশীর্বাদ প্রার্থনায়। বিহারের অরণ্যভূমির এক নির্জন রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে অকস্মাৎ যেন বারাকপুরের ইছামতী-সরস মৃত্তিকার শ্যামল সুবাস ভেসে আসে। পিতার দিনলিপিতে প্রণাম করলেন মহানন্দ-তনয়। একটি প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরিত হল পুত্রের দিনলিপিতে। তারিখটা এপ্রিল তিন, উনিশ শ' পঁচিশ। বাংলা সতের বৈশাখ, তের শ' বত্রিশ। 'পথের পাঁচালী' রচনার সংকল্প-দিবস। সূচনাদিবসও। 'নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ি' দিয়ে শুরু।

সে-রাতে দিনলিপিতে লিখলেন, 'জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট. .অস্তসূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য. জগতের শতকরা ৯৯ জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়।...

'সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পেঁাছে দেওয়া। তাঁরা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দবার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে এসেছে...এই কাজ তাঁদের করতে হবেই..তাঁদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা...।'

এ-এক মহৎ শপথ। পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণ চাইছেন 'অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে'। এ তো নেহাৎ গল্প-লেখা নয়। কয়েক পাতা লেখা হতেই কলকাতা চলে এলেন। গোলদীঘির ধারে এক সন্ধ্যায় পাতাগুলি মেলে ধরলেন নীরদ চৌধুরীর সামনে। দ্যাখো, হবে আমার?

কী কাণ্ড করেছেন! নীরদ আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন বিভূতিভূষণকে। বললেন, চালিয়ে যান বিভূতিবাবু, অসাধারণ হবে!

নীরদের উপর গভীর শ্রদ্ধা বিভূতিভূষণের। ও'র কথায় একটা জোর পেলেন যেন। আর দেরি নয়। এবার চলবে কলম। ফিরে এলেন ভাগলপুরের মহালে। সদর কাছারি বুড়ানাথ রোডের 'বড়বাসা'। দোতলার উত্তর দিকের ঘরে একটা বনাতে মোড়া টেবিল। তার উপর পারকার কলম চলছে কাগজের বুকে। টেবিলে ফুলদানিতে কিছু ফুল। জানলাটা খোলা। একটা নিমগাছ সেখানে শাখা দোলায়। সামনে গঙ্গা। উদয়াস্ত তার বিচিত্র লীলা।

কিন্তু কেবল লিখে আর লীলা দেখে চলে না। চাকরিতে তো আর ইশতফা দেননি। বেরোতে হয় মহালে। কাগজ-কলম সঙ্গে থাকে। আজমাবাদ কাছারিতে বসে লেখেন মাঝে মাঝে। 'নকছেদী ভকতের দেওয়া বেলফুলের ঝাড়ের পাশে বসে পথের পাঁচালী লিখতুম। মুহুরী গোষ্ঠবাবু বসে হিসাব বোঝাতো।'

আর যাঁকে বোঝানো, সেই মানুষটি তার আগেই সব হিসেবের যোগ-পূরণে শূন্য নামিয়ে বসে আছেন। বিহারের অরণ্যভূমির মধ্যে বসে তাঁর মন তাকিয়ে আছে সুদূরে। যেখানে 'বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ'। ইছামতীর তীরে সেই ছোট্ট সবুজ

গ্রামখানি তাঁর। তিনি তারই শ্যামরসে তন্দ্রাতুর।

ভাগলপুরের বড়বাসায় বসে লিখছেন। 'সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো ছড়ানো আছে...ফুলদানিটাতে ক্রিসেনথেমাম—কলাফুল। টেবিলটাকে হঠাৎ রহস্যময় মনে হয়।' কথাটি লেখা আছে উনিশ শ' পঁচিশের বিশ নবেম্বরের ডায়েরিতে। ওই সঙ্গে আর একটি কথা, 'একান্ন বৎসর পরে আমার কোন চিহ্নও খুঁজে মিলবে না। কিন্তু আমার এই লেখা হয়ত থেকে যাবে।' 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে এ এক আশ্চর্য প্রত্যয়ের স্বাক্ষর।

লিখছেন ভাগলপুরে বসে। তবু 'বড়বাসার নির্জন ছাদটায় নির্জন শীতসন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুর দিকে চেয়ে দূর ইছামতীর বুকের একটা অন্ধকার ঘন তীরের কথা মনে পড়ল।'

তিনি যেন ইছামতীর তীরে। বল্লার ভাঙনের মুখে সেই শিমুলগাছটা। লক্ষ্মণ জেলের শাশুড়ি ক্ষুদি গোয়ালিনী মারা গেল, তাকে পোড়ানোর জায়গাটা। কেমন যেন উদাস উদাস ভাব। কতকাল আগেকার কথা। দিগন্তবিস্তৃত মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে যেন হাতছানি দিত। শীতের এই অপরাহ্নে বাবলাগাছে লেগে থাকা রাঙা রোদটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে কতো কথা মনে হয়। লিখতে লিখতে ছায়া-ছবির মত ভেসে ওঠে 'পিসিমার সেই কঞ্চিকাটা বাঁশবন' 'সইমাদের বাড়ির পথের হেলান গুঁড়ি বকুলগাছটা' 'সইমার বড় অসুখ'—হঠাৎ মন কেমন হয়ে যায়। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় পিছনের জীবন। সেই গ্রাম, নদী, নীলকুঠি, ধলচিতের খেয়া, মাধব-পুরের মাঠ, চড়কতলাব মেলা, সলতে খাগি আমগাছ, সইমাদের বকুলগাছটা, সেই সজনে-গাছটা মায়ের হাতে লাগানো, এমনকি মায়ের ভাঙা কড়াখানা পর্যন্ত সশরীরে হাজির। গ্রামের নামটি বারাকপুরের বদলে করা হয়েছে নিশ্চিন্দিপুর। তাঁর গ্রামের কিছুদূরে কোম্পানীর আমলের গোলগোলিযা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন নিশ্চিন্দপুর নামে একটি ছায়ানিবিড় ছোট্ট গ্রাম দেখে। তখন তিনি বনগাঁ স্কুলের ছাত্র। পটে আঁকা ছবির মত গ্রামটিও তাঁর চিত্তপটে আঁকা হয়ে গেল সেদিন। ভালো লেগেছিল নিশ্চিন্দপুর নামটি।

পরিণত বয়সে রাজপুর-হরিনাভিতে শিক্ষকতার কালেও পেলেন সেখানে আর এক নিশ্চিন্দিপুর, পেয়ারাবন, বাঁশবন, আমকাঁঠাল আর লিচুবনের ছায়ায় ঢাকা, সেও এক মায়াময় পল্লী। নামটি আজও তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করে। ম'খানে দাঁড়িয়ে অপু, প্রথম পুরুষ, হয়ে উঠল উত্তমপুরুষ, লেখক স্বয়ং। মা, বাবা, পিসিমা, পাঠশালার প্রসন্ন গুরুমশাই সবাইকে নিয়ে এগিযে চলল পথের পাঁচালী লেখা।

লেখা চলুক, কিন্তু উপেনবাবুদের আদমপুরের আড্ডায় চাঞ্চল্য জাগে। ব্যাপার কি, লোকটা শহরে এসে থাকছেন অথচ অড্ডায় হাজিরা দিচ্ছেন না, হেতু?

এই 'হেতু' জানতে গোটা আড্ডাটিই এক বিকালে মোগশরপল্লীর বড়বাসার দোতলায় চড়াও হয়ে 'থ'। বলে কি! একেবারে আস্ত উপন্যাস ফেঁদে বসা? শোনান দেখি মশাই।

অপ্রস্তুত বিভূতিভূষণ আস্তে আস্তে পাণ্ডুলিপি মেলে ধরেন। অনেকক্ষণ একটানা শুনে, উপেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিস্ময়াবিষ্ট।

নীরদ তাঁকে আগেই ভরসা দিয়েছেন। এঁদের প্রশংসায় উৎসাহ দ্বিগুণ হল। এর পর, অমরেন্দ্রনাথ দাস বলছেন, 'মধ্যে মধ্যে বুড়ানাথ রোডের খেলাতচন্দ্র ঘোষ স্ট্রীটের বড়বাসার দ্বিতলে উহার লিখিত অংশ আমরা শুনিতাম।' উপেন্দ্রনাথের

কথা, 'যেমন লেখা হত তিনি আমাদের পড়ে শোনাতেন আর আমার কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসালাভ করে বিশেষরূপে উৎসাহিত বোধ করতেন।'

উৎসাহের সঙ্গেই প্রায় শেষ করে আনছিলেন। হঠাৎ একটি কিশোরী এসে উলটে পালটে দিল বইখানাকে।

'একদিন হঠাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হল-এ একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি এবং মন দুই-ই আকর্ষণ করল—তার ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হল, উপন্যাসে এই মেয়েকে না আনলে চলবে না। পথের পাঁচালী আবার নতুন করে লিখতে হল, এবং রিকাসট করায় একটি বছর লাগল।'

দুর্গা এলো। এলো এক প্রক্ষিপ্ত চরিত্র রূপে নয়, নায়কের নিগূঢ় সত্তার ব্যঞ্জনা-রূপে তার আবির্ভাব। নায়ক অপুর দিদি দুর্গা। সে-ই প্রকৃতিপ্রেমের কাজল পরালো অপুর চোখে। হাত ধরে পথ চিনিয়ে নিয়ে যায় সে ভাইকে প্রকৃতির লীলানিকেতনে।

বাবা, মা, পিসিমাকে নিয়ে ন্যায়করূপে নিজের জীবন চিত্রণের বাস্তব উপাদানের মধ্যে একটি কল্পচরিত্র সৃজনে সারা হৃদয় ঢেলে দিলেন বিভূতিভূষণ। সেই তন্ময়তার মধ্যে দুর্গাকেও সত্যি বলে মনে হয়। সাহিত্যের কথা নয়, তাঁর নিজের ডায়েরিতেও তার ছাপ পড়ে। ওই সময়ের চার অকটোবর, উনিশ শ' সাতাশ, দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'র একটি কথা 'এই সব জ্যোৎস্নায় যে কার মুখ মনে পড়ে। এই মৃদু হাওয়ায় তার স্পর্শ আছে...ছেলেবেলাকার সেই নবীন শিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো।' মা-বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে পর্যন্ত কল্পলোকের দিদি দুর্গার আশ্চর্য উপস্থিতি। একবার নয় বারে বারে ঘটতে থাকে। অপু বুঝি হযে যান বিভূতিভূষণ নিজে। 'স্মৃতির রেখা'র একশ' চারের পাতায় লেখা, তেরশ' পঁয়ত্রিশের এক এপ্রিল—'সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেক দূরের আমার গ্রামের চড়কতলার মেলা থেকে হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা মেলা দেখে ফিরে যাচ্ছে—কারুর হাতে বাঁশের বাঁশি, কারুর হাতে মাটির রঙ করা ছোরা, মাটির পাল্কী।...

দিনলিপিতে লিখলেন, 'আজকের নিষ্পাপ অবোধ দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলোর পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি কল্পনা করতে বড় ভালো লাগে। দিদি দুর্গা যেন রুক্ষ চুলে হাসিমুখে আঁচলে কদমা বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দচাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়ি ফিরছে—।—অপু—ও অপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি দ্যাখরে,—ও অপু। পঁচিশ বৎসরের পার থেকে ডাক আসে।'

সৃষ্টির তন্ময়তায় বাস্তব আর কল্পনা একাকার। পথের পাঁচালী হয়ে ওঠে জীবন এবং জীবনস্বপ্নের কাব্য। তাতেই তিনি বিভোর।

ভাগলপুরের জীবন নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হয় বইকি। উনিশ শ' আঠাশের বারো ফেবরুয়ারির ডায়েরিতে লেখা হয় 'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি। এই বন-নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুঁড়েবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়ি-পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ওই রকম সুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে ঘোরা, এ দেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই ভোরিল, অ্যাকটিভ লাইফ, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এই সব।'

আরণ্যকের, অরণ্যকাব্যের কাঠামো তৈরি হতে হতে পরের লাইনেই অন্য কথা, 'দূর বাঙলাদেশে এখন বসন্ত পড়েছে।'

তারপরেই ডায়েরির পৃষ্ঠান্তরে, 'মনে হল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনে বনগ্রাম স্কুল থেকে হোম সিক হয়ে বাড়ি ফিরতাম। ভরতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা, গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মত লাগত। কালীর সঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হত, কতদিন পরে আবার এসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি। নভেলে (পথের পাঁচালীতে) এইসব শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোন লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, টুর দ্য ফোরস হয়ে পড়বে।'

একটু পরেই, 'নেবুফুলের গন্ধে মনে পড়ে কতকাল আগে কোন কৈশোরের দিনে, স্নিগ্ধ ছায়াভরা বৈকালে যেন গোপাল গয়লার বাড়ির সামনের চড়কতলার পথটা দিয়ে যাচ্ছি।'

মন তাঁর বারে বারে ফিরে আসে ইছামতীর তীরে, বারাকপুরে। ক'দিনের মধ্যেই তাই 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার সংকল্প লিপিবন্ধ হয় ডায়েরিতে। তারিখটা উনিশ শ' আঠাশের পয়লা মারচ। দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদের মধ্যে কলবলিয়াতে স্নান করতে নেমেছেন, 'নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ওই আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধু-ধু বালিয়াড়ি পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পার ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলেভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দফুল। গত পাঁচ শত বৎসর ধরে কত ফুল ঝরে পড়ছে। কত পাখি, কত বনঝোপ আসচে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটাশেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ওই ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ওই বাঁশবনের ঘাটের নিচেই। কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ওই শান্ত নদীর ধারে ওই আকন্দফুল, ওই পাটাশেওলা, বনঝোপ ছাতিম বন।—

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।'

পয়লা থেকে পনের, মারচের আর একটা দিন, ডায়েরির পাতায় আর একটি সংকল্প। ভাগলপুর থেকে গঙ্গায় স্টিমার করে মহাদেবপুরঘাটে নেমেছেন। তখন মেঘান্ধকার সন্ধ্যা। মুকুন্দ, পূরণ, রূপলাল, ছট্টু সিংদের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে চলছেন আস্তে আস্তে। বাঁ-ধারে পর্বতের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। পায়ের শব্দে হুড়ুম হুড়ুম জলে পড়ছে গঙ্গার ঘড়িয়ালগুলো। দিকভ্রম হতে লাগল বালির চরে এসে। এত অন্ধকার, দু'হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। দূরে দূরে বালির চরে আলেয়ার আলো। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে। তারপর একে একে কত ভূতের গল্প হল।

ঘরে ফিরেই এসব কথা টুকে, পরে লিখলেন ''দেবতার ব্যথায়' এই রকম লিখতে হবে যে, কোন উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম-শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করে—।'

কিন্তু উন্নততর গ্রহের জীবের শূন্যপথে যাত্রার কাহিনী লেখার আগে অপুর

নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে পৃথিবীর বিচিত্র যাত্রাপথের কাহিনী যে শেষ করতে হবে। নিশ্চিন্দিপুরের কথাতেই যে অনেক সময় গেল, অনেক পাতা ভরল। পরিকল্পনাটি যে বিরাট। তার একটা অংশ নিয়ে আপাতত এখানেই শেষ করা যাক। ক'দিনের মধ্যেই সমাপ্তি টানলেন পথের পাঁচালীর। ছাব্বিশ এপরিল, উনিশ শ' আঠাশ, বাঙলা বারো বৈশাখ, তের শ' পঁয়ত্রিশ। অপুকে নিশ্চিন্দিপুর থেকে পথে নামিয়ে শেষ লাইনটি লিখলেন, 'সে বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি...

চল এগিয়ে যাই।'—সমাপ্ত। তার নিচে নাম স্বাক্ষর—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবই তো হল, এখন ছাপার কী হবে?

উপেন্দ্রনাথ তাঁদের আদমপুরের আড্ডায় বা অমরেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ির সামনের আসরে মাঝে মাঝেই একটা মাসিকপত্র বার করার পরিকল্পনার কথা শোনাতেন। ইচ্ছাটা যে অনেক দিনের তার সাক্ষী অমরেন্দ্রনাথের উনিশ শ' ছাব্বিশের স্মৃতিচারণ।—"উনিশ শ' তেইশ সালের কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর ঘনায়মান অন্ধকারে সন্ত্রস্ত আমরা কয়জন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাসৈকতে সান্ধ্য-সম্মেলনে সংকল্প করি 'রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ'। সেই মন্ত্রসাধন সন্ধানে উপেনবাবু কলিকাতা যান। এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে পত্রিকার নামকরণ করেন।"

সেই নাম 'বিচিত্রা'। কিন্তু বেরোচ্ছে কবে?

উপেন্দ্রনাথের কথা, বিভূতিভূষণ তাঁদের আড্ডায় এসে একদিন বললেন, বইটা প্রবাসীতে পাঠিয়েছিলুম। ওরা ফেরত দিয়েছে।

সারা মুখ তাঁর বিষাদে কালো হয়ে গিয়েছে। উপেন্দ্রনাথ খুশির হাসি হেসে বললেন, ঠিকই হল। যা আমার অদৃষ্টে লেখা আছে তা আপনি অন্যকে দেবেন কি করে? ওটা আমার—আমিই ছাপাবো আমার বিচিত্রায়।

বিচিত্রা? অনেকদিন ধরেই তো বলছেন—বার করবেন,—করছেন কই?

শিগগিরই দেখতে পাবেন। পোক্ত ভিত না করলে টিকবে কেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করে লেখা ঠিক করলাম। এবার আর আটকায় কে। আপনার ও বই আমার পত্রিকার একটা শক্ত ভিত হবে।

শুনে বিভূতিভূষণ ভারি খুশি।

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর প্রকাশপ্রসঙ্গে এই কথাগুলি উপেন্দ্রনাথ নানা জায়গায়, এমনকি তাঁর স্মৃতিকথায়ও বলেছেন।

প্রবাসীর মাধ্যমে যাঁর সাহিত্যজগতে আবির্ভাব এবং পরে যিনি প্রবাসীর নিয়মিত লেখক, তাঁর প্রথম উপন্যাস কিন্তু বিচিত্রাতেই বেরোয। কারণ জানি না। তবে প্রবাসীর ফেরত দেওয়ার কথা বিভূতিভূষণ বলেননি কোথাও। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, উনিশ শ' আঠাশের ছাব্বিশে এপরিল এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয় এবং ওই দিনই তিনি উহা বিচিত্রায় প্রেরণ করেন।

ওই তারিখ বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে লেখা আছে, 'আজ আমার সাহিত্যসাধনার একটি সার্থক দিন—এইজন্য যে আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ নীরদ চৌধুরীও কিন্তু পুরো নস্যাৎ করে দিলেন প্রবাসীর ফেরত দেওয়ার কথাটা। তিনি পথের পাঁচালীর প্রথম পাঠক, প্রধান গুণগ্রাহী এবং উপন্যাসটির রচনা থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত নানাভাবে জড়িত। বিশেষ করে

প্রবাসীর সঙ্গে তিনি যুক্ত ওই সময়। তাঁর কথা, ভাগলপুরে পথের পাঁচালী রচনাকালে উপেনবাবুদের আড্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন বিভূতিবাবু। সেই সূত্রেই বইখানা বিচিত্রায় প্রকাশের বন্দোবস্ত হয়।

যাই হোক, পাণ্ডুলিপি 'বিচিত্রা'তেই পাঠিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু পাঠিয়ে দিলেই তো আর ছাপা হবে এমন কথা নয়। একদম আনকোরা ঔপন্যাসিক। বিচিত্রায় ইতিমধ্যে ও'র দুটি গল্প বেরোল—'বউচণ্ডীর মাঠ' আর 'নববৃন্দাবন'। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' বেরোচ্ছে না কেন? অধৈর্য লেখক একদিন বিচিত্রা অফিসেই হাজির। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ নেই। বাইরের ঘরে ক'জন উন্নাসিক লেখক আসরের ধ্বনিতে আঁচ দিচ্ছেন। পাঁচালী ফাচালীর লেখক এই গ্রাম্য মানুষটিকে তাঁরা প্রায় তাচ্ছিল্যে হাঁকিয়ে দিলেন, উপন্যাস? অ্যা! উপন্যাস ছাপাতে চাইছে!

বেওকুফ বনে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন পথের পাঁচালীর লেখক। এমন সময় উপেন্দ্রনাথ এসে গেলেন। তিনি সাদরে ও'কে নিয়ে গেলেন সম্পাদকের ঘরে। ও'কে আশ্বস্ত করলেন। তবু সম্পাদকের পছন্দ হলেও একক কেউ ঝু'কি নিতে চাইছিলেন না। বিচিত্রা কর্তৃপক্ষ বৈঠক বসালেন তাঁদের অফিসে। ডাক পড়ল লেখকের। পড় দেখি, সবাই শুনে বুঝুক চলবে কিনা। উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি তুলে দিলেন ও'র হাতে।

এ বৈঠকের অন্যতম শ্রোতা গোপাল হালদার। তিনি তো হতবাক। বছর পাঁচেক আগে ওই লোকটিকে তিনি দেখেছিলেন পূর্ববঙ্গেব এক মফঃস্বল শহরে—গো-রক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমাণ প্রচারক। ও'র বক্তৃতা অবশ্য সেদিন ভালোই লেগেছিল। তাই বলে উপন্যাস? নীবদ চৌধুরীকে জানতেন গোপালবাবু। দেখলেন, বৈঠকের আগে নীরদ আর বিভূতিভূষণ দুই বন্ধুতে বইটা নিয়ে নানা পরামর্শ করছেন। তারপরে শুরুর দিকের 'বল্লালী বালাই' থেকে অনেকটা পড়া হল বৈঠকে। গোপাল হালদারের ভাষায় 'সবাই মুগ্ধ এবং এক বৈঠকেই বিচিত্রায় প্রকাশ সাব্যস্ত হল।'

তের শ' পঁয়ত্রিশ, বিচিত্রার দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা থেকে পথের পাঁচালীর প্রকাশ শুরু। মাস আষাঢ়, পৃষ্ঠা ক্রমাঙ্ক আঠাশ। তখনকার দিনে প্রবাসীর লেখার নিচে থাকত লেখকের নাম—তাও পাইকা হরফে। আর বিচিত্রা! শিল্পী দিয়ে আঁকিয়ে, ব্লক করে লেখার উপরে শিরোনাম আর লেখকের নাম ছাপাত। আনন্দ আর ধরে না বিভূতিভূষণের। আর শুধু কি বড় করে ছাপা? কত বড় বড় নামের মালার মধ্যে তাঁর নাম। সংখ্যাটির প্রথমেই তাঁর সেই 'কল্পলোকের দেবতা'র নাম। কবিতা, সুসময়। রবীন্দ্রনাথেরই আরও তিনটি লেখা ওই একই সংখ্যায়—ধারাবাহি চলছে 'যোগাযোগ' উপন্যাস, 'তেল আর আলো'—রম্যরচনা এবং ভাণুসিংহের পত্রাবলী। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে'ও বেরোচ্ছিল তখন বিচিত্রায়। মাঝখানে কার্ত্তিক সংখ্যা বাদ দিয়ে একটানা চলল পরের বছর অর্থাৎ তের শ' ছত্রিশের আশ্বিন অবধি। মোট পনের কিস্তিতে শেষ হল পথের পাঁচালী।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রাক্কালে জীবনেব মূল্যবোধ নিয়ে সাহিত্যে যখন তীব্র সংশয় তখন বাঙালী পাঠক দেখল এক সাধকশিল্পী কী আশ্চর্য বিশ্বাসে আত্মার জ্যোতির্ময়রূপ উদ্‌ঘাটিত করে চলেছেন। জীবনের অযুত বিক্ষোভের মধ্যে মেঠোসুরে একতারা বাজিয়ে চলেছেন কোন বাউল যেন। সফেন সমুদ্রের মধ্যে সবুজ দ্বীপের মত জেগে উঠেছে এক নির্জন সাধকের সাহিত্যলোক।

আঘাতটা যে এমন নির্মমভাবে আসবে, ভাবতে পারেননি বিভূতিভূষণ। দেখলেন পথের পাঁচালী বই হয়ে বেরোবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বিচিত্রায় যখন ছাপা হচ্ছে, নীরদ চৌধুরী তখন থেকেই লেগে আছেন, সাহিত্যিক বন্ধুদের ডেকে ডেকে শোনাচ্ছেন, পড়তে অনুরোধ করছেন, চেষ্টা করছেন প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণের। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ সুখ্যাতি করছেন বটে, কিন্তু প্রকাশকরা রা করেন না। কেউ কেউ দু'একটা কথা বলেন, তবে সেগুলি যেন আঘাত দিতেই। মুখের 'পরেই বলে বসেন, না মশাই, প্রেম নেই, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নেই, খুন-জখম কিস্যু নেই, ও বই চলবে না।

কেউ বা নাম শুনেই বিস্মিত, কী নাম বললেন? পথের কী? পাঁচালী? তা গাঁটের কড়ি খরচা করে কে আর পাঁচালী ছাপতে যায় বলুন?

কোন প্রকাশককে যদি পড়তে অনুরোধ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব, জানি মশাই, ওটা বটানির বই, পড়বার দরকার নেই।

একটা গতি করার জন্য বিভূতিভূষণ ভাগলপুরের পাট প্রায় তুলে দিয়ে কলকাতাতেই আস্তানা নিয়েছিলেন। এবার হাল ছেড়ে দিলেন। ঘুরে ঘুরে মুখে কালি মেরে গিয়েছে। যে আশা নিয়ে কলম ধরেছিলেন এমনি করে তার মৃত্যু ঘটবে? কলকাতায় তবে আর কেন থাকা। ভাগলপুরের সেই ব্রাত্যজীবনই শ্রেয়। তিনি ফিরে যাবেন। মিরজাপুরের সেই প্যারাডাইস লজের কোনার অন্ধকার ঘরটায় শুয়ে শুয়ে প্রায় কান্না পাচ্ছিল তাঁর। এমন সময় নীরদ চৌধুরী এসে ঢুকলেন ঘরে, বিভূতিবাবু!

সাড়া দিলেন না বিভূতিভূষণ।

হাত ধরে টেনে তুললেন নীরদ, উঠুন, এক্ষুনি বেরোতে হবে।

থাক নীরদ, আমার জন্য আর কত কষ্ট করবে? আর কোন পাবলিশারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই তোমার। কালই আমি জঙ্গলমহালে ফিরে যাচ্ছি।

সে কালের কথা কাল, এখন তো চলুন। নীরদ চৌধুরী এক রকম জোর করেই ও'কে টেনে তুললেন। তিনি অন্য জাতের মানুষ। আত্মবিশ্বাসে অটল। তাঁর বিশ্বাস 'পথের পাঁচালী' বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হবে। যে করেই হোক এর প্রকাশ চাই-ই।

একানব্বুই নমবর আপার সারকুলার রোডের প্রবাসীর আড্ডায় এসে ক্ষোভে ভেঙে পড়লেন নীরদ। সব শুনে সজনীকান্ত দাস বললেন, দাঁড়াও, পড়ে দেখি।

নীরদও তাই চান। বিচিত্রার কপিগুলি সংগ্রহ করে রাত্রে পড়তে বসলেন সজনীকান্ত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত একটানা পড়ে চললেন। সে পড়ার অভিজ্ঞতা তিনি আত্মস্মৃতিতে এভাবে লিখেছেন, 'বেশ বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাঙলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে।...উত্তেজনায় শেষ রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র কাটিল।'

পরদিন বেলা দশটায় অফিসে এসে নীরদ চৌধুরীর কাছে প্রকাশন সমস্যাটা ভালো করে জানতে চাইলেন সজনীকান্ত, বুঝিয়ে বলো দেখি, কেউই কি রাজি নয় ছাপতে?

নীরদ কয়েকজন প্রখ্যাত প্রকাশকের নাম করলেন। একজন বলেছেন, বিনে পয়সায় বইটা পেলে ছেপে দেখতে পারেন। 'বিনে পয়সা কেন' জিজ্ঞেস করায় বলেছেন, ও বই চলবে না।

যদি চলে?

তখন চিন্তা করা যাবে। তবে আগে চুক্তি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিভূতিভূষণ তাতেই রাজি হয়েছিলেন। নীরদ রাজি নন।

অপর একজন পঞ্চাশ টাকায় বইটা কিনে নিতে পারেন। নীরদ তাতেও অসম্মত।

শুনে সজনীকান্ত বললেন, ঠিকই করেছো। নিয়ে এসো ভদ্রলোককে।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে এর আগে কোন পরিচয় ছিল না সজনীকান্তর। নীরদই বন্ধুকে নিয়ে এলেন প্রবাসীর সেই আড্ডায়, শেষ চেষ্টা দেখতে। এই দু'জনের প্রথম পরিচয়। বিভূতিভূষণের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য সজনীকান্ত উনিশ শ' উনত্রিশের এই সময়টাকে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলে উল্লেখ করেছেন 'আত্মস্মৃতিতে'।

কলকাতায় তাজা কঞ্চি মেলানো ভার। ভাগলপুরের একখানা শুকনো কঞ্চিহাতে নীরদের সঙ্গে হাজির হলেন বিভূতিভূষণ। সেই শৈশব থেকে কঞ্চির অভ্যাসটা সমানে রয়েছে তাঁর।

অপুর হাতের কঞ্চি! পথের পাঁচালীর লেখক স্বয়ং যেন অপু হয়ে হাজির সাহিত্য-আড্ডায়। সবাই অভ্যর্থনা করলেন। একজন চায়ের ফরমাস দিতেই পরমোৎসাহী আর একজন প্রস্তাব করলেন, শুধু চা নয়, আজ একেবারে নিশ্চিন্দিপুর স্পেশাল— মুড়ি-তেলেভাজা।

কিন্তু সকলের এই উৎসব-আনন্দের মধ্যে নীরদ যখন প্রকাশন-সমস্যাটা তুলে ধরলেন বৈঠকে যেন ঝড়ো দমকায় নিবে গেল উৎসবের মশালটা।

সজনীকান্ত এতক্ষণ কথা বলেননি। বসে ছিলেন গুম মেরে। হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রীতিমত। সবার দিকে তাকিয়ে আহ্বান জানালেন, আমরা চাঁদা তুলে ছাপবো পথের পাঁচালী।

সবার দিকে তিনি তাকালেন সমর্থনের আশায়। গোপাল হালদারের চোখ চকচক করছে—আমি নিচ্ছি টাকার দায়িত্ব। ফেণীতে তাঁর বাবা ঋণদান অফিসের প্রধান কর্ম-সচিব। যে করে হোক বাবার কাছ থেকে টাকা তিনি আনবেনই। এখন সজনীকান্ত করুন প্রেসের ব্যবস্থা। নীরদচন্দ্রর উৎসাহ আর দেখে কে। বললেন, কমপোজটা বাদে আর যাবতীয় প্রেসের কাজ আমি করব, সেজন্য কোন কর্মচারীর দরকার নেই।

আবেগে হতবাক বিভূতিভূষণ।

সাহিত্যিককে সাহিত্য-আড্ডা না বাঁচালে, কে বাঁচাবে? আর এ রাউন্ড চা হয়ে যাক।

কিন্তু সজনীকান্ত আবেগে ভাসার লোক নন। ঢিলেঢালা কাজ পছন্দ করেন না তিনি। বললেন, আগে একটা পাবলিশিং কনসার্ন খোলা হোক। পাকা লেখাজোকা হোক।

হোক। হোক। সবাই সায় দিলেন।

প্রকাশনালয়ের নাম হবে কী?

সজনীকান্তর স্ত্রী তখন আসন্নপ্রসবা। ব্যাস, ওই ভবিষ্যৎ ছেলের নামেই এই মহৎ কাজটা হোক। সম্ভাব্য ছেলের একটা নাম বাতলাতে বলা হল সজনীকে।

কিন্তু যদি ছেলে না হয়ে—

আলবৎ হবে। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে থামিয়ে দিলেন সজনীকান্তকে। কথাটায় সজনী দাসেরও যেন একটা বিশ্বাস এলো মনে। নাম দিলেন—রঞ্জন। সারা আসর জয়-ধ্বনিতে মুখরিত হল।

সজনীকান্ত দ্রুত একটা ফরমা তৈরি করে ফেললেন। খশখশ করে কী সব লিখে বিভূতিভূষণের হাতে কলম তুলে দিলেন, নিন, সই করুন।

সই কিসের?

সজনী-বিভূতি চুক্তিনামা। সাক্ষী, নীরদ চৌধুরী আর গোপাল হালদার।

এসব ব্যাপার বোঝেন না বিভূতি। তবু আনন্দ আজ তাঁর অপরিসীম। হাতে কলম নিলেন। সই করতে গিয়ে একটু থামলেন, এর দরকার কি?

ব্যবসা করতে গিয়ে শুরুতেই কাঁচা কাজ ঠিক নয়। সই করুন। সজনী দাসের পরিষ্কার কথা।

ব্যবসা? সাহিত্যটা কি ব্যবসার ব্যাপার? একটু চোট খেলেন বিভূতি।

হাঁ ব্যবসাই। পাবলিশারদের দুয়ারে ঘুরে ঘুরেও বুঝতে পারেননি কথাটা?

শক্ত কথা সজনীর।

ঠিক আছে। আচার্য রায় তাঁকে ব্যবসার উপদেশ দিয়েছিলেন। তা ভালোই হল। সই করতে গিয়ে আবার কী যেন ভাবলেন। থেমে গেল কলম।

কী হল আবার?

ব্যবসায় একটু দরাদরি চাই। এ যেন কেমন লাগছে।—বলেই শিশুর মত হেসে ফেললেন।

ফেলুন দর। সজনীকান্ত বললেন, আমি তিনশ' টাকা দেবো। আপনি বলুন এবার।

. একটু ভেবে বিভূতি বললেন, আমি আরও পঁচিশ টাকা চাই।

সজনী দাস তাতেই রাজি। এবার সই করুন।

আসরের সবাই হাসছিলেন ব্যাপার দেখে। সেদিকে খেয়াল নেই বিভূতির। বললেন, করছি সই, আগে কিছু অ্যাডভানস করবেন না? দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়ল আসর এবার। সজনীকান্ত সবাইকে থামিয়ে দিলেন। সিরিয়াস ব্যাপার এসব। পঁচিশটি টাকা আগিয়ে দিলেন, এই অ্যাডভানস। পর পর সই হল। পাকা হল কনট্রাকট। সেদিন, সে বৈঠকেই প্রবাসী অফিসের অন্তর্গত শনিবারের চিঠির ছোট ঘরটিতে বসে মতি-বাবুর দোকানের ডিম-মাংস সংকার করে 'রঞ্জন প্রকাশনালয়ের' শুভ মহরৎ হল। ক'দিনের মধ্যে, সাত জুলাই সজনী-তনয় রঞ্জনের জন্ম।

এদিকে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারবাবুকে দিয়ে মহালের কাজ আর চলছে না যে হুজুর! ভাগলপুর থেকে কর্মচারীদের অভিযোগ হুজুরে পৌঁছনোর আগেই আসামী হাজির, সিদ্ধেশ্বরবাবুর সমীপে। বইয়ের ব্যাপারে মাঝে মাঝেই ফাঁকি যাচ্ছিল মহালের কাজে। এবার তো আর কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার উপায় দেখছেন না বিভূতিভূষণ। কাজটায় ইস্তফা দেওয়াই উচিত ভাবলেন।

ভাবনার দায় পুরোটা যে ওই মানুষটির কাঁধে চাপাতে পারছেন না সিদ্ধেশ্বর-বাবু। বললেন, তা নিজের খরচা ছাড়া, ভাইকে কলকাতায় রাখবেন, ডাক্তারি পড়াবেন—এ সবের জন্য একটা রোজগারের ব্যবস্থাও তো চাই' এখানে!

তা তো নিশ্চয়। রোজগারের ব্যবস্থা না হলে চলবে কী করে।—জবাবটা এমন যে, ওসব ব্যবস্থা না হলে কি আর বলছেন! অত কাঁচা!

তবে অচেনা লোক ভুল বুঝলেও সিদ্ধেশ্বর ঘোষের তা হবে না। দু'চারটে প্রশ্নের পরই স্বীকার করলেন লোকটি আপাতত বই ছাড়া কিছুই ভাবনা নেই ও'র মাথায়, রোজগারের কথা অপ্রাসঙ্গিক। কেবল শিল্পী বলেই নয়, দুর্লভ এক সততা, সরলতা ও সহৃদয়তার প্রতীক ওই মানুষটির সঙ্গে এ বাড়ির কেউই সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি

নয়। তিনি ও'কে দু'দিন পরে আবার আসতে বললেন।

পিতামহ খেলাতচন্দ্রের স্মৃতিতে চৌষট্টির 'এ', ধর্মতলা স্ট্রিটে তখন নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে 'খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনসটিটিউশন'। সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজেই তার সভাপতি। নিরঞ্জন রায়চৌধুরী সম্পাদক। হেডমাস্টার তখন হেনরি ক্লিফোরড ক্লারিজ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বিভূতিভূষণকে আটকে ফেললেন সেখানকার শিক্ষকতায়।

এ এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব জীবনের। চিত্তের দিক থেকে সর্বদা ছাত্রের ন্যায় পলায়নী প্রেরণা, আর বারে বারে সেই স্কুলের বন্ধন 'ব্যর্থ শিক্ষক' বিভূতিভূষণের। তবু চাকরি একটা চাই-ই। আঠাশ সালে ম্যাটরিক পাশের পর ছোট ভাই নুটুকে ডাক্তারিতে ভরতি করা হয়েছে ক্যাম্পবেলে। দু'ভাই এখন মিরজাপুরের মেসে থেকে যাতায়াত করছেন। নুটু কলেজে, বড় ভাই স্কুলে। শাঁখারিটোলার মধ্য দিয়ে ধর্মতলা খেলাতে পৌঁছনোর একটা সহজ পায়ে হাঁটা পথ পাওয়া গিয়েছে। একটা মস্ত সুবিধা। আর সুবিধা, উলটো দিকেই এক ফালি ছুটির মত সবুজ মাঠ—ওয়েলিংটন—এখনকার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। ক্লাস যখন না থাকে, ক্লারিজ যখন বেত চালাচ্ছেন ছাত্রদের পিঠে, চাকলাদার বিরাজমোহন নল-চৌবাচ্চার অঙ্কে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছেন ক্লাসসুদ্ধ, শত্রু-শানচু-কসু-কানচু করছেন উমাপদ কাব্যতীর্থ, তখন কড়া দরোয়ান কালুয়ার পাশ দিয়ে পালিয়ে এসে পামগাছের তলায় দূর্বাঘাসের উপর শুয়ে পড়েছেন বাঙলা-শিক্ষক বিভূতিভূষণ। আয় কমলো কিন্তু। বেতন পঞ্চাশ লিখে—চল্লিশ টাকা পাওয়া।

স্কোয়ারের মোড়েই ধর্মতলা রাস্তার উপর একটা পুরানো বইয়ের দোকান। মুসলমান দোকানি ওয়াজেদ আলির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে মাসটার ব্যানারজি-বাবুর। অফ্ পিরিয়ডে বা ছুটির পরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেশ-বিদেশের নানা বই-ম্যাগাজিন পড়েন। এ তো একটা উপরি পাওনা। পাওয়া যায় আরও একটা জিনিস হাতের মুঠোয়। দু'পা এগোলেই আটচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে এক ঐতিহাসিক আড্ডাতীর্থ। শিল্পপতি শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গশ্রী পত্রিকার অফিস। তবে সে-কথা এখানে নয়। আর সেখানে জমবার সুযোগই বা কই এখন। ছাপাখানা চালু করে দিয়েছেন সজনীকান্ত। ছুটি হলেই ছুটতে হয় সেদিকে।

প্রেস থেকে প্রুফ আসছে। প্রথম দেখছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। দ্বিতীয় প্রুফ সজনীকান্ত দাস। তৃতীয় দফা নিজে দেখে চূড়ান্ত প্রিনট অরডার দিচ্ছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপন্যাসের প্রথম ফরমাটা যেদিন ছাপা হল, মহানন্দতনয় ডায়েরিতে তারিখটা টুকে রাখলেন, শুক্রবার, জুলাই ছাব্বিশ, উনিশ শ' উনত্রিশ। পরদিন শনিবার বিকালেই ছাপা ফরমাসহ পাণ্ডুলিপির কয়েকটা অধ্যায় পড়া হল প্রবাসীবাড়ির আড্ডায়। সজনী-গোপাল-নীরদরা তো আছেনই, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ প্রমুখও হাজির। তাঁরাও সেদিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন শুনে। রাত্রে ডায়েরিতে লিখলেন বিভূতিভূষণ, 'সকলেই খুবই উপভোগ করলেন, এটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়।'

এই একটি বৈঠকেই সাড়া পড়ে গেল সাহিত্যিক মহলে। ভিড় হতে লাগল প্রবাসী অফিসে পথের পাঁচালীর পাঠ শুনতে। লেখকেরও বেড়ে গেল উৎসাহ। যেমন ছাপা হয়, পাঠ হতে থাকে আসরে। এমনি এক আসরে উপস্থিত ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। দুর্গার মৃত্যুর পরে বাবা-মার সঙ্গে কাশী যাচ্ছে অপু। মা-ঝে-র পা-ড়া স্টেশনে ডিসট্যানট সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে অপুর মনে পড়ল, দিদি দুর্গা বলেছিল, 'অপু,

সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?'—অপুর এখানকার বেদনাময় স্মৃতি-চিত্রের বর্ণনা শুনতে শুনতে আবেগে লাফিয়ে উঠলেন বাঙলা সাহিত্যের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক মোহিতলাল। অশ্রুসজল চোখ। বিভূতিভূষণের হাত জড়িয়ে বললেন, কী কাণ্ডই করেছেন মশাই রেললাইন আর ডিসট্যানট সিগন্যাল নিয়ে! অপূর্ব!

কোথাও কড়া রঙ চড়াননি। ঠিক যেন অবন ঠাকুরের আঁকা মেটে রঙের ভারতীয় চিত্র।

বিশ শতকের তিন দশকের মুখে যুগ-জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যে পড়ে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতিগোষ্ঠী যখন বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে সংশয় আর সংঘাতে দিশেহারা করে ফেলেছেন সেই সময় জীবন ও সাহিত্যের শাশ্বত সংগীত নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন একতারা হাতে পথের কবি বিভূতিভূষণ। সজনীকান্তর কথা 'আমরা দীর্ঘ বিরোধ আর কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি, এ যে কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন!'

বলছেন না কিছু নীরদ প্রকাশ্যে। তিনি সংযত সতর্ক হয়ে প্রথম প্রুফ দেখছেন, মাজা-ঘষার পরে ফিনিশড প্রোডাকট আসরে ফেলে যাচাই করা।

বইয়ের শুরুতেই প্রথম লাইনের শেষ শব্দটি 'কোটাবাড়ি' কাটা, হল 'কোঠাবাড়ি'। বীরু রায়ের পুত্রকে কুমিরে নিয়ে যাওয়ার পর লেখা—'নৌকার লগি লইয়া এদিক ওদিক তাড়াতাড়ি করা হইল।' বিচিত্রায় তাই-ই বেরিয়েছে। 'খোঁজাখুঁজি'কে বিভূতিভূষণের গ্রাম্যভাষায় বলে 'তাড়াতাড়ি'। তিনি রাখতে চান শব্দটি। ধ্যেৎ, এ-বই আপনার গ্রামের জন্য নয়, সারা দেশের। ওতে সবাই বোঝে 'চটপট' 'দ্রুত'। কেটে করলেন খোঁজাখুঁজি। আপত্তি করলেন না বিভূতিভূষণ। তবে তর্ক বেধে গেল 'ওম্' নিয়ে। একখানা রাঙা ছিটের সুতী চাদর পেয়ে ইন্দিরঠাকরুন যেখানে বলছেন, 'দিব্যি কেমন ওম্', নীরদের সেখানে ঘোর আপত্তি—কেউ বুঝবে না ওই 'ওম্'।

না বুঝুক, ও আমার গ্রামের প্রাণের ভাষা, বদলাবো না আমি। অনেক তর্কেও কিন্তু বদল্যালেন না কথাটা তিনি। যেমন বদলাননি বইয়ের নামটি। হাঁ, 'পথের পাঁচালী' নামটাই নীরদের না-পছন্দ ছিল আগে।

হেতু?

পাঁচালী-ফাচালী নেহাত গেঁয়ো।

এতে তো গ্রামের কথাই লিখেছি আমি।

ঠিক আছে, গ্রামের কথাই হোক, নাম দিন 'নিশ্চিন্দিপুরের কথা'। পথের কথা তো নেই এ বইয়ে।

পথের কথা নেই? একটু ভেবে বিভূতিভূষণ বললেন, সত্যিই পথ এখানে নেই, কেবল অপুর পা দেওয়া পথে। তবু পথ পাবে নীরদ ক'দিন পরে তোমাকে দেখাবো।

তার মানে?—নীরদ চৌধুরী স্পষ্ট জবাব চান।

বিভূতিভূষণ বললেন, আজ মাফ করো, একদিন নিশ্চয় তুমি জানবে, সবার আগে জানবে তুমি। শুধু এ নামটা আমায় রাখতে দাও।

ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন আর জোর করতে পারেননি নীরদ। পরে অবশ্য জেনেছিলেন হেতু।

তাই বলে নিজেই কি কম হাত চালিয়েছেন বিভূতিভূষণ। একেবারে শুরু থেকে

শেষ পর্যন্ত তা চলেছে। সেই শেষের লাইনে 'সে বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্য তিলক' বদলে করলেন 'সে পথের বিচিত্র আনন্দযাত্রার অদৃশ্য তিলক'। তবু স্বস্তি নেই, আবার বদল—'ক্ষুদ্র জীবনপথের বিচিত্র আনন্দযাত্রার অদৃশ্য জয়তিলক' পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি...চলো এগিয়ে যাই।"

এ তো বিচিত্রা থেকে বইয়ের কালে বদল। বিচিত্রায় প্রকাশের কালে তো পাণ্ডু-লিপির শেষ পাতাটি প্রায় পুরোই পালটে দিলেন। সে পাতাটি এমন ছিল:

'স্বপ্নে এক একদিন তাহার মন ছুটিয়া যায় নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে। সে যেন তাহাদের বনের দিকের ঘরটিতে বসিয়া জানলা খুলিয়া দিয়াছে। জঙ্গলের দিকে নীলমণি জ্যাঠাদের পোড়ো ভিটার বাতাবিলেবু গাছটার মাথায় সকালের রাঙা রোদ উঠিয়াছে, কঞ্চির ডালে ফিঙে পাখি পিড়িক পিড়িক ডাকিতেছে, সোঁদালিগাছের লম্বা লম্বা শুঁটি ডালে ডালে দুলিতেছে।

ওই পাশের নিষ্প্রদীপ পোড়ো ভিটা হইতে ভিটার মালিক ঠ্যাঙারে বীরু রায়, ব্রজ চক্রবর্তী, তাহার ঠাকুরদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কার, জ্যাঠা নীলমণি রায়, পিসি ইন্দির-ঠাকরুণ, দিদি দুর্গা, তাহার বাবা, আরও কত উত্তরপুরুষ প্রভাতের তরুণ আলোর অভ্যর্থনা লইয়া বলে—এই যে আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আছ তুমি, নবপ্রভাতে আলোর রথে উঠিয়া তোমার জীবনের যে জয়যাত্রা আমাদের সকলের পক্ষ হইতে হে তরুণ উত্তরপুরুষ, তোমার নবীন হাতে তাহার অশ্ববল্গা আমরা যে তুলিয়া দিয়াছি, আমাদের বংশের উপযুক্ত হও, তোমার গমনপথ আমাদের সকলের আশীর্বাদে মঙ্গলময় হে।

আরও হয়—সোঁদালির বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমার বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, প্রভাতের পদ্মের মত তরুণী সুন্দরী দুঃশলা, ভগ্নউরু পরাজিত রাজা দুর্যোধন, স্বয়ম্বর সভায় বরমাল্য হস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, সরযূতটের বনে শরাহত কিশোর বালক সিন্ধু, তমসাতীরের পর্ণকুটিরে পবিত্র অজিনশয্যায় প্রীতিমতি তাপসবধূগণ বেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়সম্বলহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র ত্রিজট, কত নির্জন দুপুরে ওই ভাঙা কবাট জানালার ধারে বসিয়া কতদিন যাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হইয়াছিল তাহারা হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলে, এই যে, তুমি আবার ফিরে এসেচ?

পথের দেবতা বলেন, পথ আমার কেবলই সম্মুখের দিকে বিস্তৃত—ফিরিয়া যাইবার কোন উপায় নাই। গ্রামের রায়পাড়া, মুখুজ্যেপাড়া ছাড়াইয়া, জেলেপাড়ার পাশ কাটাইয়া, বাহিরের দক্ষিণ মাঠের উপর দিয়া জলসত্রতলা পিছনে ফেলিয়া আমার পথ কেবলই সামনে চলিয়াছে—সম্মুখে জানা অজানা গ্রাম নগর তাহার পর বন, পাহাড়, মরুভূমি, সমুদ্র ডিঙাইয়া দূর হইতে সুদূরে, আরও দূরে—জীবনের রথে উঠিয়া ফিরিয়া চাহিবার নিয়ম নাই, হে নবীন পথিক, অগ্রসর হও।'

এবার বইয়ের সঙ্গে মেলাতে গেলেই বদলটার স্বরূপ ধরা পড়বে। বদলাতে গিয়ে কেবল অনেক পাতাই নয়, বাদ দিয়েছেন অনেক কাহিনীও। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যেন শেষ নেই। এ-সময়ের দিনলিপির কথা—

'উঃ গত ছ'মাস কী খাটুনিই গিয়েছে। জীবনে বোধহয় আমি এরকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত

কাটিয়েছি। ইডেন গারডেনে কেয়া ঝোপের বনে ও একদিন বোটানিক্যাল গারডেনে লাল ফ্লফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই না ভেবেছি।'

এমনি করেই শেষ করলেন তিনি 'পথের পাঁচালী'। আঠাশ সেপটেমবর, শনিবার প্রেসে যেতেই প্রুফের শেষ তাড়াটা হাতে পেলেন। কয়েকবার মিলিয়ে দেখেই প্রিনট অরডার। বই প্রকাশিত হল দোসরা অকটোবর, বুধবার, উনিশ শ' উনত্রিশ—মহালয়ার দিন।

দফতরির ওখান থেকে কয়েকটা মাত্র কপি বাঁধাই হয়ে এসেছে। তারই এক কপি সজনীকান্ত তুলে দিলেন ও'র হাতে। পিতৃদেবকে উৎসর্গ করা বইখানা বুকের উপর চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিভূতিভূষণ। নিমীলিত চোখের দুটি পাতা।

সজনীবাবু ও'র কাছে এ-সময়ে আশা করেছিলেন শিশুর উল্লাস। উলটো হতে দেখে ডাকলেন, বিভূতিবাবু।

চোখ মেললেন সজনীকান্তর ডাকে।

কী ভাবছেন?

আমার বাবার কথা। বিভূতিভূষণের চোখে জল।

বইখানা সজনীকান্তর হাতে তুলে দিলেন—প্রীতি উপহার, নীচে নাম স্বাক্ষর করলেন—'অপু'।

সে তারিখের দিনলিপিতে লেখা, 'আজ মহালয়া পিতৃতর্পণের দিন। তিল তুলসীতে আমি বিশ্বাস করিনে। বাবার অসম্পূর্ণ কাজ আমি যদি শেষ করতে পেরে থাকি, তার চেয়ে সত্যতর কোন তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

এদিনে জীবনের তুচ্ছতম জিনিসকেও মহত্ত্বের আসনে দাঁড় করিয়ে দেখতে পাচ্ছেন। সবাইকেই তাঁর বেশি করে ভালো লাগছে। ডায়েরি লিখতে বসে মনে পড়ল সেই পুরানো কলমটার কথা, যা দিয়ে পথের পাঁচালী রচনা শুরু হয়েছিল। পরে নিব মোটা হওয়ায় নতুন পারকার দিয়ে লেখেন। সেই 'পুরানো বন্ধু'কে টেনে নিলেন হাতে ডায়েরি লিখতে। 'নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আর থাকতে দিলুম না।'

লেখার কলমটার অভিমান হতে পারে, আর যে তাঁর এই লেখকজীবনকে গড়ে তুলল, সে?

'তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে রেখেছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।'

'আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখি-ডাকা, তেলকুচো ফুল-ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটেকে অভিনন্দন করে শুধু জানাতে চাই—ভুলিনি! ভুলিনি! ভুলিনি! যেখানেই থাকি ভুলিনি। তোমার কথাই লিখে রেখে যাব—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুন্ন থাকে।'

পথের পাঁচালী নিয়ে দেশময় আলোড়ন; ও'কে নিয়ে টানাহে'চড়া শুরু হয়েছে। কিছু লোক ও'কে পাকড়াও করে সম্পাদক করলে এক সিনেমা-সাপ্তাহিক 'চিত্রলেখা'র। উনিশ শ' ত্রিশের পনের নবেমবর থেকে তার প্রকাশ। গোটা আঠারো সংখ্যা বেরিয়েছিল। কিন্তু এসবে মাতলে চলবে না। সাবধান হলেন বিভূতিভূষণ। একটা সাধারণ কর্মসূচী

বেঁধে নিয়েছেন জীবনকে তৈরি করার জন্য।—

'জীবনকে আরও গভীরভাবে জানতে হবে। পরিচিত হতে হবে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদদের মহৎ ভাবনার সঙ্গে। জ্ঞান বাড়াতে হবে ইতিহাস, শারীরতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন সম্পর্কে। অবসর সময়ে 'কোয়েনট' ধরনের মানুষের সঙ্গ চাই। আর চাই লেখা।'

জীবন অপরাজেয়। পথের পাঁচালীতে শুধু হাতছানি সে জয়যাত্রার। 'সোনা-ডাঙার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়া পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে শুধুই সামনে।'—আলোক-সারথি সে।

এক দিস্তা লেখা কাগজ নিয়ে এলেন বিভূতিভূষণ। নীরদের হাতে দিলেন, পড়ে দ্যাখো।

হাঁ, 'আলোক-সারথি'ই শিরোনাম। খানিকটা পড়েই হেসে ফেললেন নীরদ চৌধুরী, পথ পেয়ে গেছি বিভূতিবাবু। এই তো পথের পাঁচালী। বিভূতি-জীবনের পথের পাঁচালী দেখতে পাচ্ছি। নীরদ চৌধুরী জানেন বন্ধুর জীবনকথা, তবে তা পরিণত জীবনের, বাল্য কৈশোরের সব তাঁর জানার কথা নয়। তাই সেদিন ধরতে পারেননি। এবার পরিষ্কার।

শুনে বিভূতিভূষণও খুশি। এ-সত্যিই তাঁর নিজের জীবনপথের কাব্য। মূল নায়ক অপু—অপূর্ব, 'সে ছিল অনেকখানিই আমার জীবনের সঙ্গে জড়ানো।' মা? 'সর্বজয়ার মধ্যে আমার মায়ের একটা অস্পষ্ট রূপ রয়েছে।' যেমন রয়েছেন ইন্দির-ঠাকরুনের মধ্যে মেনকা পিসি, হরিহরের মধ্যে পিতা মহানন্দ। ডায়েরিতে স্মৃতির রেখায় তার স্বীকৃতি—'বর্ণিত নায়ক নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য—দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।'

নীরদ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, তা একসঙ্গে শেষ করলেন না কেন?

ওই দু'শ' আঠাশ পাতার বই ছাপতেই কত ফৈজৎ পোহালে, আরও মোটা করবো?

এবার আর ভাবনা নেই। প্রকাশক লুফে নেবে আপনার বই। চালিয়ে যান।

চালাতে শুরু করলেন বিভূতিভূষণ। যেমন যেমন লেখা হচ্ছে, পৌঁছে দিচ্ছেন নীরদের হাতে। নীরদ চৌধুরীও তা জমা দিচ্ছেন প্রবাসীতে। আর কাট-ছাঁট নয়, পড়েও দেখছেন না কী যাচ্ছে প্রেসে। নাম কেন 'আলোক-সার. সে প্রশ্নও যেমন করেননি আগে। আবার প্রেসে দিতে গিয়ে দেখেন, বিভূতিভূষণই সে নাম বদলে করেছেন 'অপরাজিত'। কেন, তাও চাননি জানতে।

প্রশ্নটা করেছিলেন গোপাল হালদার, অপরাজিত অর্থ কি?—লাইফ ফোরস?

খুশিতে হেসে উঠেছিলেন বিভূতিভূষণ।

গোপাল হালদারের কথায় বলি, 'সাধারণতঃ নিজের কোন লেখার নিন্দা বা প্রশংসায় কোন কথা বলতেন না বিভূতি। তবে খুশি হলে হাসতেন প্রাণখোলা। তেমনি হাসতে লাগলেন।'

মোহিতলাল মজুমদার যেদিন চেপে ধরলেন অপরাজিতর বক্তব্য নিয়ে, সেদিন কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না বিভূতিভূষণ। বললেন, যে ধারাটিকে আমি অনুভূতিগোচর করতে চেয়েছি তা হল ভাসটনেস অব স্পেস অ্যান্ড পাসিং টাইম।'

'প্রবাসী'র তের শ' ছত্রিশের পৌষ-সংখ্যা থেকে বেরোতে লাগল অপরাজিত আর

শেষ হল তের শ' আটত্রিশের আশ্বিনে।

বই আকারে বেরোল তের শ' আটত্রিশ, অর্থাৎ ইংরাজি উনিশ শ' বত্রিশ মাঘে প্রথম খণ্ড আর দ্বিতীয় খণ্ড ফাল্গুনে। দু'খণ্ড মিলিয়ে একসঙ্গে বেরোয় পরে। পথের পাঁচালী উৎসর্গ করেন পিতৃদেবকে। আর অপরাজিত—মাতৃদেবীকে।

আসলে এই দু'খানার সঙ্গে পথের পাঁচালী মিলিয়েই এক অখণ্ড উপন্যাস, নামের যা হেরফের। লেখকের মনেও এই অবিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনা ছিল। 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে পরে যামিনীকান্ত সোমকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন 'উনিশ শ' চব্বিশ সালের পুজোর সময়টা থেকে এই বইটার কথা ভেবেছি। আর উনিশ শ' বত্রিশের মারচ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায়নি যখন আমি এই বইটার কথা না ভেবেচি।' উল্লেখ্য, উনিশ শ' বত্রিশের দশ মারচ বাংলা তের শ' আটত্রিশ, ফাল্গুনই অপরাজিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল। এদিনই শেষ ফরমাটার প্রুফ দেখে দেন বিভূতিভূষণ। দিনলিপিতে তা লেখা আছে। সেখানে তিনি লিখলেন '...আজ সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল...।'

ইতিমধ্যে প্রবাসী ও বিচিত্রায় যেসব ছোট গল্প বেরিয়েছিল তার একটা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে মেঘমল্লার নামে, উনিশ শ' একত্রিশে। বইটি উৎসর্গ করেন মেজমামা শরৎ চাটারজিকে। মামা বসন্ত চাটারজির ভাটপাড়া বাড়ি থেকে গঙ্গায় নাইতে গিয়েছিলেন মামীমা নির্মলা দেবীকে নিয়ে। কারা যেন সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে গিয়েছে, জলের ঢেউয়ে একবার জাগছে, একবার ডুবছে সেই প্রতিমা। বিভূতিভূষণের মনে হল, দেবী যেন দারুণ বেদনায় উঠে আসতে চাইছেন অন্ধকার তিমির গর্ভ থেকে। এই ভাবনাটিকে ইতিহাসের কাঠামোয়, অতিপ্রাকৃতের আতর মাখিয়ে লেখা গল্প মেঘমল্লার। জীবনের প্রথম রচনা 'উপেক্ষিতা' থেকে শুরু করে, মেঘমল্লার, উমারানী, পুঁইমাচা, অভিশপ্ত, নাস্তিক, ঠেলাগাড়ি, খুকীর কাণ্ড, বউচণ্ডীর মাঠ এবং নববৃন্দাবন—এই দশটি গল্প নিয়ে বইখানা। নববৃন্দাবন গল্পটি বেতারে পাঠ করেন বিভূতিভূষণ তখনকার ইনডিয়ান ব্রডকাসটিং কোমপানির আমন্ত্রণে, সে বছর শ্রাবণে। পরের মাসে এ-সম্পর্কে শ্রোতাদের তৃপ্তিসংবাদও পরিবেশন করেন বিচিত্রা। এদিকে অপরাজিতর ধারাবাহিক প্রকাশ যে মাসে শেষ হল, প্রবাসীর সেই সংখ্যায়ই মেঘমল্লার গ্রন্থ সম্পর্কে সুখ্যাতিযুক্ত আলোচনা করেন আর-এক বিভূতি—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দশটি গল্পের মেঘমল্লার, অভিশপ্ত এবং বউচণ্ডীর মাঠ এই তিনটি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে রচিত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও বিষয়টির উল্লেখ করেছেন আলোচনা-কালে। তবে উপেক্ষিতার অতিপ্রাকৃত চেতনার অংশটি গ্রন্থাকারে বেরোবার সময় বাদ গিয়েছে বলেই তিনি সে গল্পটির উল্লেখ করেননি।

আসলে অতিপ্রাকৃত চেতনার প্রভাব তাঁর প্রায় সব রচনাতেই থাকছে। পথের পাঁচালী আর অপরাজিততেও। পথের পাঁচালীতে দেখা যাবে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে দুর্গার প্রায়ই মনে হত, মা, বাবা, ভাই, সকলকে ছেড়ে, তাকে যেন কোথায় চলে যেতে হবে। সে অনুভব করত তার জীবনে কী একটা অনিবার্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। ছাত্র বিভূতিকে উৎসর্গ করা বই 'মৌরীফুল'ও বের হয় উনিশ শ' বত্রিশে। ওদের বাড়ি, ওর কাছে তিনি হাজির হয়েছিলেন 'মৌরীফুল' গল্প নিয়েই। সেই গল্প এবং মোট দশটি গল্প নিয়ে এ বই। মৌরীফুল, জলসত্র, রোমানস, রাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটি দেবতা, গ্রহের ফের এবং মরীচিকা। এর মধ্যেও হাসি

বিভূতিভূষণের খাতায় অপরাজিত-র খসড়া।

খুঁটিদেবতা ইত্যাদি এক গ্রন্থ অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনী।

অপরাজিত রচনার কালে এ চেতনা আরও গভীর। সে সময়কার ডায়েরি তৃণাঙ্কুরে আছে, কম্যুনিস্ট গোপাল হালদারের সঙ্গে স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে ঘোর তর্কের কথা। আছে একটি লাইন, 'অতুলবাবুর কাছে একটা স্পিরিচুয়াল সারকেলের ঠিকানা নিলুম।' এ সময়ে ডায়েরিতে লিখছেন—'একটা কথা আজকাল নির্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা স্পিরিচুয়াল নেচার আছে...।' অপরাজিতর চারশ' তিন পাতায়ও ঠিক ওই কথাটি অপুর 'এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে...।' পরবর্তী কথাগুলিও দু'জায়গাতেই একেবারে অভিন্ন। এমনি নিদর্শন আরও আছে 'অপরাজিত'তে। কিছু প্রবাসীতে বেরিয়েছিল কিন্তু বইয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বসে জেবউন্নিসা, উদিপুরী বেগম, মমতাজ, জাহানারার কথা ভাবতে ভাবতে অপুর মনে হচ্ছে—'কে জানে এখানকার সেসব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক যমুনা তাহার সাক্ষী আছে। গৃহ-ভিত্তির প্রতি পাষাণ খণ্ড তার সাক্ষী আছে; কিন্তু তাহারা তো কথা বলিতে পারে না।'—বইয়ের এই অংশের পরে 'প্রবাসী'তে ছিল—'শতাব্দীর পার হইতে পুরসুন্দরীরা প্রতি জ্যোৎস্না রাত্রে হয়ত আজও এখানে নিঃশব্দ চরণে নামিয়া আসিয়া জলহীন নহরের পাশে বসিয়া রাত কাটায়, সকল কক্ষ, অলিন্দ, প্রকোষ্ঠ, গৃহতল হয়ত আজও তাদের অদৃশ্য আবির্ভাবে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে—কে জানে?'

এরকম বাদ গিয়েছে অনেক লেখার অনেক অংশ। কিন্তু সে কি কেবল আধিভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গ? লেখকের কত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, কত সুন্দর কাহিনী, লেখক-জীবনের কত মূল্যবান দলিল বাদ গিয়েছে 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' গ্রন্থ থেকে। বর্জিত অংশগুলি নিয়ে 'অপুর কথা' বলে পৃথক বই হবে কথা হল। হয়নি কেন জানিনা। দেখছি কেবল বর্জনই। কখনো বা বাইরের চাপে, কোন ব্যক্তির রোষ থেকে মুক্তি পেতে, কখনও কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের হুমকিতে বিপন্ন হয়ে। তবে সব বর্জন সেজন্য নয়, কারণ জানাও নেই। হয়ত বইকে মসৃণ করতেই। তবু তা হয়নি সব সময়। বিভ্রাটও ঘটেছে অনেক। এসব বর্জিত অংশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিই।

বুড়ি ইন্দিরঠাকরুনের চেয়ে পাওয়া লাল সুতীর চাদর গায়ে দিয়ে বেজায় খুশি ভাব দেখে 'দুএকটা দুষ্টু মেয়ে বলে, উঃ ঠাকমাকে রাঙা কাপড়ে যা মানিয়েচে! ঠাকমার বুঝি বিয়ে!'—বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ এখানেই ইতি। কিন্তু এর পরেই অপুর সে কী কাণ্ড! গা শিউরে ওঠে ভাবতে। বইয়ে নেই, আছে বিচিত্রায়। ঘটনাটি এই—

"খোকাকে কোলে করিয়া দুর্গা উঠানে বেড়াইতেছিল। বুড়ী বলিল, 'আয় দুগ্‌গি ঘরের মধ্যে'। খুকী ভাইকে দাওয়ায় বসাইয়া ছুটিয়া পিসির ঘরে ঢুকিল। পিসি মাঝে মাঝে লুকাইয়া তাহাকে এটা ওটা খাওয়ায়—লোভে লোভে সে ঘোরে। তাহার আন্দাজ মিথ্যা নয়। বুড়ী পিতলের ঘটিটা দেওয়ালের কোণে বাঁশের উপর কাদা দিয়া গড়া তাক হইতে নামাইয়া বলিল, 'একটা দিব্বি রেখে দিইচি তোর জন্যে। নে ধর।'

একটা পাকা নোনার আধখানা। খুকী বাঁহাত দিয়া খাটো চুলের গোছা কাণের কাছে সরাইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল—পাকা? কোথা থেকে পেলি পিসি?

খাইতে খাইতে সে বাহিরে আসিল। পরক্ষণেই তাহার ভয়সূচক ডাক বুড়ীর কাণে গেল, 'ও পিসি শিগগীর আয়'।

বুড়ী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুর্গা নিচু হইয়া বসিয়া খোকার মুখের কাছে হাত লইয়া যেন ওৎ পাতিয়া আছে। বোধহয় সে একটুখানি নোনা ভাইয়ের মুখে দিতে গিয়া টের পাইয়াছে—দাওয়ায় সুপুরির কি কাঁঠালবিচি পড়িয়াছিল, খোকা তাহাই তুলিয়া মুখে পুরিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে শান্তভাবে বসিয়া আছে। এখন যদি গিলিয়া ফেলিতে যায়!...ভয়ে খুকীর মুখ শুকাইয়া গেল। জোর করিয়া বাহির করিতে গেলে যদি গিলিতে যায় তবেই এখনি গলায় আটকাইয়া যাইবে!

ইহাদের ভয়ের ডাক শুনিয়া সর্বজয়া আসিল। বুড়ী বলিল—তাড়াহুড়ো কোরো না বউ, খোকা সুপুরি মুখে করে বসে আছে, আস্তে আস্তে বার করে ফেলতে হবে।'

চক্ষের নিমিষে এক কাণ্ড ঘটিল।

মাকে দেখিয়া খোকা একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের মধ্যে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল, তাহার পরই শান্ত চোখ দুটা হঠাৎ কোন আশঙ্কায় ও ভয়ানক ভয়ে বড় বড় হইয়া উঠিল, গলা দিয়া গা-গা-গা একটা চাপা আর্তস্বর বাহির হইতে লাগিল। খোকা মুখখানা অস্বাভাবিক ভাবে উঁচু করিয়া দুবার যেন খাবি খাওয়ার ভাবে ঢোক গিলিবার চেষ্টা করিয়াই চিত হইয়া পড়িয়া গেল। সর্বজয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 'ওমা কি হোল' বলিয়া এক আর্ত চিৎকার করিয়া উঠিতে বাহিরের রোয়াক হইতে হরিহর ছুটিয়া আসিল। সর্বজয়া চিৎকার করিয়া বলিল, 'ওগো খোকার গলায় ছিরেবিচে গো—শিগগীর দ্যাখো!'

খুকী কাঁদিয়া উঠিল। বুড়ী থতমত খাইয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সংসার উল্টাইয়া কি কোথায় যেন ছত্রাকার হইয়া গেল!

হরিহর বসিয়া পড়িয়া খোকার গলার মধ্যে সাবধানে আঙুল পুরিয়া দিয়া দেখিল—কি একটা জিনিস গলার মধ্যে আটকাইয়া রহিয়াছে বটে। দু'দুবার জিনিসটাকে কায়দার মধ্যে আনিয়াও পিছলাইয়া ফেলিল। সেও ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল, 'তাই তো কি করি? খুকী শিগগীর দৌড়ে যা, নীলমণির বাবাকে ডাক দিকি—ছোট।'

ঠিক সেই সময় খোকার মুখে কি দেখিয়া সর্বজয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওগো খোকা যে গেল।'

'খোকা গেল কি, গিয়াছে—।'

চোখ তাহার ঠিকরাইয়া মাথা হইতে বাহির হইতে চাহিতেছে, গলার মধ্য হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বাহির হইতেছে। বাঙা টুকটুকে কচি হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পা দুটি আড়ষ্ট হইয়া বাঁকিয়া আসিতেছে..মুখ রক্তবর্ণ...একদণ্ডে মুখখানা সাদা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।

সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল—হরিহরের হাত পা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। কেবল শেষ মুহূর্তে কি জানি কোথা হইতে সর্বজয়ার বাঘিনীর মত সাহস ও মনের তেজ আসিয়া পড়িল। সে নিমেষের মধ্যে হরিহরের হাত ছিনাইয়া সরাইয়া দিয়া খোকার গলার মধ্যে আঙুল পুরিয়া দিল, আলটাগবার নিচে নলির মুখে কি একটা তাহার হাতে ঠেকিল বটে, কিন্তু ততদূর আঙুল যায় না। কে যেন শেষ মুহূর্তে শিখাইয়া দিল, ওটাকে গলার এক পাশে লইয়া যাইবার চেষ্টা করো—খানিকক্ষণ বৃথা ধস্তাধস্তি করিয়া সে দৃঢ়হস্তে বাঁকা তর্জনী আঙুলে বাধাইয়া একটা আধুলা খোকার গলা হইতে বাহির করিয়া আনিল।

আঃ!...সকলের শরীর দিয়া যেন বিদ্যুতের মত একটা ঝাঁজ বাহির হইয়া গেল. খোকা হাঁপাইয়া উঠিয়া একবার ঢোক গিলিয়া খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া চিক্কুর

পাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।...

সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিতে লাগিল—সকলেই একসঙ্গে কথা কহিতে লাগিল—'জল...পাখা...গামছা...তুলসীতলার মাটি...হরিনুট মানৎ...।' ঘাটের পথ হইতে শশী পালিতের মা গোলমাল শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি হাঁপ ফেলিয়া বলিলেন, 'বাবা তারকনাথ! মা যশড়ার কালী!...গা ঠক ঠক করে এখনও কাঁপচে...কি সর্বনাশ!...হ্যারে ইন্দির পিসি, বলি আধ্‌লা পয়সা ওর হাতে ছিল, না পিড়ের ধারে পড়ে টড়ে—''

যখন সব শান্ত হইয়া গেল, আরও যাহারা আসিল তাহাদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল নিবৃত্তি সাঙ্গ হইলে যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন সর্বজয়া একেবারে আকুল কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল—'ওমা আমার কি হবে।...কি হয়েছিল গো আমার আর একটু হলে।...ওগো আমি কোথায় যেতাম গো তা হোলে...।''

দুর্গা ভাইকে নামিয়ে রেখে পিসির কাছে যে নোনার লোভে গিয়েছিল সেই নোনার খবরটি কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতে দাসীঠাকরুন এসে ফাঁস করে দিলেন সর্বজয়ার কাছে নোনার দাম চেয়ে। 'নোনা গিয়েচে কিনতে! আজ নোনা কাল দানা খাওয়াবো।' বলে বুড়ীকে বকা। বুড়ী বলছে 'তা দে বউ দুটো পয়সা'। এই নিয়ে কলহের পর বুড়ী সেই যে বাড়ি ছাড়লেন সেই শেষ।

পিতা মহানন্দর পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরিখানায় প্রণাম করে পথের পাঁচালীতে হাত দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। এ ছিল তাঁর জীবনোপন্যাস। অপুর্বর বাবা হরিহরের আড়ালে রয়েছেন লেখকের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিহরের নামে মহানন্দরই চরিত্র বর্ণনা করে তাঁরই পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরির পাতাগুলি ছেপে দিলেন হরিহরের ডায়েরি বলে। এতেই ঘটল ফ্যাসাদ। 'হরিহরের' এটোয়াতে বন্ধু ত্রৈলোক্যনাথ শীলের বাড়ি থাকার কথা আছে, আছে শীল পরিবারের আচার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য। বিচিত্রায় তা দেখেই শীল পরিবারের পক্ষ থেকে লেখকের উদ্দেশে পত্রাঘাত এলো।—কে মশাই হরিহর? ত্রৈলোক্যনাথের কোন বন্ধু নেই ও নামে, কেউ থাকেওনি এসে এটোয়ার বাড়িতে ওই তারিখে। এসব কী লিখছেন, কেন লিখছেন, জানাবেন, ইতি...।'

চিঠি নিয়ে বন্ধু নীরদ চৌধুরীর কাছে হাজির বিপন্ন বিভূতিভূষণ। নীরদ স্বচক্ষে দেখেছেন মহানন্দর ডায়েরিতে ওই কথা লেখা। তিনি বললেন, চুপ করে থাকুন, এর পর কিছু বললে ডায়েরিখানা দেখিয়ে দেবেন।

সে কী করে হবে, ডায়েরী তো বাবার, বইয়ে তো হরিহরের নাম! বিভূতিভূষণ ঘাবড়ে গেলেন। ও'রা ধনী, যদি কিছু ফ্যাসাদে ফেলেন! না, নীরদের কথায় ভরসা পেলেন না তিনি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরু থেকে 'হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশোড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বংশ'-র উপর পর্যন্ত একটানা কাঁচি। বিচিত্রায় প্রকাশিত এবং বইয়ে বর্জিত সেই অংশটি এই—

''হরিহর রায় শিষ্যবাড়ি হইতে কয়েকদিন বাড়ি আসিয়াছে। বাহিরের রোয়াকে বসিয়া সে একটা বাকস খুলিয়া হিসাবপত্র লিখিতেছিল। অনেকগুলি বালির কাগজে বাঁধা খাতা পাশে বাহির করা আছে। হিসাব মেলা শেষ হইলে একখানা ছোট বাঁধা খাতা বাহির করিয়া সে পড়িতে লাগিল।

একথা পূর্বে বলা হয় নাই যে, হরিহর একজন লেখক। অর্থাৎ নামজাদা না হইলেও উক্ত ব্যাতিকগ্রস্ত বটে। কাশীতে থাকিবার সময় গীতগোবিন্দ বাঙলা পদ্যে

অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়াছিল। এক কপিও বিক্রয় হয় নাই। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে বিতরণ সাঙ্গ হইয়া গেলে বাকী বইগুলি কাশী হইতে আসিবার সময় যে কাঠের বাক্সটা আনিয়াছিল উহার মধ্যে কাগজকাটা পোকার আহার্যস্বরূপ সঞ্চিত আছে।

ছোট খাতাখানি তাহার ভ্রমণ কাহিনীর ছোট ছোট বর্ণনা ও নোটে ভরতি।—

'এই যতদিন পশ্চিমে বেড়াইতেছি ও উহার এক বৎসর পূর্ব হইতেই দেহ অপটু, কখনো দু'দিন কখনো একদিন অন্তর জ্বর হয়। কখনো বা একজ্বরী অবস্থানে দিন যাইতেছে—বিশেষত মানসিক চিন্তাও খুব বেশি—এই সব কারণেই পশ্চিমে বায়ু পরিবর্তনে আসা।'

পরে—'শুক্রবার ১১ই ভাদ্র কাণপুর হইতে রওনা হইয়া ইটোয়াতে বন্ধু ত্রৈলোক্য-নাথ শীলের বাড়ি আসিয়া ১২ই সন্ধ্যার গাড়িতে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। ইটোয়াতে জলবায়ু উত্তম। বাঙালীর সংখ্যা অল্প। যমুনার প্রায় উপরেই এই শহর। এখানে একটি দুর্গা ও যমুনাতীরে বশিষ্ঠ-প্রতিষ্ঠিত একটি শিবালয় আছে।'—ইত্যাদি।

আজ প্রায় ১৬ বৎসর আগেকার লেখা। দশ বৎসর ধরিয়া ভবঘুরে হরিহর কি সোজা ঘোরাটা ঘুরিয়াছে। আগ্রা, কানপুর, কাশী, মথুরা, বদরীনাথ, সব স্থানেই কিছুদিন ধরিয়া বাস করিয়াছে। ধীরে ধীরে পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়া-ছিল এক রকম বলিতে গেলে। সেই আষাঢ়ু স্কুলে প্রথম যৌবনে পনের টাকা বেতনে মাস্টারি করা, তারপর পিতা রামচাঁদ তর্কালঙ্কার মারা গেলেন—পিতার মৃত্যুর পর দিন কতক কি কষ্টে গিয়াছিল। পিতা ছিলেন নিরীহ পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ। পুঁথিচর্চা ও পাশাখেলায় সেকালের স্বন্দ্বহীন শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা সহজেই চলিয়া যাইত। ঘরের উঠানে পূজার দো-পাটি ফুলের, দূর্বা-তুলসীর অভাব ছিল না। ঘরের গরু দুধ দিত, শ্বশুরবাড়ি হইতে বাকি সাহায্য হইত। দূর দেশের যে টান আশৈশব তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতার নিকট হইতে তাহা আসে নাই নিশ্চয়। হয়তো আসিয়াছিল মাতৃকুল হইতে, নয়তো কোন অজ্ঞাতনামা পূর্ব পুরুষের রক্ত হইতে, কে জানে? কিন্তু মোটের উপর পিতার মৃত্যুর পর সেই অদম্য পিপাসা তাহাকে ঘরছাড়া করিল। আষাঢ়ু স্কুলের মাসটারি ছাড়িয়া দিয়া এক কার্ত্তিক মাসের সকালে পুঁটলি বাঁধিয়া রওনা হইল—টিকিট কাটিয়া একেবারে কাশী। সেখানে কিছুদিন সংস্কৃত পড়িল, কিছুদিন গান শিখিল, কিছুদিন সব ছাড়িয়া দিয়া শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কুসঙ্গ জুটিল, কত কী হইল। হরিহরের বয়স ৩৬/৩৭ হইবে। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, দোহারা চেহারা, রঙ শ্যামবর্ণ, পরিধানে লাল পাড় ঠেঁটি-ধুতি, বাম হাতেতে একটা তামার মাদুলী। এই মাদুলীটির একটা ইতিহাস আছে—।"

একটি চিঠির চোটে পথের পাঁচালী থেকে বাবার ডায়েরির মূল্যবান দলিল সমেত একটা আস্ত অধ্যায়ই উড়িয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ। আর অপরাজিতর একটি সামান্য মন্তব্যের জন্য একেবারে অ্যাটর্নির ধমক, ক্ষমা চাইতে হবে লেখককে! বন্ধুরা যত বোঝাচ্ছেন, নো ক্ষমা প্রার্থনা, আমরাও অ্যাটর্নি লাগাচ্ছি. লড়তে হবে, ততোই আপত্তি বিভূতিভূষণের, চ্যান করুকগে যাক, যতো সব ফোতোদের কান্ড! আমি বাদ দিয়ে দেবো বইয়ে, বলে আসি। শেষ পর্যন্ত অ্যাটর্নির মক্কেল, ওই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। কিন্তু হিল্লে হল না কিছু। তাঁদের কথা, ওসব লিখছেন কেন বুঝি না মশাই? আসলে আমাদের টাকাকড়ির পরে ঈর্ষা আপনাদের। এবার লিখিত দুঃখ স্বীকার করবেন তো রেহাই পাবেন। দুটি ধাক্কাই এক সম্প্রদায়ের। শীলেরাও সুবর্ণবণিক! এ যেন কাকতালীয়বৎ যোগাযোগ!

তের শ' আটত্রিশের আশ্বিনে অপরাজিত প্রকাশ সম্পূর্ণ হল প্রবাসীতে। কার্তিকেই বিভূতিভূষণের লিখিত দুঃখস্বীকার ছাপা হল। চিঠিটা লেখেন আশ্বিনে, বারাকপুরে বসে। কার্তিকে তা বেরোয় 'অপরাজিত ও সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়' শিরোনামে এবং সূচীপত্রেও তার উল্লেখ করে। বিভূতিভূষণ লিখলেন,

'সবিনয় নিবেদন,

গত মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার 'অপরাজিত' উপন্যাসের কয়েকটি ছত্রে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেন। ছত্র কয়টি এই:—

'সোনার বেনেদের বাড়ির ঘৃত দুগ্ধপুষ্ট আহ্লাদে ছেলে, তাদের না আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে কল্পনার অঙ্কুর। এই বয়সেই তারা এমনি পয়সা চিনিয়াছে, এক ক্লাসের বই পড়া হইয়া গেলে চাকরের হাতে পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রয় করিতে পাঠায়, মাহিনা দিবার সময় আবার ছাত্রের দাদা আগে রসিদটা লিখাইয়া ও সই করাইয়া লয়। দু'তিনবার পড়িয়া দেখে, তারপর মাহিনা দেয়।'

বলাই বাহুল্য এই কথা কয়টি দ্বারা আমি সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় বা উক্ত সম্প্রদায়ের কোন প্রকৃত ব্যক্তিবিশেষের উপরে কটাক্ষ করি নাই। তত্রাচ যদি সেই সম্প্রদায়ের কেহ এই ছত্র কয়টিতে মনে ব্যথা পাইয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহার নিকট এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।—বিনীত—

বারাকপুর, যশোহর — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'।

৭ই আশ্বিন, ১৩৩৮

এই চিঠির নিচে প্রবাসীর পক্ষ থেকে সম্পাদক জানান, তাঁরাও সুবর্ণ বণিকদের কয়েকটি প্রতিবাদপত্র পেয়েছেন। লেখকের ন্যায় তাঁরাও দুঃখ স্বীকার করছেন।

অপরাজিত গ্রন্থাকারে বেরোবার কালে 'সোনার বেনের বাড়ির ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট আহ্লাদে ছেলে'র কথা বাদ দেওয়া হল।

বড় বড় অধ্যায় বাদ গেলেও যা হয় না, একটা ছোট্ট অনুচ্ছেদ মাত্র বাদ গিয়ে তার চাইতেও বড় বিভ্রাট ঘটিয়েছে অপুর পাঠশালায়।

'গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানের পাশেই তাঁহার পাঠশালা।'—এই ভাবে বইয়ের চতুর্দশ অধ্যায়ে 'আম আঁটির ভেঁপু'তে পাঠশালার কথা শুরু। সেখানে অপু পড়তে যাচ্ছে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপমুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ শিগগির করে; আজ যে তুমি পাঠশালায় পড়তে যাবে!...মুড়ি বেঁধে বাবার সঙ্গে পাঠশালায় গেল অপু।...অপুকে লক্ষ্য করে গুরুমশায় বলছেন, 'হাসে কেরে?.. হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যা? এটা নাট্যশালা নাকি?'...তারপর সতেকে দিয়ে থান ইট আনানো, ভয়ে অপুর আড়ষ্ট হওয়া, গলা পর্যন্ত কাঠ হয়ে যাওয়া। তবে 'বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভরতি ছাত্র বলিয়াই, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।'

ওই বাক্যটির সঙ্গে সঙ্গে অনুচ্ছেদ শেষ। পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম লাইন—'পাঠশালা বসিত বৈকালে।' এর পর সেখানে দীনু পালিত, রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল এবং রাজু রায়েরা এসে যেসব গল্প জমাতো সেসব কথা। অপুর দা দিয়ে তামাক কাটার শখ, মাছের ঝোল-ভাত রেঁধে খাওয়ার সাধ, বড় হলে প্যাঁড়া কিনে খাওয়ার স্বপ্ন—ইত্যাদি।

সেসব স্বপ্নসাধের কথা নয়, প্রশ্ন হল, প্রথমে দেখছি অপু স্কুলে যাচ্ছে সকালে আর পরেই দেখছি 'স্কুল বসিত বৈকালে'! সতর্ক পাঠকের পক্ষে এ-রকম সময় বিভ্রাটে জোর চোট খাওয়ার কথা।

কিন্তু কেন এমন 'সকাল-বিকালে'র সংঘাত? বিভূতিভূষণের রচনা এবং বাঙলা সাহিত্যে গ্রাম্য পাঠশালার এমন বহু পঠিত অনন্য চিত্রের মধ্যে এমন মারাত্মক প্রমাদ থাকে? কারণ আর কিছু নয়, মাঝখানের একটি অনুচ্ছেদ বাদ।

বইয়ে 'গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন'-এর পরে যেখানে 'স্কুল বসিত বৈকালে' লেখা, তার মাঝখানকার বর্জিত অনুচ্ছেদটি এ রকম—

'সেই হইতে বছর খানেক অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সে প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠ-শালায় গিয়াছিল। পরে তথায় কিছু হইতেছে না দেখিয়া তাহাকে তাহার বাবা রাজু রায়ের পাঠশালায় ভরতি করিয়া দিল।'

এর পর, পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য—'রাজু রায়ের স্কুল বসিত বৈকালে।'—

অর্থাৎ সকালের পাঠশালা প্রসন্ন গুরুমশায়ের, বিকালের পাঠশালা রাজু রায়ের। দুটি পৃথক পাঠশালা। মাঝের একটি অনুচ্ছেদ এবং রাজু রায়ের নামটি বাদ যাওয়ায়, দুটো ঘুলিয়ে একটি পাঠশালায় দাঁড়িয়েছে বইয়ে। কিন্তু পথের পাঁচালী যখন বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় তখন এ ভুল ছিল না। সেখানে দুটি পাঠশালার পৃথক বর্ণনা।

শুধু সময়ের ব্যাপার নয়, সতর্কভাবে পড়লে এমন আরও কথা বইয়ে পাওয়া যাবে যাতে দুটি পৃথক পাঠশালার আভাস ধরা পড়বে। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে, প্রসন্ন গুরুমশায় বাড়িতেই মুদির দোকান এবং তার পাশে পাঠশালা চালাতেন। কিন্তু 'স্কুল বসিত বৈকালে'র পর যে পাঠশালার বর্ণনা তাতে দেখছি—'কোন দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারি পাশে বন, নিকটে বা অন্য কোন দিকে কোন বাড়ি নাই—শুধু বন।' আবার প্রথমে, গুরুমশায় দোকানের মাচায় বসে সৈন্ধব লবণ ওজন করেন। পরে দেখি, গুরুমশায় বসে থাকেন একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে, তালপাতার চাটাইয়ে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, বই থেকে এসব অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা হয়নি। অথচ একটি অনুচ্ছেদ উধাও, এবং কয়েকটি জায়গায় পরে রাজু রায়ের নামটিও বাদ দিয়ে কেবল 'গুরুমহাশয়' কথাটি রাখা হয়েছে যাতে দু'জন গুরুর আভাস না থাকে।

তবু চিহ্ন থেকে যায়। পথের পাঁচালী শেষ করে তা অপরাজিততে এসে ধরা পড়ে।

'অপরাজিত'তে আছে, মাঠে কারা শুকনো খেজুর ডালের আগুনে রস জ্বাল দিচ্ছে দেখে অপুর সেখানে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, কারণ—

'রাজু রায়ের পাঠশালার সেই দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথা বার্তার প্রতি তাহার প্রবল মোহ আছে—একটা বিস্তৃততর, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়।'

কে এই রাজু রায়? বইয়ে তো প্রসন্ন গুরুমশায়ের কথা। সেখানে দীনু পালিত রাজকৃষ্ণ সান্যাল, রাজু রায় প্রমুখ আড্ডা দিতে আসতেন, গল্প করতেন। পাঠশালা তো প্রসন্নর। কিন্তু বিচিত্রায় রয়েছে, বিকালে রাজু রায়ের পাঠশালায় ওই সব বয়স্কদের গল্প করার কথা। 'অপরাজিত'তে তারই উল্লেখ।

নিজের জীবনেও বিভূতিভূষণ একাধিক গুরুর পাঠশালায় গিয়েছেন। প্রসন্ন গুরুমশায় তাঁর হাতেখড়ির গুরু। সে নামটি ঠিক রেখেছেন পথের পাঁচালীতে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ রাজু রায়ের পাঠশালা বলতে হয়তো হরি রায়ের পাঠশালা বোঝাতে

চেয়েছিলেন। একেবারে নিজ গাঁয়ের লোক বলেই নামটা ঘুরিয়ে দিতে পারেন। তবে অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে অনেক মিল বর্তমান। উপন্যাসের প্রয়োজন একটি পাঠশালাতেই মিটতে পারে, কিন্তু নিজের জীবনের কথা লিখতে গিয়ে এসব ঘটনার কোনটিকেই বোধহয় বাদ দিতে চাননি তিনি। অথচ বাদ গিয়েছে, এবং বিভ্রাট ঘটিয়েই বাদ গিয়েছে। পরের পর সংস্করণে পথের পাঁচালীতে অনেক গ্রহণ-বর্জন, অদল-বদল করেছেন বিভূতিভূষণ। পাঠশালা অধ্যায়েও হাত পড়েছে। প্রমাণ অনেক। তবু সকাল-বিকালের সমস্যাটি রয়েই গিয়েছে।

'ইউনেসকো'র উদ্যোগে প্রকাশিত পথের পাঁচালীর ইংরাজি সংস্করণে কিন্তু পাঠশালার এই সময়-সমস্যার অনেকটা সমাধান চেষ্টা হয়েছে ভাষার একটু মোচড়ে। অপুর সকালে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে যেখানে আছে 'পাঠশালা বসিত বৈকালে', সেখানে বলা হয়েছে 'দি আফটারনুন সেশন অব দি স্কুল ওয়াজ অ্যাটেনডেড বাই সাম এইট অর টেন স্টুডেনটস—যেন একই স্কুল বিকালেও বসত এ-রকম একটা ভাব। এবং এ-ভাবটি বোধহয় পেয়েছেন তাঁরা সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'পথের পাঁচালী'র সংক্ষিপ্ত শিশু সংস্করণ থেকে।

বোধহয় ওই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থেকে আরও কিছু উৎসাহ পেয়ে থাকবেন তাঁরা।

শৈশবের স্বপ্ন জগত ছেড়ে জীবন-সংগ্রামের জন্য অপুর কাশীর জীবনযাত্রার যেন কঠোর কর্তব্যের মথুরা বাস বর্ণিত হয়েছে শেষ অধ্যায়ে। গ্রাম থেকেই এই করুণ অথচ অনিবার্য বিদায় কাহিনীর প্রথম নাম ছিল 'উড়ো পায়রা', পরে বদলে করা হয় 'অক্রুর সংবাদ'। ইংরাজি অনুবাদক তিন অধ্যায়ে বিধৃত মূল বই থেকে শেষের অধ্যায় এই 'অক্রুর সংবাদ' আস্ত বাদ দিয়েছেন। রেখেছেন 'বল্লালীবালাই'—দি ওলড আনট, এবং 'আম আঁটির ভেঁপু'—চিলড্রেন মেক দেয়ার ওন টয়স'। মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসট্যানট সিগনাল অপুর চোখের থেকে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বই শেষ। অপুর সঙ্গে পাঠকের কাশী যাত্রা হয়নি ইংরাজি সংস্করণে।

গ্রন্থটির অন্যতম অনুবাদক টি. ডবল্যু ক্লারক ভূমিকায় কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যা যেমন ঘটেছে তেমন করে বলে যাওয়াই ব্যানারজির রীতি। ঘটনা মিলিয়ে সুতোয় গেঁথে নেওয়ার দায় ছেড়ে দিয়েছেন তিনি পাঠকের 'পরে। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে অপু তার দিদি দুর্গা, তাঁর ঘর, তার গ্রাম থেকে বিদায় নিচ্ছে—এমন একটা অপূর্ব ক্লাইম্যাকস-এ লেখক নিজের অজ্ঞাতেই পেঁীছেছিলেন' তবু থামেননি, কারণ নাটকীয়তা সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য নয়, অথচ পাঠককে আর এগোতে দিলে সে কিন্তু অ্যানটি ক্লাইম্যাকসে পেঁীছবে। চলচ্চিত্রে রূপায়ণকালে সত্যজিৎ রায় এখানেই শেষ করেছেন। সজনীকান্তকৃত সংক্ষিপ্ত শিশু সংস্করণও শেষ এখানে। একেই অনুকরণ করা হয়েছে নয়াদিল্লীর সাহিত্য আকাদমির সহযোগিতায় প্রকাশিত পথের পাঁচালীর ফরাসী অনুবাদে। এই যুক্তিগুলি নিজ পক্ষে রেখে শ্রী টি. ডবল্যু ক্লারক বলেছেন—

'হোয়েন দ্য ট্রেন জারনি টু বেনারস বিগিনস, দ্য কাসট হ্যাজ অলরেডি ব্রোকেন আপ ফর অপু দ্য রোড গোজ অন; বাট দুর্গা, হিজ হোম অ্যানড হিজ ভিলেজ, আর নাউ ফাইনালি লেফট বিহাইনড। অ্যাজ দ্য ট্রেন ড্রজ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য স্টেশন, দ্য লাসট করডস অব দ্য সিমফনি আর স্ট্রাক, অ্যানড দ্য রেস্ট শুড বি সাইলেনস।'

ঠিক এই কারণেই আশী পৃষ্ঠার একটা পুরো অধ্যায় বাদ দেওয়া যুক্তিসহ কিনা তা পণ্ডিতদের বিচার্য। উল্লেখ্য একটি কথা। বিভূতিভূষণ তাঁর বইয়ের চলচ্চিত্র রূপায়ণ দেখেননি। তবে তাঁর একটি গল্প আছে 'উড়ুম্বর' নামে। কালিদাস, ভবভূতি

থেকে ব্যাস পর্যন্ত তাঁদের বইয়ের ফিলম করাতে ব্যস্ত—এমন একটা ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে এ যুগের ফিলমপ্রীতির আতিশয্যকে তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনেছেন তিনি। লেখকদের ফিল্মের প্রতি লোভকে ব্যঙ্গ করাই 'উড়ুম্বর' গল্পের লক্ষ্য।

যা হোক, ক্লাইম্যাক্সে ওই সিমফনির জন্যই পথের পাঁচালীর ইংরাজিতে অনূদিত নামকরণ হয়েছে 'সঙ অব দি রোড'।

একদিন পথের পাঁচালী নাম নিয়ে বন্ধু নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের কথা, বিশেষ করে 'পাঁচালী' শব্দে নীরদের না-পছন্দ আর নাছোড়বান্দা বিভূতিভূষণ। ভবিষ্যৎ কালের এই ভাষান্তরের আভাসও কি পেয়েছিলেন সেদিন লেখক? সেই 'ওম্' নিয়ে কত তর্ক। নীরদ চৌধুরী বলছেন, 'বদলান শব্দটা।' বিভূতিভূষণ বদলাবেন না। শীত-চাদরের উষ্ণ আমেজ বোঝাতে অন্য কোন বিকল্প শব্দ তিনি ইন্দিরঠাকরুনের মুখ দিয়ে বলাবেন না। সেদিন কি তাঁর কল্পনায় ছিল এই ভাষান্তরণের কথা? 'দিব্যি কেমন ওম্—মোটাসোটা দিব্যি কাপড়'—ইন্দিরঠাকরুনের এই কথাটি অনুবাদে 'ওহ্, ইটস্ লাভলি! সি একসক্লেমড। ইট'ল বি বিউটিফুলি ওয়ারম; ইট'স সো নাইস অ্যানড থিক।'

বৈঁচি-ঘেঁটু-সোঁদালিরা অবশ্য অপরিবর্তিতই আছে যথাসাধ্য; এবং ইংরাজি বইটিও বারাকপুরের সেই গ্রামের গন্ধে ভরপুর।

তবে গ্রামের নামটি ভুল হয়েছে ভূমিকার লেখক পরিচিতিতে। বিভূতিভূষণের পূর্বপুরুষের আদিবাড়ি চব্বিশ পরগণার 'পানিতর'কে বলা হয়েছে 'পানিতা'। তা হোক, পরে তাঁরা বাসিন্দা হন বারাকপুরের। নিজের গ্রাম বলতে এই বারাকপুরকেই তিনি বুঝতেন, বলতেন। কিন্তু ইউনেসকোর বইয়ের ভূমিকায় গ্রামের নাম বলা হয়েছে নানগ্রাম ইন দ্য বারাকপুর ডিসট্রিকট। প্রথম কথা, বাবাকপুর বলে কোন জেলা নেই, আছে একটি মহকুমা, চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত। বিভূতিভূষণের বাড়ি সে ব্যারাকপুর নয়। একদা যশোহর জেলার, বর্তমানে চব্বিশ পরগনা জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ইছামতী তীরবর্তী একটি ছোট্ট গ্রাম এই বারাকপুর। 'নানগ্রাম' বলে কোন গ্রামের অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা জানি না। আবার দেখছি ভূমিকায় আছে, গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি নানগ্রামে হাই স্কুলে পড়তে যান। ও'র গ্রাম যশোর হলেও স্কুল, রেল স্টেশন, বাজার ইত্যাদি দেড় মাইল দূরবর্তী নদীয়া জেলার গোপাল-নগর। এই গোপালনগরই বিভূতিভূষণের গ্রামের ডাকঘরের ঠিকানা। বহু ক্ষেত্রেই বিভূতিভূষণ নিজের গ্রামের ঠিকানা দিয়েছেন, গোপালনগর—জেলা নদীয়া বলে। জাঙ্গিপাড়া স্কুলের খাতায়ও তাঁর বাড়ির ঠিকানা—বিভূতিভূষণ ব্যানারজি, পোঃ গোপালনগর, জেলা নদীয়া।

যাই হোক, হাই স্কুলে পড়তে যান বিভূতিভূষণ 'বনগ্রামে'। এই বনগ্রামকেই নান-গ্রাম বলা হয়নি তো? লনডনের জরজ অ্যালেন আনউইন লিমিটেডের প্রকাশিত অমন একখানি সুমুদ্রিত সনিষ্ঠ অনুবাদগ্রন্থে এ-রকম একটি মুদ্রণ প্রমাদ একাধিকবার কি সম্ভব? বাড়ি নানগ্রামে, বাড়ির গ্রাম্য স্কুল ছেড়ে পড়তেও যাচ্ছেন নানগ্রাম হাই স্কুলে এ-রকম অসঙ্গতিই বা থাকবে কেন? বিশেষ করে অনুবাদক হিসাবে শ্রীক্লারকের সঙ্গে যখন শ্রীতারাপদ মুখারজির ন্যায় অপর একজন বিশিষ্ট বাঙালীর নাম রয়েছে তখন বিভূতিভূষণের গ্রাম নিয়ে নির্ভুল তথ্য থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বইখানি আজ এঁদের জন্যই বিশ্বপাঠকের সামনে উপস্থিত। বইখানি উপনীত তার ভাষার অতীত তীরে। আগ্রহটা সেখানে বেড়েছিল বইটির সত্যজিৎ রায়কৃত

চিত্ররূপ দেখার পরেই। ভাষান্তরিত মূল বই আলোড়ন তুলল এবার। কোন কোন সমালোচকের খেদ—কেন এত বিলম্বে পেলেন তাঁরা এমন বই। কারও কথা, 'মারভেলাস'। হ্যাঁ, পথের পাঁচালী সম্বন্ধে ওই মন্তব্যটি করে অকসফোরড সেলস-এর অন্যতম সমালোচক এম. জি. ম্যাকনে কিন্তু বহু আলোচিত ক্লাইম্যাকস প্রসঙ্গেও একটি কথা বলেছেন। তাঁর কথা, ব্যানারজি নিজেই হয়ত অত পরিচ্ছন্ন সমাপ্তি চাননি। তিনি জানতেন, উপন্যাসের মত জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।'

বিখ্যাত সমালোচক মারটিন স্যামুর স্মিথ এডিনবরার দ্য স্কটসম্যান পত্রিকায় বইটিকে অভিনন্দিত করে বললেন, 'বাঙলা ভাষার এই ধ্রুপদী গ্রন্থটি ইংরাজি ভাষাতেও 'ক্লাসিক' পর্যায়ে গণ্য হবে।'

উনিশ শ' পঁচিশের বিশ নবেমবর ডায়েরিতে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'একান্ন বৎসর পরে আমার কোন চিহ্নও খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়ত থেকে যাবে।' 'লেখা থেকে যাওয়া' কোন্ অর্থে বলেছিলেন জানি না, তবে শুধু থেকে যাওয়া নয়, বিশ্বপাঠকের কাছে, এই দিনলিপির প্রায় তাঁর কল্পিত সময় সীমার মুখে এসেই নতুন করে হৃদয়বিজয়ের অভিযান শুরু করল পথের পাঁচালী—একান্নর জায়গায় তেতাল্লিশ বছর পরে।

কিন্তু পরের কথা বলতে আবাব গোড়ার কথা হারিযে না যায়। ফিরে যাই সেখানে, সেই পথের পাঁচালী-অপরাজিত বাঙলা ভাষায় ছাপা হল, তারপর।—

তারপর দু'খানি বই নিয়ে হৈ-হৈ। লেখককে নিয়ে টানাটানি, অভিনন্দন, সভা-সমিতিতে সম্বর্ধনা, আলোচনা সমালোচনা পত্রপত্রিকায লেখালেখির ঝড়। এ-রকম নগদপ্রাপ্তির আর নজির নেই বাঙলাদেশে।

তখনকার বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক পত্র ত্রৈমাসিক পরিচয়ে তের শ' উনচল্লিশ শ্রাবণ সংখ্যায় নীরেন্দ্রনাথ রায় পথেব পাঁচালী নিযে এক মস্ত নিবন্ধ লেখেন। তাতে প্রথমেই তিনি স্বীকার করলেন—বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী লেখক, কারণ তাঁর প্রথম বই যে 'খ্যাতি ও স্তুতি' লাভ করেছে তা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎ-চন্দ্রের ভাগ্যে জোটেনি।

তিনি বললেন, পথের পাঁচালীতে শিশুচিত্তের বিকাশোত্তি' :স লেখক অনন্য-সাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ কীর্তি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।

প্রসঙ্গত অপরাজিতর কথা এনেছেন। বলেছেন, বিভূতিভূষণ যে কবি, অপরাজিতই তার প্রমাণ।

প্রকৃতিবর্ণনা, বিশেষ করে বিন্ধ্যারণ্য চিত্রণের সুখ্যাতি করে নীরেন রায় বলছেন—ভাষার লালিত্যে, ভাবের ঘনত্বে, পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় এর তুলনা বাঙলা ভাষায় দুর্লভ।

বিভূতিভূষণ যে নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারেননি, এই আলোচনাটিতে তাও ব্যক্ত। নীরেনবাবুর কথা, ছদ্মবেশী আত্মচরিত বলে, গ্রন্থকারেব জীবনের দ্যোতনা-পূর্ণ এমন অনেক ঘটনা যা সাধারণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত সাধারণ মনে হবে, তাও বেশ গুরুত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে বইয়ে।

তির্যক কিছু বক্তব্য ছাড়া সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা সোপকরণ শুদ্ধি হয় না, এটাই রেওয়াজ। সুতরাং তাও আছে। ইতুপুজা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে না হয়ে কেন মাঘে

হল, কেন সরস্বতী পূজো মাঘের কয়েক 'দিনের' বদলে কয়েক 'মাস' পরে ছাপা, সে প্রশ্ন আছে। সর্বোপরি বলা হল দুটি কথা। মানবচরিত্র অঙ্কণে তাঁর দৃষ্টি অগভীর। আর অপু-লীলার প্রণয় সম্বন্ধের উল্লেখ করে বললেন—লেখক রমণী-মন-অনভিজ্ঞ।

প্রসঙ্গত নীরদ চৌধুরীর একটি কথা মনে হল। বালিগঞ্জে তাঁর দাদার বাড়িতে বসে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। পথের পাঁচালীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অবশ্য অন্য জাতের। তিনি বলেন, বাঙলা সাহিত্যের তিনখানা মাত্র উপন্যাস বাছাই করতে দিলে তিনি তার মধ্যে একখানা তুলে নেবেন পথের পাঁচালী। সে অন্য কথা। ব্যক্তি মানুষটি সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নীরদ চৌধুরীর কাছে নানা কথা শুনছিলাম। হঠাৎ বললেন, বি. এ. পরীক্ষার আগে ও কিছু পরে কয়েক মাসের জন্য স্ত্রীসংসর্গ তো করেছেন বিভূতিবাবু; কিন্তু জানেন মশাই, পথের পাঁচালী অপরাজিত লেখা পর্যন্ত নারী যে...বলে থামলেন।

পাশেই বসেছিলেন নীরদবাবুর স্ত্রী অমিয়া দেবী। নীরদবাবু বললেন, চলুন পাশের ঘরে। অমিয়া দেবী বললেন, তোমরা বরং বোসো, আমিই উঠি।—তা কেন। তুমি বোসো না, আমি ও'কে একটা কথা বলেই আসছি। আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে, বিভূতিভূষণের, রমণী মন কেন, রমণী দেহ এবং তাদের শারীরধর্মের নিয়মিত ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য ঘটনা বললেন মেসসঙ্গী নীরদ চৌধুরী।

নীরেন রায়ের পরে আর এক রায়—ডঃ নীহাররঞ্জন। তিনি লিখলেন পরিচয়ের তিন মাস পরে বিচিত্রায় কার্ত্তিক সংখ্যায়। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত মিলিয়েই তাঁর আলোচনা। তাঁর কথা, 'এই বই দু'খানির মধ্যে পাই একটা সেনস অব স্পেস, একটা উদার উন্মুক্ত বিশালতার আভাস।. তিনি মানুষকে বুঝেছেন ও জেনেছেন, যেখানে সে অসীম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সীমাহীন প্রকৃতির আত্মীয় এবং আদিঅন্তহীন শাশ্বত কালের সঙ্গে সে নিজেকে এক করে অনুভব করেছে। এই উপলব্ধির সীমা নেই।

ডঃ নীহাররঞ্জনের ভাষায়, যাঁরা এপিক লিখেছেন, যাঁরা সুবিশাল কক্ষের দেয়ালের পর দেয়াল জুড়ে বড় ফ্রেসকো এঁকেছেন, মনের জগতে বিভূতিভূষণ তাঁদের আত্মীয়।'

তবে সমালোচক বললেন, দুটি বইয়ে প্রকৃতিবর্ণনার বৈচিত্র্য কম।

একটি বাস্তব জীবনচিত্রে নেহাত বৈচিত্র্য আনার জন্যই কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে লেখকের আপত্তি ছিল কিনা সে প্রশ্ন না তুলে নীহাররঞ্জনের পরবর্তী উক্তিটির উল্লেখ করি—'যদিও অমরকণ্টকের বর্ণনা ক্লাসিক্যাল তুলনা নেই তার'।

একটা কথা। নিজের কোন বই সম্পর্কে কোন সমালোচনা হলে কিছু বলতেন না বিভূতিভূষণ—না লিখে, না মুখে। নীরেন রায়ের অনেক কথার পরোক্ষ প্রতিবাদ করেছেন নীহার রায়। অপুর জীবনের অগভীরতা সম্পর্কে নীরেন রায়ের বক্তব্য সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়—'অপুর জীবন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত এবং বোধহয় গভীরতা ও প্রসারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক-বিরোধ আছে।'

সে যে যাই বলুন, সামনে কেউ লেখার নিন্দা করলে চুপ করে থাকতেন লেখকটি। কেউ যদি বলেন, অমুক আপনার লেখার এমনি সমালোচনা করেছেন, বিভূতিভূষণ হয়ত বলবেন, ও, তাই নাকি। এর বেশি নয়। তবে কেউ প্রশংসা করলে বেজায় খুশি, হাসতেন, মাথা দোলাতেন। রাত্রে ঘরে গিয়ে ডায়েরিতে টুকে রাখতেন।

বিভূতিভূষণের যে-কোন লেখাই তখন আলোচ্য হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে যেমন মেঘমল্লার গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তেমনি

মৌরীফুল' গল্পগ্রন্থ নিয়ে পরিচয়ে আলোচনা করেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। তবে সবার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে একটি বই—পথের পাঁচালী।

অন্নদাশংকর রায়ের কথায়, 'বাঙলা উপন্যাসের সবচেয়ে ছোট একটা তালিকা করলেও পথের পাঁচালীকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। দশখানার মধ্যে একখানা তো বটেই, পাঁচখানার মধ্যেও একখানা।'

তিনি বললেন, 'পথের পাঁচালী তার ভিতরকার আসল মানুষটিকে মরণাতীত করবে। দেশ যখন আমাদের অনেকের নাম ভুলে যাবে তখনও তাঁর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে অগণিত পাঠকের চিত্তপটে।'

এই 'ভিতরকার আসল মানুষটি' যে অপু এবং বিভূতিভূষণের অভিন্ন সত্তা তা বুঝতে আর বাকি ছিল না সেদিন কারও। সবাই জেনেছে সেদিন, বিভূতিভূষণ আর অপুর মধ্যে কেবল লেখক-নায়ক সম্বন্ধ নয়, আরও কিছু বেশি।

রাজশেখর বসু তো পরিষ্কার বললেন, 'প্রথম আলাপেই মনে হল তিনি স্বয়ং তাঁর সৃষ্ট অপু।'

একথা ঠিক, পথের পাঁচালীতেই অপুর প্রথম প্রকাশ বলে তার সম্পূরক গ্রন্থ 'অপরাজিত'র কথা সেদিন পৃথকভাবে কম উচ্চারিত হয়েছে। কিছুটা উপেক্ষিতও হয়েছে হয়ত বা। রসিকজনের দৃষ্টি অবশ্য এড়ায়নি।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথাটি স্মরণীয়। 'আমার মনে আছে ছাত্রাবস্থায় যে অধীর আগ্রহে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা পড়তুম সেই আগ্রহে উক্ত কালে মাস-মাস অপরাজিত পড়বার অপেক্ষায় থাকতুম।

'আমার কাছে অপরাজিত বিভূতিভূষণের সর্বশ্রেষ্ঠ বই বলে মনে হয়। আর এর মধ্যে অপুর বিবাহের আর বিবাহিত জীবনের যে মনোজ্ঞ ছবি বিভূতিভূষণ এঁকে গিয়েছেন সেটিকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'লভ আইডিল' বা প্রেমচিত্রের অন্যতম বলে আমার মনে লেগেছে।'

অতো সুখ্যাতির নায়ক বিভূতিভূষণকে নিয়ে নানা দিকে আলোড়ন। নানা সভায় সম্বর্ধনার আয়োজন। রিপন কলেজেও চাঞ্চল্য জাগা স্বাভাবিক। বিভূতিভূষণ সেখানকার প্রাক্তন ছাত্র। নিজেদের দাবি সাব্যস্ত করতে ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিত উদ্যোগে হল বিভূতি-সম্বর্ধনা। পুরোহিত স্বয়ং বীরবল—প্রমথ চৌধুরী। বারো সেপটেমবর, উনিশ শ' তেত্রিশ।

কলেজের পক্ষ থেকে অভিনন্দনবাণী পাঠ করলেন অধ্যক্ষ মহোদয়। এর উত্তরে সবিনয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন বিভূতিভূষণ। তাঁর জীবনের এই যেটুকু সাফল্য তা মুক্তরূপা প্রকৃতির দান। প্রকৃতিই তাঁর চোখে অঞ্জন পরিয়ে দৃষ্টি খুলে দিয়েছে... ইত্যাদি।

প্রতিক্রিয়াটি বেসুরো ঠেকছিল। একটা মৃদু গুঞ্জরণ আশেপাশে, অধ্যাপকমহলে! সব চুপচাপ। ব্যাপার কী?

ব্যাপারটা খোলসা করলেন তৎকালীন ইংরাজি সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য। তিনি মঞ্চে দাঁড়াতেই ভাবখানা বোঝা গেল। সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ।—এই কলেজেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র আজ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন এ তাঁদের অত্যন্ত আনন্দের কথা। তবে তাঁরা আশা করছিলেন, যতো সামান্যই হোক, এই শিক্ষায়তন ওঁর জীবন গঠনে যতটুকু সাহায্য করেছে তার উল্লেখ থাকবে উত্তরে।

বিভূতিভূষণের পাশেই বসেছিলেন কবিবন্ধু কালিদাস রায়। ওঁকে চুপি চুপি

বললেন, করেছো কী! কলেজ লাইফ সম্বন্ধে না হয় বানিয়েও দু' কথা বলতে।

বিভূতিভূষণ নির্বিকার।

এমন সময় সভাপতি দাঁড়ালেন। গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, আদ্দির বুটিদার পাঞ্জাবি পরনে, সাদা ঢিলেঢালা পাজামা। প্রশস্ত ললাট, গভীর দৃষ্টি, সমালোচনার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল গাণ্ডীবধন্বা বীরবল।

বিভূতিভূষণের প্রায় কম্প দিয়ে জ্বর এলো। মেঠোসুরের একতারার মত একখানি পাঁচালী হাতে পল্লী বাঙলার এক চারণ যেন আসামী। অপর দিকে ঠিক যেন বিপরীত কোটি থেকে দণ্ডায়মান আধুনিক নাগরিকতার ভাষ্যকার প্রমথ চৌধুরী। মোক্ষম কিছু একটা শুনবার জন্য মুহূর্ত গুনছে সভা।

কিন্তু এ কী বলছেন বীরবল?—পিতৃভূমি পাবনার হরিপুরে, কাটিয়েছি কৃষ্ণ-নগরে। আবার কর্মজীবনে পদ্মা, তাব তীরবর্তী পল্লী, পথ, প্রকৃতি, প্রাণিকুল—এ সকলের সঙ্গেও পবিচয় ঘটেছে। একটানা নগরজীবনের মধ্যে সেইসব সুন্দর দিনের আলো যেন ঝলকিয়ে উঠল হঠাৎ এই লেখকেব বইয়ে। কী এক আশ্চর্য দৃষ্টির আলোয় লেখক তাঁর নিশ্চিন্দিপুরকে দেখেছেন' সে আলোতে সারা পল্লিপ্রাণই যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে।

তারপরে বিভূতিভূষণের কথার জের টেনে বললেন, ও'র কথা ভেবে দেখবার মত। শিক্ষাক্ষেত্রে যা চলছে তাতে কোন ছাত্র যদি এই সরস্বতীর মন্দিরগুলিকে জীবন গঠনের তীর্থ বলে মনে করতে না পারে সে ত্রুটি তার নয়। স্কুল পালিয়েই রবীন্দ্র-নাথকে পরম অভিজ্ঞানপত্র হাতে নিতে হয়েছিল। এখানে পথই বিভূতিভূষণকে পাঁচালীকার করেছে।

করতালিধ্বনির মধ্যে সভা শেষ। বিভূতিভূষণের তখনও কম্পন, তবে এবার আবেগের। কালিদাস রায ঝাঁকুনি দিলেন আনন্দে, হযে গেল বিভূতি, বীরবলের সার্টিফিকেট! এবার নির্ভযে বাণীবনে বিচরণ কব। বাঙলাদেশ এখন তোমার হাতের মুঠোয়।

বীরবলকে, অধ্যাপকদেব নমস্কার করে মেসের পথে পা দিলেন বিভূতিভূষণ। বীরবলের একটি কথা বার বার আজ মনে পড়ছে, 'সবস্বতীকে কিনডারগারটেনের শিক্ষয়িত্রীতে পবিণত করার জন্য যতদূব শিক্ষাবাতিকগ্রস্থ হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।' বীরবলের একটি মন্তব্য টোকা আছে বিভূতি-ভূষণের দিনলিপি তৃণাঙ্কুরে—ইন ইয়োরোপ হি কুড হ্যাভ বিন এ সেলিব্রিটি।

তা তো হল, প্রশংসা-অভিনন্দনে তো অভিষেক হল অনেক। তবু একটি মুখ থেকে যদি আশীর্বচনের মত উচ্চারিত হত একটি মাত্র বর্ণ, সাধনাকে ধন্য মানতেন তিনি। সে তাঁর কল্পলোকের দেবতা। মাঝে মাঝেই কথাটা মনে হয়।

হঠাৎ একদিন খেলাত স্কুল থেকে মিরজাপুরের মেসে এসে খবর পেলেন, আজ প্রশান্ত মহলানবিশের বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেদিনের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ আছে একথা। তারিখটা পাঁচ এপরিল, উনিশ শ' তেত্রিশ।

মহলানবিশের বাগানবাড়িতে গিয়ে দেখেন সুনীতিকুমার, কালিদাস নাগেরা আগে থেকেই সেখানে হাজির। একটু পরেই এলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই কল্পলোকের দেবতা সশরীরে আশীর্বাদ করলেন। প্রশংসা করলেন পথের পাঁচালীর। বললেন, এ-বিষয়ে কিছু লিখেও পাঠিয়েছেন পরিচয়ে।

সেই সন্ধ্যার অসীম আনন্দের মধ্যেই মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী অর্থাৎ

রানী মহলানবিশ জলযোগের নামে প্রায় ভূরিভোজনে আপ্যায়ন করলেন সবাইকে। বিভূতিভূষণের মনে আছে, একটির পর একটি আইটেম আসতে আসতে শেষে যখন এলো আইসক্রিম রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, আরে স্টিল দে কাম!

শুধু কবির দুর্লভ সংসর্গলাভই নয়, একটা সম্পর্ক যেন স্থাপনা করলেন কবি ওই তরুণের সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যে ডাক এলো কবির কাছ থেকে, তাঁর নতুন লেখা 'বাঁশরি' তিনি শোনাতে চান। কথাটি লেখা আছে ও'র দিনলিপিতে উনিশ শ' তেত্রিশের পয়লা মে—'স্কুল থেকে টাকা নিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্ধান করেছেন। তাঁর নতুন নাটক পড়বেন, বলেছেন বিভূতিকে আনা চাই।'

ইতিমধ্যে বৈশাখে পরিচয় প্রকাশ করল রবীন্দ্রনাথের ওই আলোচনা। বাংলা তারিখ অনুসারে সেটা তের শ' চল্লিশ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'আমার দেহ শ্রান্ত এবং কলম কুঁড়ে হয়ে এসেছে। সমালোচনা করবার মত উদ্যম হাতে নেই। বিপদ এই ঘটল, আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোন মত দিইনি—এই অপরাধ হল নিবিড়—যথা, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী।...

পথের পাঁচালী আখ্যানটাও অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্ম আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালী যে বাঙলা পাড়াগাঁয়ের কথা তাকে নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, কোন জিনিস ঝাপসা হয়নি। মনে হয় খুব খাঁটি উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্য সস্তাদরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই—বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখিনি। এই গল্পে গাছপালা, পথঘাট, মেয়েপুরুষ, সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনেব থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত কবে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল, অথচ পুবাতন পরিচিত জিনিসের মত তা সুস্পষ্ট।'

॥ এগার ॥

শ্রীরামপুরে বনফুল সাহিত্য সংঘের আমন্ত্রণে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ। জমজমাট সাহিত্যবাসর। সবাই উৎকর্ণ, এক্ষুনি প্রধান অতিথিব ভাষণ। হঠাৎ উঠে গেলেন প্রধান অতিথি।

উদ্যোক্তারা উদ্‌বিগ্ন। কোথায় যাচ্ছেন? গোস্বামীপাড়াব ঠাকুরদাসবাবু লেনের একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখালেন বিভূতিভূষণ, ওই দিকে যাবো।

প্রধান অতিথি না থাকলে সভা সামাল দেওয়া দায়। উদ্যোক্তারা বোঝালেন, এক্ষুনি একটা গানের পরই বক্তৃতা। তাছাড়া জানালেন, ওই উদ্দিষ্ট বাড়ির একটি ছেলে বিভূতিভূষণের জন্যই মঞ্চের পিছনে অপেক্ষা করছে। ও'রা তাকে বক্তৃতা পর্যন্ত বসিয়ে রাখবেন।

কোথায় ছেলেটি? ছেলেটিকে আনা হল। বাবার নাম কী?

পাঁচু ভাদুড়ী।

বিভূতিভূষণ বুঝতে পারলেন না। লজ্জা ভেঙেই প্রশ্ন করলেন—মায়ের নাম?

না। মায়ের নাম সে যা বলল সেটা ওর ঠাকমার ডাকা নাম।

বিভূতিভূষণ চিনতে পারলেন না। মুখে কি কোন আদল আসে? একবার খুঁজে দেখতেই হবে। কিছুদিন আগে এসেছিলেন আনন্দ পরিষদের সভায় উনিশ শ' ঘাত্রিশের পয়লা মে। সেবারও খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উদ্যোক্তারা ধরে নিয়ে গেলেন শ্রীমতী লীলা গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। তবু লোক পাঠিয়েছিলেন তল্লাসীতে। বাড়িটাতে কোন লোকেরই নাকি খোঁজ পাননি ও'রা। এভাবে তিনি হারিয়ে যেতে দেবেন না অন্নপূর্ণাকে—ফুলিকে।

কোনরকমে ভাষণ শেষ করে পা বাড়ালেন ওই বছর আটেকের ছেলেটির সঙ্গে। আশ্চর্য, ছেলেটিও এগিয়ে চলেছে ওই গোঁসাইপাড়ার দিকেই। যেতে যেতে সেই ঠাকুরদাসবাবু লেনের গলির মধ্যেই। একটা কোঠাবাড়ির সামনে এসেই ছেলেটি ও'র হাত ছেড়ে দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলো। ওমা, এই দ্যাখো না, মামাকে ধরে এনেছি।

মামা! একটা চমকের মুহূর্ত গুনছেন বিভূতিভূষণ। এমন সময় দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো একটি বউ। কে?

মুখের ঘোমটা সরিয়ে দিল অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা! ফুলি! হাউ শুড আই গ্রিট দী? ইন সাইলেনস অ্যানড টিয়ারস? কারো মুখে কথা নেই।

না, আজ আর কোথাও নয়, উদ্যোক্তাদের লোককে ফিরিয়ে দিল অন্নপূর্ণা। আজ সে অকুণ্ঠ, অনর্গল। সারারাত ধরে কথা বলবে দু'জনে, কত জমানো না-বলা কথা। অন্নপূর্ণা জানে, তার দাদার নাম আজ যে গগনে দীপ্তিময়, কোন ক্লিন্ন হাত কুৎসার কালিমা ছিটিযে তুলতে অক্ষম ততো দূর। আজ আর কেউ পারে না জননী অন্নপূর্ণার মর্যাদায় আঘাত হানতে।

বিভূতিভূষণও সম্মত। ছাতে বসে গল্প হল দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত। স্মবণের আবর্তে ভেসে আসে বেদনার রক্তরাগে রঞ্জিত দিনগুলি। মাসটার কাকু, ফুলি, নিভাননী, মা মৃণালিনী—সব স্মৃতি। সেই সত্য মজুমদারের ঘরখানা। একটু একটু করে রাত বাড়ছে। মা সংজ্ঞাহীন প্রায, ফুলি জলন্যাতা নিয়ে আসছে মার কপালে দিতে। নিভাননী বলছেন, আর কী হবে দিয়ে, থাক। তাঁর কোলেব 'পরে নুটু ঘুমিযে পড়ছে। অন্নপূর্ণা তাকে ডেকে নিয়ে খাইযে দিল। বিভূতির আর খাওয়া হয়নি। মা বিদায় নিচ্ছেন—কতো টুকরো টুকরো চিত্র মিলে এক অখণ্ড চিত্রপট। ঠিক হল পরদিন সকালে এক সঙ্গে ও'রা দু'জনেই রাজপুর যাবেন। যেমন কথা, তেমন কাজ, ভোরের ট্রেনেই যাত্রা।

নতুন চমক সেখানে। রাজপুর পেঁাছেই দেখেন, মণিরা সব ঘিরে আছে নিভাননীকে। গো-রক্ষিণী সভার কাজে চাটগাঁয়ে সেই যে উঠেছিলেন অন্নদাচরণ দত্ত চৌধুরীর বাড়ি, ওরা সব তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়ে। উনিশ শ' তেইশ-এ ওদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের জন্য। কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে সেই সম্পর্কের সুতোটিকে ওরা বুনে বুনে চলেছে। বেঁধেছে বিভূতিভূষণকে। দেখাসাক্ষাৎ আর ঘটল কই তারপরে! তবে অন্নদাবাবু, তাঁর বড মেয়ে মণিকুন্তলা—ও'রা চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছেন। এতদিন বাদে ওদের সঙ্গে দেখা। শুনলেন এই রাজপুরেই এক আত্মীয় বাড়ি এসেছে ওরা বেড়াতে। নিভাননীর কথা বিভূতিভূষণের কাছেই শোনা। সেই সূত্রে নিভাননীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিভূতিভূষণের হঠাৎ আগমন। অথচ নিভাননীর সঙ্গে তখনকার আলোচ্য ছিল ওদের বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গই। আর মূর্তি-

মান তিনিই হাজির!

বিভূতিভূষণ কী খুশি। কী ভালো ওরা, ওই মেয়ে মণি, ছেলে অমিয়, ওদের বাবা-মা—সবাই। কিন্তু আরও ভালোটি যে বেশ জড়সড় হয়ে বসে আছেন এক পাশে সে ব্যাপারটা আন্দাজই করতে পারেননি।

ফলে ওরা যখন বিভূতিভূষণকে নিয়ে মেতে উঠেছে, সবার অলক্ষ্যে তখন গোমড়া হয়ে রয়েছে আর একখানা মুখ। মণিকুন্তলার সতর্ক দৃষ্টি এড়ালো না।—সর্বনাশ! রেণুকেই উপেক্ষা করা হয়েছে! শ্রীমতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল বিভূতিভূষণের।—আমার ছোট বোন রেণু। আপনি যেবার যান তখন ও দেড় বছরের মাত্র। কিছুতেই আপনার কাছে যেতে চাইতে না, মনে পড়ছে?

সেই রেণু? লেডি হয়ে গেছে দেখছি। ইস্, কী অন্যায়টাই হয়ে গেছে। এখন শ্রীমতীর মান ভঞ্জনের উপায়?

ফিক করে হেসে ফেললে তের বছরের মেয়েটি। বললে—গল্প বলতে হবে। আমার সঙ্গে। অপুর গল্প।

বিভূতি হেসে ফেললেন, হায় হায় এত সস্তায় এক সুন্দরীর মন পাওয়া যাবে!

ধেৎ দুষ্টু!

ধেৎ দুষ্টু কী?

অপুব গল্প বলুন।

অপুর গল্প? সে তো সব লিখে ফেলেছি। তুমি পড়েছো নাকি?

পড়িনি? শুনলেন?—হাস, রেণুই উল্টো গল্প জুড়ে দিল। পথের পাঁচালী সে পড়তে গিয়ে রাগ করে ফেলেই দিয়েছিল প্রথম। তারপর দুর্গাকে অমনি করে মরতে দেখে কত কান্নাই কেঁদেছে। দিদিরা বলে, বোকা মেয়ে ওসব সত্যিকারের নয়, সব বানিয়ে লেখা। বানিয়ে বানিয়ে দুর্গাকে কেন মারলেন অমন করে? আবার বাঁচিয়ে দিন, অপুর সঙ্গে রেলগাড়ি দেখতে যাক—ইত্যাদি ইত্যাদি সে কতো পরামর্শ, উপদেশ রেণুর। শিশুর মত শুনছেন বিভূতিভূষণ আর সায় দিয়ে যাচ্ছেন সব কথায়। রেণু ভারি খুশি। আর কাছছাড়া হয় না। পথের পাঁচালী অপরাজিতর এক সম্পূরক ভল্যুমই প্রায় ওর প্রশ্নের উত্তরে বানিয়ে বানিয়ে বলে যেতে হল।

তারপর সবাই মিলে ফুলিদের বাড়ির পিছনের বাগানে বোতল দিয়ে পরোটা বেলা, দোলতলায় মাদুর পেতে গান-গল্প-আনন্দ আসর। বোসপুকুরে নাইতে যাওয়া, এমনি করেই একটা খুশিভরা দিন কাটে।

এর মধ্যে কথা আছে। বোসপুকুরে নাইতে যাচ্ছে সবাই। কিন্তু আর সকলে পিছনে আসুক, বিভূতিভূষণকে আলাদা করে চলতে হল রেণুর সঙ্গে। পথে রেণু কতো বার শোনালে, আপনাকে বড্ড ভালো লাগছে।

তা তো নিশ্চয়ই।—বিভূতিভূষণ পরপাঠ সায় দেন।

কিন্তু রেণুর অভিমান হয়।—নিশ্চয় মানে? আমাকে কেমন লাগছে বললেন না তো।

এই সেরেছে। বিগড়ালো বুঝি। তড়িঘড়ি সামাল দেন, তোমাকে তো দেখেই পছন্দ হয়েছে। দেখছো না ওদের ছেড়ে তোমার সঙ্গেই আছি।

একটু থেমে বললেন, তবে একটা কথা ভাবছি।

কী কথা?—উৎসুক ত্রয়োদশী।

ভাবছি, বোসপুকুরে নেমে সাঁতারের ' লায় যে পারবে আমার সঙ্গে, তার সঙ্গেই ভাব করব।

পুকুরে নেমে রেণু ক'বার চেষ্টা করে দেখল। কিন্তু এ ব্যাপারে সে তেমন অভ্যস্ত নয়। মেয়েদের সিঙ্গল্‌স্‌-এ ফুলিই ফারস্ট। রেণুর মুখের দিকে চেয়ে করুণা হল বিভূতিভূষণের। বললেন, রেণু হল সবার ছোট, ওর হয়ে আমিই সাঁতরাচ্ছি। অন্যদের তাতে আপত্তি। রফা হল। ওরা সব একবার আর দু'জনের হয়ে বিভূতিভূষণের দু'বার পারাপার—সমান হবে। তাতে কে বিজয়ী হয় দেখা যাক।

সাঁতার শুরু। ঘাটে বসে উৎসাহ যোগায় রেণু। ইছামতীতে ঝাঁপাই করা বিভূতি-ভূষণের পক্ষে প্রতিযোগিতায় ট্রফি নেওয়া কিছু কঠিন হল না। যুগ্মভাবে জয়ী বিভূতি-রেণু।

স্নান সেরে ওরা গাড়িতে উঠল। বিভূতিভূষণ কিছুতেই উঠবেন না। এতদিন পরে মালগু, বোড়াল, রাজপুর, হরিনাভি, নিশ্চিন্দিপুরের সেই 'বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ'-এ আসা গিয়েছে। কতো পরিচিত এর পথপ্রান্তর। তাকে চাকার ধুলো উড়িয়ে উপেক্ষা করে যাবেন না তিনি। তাঁর পথ পায়ে চলার, পদে পদে পরিচয়ের, প্রীতি বিনিময়ের। কিন্তু স্নানের পরে ওরা হাঁটতে নারাজ। ওদের নিয়ে গাড়ি চলল। নেমে পড়ল রেণু।

কী হল, নামলে যে!

ভিজে চুল এলিয়ে, চোখের পাপড়ি মেলে দূর বনরেখায়, হাঁটতে হাঁটতে রেণু যেন উদাস সুরে বলে, এক একজনকে হঠাৎ কেমন ভালো লেগে যায়, আপনাকে যেমন লাগছে। সব সময়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করছে।

অর্থাৎ সঙ্গী হতে চাইছো।

তার মানে?

সে মানে সবাইকে অমনি বলা চলে না। আগে শুনি তোমার কী কী গুণ আছে। কী কী জানো।

ভালো নাচতে জানি।

চমৎকার! ঘরে ফিরে দেখাবে?

হুঁ-উ—। ভারি খুশি রেণু এমন সুযোগে।

বিকালে সে নাচল। মণিকুন্তলা গাইল সঙ্গে—

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমো, নমো নমো, নমো নমো

এ মধুর স্মৃতি আজও উৎকীর্ণ বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে। রাতে ও'র কাছে বসে আঙুলগুলো মটকাতে লাগলো রেণু। এক সময়ে ওইটুকু মেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে একটা।

কী হল?

ভাবছি আর জন্মে কী যেন একটা সম্বন্ধ ছিল আপনার সঙ্গে।

আমি জানি।

বলুন তো।

তুই আমার মেয়ে ছিলি।

তাহলে মেয়ের মতই দেখুন।—বলেও ও'র কাঁধে মাথা রেখে দেহে ঢল নামালো কিশোরী। বিভূতিভূষণ আদর করে বললেন, আজ থেকে আমার রেণুমা।

অ্যানটি ক্লাইম্যাকস! একখানা অভিনব ফিলম যেন দানা বাঁধতে বাঁধতে দর্শকদের সামনে অকস্মাৎ চুরমার। ফুলি, মণি, নিভাননীরা হেসে সারা।

ওদিকে কিন্তু অন্য জগতে ভাসছে দু'জন। নতুন সম্পর্কে শিহরিত বিভূতিভূষণ আর তাঁর রেণুমা।

ওরা হাসুক। রেণুমা বলে, ভূতের গল্প বলুন।

কী খুশি ভূতের গল্প শুনে! বিভূতিভূষণ ভাবেন—একদম ছেলেমানুষ রেণুমা। আর রেণুমা কী ভাবে ও'কে? পরদিন একটা লবেনচুসের কৌটা উপহার দিলে বিভূতি-ভূষণকে।

এ কী! এ দিয়ে আমি কী করব?

খাবেন। আপনি একদম ছেলেমানুষ। তাই এটা দিলাম আপনাকে।

নিজের কাছে যেন ধরা পড়ে যান বারাকপুরের চিরকিশোর।

চলে আসবার সময় কোত্থেকে একটা গন্ধরাজ তুলে এনে দিলে ও'কে রেণুমা। বললে, ঠিকানা দেবেন। বাড়ি এসে পত্র দেবো।

কী লিখবে তাতে?

নিরুত্তর।

কী ভাবছো?

ভাবছি আগে কেন ভাব হল না।

সত্যিই কিছু বলতে পারেন না বিভূতিভূষণ। মেসে ফিরে দিনলিপিতে স্বীকার করেন, 'রেণুমার কথাগুলি আমাকে কেমন যেন আনন্দে ডুবিয়ে রাখে।'

তারপর সেই ঠিকানায় কত লেখালেখি, কতো আমন্ত্রণ, যাওয়া-আসা।

বন্ধুদের কাছে শুধু রেণুমার গল্প। রেণু কেমন নাচে, গায়, ও'কে ভালবাসে, ও'র কাছে বসে নখ কেটে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। গড়িয়ার মাঠে জ্যোৎস্না দেখতে গিয়েছেন, সঙ্গে নীরদ চৌধুরী, পশুপতি বসু, সস্ত্রীক ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। বিভূতিভূষণকে গল্প বলতে বলা হল। কিন্তু ও'র মুখে তখন কানু ছাড়া গীত নেই, রেণু ছাড়া কথা নেই। 'ওদের বাড়ি যেতেই রেণুমা সেদিন পাখা হাতে বাতাস করতে বসল। শরবত নিয়ে এলো দৌড়ে। ওর বাবা বলেন, আপনি এসেছেন আর সব ভুলে গিয়েছে রেণু। রেণু লজ্জায় লাল। বাবা সরে গেলে বলে, আপনার জন্য রজনীগন্ধা রেখেছিলুম, শুকিয়ে গেছে। পদ্ম আছে দেবো? নেবেন? রেণুমা দেবে নেবো না? আসার সময় নিচের সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে আসে। আমার কোলের কাছটিতে দাঁড়িয়ে বলে, আপনি আবার সামনের বুধবার আসবেন তো? আমি প[illegible] দিকে চেয়ে থাকি কখন আসবেন।'

গল্প নয়, সত্য কাহিনী। শুনে সবাই তাজ্জব।

মেয়েদের ম্যাট্রিকের বাঙলা খাতা দেখছেন বিভূতিভূষণ। নীরদ চৌধুরী মেসে ঢুকে দেখেন, খাতাগুলি ছড়ানো, কী যেন ভাবছেন লোকটি।

ব্যাপার কী, কোনো মেয়ের লেখা মন ভুলালো নাকি? এবার ঠিকানার ভাবনা?

না। কী জানো নীরদ, রেণুমাও এবার পরীক্ষা দিচ্ছে। মেয়েদের খাতা দেখতে দেখতে রেণুমার কথা মনে পড়ছে। তাই সব মেয়েকেই দেখছি পাশ করিয়ে দিয়েছি!

উনিশ শ' সাঁইত্রিশ-এ প্রকাশিত 'বিচিত্র জগৎ' রেণুকে উপহার দেওয়া হল।

তা বেশ এ বাৎসল্য। মেয়ে তো একটি জুটল। কিন্তু তার আগের কাজটি যে রয়ে গেল!

তার মানে?

মাসটার বিভূতিভূষণকে মানে বোঝালেন নীরদ চৌধুরী, মানে এবার একটা বিয়ে

করতে হবে।

অসম্ভব। বিভূতিভূষণ অসম্মত।

তর্ক বাড়ালেন না নীরদ, তবে হালও ছাড়লেন না। পর পর দু'তিন জায়গায় মেয়ে দেখলেন। এক জায়গায় তো কথা প্রায় পাকা। না জানিয়ে বিভূতিভূষণকেই পাত্রী দেখাতে নিয়ে গেলেন। পথের পাঁচালীর লেখকের জন্য সেদিন বাঙলাদেশে বাছাইকরা মেয়ে জোটানো কোন কষ্ট ছিল না। যাকে দেখানো হল সে সত্যিই সুন্দরী, সুশিক্ষিতা।

কিন্তু কোন লাভ হল না। বিভূতিভূষণ নারাজ। তাঁর লাভের মধ্যে একটি সুন্দর গল্প লেখা হল, নাম 'কনে দেখা'।

যোটক মিল কেন হবে না? নীরদ ক্ষুব্ধ হলেন। বিভূতিভূষণ প্রায় ক্ষমা চাইলেন। আমি পারব না নীরদ। ওপারে আমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে গৌরী!

নীরদ জানেন, পরলোকগতা গৌরীর আত্মার সঙ্গে বিভূতিভূষণের নিত্য সহবাসের কথা। গৌরীর লেখা চিঠি দুখানা তিনি দেখেছেন, আজও বিভূতিভূষণ জামার বুকপকেটে রাখেন। মাঝে মাঝে চাঁপাফুল কিনে রেখে দেন তার সঙ্গে। গৌরীর সঙ্গে ফুলশয্যার রাতে নাকি ছিল একরাশ চাঁপা। ওঁর শয্যাশিয়রে গৌরীর সেই স্মৃতি আর হাতের ঝালরবোনা একখানি তালপাখা থাকে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস, গৌরীর স্মৃতিবাসর ওঁর শয্যা। সব জেনেও নীরদ চেষ্টা করেছিলেন আর একটা বিয়ের। বেদনার স্মৃতিযাপন থেকে নবজীবনে উত্তরণের জন্য। হল না।

নারীজাতি সম্পর্কে ওঁর জানার সীমা অতি সীমিত। সে অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জুড়ে রয়েছেন মা মৃণালিনী। নারীর বিচিত্র রহস্য সম্পর্কে তখনও ওঁর ধারণা ভাসা ভাসা। কৌতূহল তাই ছিল বৈকি।

কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধু ওই বয়স্ক শিশুকে নিয়ে অনেক কৌতুক করেছেন। এক নামজাদা সাহিত্যিক তো তাঁর কল্পিত মেম-প্রণয়িনীর সঙ্গে আলাপ- করানোর নাম করে দুপুর বারোটা থেকে ইডেন গারডেনে বসিয়ে রাখলেন রাত আটটা অবধি। শেষে কারো পাত্তা নেই দেখে মনোদুঃখে ফিরে আসা। না, এসব কথা গোপন করতেও তিনি জানেন না। নীরদকে সব বললেন। নিন্দা করলেন ওই সাহিত্যিকের।

নীরদ কিন্তু উল্টো মন্দ বললেন বিভূতিভূষণকেই, আপনি গিয়েছিলেন কেন? লজ্জা করে না বলতে!

নীরদের ধমক খেয়ে বোকামিটা বুঝতে পারলেন। একটু ভেবেই বললেন, যত সব ফোতো, ফোতোদের কাণ্ড। চ্যান বরুকগে, যাক। আর কোথাও যাচ্ছিনে ওদের সঙ্গে।

একদিন মেসের জানলায় নীরদকে ডেকে উল্টোদিকের একটা বাড়ির জানলা দেখিয়ে বললেন, জানো, ওখানে রোজ সকালে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায়। আমি যতক্ষণ ইচ্ছে দেখি, ও সরে যায় না। কী সুন্দর—

থামুন। আবেগের মুখে কুলুপ-মারা ধমক দিলেন নীরদ।—এসব কী হচ্ছে আপনার? আপনি না বিশ্বাস করেন, গৌরীর ভালবাসা, তার আত্মার সান্নিধ্য? তাহলে?

ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য হয়ে গেল বিভূতির মুখ। তারপরেই দু'চোখ ছেড়ে জল। নীরদ বুঝলেন, গৌরীর নামটা করে আঘাত দেওয়া ঠিক হয়নি।

পরদিন বিভূতিভূষণ মেস থেকে উধাও। পরে জানা গেল, রাজগীর গিয়েছেন। প্রভু বুদ্ধ আর অর্হৎ, ভিক্ষু শ্রমণের ধ্যানকুঞ্জ রাজগৃহ। বিম্বিসারের বেণুবন। এখানে সপ্তপর্ণীতলে ধ্যানমগ্ন গৌতম। তাঁর নিরাশক্তিকে পরীক্ষা করতে অপাবৃত যৌবন

নিয়ে সামনে দাঁড়ানো মহিষী ক্ষেমা—'দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন জয়-শিখা'। কিন্তু হায়, অবিচল ভগবান সুগতর সামনে দেখতে দেখতে লোলচর্মসার বৃদ্ধার মত লুটিয়ে পড়ল পরাজিতা সম্রাজ্ঞী। বৃদ্ধ বিভূতিভূষণের ধ্যানগুরু। বেশ কয়েকদিন কাটালেন এখানে।

এখানেই রত্না বাগচীর চিঠিটা পেলেন। 'শনিবারের চিঠি'র অফিস ঘুরে চিঠি এসেছে এখানে। এই নামেরই একটি সান্যাল মেয়ে কিছুদিন আগে চিঠি দিয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে। সে জানতে চেয়েছিল, পথের পাঁচালীর অপু লেখক স্বয়ং কিনা। এবার সান্যাল নয়—বাগচী, চাইছে—দেখা করা যায় কিনা জানতে। মেয়েদের কাণ্ড, আজ সান্যাল, কাল বাগচী, ওলটপালট ব্যাপার। অথচ মনটা-মানুষটা একই। ফিরেই এক সকালে ইনটালির চোদ্দ, মিডল রোডে হাজির। দরজা খুলেই রত্না অবাক—অপু! হাতের কঞ্চিখানা ঠিকই আছে।

বিভূতিভূষণ বললেন, কই খাতা আনো।

এখন তো আর ছাত্রী নই, মুনসেফগিন্নী, খাতা দিয়ে কী হবে?

রত্না শুনেছে, পথের পাঁচালীর লেখক মাস্টারি করেন।

ছাত্রী নও, লেখিকা। চিঠির ভাষায় বুঝতে পেরেছি। খাতা দেখাও।—মাস্টারির ঝাঁজ।

ক্রমে খাতা বেরোয়, চলে পাঠ, কাটকুট, উৎসাহ, ছাপানোর ব্যবস্থা। 'রূপশ্রী' 'মাতৃভূমি' 'তরুণের স্বপ্ন' ইত্যাদির লেখক-লেখিকার তালিকায় রত্না বাগচী একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠল। রত্নার স্বামী সমরেন্দ্র দাদা ডাকেন। ঢাকা, চাটগাঁ, পিরোজ-পুর যেখানেই বদলি হন, দাদাকে নিমন্ত্রণ পাঠান। এবং বলা বাহুল্য দাদাও হাজির। এই তো সুখ। আলোয় ওদের গৃহারতি। আর আলো তাঁকে ঘব ছাড়িযে পথ দেখায়—এগিয়ে চলার।

নীরদও তো বিয়ে করল সেদিন। মেস ছেড়ে গিযে উঠল উত্তর কলকাতার যতীন্দ্র ম্যানশনে। সে বউভাতের সন্ধ্যা। বিশেষ দিনের সাজসজ্জায় বাড়ি যখন মৌ-মৌ করে তুলেছেন আত্মীয়বন্ধুরা, তার মধ্যে ওঁব খাপছাড়া আবির্ভাব। আধময়লা পোশাক, ছেঁড়া জুতো। পর পর বিশিষ্টরা নববধূর সামনে সাধ্যমত সপ্রতিভ ভঙ্গীতে আকর্ষণীয়, মূল্যবান প্রীতি-উপহারের প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন। শেষের দিকে লোকটি এগিয়ে এলেন। ওঁর পোশাকে নীরদের রাগ হলেও, এদিন আর কিছু বলতে ইচ্ছে হল না। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন, অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুরা এ নিয়ে ওঁকে কী সব বলছিলেন, আর উনি হাসছিলেন।

হাতে দুখানা বই। নিরাববণ। তবে বই দুখানা যে নতুন তা বোঝা গেল। সদ্য প্রকাশিত অপরাজিত দু'ভল্যুম। অপরাজিত প্রথমে দুখণ্ডেই বেরোয়। অমিয়ার হাতে বই দুখানা যখন দিচ্ছেন, পিছন থেকে নীরদ এসে পরিচয় করালেন—এই হল বিভূতি-বাবু, আমার কলেজ-বন্ধু। আর প্রায় নিঃসঙ্গ মেস-জীবনের সহবাসী।

তখনও অমিয়া বোঝেনি, কে বিভূতিবাবু। কিছু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, ততক্ষণে নীরদ আবার বললেন, ওঁর নিজেব লেখা বই।

ওঁর নিজের লেখা মানে? পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ? কলেজে বি. এ পড়বার সময় ওই বইখানা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল অমিয়া। এই তার লেখক? বউভাতের রম্য রজনীর সেই আড়ষ্ট-আবেশের মধ্যেও চমকে উঠল সে। আর একবার ভালো করে দেখে নেবার জন্য চোখ তুলতেই লোকটি যেন লজ্জা পেয়ে পালালেন। মুখে শুধু

হাসি। বললেন—আবার দেখা হবে শিগগিরই। নমস্কার।

কিন্তু অনেক দিনেও আর আসেননি। সবাই আসে, কিন্তু সবচাইতে যিনি ঘনিষ্ঠ, তিনি কেন আসেন না? স্বামীকে প্রশ্ন করেছিল অমিয়া। নীরদ বললেন, ও'র কিছু ঠিকঠিকানা নেই। সময় পেলেই গ্রামে বা পাহাড়ে-জঙ্গলে যান। শহর ও'র ভালো লাগে না।

অপরাজিততেই আছে 'বড় বড় বাড়ি থাকিলে কি হইবে এখানে বন নেই মোটেই'। তাই অপুর আকুল কান্না—'আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয় ভগবান, তুমি এই করো। ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়, নইলে বাঁচব না। পায়ে পড়ি তোমার—।'

তাই বলে কি শহরকে তিনি এড়াতে পারেন! কর্মসূত্র আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চায়। ছুটিছাটা ছাড়া তো মাস্টারি আর লেখা। আর একটা আকর্ষণ আছে—সে এক আশ্চর্য আড্ডা। চৌষট্টি নমবর থেকে ছাপ্পান্ন নমবর—দুই-ই ধর্মতলা স্ট্রিট। স্কুল থেকে আটটি নমবর পিছিয়ে এলেই এই আড্ডা।

ছাপ্পান্ন নমবর ধর্মতলা স্ট্রিট। দোতলার একটা প্রশস্ত ঘর। ঢুকলেই মনে হবে বেশ একটা সিরিয়াস পরিমণ্ডলে এসে পড়া গেছে। বাঙলাদেশের তদানীন্তন বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, অধ্যাপক, গায়ক, গবেষক, শিল্পী, বিজ্ঞানী —সবাইকে এনে জমিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। এটা সজনীকান্ত দাসের 'বঙ্গশ্রী' অফিস। বাঙলা তেরশ' উনচল্লিশের মাঘ থেকে পত্রিকাটি বার করেন শিল্পপতি শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। সজনীকান্ত সম্পাদক।

সজনীকান্তের কথা হল 'সাহিত্যিকের আড্ডাই সাহিত্য পত্রিকার প্রাণ; ঢিলা-ঢালা স্বাচ্ছন্দ্য, তক্তপোশ, তাকিয়া, তামাক, তাম্বুল, অবাধ রাজা-উজির-মারি গল্প অথবা তীক্ষ্ন কথার তরবারিক্রীড়ার মধ্যেই সাহিত্যের আড্ডা স্ফূর্তি লাভ করে।'—এর অভাবেই সাহিত্য পত্রিকা দাঁড়াতে পারে না বলে তাঁর ধারণা। সুতরাং এমত আড্ডার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে যত্নের অবধি ছিল না তাঁর।

সে আসরে ঘুরেফিরে হাজিরা দিতেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, সুশীলকুমার দে, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র বসু, নীরদ চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী আর অশোক চট্টোপাধ্যায়।

আসতেন নজরুল, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, শৈলজানন্দ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বাসব ঠাকুর।

পরিমল গোস্বামী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নলিনীকান্ত সরকারও ডিউটি দিয়ে যাচ্ছেন। সুযোগমত ঘুরে যাচ্ছেন অজিত দত্ত, বনফুল, হেমচন্দ্র বাগচীরাও। যামিনী রায়, অতুল বসুকেও পাওয়া যাবে। কে না আসতেন?—একজন—বুদ্ধদেব বসু। এ-সম্পর্কে সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে স্বীকার করেছেন. অচিন্ত্যও রামকৃষ্ণপ্রভাবে আসতে শুরু করেন কিন্তু 'ধ্যানমৌন বুদ্ধকে টলাইতে পারি নাই'।

এ-রকম একটা পরিবেশ সমীহ করার মত বইকি। এই আসর সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী তাঁর 'সপ্তপঞ্চ'র 'নানা রঙের দিনগুলি'তে যে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায়। সবটাই, যা ভেবেছিলেন তা নয়। সুনীতিবাবুরা হাত চিৎ করে বসে আছেন ভাগ্য গণনা করাতে। গণনা করছেন সুরেশ বিশ্বাস, আর কার ক'বার বিদেশ যাত্রা আছে, খ্যাতির সীমা আরও বাড়ছে কিনা বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য কেমন যাবে ইত্যাদি বলছেন তিনি। সজনীকান্তের সামনে তারাশঙ্কর বসে কোন প্লট ভাবছেন

না। ক্রমশ প্রকাশিতব্য তাঁর কোন উপন্যাসের কপি যথাকালে হাজির করতে না পারায় সজনীকান্তের ধমক খেয়ে চুপ মেরে বসে আছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কোণে বাইবেলের পকেট এডিশনের মত একখানা ইংরাজি বই নিয়ে পড়ছেন, ওটা কোন ঈশ্বরতত্ত্বের বই নয়—অশ্বতত্ত্বের—তাঁর গবেষণা রেসকোরস নিয়ে। প্রেমেনকে যে অসুস্থ মনে হচ্ছিল, ওটা কিছু নয়—ওটা তাঁর স্বভাবজাত কল্পিত অসুখের বিমর্ষতা। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় রাজ্যের বেদনা মুখে মেখে উদাস ভঙ্গির বিলাস যাপন করছেন। পরিমলবাবুর আশ্বাস, ও জন্যেও কারো চিন্তা করবার কিছু নেই।

নীরদ-বিভূতির ওই যে সিরয়াস ঝগড়াটা হঠাৎ সেটা নিষ্পত্তি হতে দেখা যাবে, নীরদের পকেট ঝেড়ে দিয়ে বিভূতি কয়েকটা বিড়ির জন্য পয়সা ম্যানেজ করেই রফা করবেন। কিংবা পাশ থেকে কেউ পরলোকগতের আত্মা বা ভূত-ভগবান সম্পর্কে আস্তে করে অনাস্থা প্রকাশ করলেই ভূগোলের বই ফেলে সেদিকে মোড় ঘুড়িয়ে মুখর হবেন বিভূতিভূষণ। সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ অচিন্ত্য ছুটে আসবেন কাছে। গলা থেকে সচেষ্ট কাসি উসকে তুলবেন নাস্তিক সজনীকান্ত। কলকাতার কোলাহলমুখর পথের পাশেই কী আশ্চর্য এক সবপেয়েছির স্বপ্ন জগত!

নলিনীকান্ত সরকার পাশের ঘরে ঢুকছেন ক'জনকে নিয়ে। গান হবে। পরিমল গোস্বামীর ভাষায় "দেহতত্ত্বের গান সব, 'এ' মারকা।"

অফিসটিতে অবশ্য এ-রকম নানা বিভাগের জন্য নানা মহল ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,—তিন মহলার অফিস, প্রথম সাধারণের আপ্যায়নের ক্ষেত্র। তার ভার কিরণ রায়ের উপর। দ্বিতীয় সজনীকান্তের বিখ্যাত মজলিশ। তৃতীয় তাঁর খাস-মহল। সেখানে আছে হাজার পাঁচেক বই, অন্তরঙ্গদের কেবল প্রবেশাধিকার সেখানে।

সজনীকান্ত আরও একটি মহলের কথা বলেছেন, সেটা মেটরোপলিটান প্রিন্টিং ও পাবলিশিং দফতর। সন্ধ্যার পর আর কেউ থাকতেন না ওই পাশের ঘরে। সে-ঘর তখন সজনীদের হেফাজতে চলে আসত। শাস্ত্রপ্রকাশক সদাচারী পণ্ডিতমশায়রা চলে গেলে রাত্রে সেখানে নলিনীকান্ত সরকারের যে জলসা বসত তাতে ঘরে গঙ্গাজল ছিটানো দরকার হত। আরও একজন আসতেন, তবে মাঝেমধ্যে এবং গভীর রাত্রে, ঠিক ধূমকেতুর মতন। তিনি নজরুল। সজনীর ভাষায় 'তিনি পবিত্র শাস্ত্র বিভাগটিকে গানে অপবিত্র করে যেতেন।'

অবস্থা দেখে সুরেশ কমপোজিটার এক সময় হতাশ হবে, না, আজ আর কোন কপি পাওয়া যাবে না। চাদর ঝেড়ে সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে পড়বে বাবুরা সব নেকক অয়েচেন!

তাহলে বঙ্গশ্রী বেরোয় কী কবে?

এই করেই। এর মধ্যেই প্ল্যান, পরিকল্পনা, রচনার দায়দায়িত্ব বে'টে নেবে সবাই। বাইরের কেউ এসে সম্পাদক সজনীকান্তকে হয়ত খোঁজ করছেন। উপস্থিত বিশিষ্ট লোকেরা নির্দ্বিধায় তাঁকে জানিয়ে দেবেন, তিনি নেই, বেরিয়ে গেছেন। বিশেষ দরকারের কথা বললে উত্তর পাবেন, ঘণ্টাখানেক পরে আসুন, হয়ত ফিরে আসবেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে সামনে তালা বন্ধ কামরাটার পাশের দরজা খুলে সজনীকান্ত আত্মপ্রকাশ করলেন। অর্থাৎ সম্পাদকীয় লেখার জন্য এই আত্মগোপন।

কিন্তু বিচিত্রমানুষ নীরদ চৌধুরীর ওসব দরকার নেই। ওই আসরের একপাশে বসেই কখনো সিরিয়াস সন্দর্ভ রচনা করছেন। আবার কখনও ব্যঙ্গ রচনার খসড়া করছেন 'বলাহক নন্দী' ছদ্মনামে।

আরও একজন এখানে বসেই বিচিত্র প্রবন্ধ লিখতে পারবেন, তিনি নীরদ-বন্ধু বিভূতিভূষণ। তবে তার আগে তাঁকে সিগারেট, নিদেন বিড়ি ম্যানেজ করে দম দিয়ে নিতে হবে। সেও এক ইতিহাস। অবস্থাটা বিভূতি-অনুরাগী পরিমল গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, 'ঘোর গরম, পাখার হাওয়া তুচ্ছ মনে হচ্ছে। এমনি সময় পাখা বন্ধ করে দিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সিগারেট জোগাড় করেছেন, খেতে হবে আরাম ক'রে। পাখার হাওয়ায় অকারণ বেশি পুড়ে যায়। তীক্ষ্ণ তীর কণ্ঠ। অবিচলিত, আত্মস্থ, আপন বিষয়ে সচেতনতাহীন। গ্রাম্য বালক যেন। উত্তেজনাহীন, রাগ-দ্বেষহীন।'

অর্থাৎ এ নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ কম হত না। কিন্তু কিছুই গায়ে মাখেন না বিভূতি-ভূষণ। খেলাত স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজতেই এখানে হাজির। সবার আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে আনা পত্রপত্রিকা পড়ে নিচ্ছেন আর ফিচার লিখছেন। বহু বিচিত্র সে ফিচার—ইংলনডের পল্লী, বেলজিয়ামের খালপথে, বরফের রাজ্য, বোম্বেটেদের শহর, পক্ষীদ্বীপ, কানাডার ভোলা পথ, সমুদ্রতলের নতুন জগত, তিব্বতী দস্যুদের পবিত্র শিখর—কংকা, আমেরিকার কাঠবিড়ালির আশ্চর্য ঘুম, কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি, এনজিনবিহীন এরোপ্লেন, ইত্যাদি। লিখতে শুরু করেন বঙ্গশ্রীর জন্য, শেষে বিচিত্রাকেও দিতে হয় কিছু ফিচার। আর এই ফিচার প্রসঙ্গেই এক ব্যাপার।

সম্বলপুর জেলার বিক্রমখোল নামক জায়গায় এক প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। খবরটা পেয়েই বিভূতিভূষণ প্রস্তুত, ওর পাঠোদ্ধার করে একটা ফিচার লিখতে হবে বঙ্গশ্রীতে। সঙ্গে চললেন পরিমল গোস্বামী এবং অন্য একজন। অভি-যানের তারিখ তিন মারচ, উনিশ শ' তেত্রিশ।

দলটির নেতৃত্ব আপনা থেকেই বর্তেছে বিভূতিভূষণের উপর। অবশ্য পথের ব্যাপারে এ রকম পথিকচরিত্রের মানুষকে নেতা হিসাবে মেনে নেওয়া নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে সঙ্গীদেরও সন্দেহ ছিল। ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত সাহিত্যকর্মে বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছেন। সম্বলপুরের দিকে তাঁর জানাশুনো লোক আছে। তাঁর ব্যবস্থায় থাকা-খাওয়ার একটা সুবিধা হতে পারে। পরিমলবাবুরা তাঁকে বলবার জন্য পরামর্শ দিলেন বিভূতিভূষণকে। তিনি আগেভাগেই ব্যবস্থা করে বেরোনোর প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। বললেন, অভিযানের স্পিরিটই আপনারা ধরতে পারেননি।

অভিযানের স্পিরিট! আচ্ছা পাগলামি তো! ও'রা চুপ মেরে গেলেন।

গাড়ি ছাড়তেই পাগলামির প্রথম লক্ষণটা প্রকাশ পেল। হু-হু করে ট্রেন ছুটছে। বাইরে দৃশ্যের পর দৃশ্যান্তর। উ'চু-নিচু অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ী পথ-প্রান্তর। রেল-সড়কের দু'ধারে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পতরুর মিছিল। দূরে দূরে শ্যাম বনচূড়ায় যেন লাল পলাশের আগুন। প্রকৃতির এই অপরূপ চলচ্চিত্র দেখে দেখে লোকটি চেঁচিয়ে মাতিয়ে তুলছেন কামরা। হঠাৎ আনন্দের এক অসহ্য উত্তেজনায় ছুটে এসে পরিমলবাবুকে এক ঝাঁকুনি। কী ব্যাপার? পরিমলবাবু ঘাবড়ে গেলেন।

কিছু ব্যাপার নয়, ক্ষেপে যান পরিমলবাবু, তাছাড়া অন্য উপায় নেই।—বলে নিজেই খ্যাপার মত কীর্তনে গলা ছেড়ে দিলেন।

বেলপাহাড় পেঁছানো এমনি করেই। বিক্রমখোল সেখান থেকে দশ মাইল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে ও'দের গন্তব্য স্থল। যানবাহন কিছু নেই। স্থানীয় লোকদের

সঙ্গে কথা বলে দুটি পথের হদিস পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটি বিপদসঙ্কুল, তাই সে-পথে যেতে বারণ করল তারা। বলা বাহুল্য ওই বিশেষ কারণেই বিভূতিভূষণ ধরলেন ওই পথ। এসব কথা পরিমলবাবু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন। তিনি বলেছেন, একটা গরুরগাড়ির ব্যবস্থা হল বহু চেষ্টায়। কিন্তু যথাকালে দেখা গেল ও'দের গাড়িতে উঠিয়ে পায়ে হেঁটে চললেন বিভূতিভূষণ অভিযানের 'স্পিরিটটি' অনুভব করতে। পরে অবশ্য গরুরগাড়িতে ওঠেন।

কোনওক্রমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো গেল। শিলালিপির তথ্যাদিও সংগৃহীত হল। সন্ধ্যার ছায়াপাতে তাড়িঘড়ি ফিরবার উদ্যোগ করছেন ও'রা, তখনই এক কাণ্ড!

বিভূতিভূষণ নিখোঁজ। সর্বনাশ! জঙ্গল-পাহাড় ঘিরে তখন অন্ধকার ঘনায়মান। বিপন্ন সঙ্গীরা দলপতির সন্ধানে হাঁকডাক, ছোটাছুটি, এমন কি আর্ত চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিধ্বনি ছাড়া কোন দ্বিতীয় সাড়া নেই। কী হবে তাহলে? এদিক-ওদিক করতে করতে হঠাৎ তাঁরা চমকে উঠলেন। কিছুদূরে একটা লোক মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে! দেখলেন বিভূতিভূষণই। কী হয়েছে বিভূতিবাবু! জোরে ডাক দিতে সাড়া পাওয়া গেল।—অদ্ভুত সুবাস এখানকার মাটির। শুঁকছি। আপনারাও শুঁকুন।

সঙ্গীরা হতবাক। কিন্তু বিভূতিভূষণের উল্লাস, যেন কোন মহাসুরভিভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে এখানে। তার স্বর্গীয় নির্যাসপানে নিজে তিনি অমৃত হয়ে গিয়েছেন।

স্মরণীয় জীবনানন্দ দাশের 'ঘাস'—

'আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎমদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,...'

জীবনানন্দের কবিতা মেজাজ পায় 'গালুডির হাওয়া খেয়ে'। সেই প্রস্তাবই বিভূতিভূষণকে করলেন নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। বিক্রমখোলের কাণ্ড শুনে তিনি হেসে অস্থির। একদিন বললেন, চলুন মশায়, গালুডির হাওয়া খেয়ে আসবেন।

সেখানে অবকাশকুঞ্জ তৈরি করেছেন ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন। বাড়িটির নাম 'সুবর্ণাচল'। স্বাস্থ্যকর তো বটেই, আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও চমৎকার। মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন তিনি। প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণকে আমন্ত্রণ জানালেন। বলা বাহুল্য এ-রকম ব্যাপারে আমন্ত্রণ কেন, রবাহূত হয়ে যেতেও আপত্তি হওয়ার কথা নয় তাঁর। তিনি গেলেন।

তাই বলে কেবল স্কুল, আড্ডা, ঘোরা আর হাওয়া খাওয়ায় দিন কাটে না। ফিচার তো লিখছেনই, গল্প লিখছেন, নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। অপরাজিত শেষ করেই 'দেবযান' লিখতে শুরু করেন। সেই উনিশ শ' আঠাশের পনের মারচ "উন্নততর গ্রহের জীবদের নিয়ে 'দেবতার ব্যথা' নামে যে উপন্যাস লিখবার সংকল্প" গ্রহণ করেছিলেন, এ সেই বই—কেবল নামটা বদল। কিন্তু অল্প কিছু লিখে রেখে দিলেন। শুরু করলেন, আরও গোড়ার অধ্যায়—দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাস। প্রবাসীতে তা বোরোতে শুরু করে উনিশ শ' তেত্রিশ থেকে। বাঙালী পাঠকসমাজ এক নতুন রস আস্বাদন করতে লাগলেন সে উপন্যাসে। এতে নায়কের জীবনে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত ঘটার কাহিনী দেখানো হয়েছে। নায়ক জিতু আগে থেকেই ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রত্যক্ষ করত মাঝে মাঝে। কেউ কেউ একে ডীন ইনজ-এর প্রভাবও বলেছেন। কিন্তু যাঁরা বিভূতিভূষণকে জানেন, তাঁরা বুঝছেন, এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্বাস। বিশ্বের বহু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার

বস্তু এই অতিলৌকিক শক্তিতে বিভূতিভূষণের কেবল গভীর আস্থাই ছিল না, অনুশীলনের দ্বারা এবিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। দৃষ্টিপ্রদীপ লেখার সময়েও প্রবাসী অফিসে প্লানচেট, পরলোকতত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় চেতনাপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন, তর্ক জুড়তেন। ও'র লেখার নিন্দা করলেও উদাসীনভাবে বসে থাকবেন। কিন্তু অতিলোকচিন্তা নিয়ে কিছু বললেই চ্যালেঞ্জ। এটা তার স্টাইলের বা রসের জন্য নয়—এ তাঁর অন্তরের বিশ্বাসের বস্তু বলে।

সেই উপেক্ষিতা থেকে পথের পাঁচালী, অপরাজিত, মৌরীফুল, মেঘমল্লার, কোনটিতেই বাদ যায়নি এ প্রসঙ্গ। দৃষ্টিপ্রদীপ তো তার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই সুর অবিচ্ছিন্ন।

দ্বারবাসিনীর পথে, নির্জন মাঠের মধ্যে বা কহলগাঁও যাত্রায় নায়ক জিতুর মনে যে অধ্যাত্ম চেতনার প্রকাশ, অপুর সঙ্গে তা অভিন্ন। দু'জনেরই সাধনা, চলমান জীবনে অদৃশ্য সেই পথের দেবতা। দুঃখের কাহিনীও দুটি জীবনের আবহ রচনা করেছে।

তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ সাল অবধি প্রবাসীতে চলল 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। ইতিমধ্যে নতুন কতকগুলি গল্পও লেখা হয়েছে বিচিত্রা ও অন্যান্য পত্রে। তার দশটি গল্প নিয়ে চৌত্রিশেই বই বেরোল 'যাত্রাবদল'। বিভূতিভূষণেব সেই কনে-দেখার গল্পটিও আছে এতে। বইটির প্রথম গল্প 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', মামা একটু ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 'ডানপিটে'র সতীশের জীবনও দুঃখের। যৌবনের কৃতী মানুষটি আজ অক্ষম বলে সংসারের গলগ্রহ। অতিলৌকিক কাহিনী নিয়ে 'পেযালা'।

অর্থাৎ লেখা এবং লেখকেব চিন্তা-কর্মে ছেদ পড়ছে না কিছুতেই। পড়াশুনো এবং প্রকৃতির পাঠগ্রহণ চলছে নিয়মিত। আর একটি কাজ। সুযোগ পেলেই স্বগ্রামে যাওয়া। দু'একদিন কাটিয়ে আসা। এই সূত্রে আরও একটা ব্যাপাব চলছিল তাঁর জীবনে। ব্যাপারটা শুধু গ্রামেই নয়, যুগপৎ শহবেও।—যা শুধু বিভূতিভূষণের জীবনেই সম্ভব এবং তিনিই কেবল পাবেন দু'দিকের তাল সামলাতে। সে-প্রসঙ্গে আসার আগে গালুডির কথা সেরে নিই।

গালুডি থেকে ফিরলেন। কেবল গালুডি নয় সেই সঙ্গে ঘাটশিলাও। পাশেই ঘাটশিলা। সেখানে বিখ্যাত তাম্রখনি রাকা মাইনস দেখতে যায় লোকে। খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। তবু জায়গাটার আকর্ষণ এখনো। বিভূতিভূষণ সেখানে এলেন নীরদরঞ্জনকে নিয়ে। স্টেশন ছাড়িয়ে, শহর পেরিয়ে একেবারে সুবর্ণরেখার কাছাকাছি একটি ঘর নিয়ে থাকলেন ক'দিন। একদিকে সুবর্ণরেখার কলধ্বনি, অপর-দিকে নির্জন অরণ্য পর্বত। দূরে দূবে ছোট ছোট গঞ্জের মত রাকা মাইনস, মুসাবনি, মৌভাণ্ড। সে সব জায়গায় যেতে-আসতেও শালবীথি, শিলাপর্বত। বাঁ-দিকে একটা ছোট পাহাড়, নাম সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। দু'জনে গিয়ে উঠলেন তার উপর। সাঁওতালদের থেকে চিঁড়ে দই কিনে খেলেন। একেবারে চূড়ায় উঠে—নাম লিখে রাখলেন এক শিলা-খণ্ডে। এ যেন তাঁরই আবিষ্কৃত পর্বতশিখর। পাহাড়টা যা নির্জন আর অরণ্যসংকুল, ও রকম ভাবটা মানায়। তাছাড়া আবিষ্কার তো বটে। বিভূতিভূষণের যাওয়া তো কেবল পৌঁছানো আর ফিরে আসা নয। যেখানে যাবেন, তার আশপাশ সুদ্ধ খুঁটি-নাটি সব কিছুর পূর্ণ তথ্য নিয়ে, সব কিছুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়ে তবে আসবেন

নীরদ চৌধুরীর দাদা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন স্পেশাল অফিসার শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী একবার পূজার ছুটিতে বিভূতিভূষণের পরামর্শেই গালুডি যান। থাকার

জায়গা ঠিক করে দিয়ে প্রয়োজনীয় একটি তালিকাও করে দিলেন তাঁকে বিভূতিভূষণ। তাতে বিউটি স্পট, দোকানপাট, দ্রব্যমূল্য থেকে আলাপযোগ্য লোকজনের নাম, দা, বালতি, দড়ি, মশারি, কুইনিন ইত্যাদি দরকারি সব কিছুর উল্লেখ।

এ তালিকা চারুবাবুর অশেষ উপকারে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর কিন্তু প্রথমটা খুব রাগ হয়েছিল, বিভূতিভূষণের ব্যবস্থা করা বাড়িটা দেখে। বিলক্ষণ বিরক্ত হয়ে কলকাতায় তিনি চিঠি পাঠালেন—'এটা আবার একটা বাড়ি নাকি? একটা মাট-কোঠা, তার দরজা বন্ধ করা যায় না, কোন হুড়কো নেই, ছিটকিনি নেই, রাতে ট্রাঙ্ক বাকস দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখতে হয়। মাঝরাতে হায়না বাড়ির ভিতর উঠোনে এসে হাঃ! হাঃ! করে ডাকে,' ইত্যাদি।

একদিন পরে বিভূতিভূষণ খবর নিতে এসেছেন, গালুডি থেকে কোন চিঠিপত্র এলো কিনা। নীরদবাবুরা তাঁকে চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। নীরদবাবুর স্ত্রীর কথা, চিঠি শুনে বিভূতিভূষণ কোন গ্রাহ্যই করলেন না। হাসতে হাসতে শুধু বললেন, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

নীরদবাবুর স্ত্রীও ক্ষুণ্ণ, ব্যাপার কি? ওরা যে এতো লিখেছে, ভদ্রলোক কিছু কেয়ারই করলেন না!

ক'দিন পরেই দেখা গেল—মাটকোঠায় ভ্রূক্ষেপ নেই চারুবাবুর। বিভূতিভূষণের তালিকানুযায়ী ঘুরে ঘুরে জায়গাটা তাঁর এতো ভালো লাগলো যে পরে আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লিখে নিয়ে গিয়ে খুব হৈচৈ করে কাটালেন পুজোর ছুটি। উপলব্ধি করলেন বিভূতিভূষণের ভ্রমণ-বৈশিষ্ট্যকে।

ঘাটশিলাতেও ফুলডুংরি, সিদ্ধেশ্বরডুংরি, ধনঝরি প্রায় পায়ের তলায় করে ফেললেন বিভূতিভূষণ। কত গাছ সে-সব বনেপাহাড়ে, কেদ, শাল, তমাল, মহুয়া, পলাশ, আসান, আমলকী। ফোটে ধাতুপ ফুল, বররা ফুল, ভাঙির ফুল। অবিশ্রান্ত বন্য শেফালী ঝরে পড়ে নীল ঝরনার গায়। সে ঝরনা গড়ায় আবার কলম্বনা সুবর্ণরেখায়। ঘাটশিলা মন ভোলালো বিভূতিভূষণের।

কলকাতা এসে সবার কাছে কেবল ঘাটশিলার কথা—চলো যাই, একবার দেখলে ওখানেই থেকে যেতে ইচ্ছে করবে। আসলে ও'র একটা বাতিক ছিল। কোন নতুন জায়গায় গেলেই তাঁর পছন্দ হবে। তারপরই ইচ্ছে—আঃ, এখানে একটি বাড়ি থাকলে বেশ হত। কিন্তু নিজের আর হচ্ছে কোথায়! ইচ্ছেটা তাই বন্ধুদের উপর চালান দেওয়া।

ঘটনাচক্রে ব্যবস্থা একটা হয়েই গেল কিছুদিনের মধ্যে। অশোক গুপ্ত নামে এক শিক্ষাব্রতী দীর্ঘকাল বিলেতে কাটিয়ে বার্ধক্যে দেশে ফিরলেন সস্ত্রীক। ফিরলেন এক সংকল্প নিয়ে। অপঙ্গ শিশুদের জন্য একটা আশ্রম করবেন কোথাও. ও'দের সেবায় শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবেন দু'জনে। ঘুরতে ঘুরতে ঘাটশিলার ডাহিগড়ায় মাট-কোঠাওলা একটা বাড়ি পেলেন সস্তায়। বাড়ি কেনা, মেরামত এসব করতে সময় গেল। কিন্তু সহজে কি সব হয়ে যায়? এদিকে পুঁজি এবং আয়ু দুই-ই ফুরিয়ে আসতে থাকে। ও'দের সঙ্গে পরিচয় হল বিভূতিভূষণের। পরিকল্পনাটাও ও'র মনে ধরল। নিজের পকেট থেকে পাঁচ শ' টাকাই দিয়ে ফেললেন। কাজটা অন্তত হোক। কিন্তু তাতে হল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে গুপ্তসাহেব একদিন বিভূতিভূষণকেই তাঁর দেয়া পাঁচ শ' টাকার বিনিময়ে ওই বাড়িটা নিতে বলেন। তিনি ঋণমুক্তি চান।

সুবর্ণরেখার তীরে শালবীথি ঘেরা, ঘাটশিলার ডাহিগড়ার এই বাড়ি। এত সস্তায়?

এ যে হাতের মুঠোর চাঁদ! বিভূতিভূষণ রাজি। চন্দ্ররেখাহীন মাটকোঠার ভিতরেই এখন চাঁদের আলো লভ্য। তাই বলে ঠিক চাঁদ পাওয়া নয়। অশোক গুপ্ত এই বাড়ি নিয়ে কতকগুলি অকল্পনীয় বাধায় ব্যর্থসংকল্প হন। স্থানীয় সাঁওতালপাড়ার লোকেরা বলে বাড়িটার দোষ আছে। তাই সস্তায় হাতবদল হয় বার বার। কিন্তু কী দোষ কেউ জানে না বা ভাঙে না। শুধু জনশ্রুতি, কাছেই নাকি সাঁওতালদের এক শ্মশান ছিল। এটা নাকি অশরীরীদের আড্ডাস্থান। শরীরীদের ও'রা বরদাস্ত করেন না এ আস্তানায়। গুপ্তসাহেব বিভূতিভূষণকে খুলে বলতেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। যত সব ফোতোদের কথা। বাড়িটির নাম ছিল 'শশীকণা'। বিভূতিভূষণ বদলে করলেন —'গৌরীকুঞ্জ'। গৌরীর স্মৃতিমন্দির।

এদিকে ছোট ভাই নুটু ডাক্তারি পাশ করে বেলডাঙায় চিনিকলে অস্থায়ী চাকরিতে লেগেছে। তাকে বিয়ে করালেন। তারিখটা একুশ অগ্রহায়ণ, উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ। বরানুগমন হল ভাটপাড়া মামাবাড়ি থেকে, সেখানেই বৌভাত। তারপর ওরা দু'জনে গেল বেলডাঙায়। কয়েক মাস পরে ছোট ভাই এবং ভ্রাতৃজায়া যমুনাকে ঘাটশিলার গৌরীকুঞ্জে এনে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ডাঃ নুটবিহারী স্বাধীন প্রাকটিস শুরু করলেন এখানে।

কিন্তু নিজেকে নিয়ে কী করবেন বিভূতিভূষণ? অপুর কথা—'তাই ভাল, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো, ভবঘুরে পথিকজীবনের সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশি মেশামেশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার সখ তাহার নাই।'

তবু সেই ভবঘুরে পথিক-জীবনের ঘোবার ফাঁকে ফাঁকে, বাঁকে বাঁকে যারা এসেছে, স্নেহসুধার পরশ দিয়েই বিদায় নেয়নি সবাই। পথের মাঝে ক্ষণসঙ্গ দিয়ে ও'র একলা-জীবনকে ভরে দিয়েছে অনেকখানি। উনিশ শ' চৌত্রিশের দিনলিপিতে ও'র নিজেরই স্বীকৃতি—'১৯২৭ সালে আমি ছিলেম মুক্ত পথিক, জীবনে তখন ছিলেম একা, এখন আরও সব এসেচে—যেমন, সুপ্রভা, খুকু, রেণু—এবা সব।'

রেণুকে আমরা আগেই দেখেছি। সেই চাটগাঁর অন্নদা দত্তচৌধুরীর মেয়ে, শকুন্তলা আর অমিয়র বোন রেণু, বিভূতিভূষণের রেণুমা। কিন্তু সুপ্রভা কে? খুকুই বা এলো কবে?

এসেছে তারা ও'র জীবনে উনিশ শ' বত্রিশেই। তবে প্রথমে অস্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্টতর হয়েছে। প্রভাবিত করেছে ও'র জীবনকে তারা দু'জন দুই বিপরীত কোটি থেকে। খুকু, ইছামতীলালিত তাঁর বারাকপুরের একটি গ্রাম্য মেয়ে। সুপ্রভা, পাইন-বারচের হাওয়ায় মাতাল শৈলশহর শিলঙের। এদের আবির্ভাবে যে আবেগের আবিরে রঞ্জিত হল বিভূতিভূষণের জীবন, তাকেই কি বলে প্রেম? হয়তো বা তাই। দিনলিপি 'উৎকর্ণ'র পাতায় ধরা পড়ে তাঁর একটি স্বগত স্বীকৃতি।—

'জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে তবে পার্থিব বিত্তে দীন হলেও মহাধনী ফোরড বা রকফেলার তোমাকে হিংসা করতে পারেন। আর যদি প্রেম না আসে, যদি কারো স্মিত হাস্যে ভরা চোখ দুটি তোমার অবসর মুহূর্তে মনের সামনে ভেসে না ওঠে, যদি মনে হয়—দূরপল্লী নদীতটের ক্ষুদ্র গ্রামে কি কোন শৈলশিখরে পাইন-বারচ-গাছের ছায়ায় কোন স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে না তবে ফোরড বা রকফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।'

গ্রামের খুকু আর শিলঙের সুপ্রভার সঙ্গে ও'র সম্পর্কটা এ থেকে আর বুঝতে কষ্ট হয় না। আরও সহজ হোক। গোড়া থেকেই শুরু করি ওদের কাহিনী।

॥ বার ॥

বেথুন কলেজের মেয়েরা সেবার আয়োজন করেছিল বিভূতি-সম্বর্ধনার। সুপ্রভার সঙ্গে আলাপটা প্রথম সেখানেই। সে তখন বি. এ পড়ছে দর্শনে অনারস নিয়ে। আলাপ করে ভালো লাগলো বিভূতিভূষণেরও। কিছুদিন আগে এই মেয়েটিই পথের পাঁচালীর প্রশংসা করে এক চিঠি দিয়েছিল সুদূর শিলং থেকে। কথায় কথায় একটা যোগসূত্রও বেরিয়ে গেল। মেয়েটি আবার নীরদের স্ত্রী অমিয়ার বান্ধবী। দু'জনেই এক জায়গার লোক—শিলঙের। কলকাতায় একসঙ্গে পড়েছে ব্রাহ্ম গারলস স্কুলে। তারপরে অমিয়া গিয়েছে সিটি কলেজে, সুপ্রভা বেথুনে। তবু ভাব দু'জনে এখনও অটুট।

বিভূতিভূষণের মুখে সুপ্রভার প্রশংসা শুনে অমিয়া তো হেসেই অস্থির—ওমা, পটুর কথা শোনাচ্ছেন আমাকে! সুপ্রভাকে ওই ডাকনামেই ডাকে অমিয়া। বললে, সত্যিই ভালো মেয়েটি। আরও একটি কথা ফাঁস করে দিল অমিয়া, জানেন, পটু আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লেখে।

তাই নাকি! বিভূতিভূষণের কৌতূহল বাড়ে।—তবে লুকিয়ে কেন?

একদিন প্রায় জোর করেই তিনি বার করালেন সুপ্রভার কবিতা-খাতা। বান্ধবী যে সব ফাঁস করে দিয়েছে সে কথা আগেই বুঝতে পেরেছে সুপ্রভা। অগত্যা খাতা খুলতে হল ভয়ে ভয়ে।

শিক্ষক বিভূতিভূষণ কলম ধরলেন। রমাকে তিনি এমনি করে প্রায় গল্পকার করে তুলেছিলেন। 'সুপ্রভার মত মননশীলা মেয়ে'কে তিনি কবি করে ছাড়বেন।

বিভূতিভূষণ কথাকার; কিন্তু কবিতার কারবারে তিনি কে? তিনি কবি। কাব্যের সুরে ঢালা তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য। প্রমথনাথ বিশির ভাষায়, 'বিভূতিভূষণ কবি, তাঁর সমস্ত রচনাই পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদার মত ছদ্মবেশী কবিতা।'

কেবল রসের বিচারে নয়, সত্যিকার কয়েকটি ছন্দে বাঁধা কবিতাও আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি তাঁর। পাবো আরও, যথাকালে।

এদিকে সত্যিই সুপ্রভার ক'টি কবিতা বিভূতিভূষণের হাতে সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হল প্রবাসীর পাতায়।

বিভূতিভূষণের আনন্দ তো বটেই, সুপ্রভার মনে সে এক আশ্চর্য শিহরণ। ভাবতে পারে না সুপ্রভা হঠাৎ কী ঘটে গেল তার ভুবনে। কতখানি দিলেন তাকে পথের পাঁচালীকার।

সিনেট হলে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাবেশ। নীহারিকাপুঞ্জ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন অ্যালবারট ডেভিস মিড। স্বয়ং জেমস জিনস সভাপতি। আচার্য রায়ের দুর্লভ সঙ্গ-ভাগী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্ধুদের পাকড়াও করছেন, চলো সিনেট।

ধ্যেৎ, ওসব বিজ্ঞানের তত্ত্ব চটকানোতে কারো উৎসাহ নেই। সবাই যখন ও'কে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তখন এগিয়ে এলো সেই মেয়েটি—আমাকে নিয়ে যাবেন?

কেন, একলা যেতে পারবে না? কলেজে যাও কী করে!

ঠিক আছে। সিনেটেই দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

অত ভিড়! বিভূতিভূষণের মনে হল, সঙ্গে করে আনলেই ভালো হত। এখন এলেও তো দেখা হবে না। বাইরে এসে গেটে দাঁড়ালেন। সেই ভিড়ের মধ্যে যখনই কোন মেয়ে ঢোকে—বিভূতিভূষণ দেখেন ও যদি তাদের মধ্যে থাকে।

এক সময় সত্যিই হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো সুপ্রভা। দু'জনে দ্রুত গিয়ে এক কোণে আসন নিয়ে বসলেন।

ডেভিস মীড বক্তৃতা করছেন। সুপ্রভাকে পাশে বসে বিজ্ঞানের সে সব টেকনিক্যাল কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন বিভূতিভূষণ। সুপ্রভার ভালোও লাগে, আবার শ্রদ্ধাও বাড়ে বিভূতিভূষণের জানার বহর জেনে। জেমস জিনস যখন বলতে দাঁড়ালেন বিভূতিভূষণ তখন তন্ময়। স্যার জেমস বলছেন—

'আলটিমেট রিয়ালিটিজ অব দ্য ইউনিভারস আর অ্যাট প্রেজেনট কোয়াইট বিয়নড দ্য রিচ অব সায়েনস অ্যানড প্রোবাবলি আর ফরএভার বিয়নড দ্য কমপ্রিহেনসন অব দ্য হিউম্যান মাইনড...'

শুনতে শুনতে বিহ্বল সুপ্রভা। বিভূতিভূষণ বললেন, শোনো সুপ্রভা, কী কথা আজ বলছেন জিনস। বিজ্ঞানের দোহাই দিযে পরম সত্যকে অস্বীকার করতে চায় বাতুলেরা। আর বিজ্ঞানী স্যার জেমস জিনস আজ অজানা এবং চিরঅপরিজ্ঞেয় রহস্যের কথাই শুনিয়ে যাচ্ছেন।

এর পর নিজেই আবেগে মাথা দোলাতে থাকেন।—ওই কথাই তো আমাদের দর্শন বলে, কতভাবে ওদের বলতে চাই কথাটা। আমিও বোঝাতে পারি না, ওরাও বুঝতে চায় না। এলে আজ শুনতে পেত ওরা।

'ওরা' বলতে সাহিত্যিক বন্ধুদের কথা বলছেন, সুপ্রভা তা বুঝতে পারে। সে বলে, সত্যিই কী সত্য আর সুন্দর ওই কথাগুলি!

ভারি খুশি বিভূতিভূষণ। সুপ্রভাকে তাঁর সেই মুহূর্তেই বেশি করে ভালো লেগে যায়, 'বড় মননশীলা মেয়েটি'। এখানেই দু'জনের মিলের আর একটা সূত্র আবিষ্কৃত হল। ধীরে-ধীরে ওরা কাছাকাছি হয়ে যায়।—কতটা, তা কেউ বোঝে না যেন।

না হলে কি সুপ্রভার বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরোবে বলে মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ দ্বারভাঙ্গা ভবনে? সুপ্রভার সাফল্যে ও'র উল্লাস ধরে না। তার এম্ এ ক্লাসে ভরতি হওয়ার দিনেও পাশে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ।

সেবার, বোধহয় তেইশ নবেম্বর, আশুতোষ হলে জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির বক্তৃতা। শ্রোতাদের ভিড়ে পাশাপাশি আছেন দু'জন। নোগুচি তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন প্রথমে জাপানিতে, পরে নিজেই তার অনুবাদ করলেন ইংরাজিতে। একবার শুনেই ও'র মুখস্থ হয়ে গেল তাঁর আশ্চর্য ক'টি কথা—'ইন দ্য ট্যুইলাইট হোয়েন দ্য ভিসন অ্যাওয়েকস'। ফেরার পথে বার বার আবৃত্তি করতে থাকেন কথাটি। তার অর্থ নিয়ে আলোচনা দু'জনে। গোধূলির রঙে দু'জনের চোখেও বুঝি 'ভিসন' জেগে ওঠে কোনো।

কিন্তু সিনেট আর আশুতোষ হলেই সব নয়, সিনেমা দেখবেন?—সুপ্রভা একদিন প্রস্তাব করে।

সর্বনাশ! এইটেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। সিনেমার প্রতি তাঁর যতটা বিরাগ, তার চাইতে বেশি রাগ ওই বন্ধ হল ঘরটা সম্বন্ধে। অমন ভাবে দরজা-জানালা সেঁটে একটা গুদাম ঘর বানিয়ে তার মধ্যে কয়েক শ' মানুষকে বসিয়ে দেওয়া তো অন্ধকূপ-

হত্যার মহড়া। ওভাবে কোন রসগ্রহণ অসম্ভব। ফিলম শোর আইডিয়াটাই বরদাস্ত করতে পারেন না বিভূতিভূষণ।

সুপ্রভার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললে, থাক।

এবার যেন একটু দুঃখ হয় বিভূতিভূষণের। সিনেমা সুপ্রভাও দেখে না বড় একটা। কেবল ও'র সঙ্গে বসে দেখার লোভেই বলেছিল।

রাজি হলেন বিভূতিভূষণ। রাজি করাতে হল সুপ্রভাকেও এবার মান ভাঙিয়ে। চিত্রা (হালের মিত্রা) হলে বসে 'মুক্তি' ছবি দেখলেন দু'জনে। শেষ পর্যন্ত ভালোই লাগলো। বিশেষ করে ভালো লাগল আর একটি আলতো ব্যাপার—তাও বুঝি দুজনারই, পাশে বসে সুপ্রভা এক সময় ও'র হাতের মধ্যে তার নরম হাতখানা রাখলে।

কী ব্যাপার!

কিছু নয়, নিজের হাতে কাজ করা একখানা রুমাল দিলে ও'র হাতে সুপ্রভা।

এসব জিনিস ব্যবহারের অভ্যেস নেই বিভূতিভূষণের। বেরিয়ে এসে বললেন, এর চাইতে বাপু আমার ছেঁড়া জামাটা রিফু করে দিলে বেশি কাজে লাগতো।

রাগ হয়নি সুপ্রভার এ-কথায়। মানুষটিকে সে চিনে ফেলেছে। বললে, কাল আসাম চলে যাচ্ছি বাবার কাছে। তাই আজ আপনার সঙ্গে সিনেমা দেখার ইচ্ছেটা মিটিয়ে নিলেম। আর রুমালটা দিলেম এইজন্যে, যেন ফিরে এলে চিনতে পারেন, মনে রাখেন এই ক'টা দিন। এসে জামা সেলাই কেন, যা বলবেন করে দেবো।

সে হবে। কিন্তু কালকেই আসাম যাচ্ছো?

বা রে, বাবার কাছে যাবো না? এখন তো ক'দিন কলেজ বন্ধ।

হুঁ।

রাগ করলেন?

না। বন্ধ যখন কলেজ, যাবেই তো।—বিভূতিভূষণ নিজেকে বুঝি সামলে নেন। তারপরে বলেন, আমারও তো স্কুল ছুটি হবে। ভাবছি কোথায় যাবো।

চলে আসুন না, শিলঙে, খুব আনন্দ করে বেড়ানো যাবে। আপনি তো বনজঙ্গল ভালোবাসেন, দেখবেন শিলঙের চারদিকে কী অবণ্যমায়া ঘেরা।

যাবো। তবে এবার নয়। অনেকদিন বারাকপুর যাইনি ইছামতীতে নাইনি। মন কেমন করছে।

বারাকপুর-ইছামতীর প্রতি ও'র টানের কাছে অন্য কোন টান যে কত তুচ্ছ তা জানে সুপ্রভা। বললে, তাই হোক। আপনি চিঠি দেবেন সেখান থেকে। আমিও লিখব। দুজনেই দু'জনের ঠিকানা নিয়ে বিদায় নিলেন।

বিভূতিভূষণ গেলেন চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলনে। পেঁৗছেই শুনলেন, রবীন্দ্রনাথের বোট ভিড়েছে গঙ্গাব ঘাটে। সুনীতিকুমার সাদরে ওঁকে হাজির করে দিলেন কবিগুরুর সামনে। পরিচয় আগেই হয়েছিল। বিভূতিভূষণ পদধূলি নিলেন। রোমাঞ্চিত হল সারা দেহমন তাঁর 'কল্পলোকের দেবতা'র আশীর্বাদের স্পর্শ পেয়ে। আর সেই রোমাঞ্চিত মুহূর্তেই ও'র মনে পড়ল, 'সুপ্রভার রুমালখানা সঙ্গে আছে'!

বারাকপুরে গিয়ে দেখেন, সুপ্রভার চিঠি এসে রয়েছে সেখানকার ঠিকানায়।

ঠিকানা বলতে পাশের পাড়া চালকি, জাহ্নবীদের বাড়ি। আধভাঙা ঘরখানা ছাড়া কেউ নেই আজ বারাকপুরের বাড়িতে। না থাক, তবু বারাকপুর আছে তার বন-জঙ্গল-পুষ্পসম্ভার নিয়ে এখনো, আছে তাঁর 'ইছামতী। বারাকপুরের ঘরেই উঠবেন

বিভূতিভূষণ, স্নান করবেন ইছামতীতে। লিখবেন, ওই ঘরের বারান্দায় বা উঠোনে বসে। শয্যাও সেখানে। কেবল খেতে যাওয়া—চালকিতে বোনের বাড়ি। রোজ তাও হয় না। পাড়ার কোন ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা বা নিজেই কিছু রান্না করে খাওয়া। এ নিয়ে জাহ্নবীর অনুযোগ আছে। কেন ও-রকম কষ্ট করছো দাদা।

বিভূতিভূষণ শোনেন না। বলেন, তবু বাবা-মায়ের ঘরখানায় একটু হাওয়া লাগে মানুষের।

কী হলে আরও বেশি করে স্থায়ী হাওয়া লাগতে পারতো, ফিরতে পারতো লক্ষ্মীশ্রী, তা জাহ্নবী বলতে পারে। তবে অনেক বলে হাল ছেড়েছে, আর বলে না। চুপ করে থাকে অভিমানে। মাঝে মাঝে নিজেই সে ঝাঁট দিয়ে যায়, দেখাশোনা করে তার বাবা মায়ের বাড়ি, দাদার ঘর। বিভূতিরও বাড়ির ঠিকানার চিঠিপত্তর জাহ্নবীর কাছেই পৌঁছে দেয় পিওন। খবর দেওয়ানেওয়া ওর কাছেই। দাদার হাতে সুপ্রভার চিঠি দিল জাহ্নবী।

সুপ্রভার প্রথম চিঠি! পকেটে করে চলে গেলেন বাইরে, ইছামতীর তীরে। বার বার খামখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। কী লিখেছে সুপ্রভা! পড়বেন কি, অনুভূতির ঘোরই কাটিয়ে ওঠা দায়। হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে সেই আইনদ্দীর বাড়ির কাছে গিয়ে একটা গাছের তলায় বসলেন। তারপরে খুললেন সে চিঠি।

সুপ্রভার চিঠি, কিছু কবিতায়, কিছু কথায়।—সব সময় ভাবছি আপনার কথা। এবার আর শিলঙও ভাল লাগছে না একলা। কী লগ্নেই যে পরিচয় ঘটল আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, কেন এমন হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে রাখলেন। চলে গেলেন বনগাঁর সেই লিচুতলা ক্লাবে। মিতে, মন্মথদাদের নিয়ে প্রায় আবৃত্তি সে চিঠির। তবু শেষ হয় না। পরদিন আবার সইমাদের বাড়ির পথের, সেই পথের পাঁচালীর বকুলগাছটার তলায় বসে চিঠি পড়া।

চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে কয়েকটা বকুলফুল খামে পুরে দিলেন। লিখলেন, এই আমার পথের পাঁচালীর বকুলগাছের ফুল, পাঠালেম তোমার জন্যে—।

এ তাঁর নতুন কিছু নয়। এ ফুল তিনি পাঠিয়েছেন রেণুমাকে, রত্নাকে, পুরুষ-বন্ধুদেরও। এবার সুপ্রভাকে।

তবু প্রথম লিপি, বকুলফুল। সুপ্রভার কাছে প্রথম শিহরণের মত। কলকাতা ফিরে তাই নিয়ে কতো কথা। ভবিষ্যতেও চিঠিতে ফুল পাঠানোর অনুরোধ সুপ্রভার। বিভূতিভূষণও উৎসাহী। প্রায় সব চিঠিতেই বকুলফুল। আর কী থাকতো? না, আর কিছু না—শুধু ফুল—আর গাছ—তারই কথা, অন্য কিছু নয়। তবু চিঠির মধ্যে ফুল? তাও একটি অনূঢ়াকে? কৌতূহল হলে অন্যায় নয়। এবং পুষ্পসুবাস যখন আসছেই খাম থেকে, একবার খুলে পড়াই যাক না একটি চিঠি। কী লিখেছেন বিভূতিভূষণ?

'কল্যাণীয়াসু,

সুপ্রভা, এবার তোমায় খুকুদের বকুলফুল পাঠানো হয়নি, সেদিন পত্রখানা ডাকে দেওয়ার পরে মনে পড়ল। আজ ওবেলা এখান থেকে চলে যাবো, তাই তোমাকে চিঠিটার মধ্যে বকুলফুল কিছু পাঠালুম। এই বকুলগাছটা আমার বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে বড় জড়ানো—ছেলেবেলায় যা কিছু খেলাধুলো, গল্প, মারামারি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সবই এই বকুলতলায় ঘটেচে, এখনও বসে লেখাপড়া করি এই বকুলতলাতেই। কত তো বকুলগাছ দেখেচি, কিন্তু মনে হয় এ-গাছের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, এর নিবিড় ডালপালার

মধ্যে কী যেন রহস্য জড়ানো। ছেলেবেলায় যখন এর ডালে উঠে খেলা করতাম, তখন মগডালের উঁচুদিকে চেয়ে ঘন ডালপালার ছায়া ও অন্ধকারে মন এক রহস্যভরা বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে যেতো। এখনও এক একদিন গাছতলায় বসে বই পড়তে পড়তে মুখ উঁচু করে চেয়ে দেখেচি, বাল্যের সে অনুভূতি আবার ফিরে আসে। আর খুব বড় গাছ, এত বড়, এত প্রাচীন বকুলগাছ এ অঞ্চলে কোথাও নেই—প্রায় দেড় বিঘে জায়গা জুড়ে আছে। কত দূর থেকে এর মাথাটা দেখা যায়! সেই কাঁচিকাটার মরগাঙের পুলটার রেলিঙের উপর উঠে দেখেচি, সেখান থেকে পর্যন্ত সবুজ ধোঁয়ার মত এর মগডাল নজরে পড়ে। আমিও এখান থেকে যাবার সময় প্রতি বছর কিছু ফুল সঙ্গে নিয়ে যাই, আমি ভারী ভালবাসি। দেখো কেমন সুগন্ধ ফুলগুলোর, তবুও তো কত শুকিয়ে যাবে, যখন তুমি পাবে। রেখে দিও।

পুঃ—এসময় আমাদের দেশে বনেজঙ্গলে কেলেকোঁড়া লতার ফুল ফোটে, এমন মিষ্টি সুবাস খুব কম উদ্যান পুষ্পে আছে। বনঝোপ, মাঠ, নদীতীর এমন আমোদ করে রেখেচে ওই বকুলতলার ফুলে। যত-বেলা যায়, ছায়া পড়ে, তত সুবাস ঘন হয়, কী অপূর্ব সুঘ্রাণ! পাগল করে দেয়, মাথার মধ্যে কেমন করে তার গন্ধে। অজস্র ফুটেচে বনেজঙ্গলে—কিন্তু তা তোমাকে পাঠানো যাবে না—একটা ফুলে তেমন গন্ধ নেই, খুব ছোট, কুচো কুচো। গন্ধের মাস এফেকটও ওই রকম অদ্ভুত হয়। দু'তিন দিনের বাসি ফুলে গন্ধ থাকেও না।'

মি[illegible] মেসেরই একটা ঘরে তখন থাকেন নৃত্যশিল্পী মণি বর্ধন। তাঁর দলের নাচের অনুষ্ঠান 'বিজলী'তে। তিনি একখানা কারড দিয়ে গেলেন বিভূতিভূষণকে—মিঃ ও মিসেস—অ্যাডমিট 'টু'।

এ দিয়ে আমার কি হবে? হেসে ফেললেন বিভূতিভূষণ।

ও'র মেসে দেখা করতে এসে কারডটা দেখেই সুপ্রভা ধরে বসল—চলুন যাই। এও সেই দরজা বন্ধ অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, কিন্তু একটু একটু করে যেন অনেক কিছুই সহ্য হয়, সহ্য করতে হয় বিভূতিভূষণকে। দু'জনে মিলেই গেলেন নাচ দেখতে। এবার কিন্তু অন্য প্রতিক্রিয়া। তাঁর মনে হল, 'আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ, সুবেশা তরুণীর দল, পরিপাটি আসন, বেশ ভালো লাগে পরিবেশটা, এসবের বেশ বড একটা স্থান আছে ছবি বা থিয়েটার দেখতে।'

হলের মধ্যে বসেই বললেন, চলো সুপ্রভা, বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

কোথায়?

যে-কোন জায়গায়।

বেশ।

স্কুল-কলেজে তো বারো মাসে তের পার্বণের ছুটি। ছোট একটা ছুটি দেখে দু'জনে মিলে শহর ছেড়ে দেওঘরে গেলেন ক'দিনের জন্য। দেওঘর, নন্দনপাহাড়, বৈদ্যনাথধাম—বেড়ানো। সুপ্রভা কথা দিয়েছিল জামা সেলাই করে দেবে। সূঁচ জোগাড় করে ওখানে বসেই একদিন ও'র ছেঁড়া জামাটা সেলাই করে দিল। হাঁ, বাইরেও ছেঁড়া জামা নিয়েই বেরিয়েছিলেন পথের পাঁচালীর লেখক। ও'র বালিশের খোল তৈরি করে দিল সুপ্রভা। বললে, বিছানাপত্তর একটু ভালো করুন এবার। কথাটা বলে, শুনে, দু'জনেরই হাসি।

একটা গান গাও সুপ্রভা।

সুপ্রভা গাইলো—

যৌবন সরসী নীরে

মিলন শতদল—

কল্পনার সায়রে শতদলের মত ভাসছে দু'টি প্রাণ।

দেওঘরের দিনগুলি ভরিয়ে দিল সুপ্রভা। প্রতিক্রিয়াটা কী রকম? দিনলিপিতে লেখা, 'ওর মত মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য ক'জনে পায়?'

এবার ছুটিতে শিলঙ চলুন আমাদের ওখানে। বেশ ক'দিন বেড়ানো যাবে একসঙ্গে।

বেশ, চলো। সুপ্রভার প্রস্তাবে আর আপত্তি নেই বিভূতিভূষণের। এর আগে দারজিলিঙ গিয়েছিল সুপ্রভা, বাবার সঙ্গে। সুপ্রভা ছাড়া ওর বাবাও অনুরোধ করেছিলেন সঙ্গী হতে। লেখার চাপে পারেননি। আজ সেজন্য দুঃখবোধ হচ্ছে। এবার নিশ্চয় যাবেন।

কিন্তু হল না। একাই সুপ্রভা শিলঙের টিকেট কাটলো। ও'র কাঁধে তখন প্রবাসীতে ক্রমশ প্রকাশিতব্য উপন্যাসের কপির চাপ। হাওড়ায় বিদায়ী ট্রেনের কামরা থেকে সুপ্রভার রুমাল-নাড়া দেখতে দেখতে মন খারাপ হয়ে গেল। মেসে ফিরে কয়েকদিন প্রায় স্নান-খাওয়া-ঘুম সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে কয়েক কিস্তির কপি শেষ। তারপরই নীরদের বাড়ি।

ঠিক নীরদের কাছে নয়, প্রস্তাবটা চুপি চুপি তাঁর স্ত্রী অমিয়ার কাছে।—ওদেব হোলডঅল আর অ্যাটাশে কেসটা চাই। সঙ্গে একটা পরিষ্কার চাদরও যদি হয়—।

এতো সাজগোজ ব'উলের? কী ব্যাপার? অমিয়া অবাক।

ভদ্রলোকের বাড়ি যাবো, একটু ভদ্র-সদ্র হয়ে না গেলে—। বোঝাতে চেষ্টা করেন বিভূতিভূষণ, তবে এদিক ওদিক দেখে। নীরদ এসে পড়লে আবার ধমক খেতে না হয়!

না, নীরদ চৌধুরী তখন ঘবে নেই। আশ্বস্ত করে অমিয়া বলে, তা কে সেই ভাগ্যবান, কোথায় থাকেন? ভদ্রলোকের নাম শুনতে পারি।

আপনার দেশে, শিলঙে—ওই ওদের বাড়ি যাচ্ছি।

শিলঙে, ওই-ওদের বাড়ি?—অমিয়া তির্যক হল।—মানে পটুব কাছে যাচ্ছেন!—অমিয়া না হেসে পারলো না।

বিভূতিভূষণও তখন হো-হো করে হাসছেন। তারপরে হোলডঅল, চাদব, অ্যাটাশে কেস সব নিয়ে হাওড়া। সেখান থেকে সুপ্রভার শৈলশহর শিলঙে। এটা উনিশ শ' ছত্রিশের মারচের শেষ।

অমিয়ার মত অন্য বন্ধুরাও হয়ত তখন ব্যাপার-স্যাপার দেখে তির্যক হচ্ছিলেন, মুখ টিপে হাসছিলেন, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বিভূতিভূষণের।

শহরে পৌঁছে প্রথমে একটা হোটেল খুঁজে আস্তানা বিছালেন। স্নো ভিউ হোটেল। স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকালে চললেন সুপ্রভার সন্ধানে।

লাবানের পথ দিয়ে চলেছেন। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছেন একটি মেয়েকে। সেও হাঁটছে—ঠিক যেন সুপ্রভার মত। কে না কে, বিদেশবিভুঁয়ে ডাকতে গিয়ে নাজেহাল হওয়া ঠিক নয়। অথচ আকর্ষণটা কাটাতে পারছেন না। দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছেন।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলেন, মেয়েটিও বারে বারে পিছন ফিরে তাঁর দিকেই চাইছে।

ভয় পায়নি তো? হঠাৎ যে দাঁড়িয়ে পড়ল? না কি, ধমকাবে। তাহলে? পিছন

বভূতি-অনুবাগিণী শিলং-এব সেই সুপ্রভা।
সৌজন্য বানা ঘোষ।

'পথেব পাঁচালী' শেষ ক'বে 'অপবাজিত'য হাত দিযেছেন—১৯৩০।
সৌজন্য   বত্না বাগচী।

ফিরে হঠাৎ দৌড়নো ঠিক নয়। অগত্যা, অন্যমনস্কতার ভান করে সামনের দিকেই পা ফেলতে হল।

পাশ কাটিয়ে সামনে যাবেন, হঠাৎ সেই চেনা গলা—আপনি!

এবার আর চিনতে কষ্ট হল না। সুপ্রভাই।

আমি জানতুম, আপনি আসবেনই।

কী করে জানলে?

বলব না।—চোখ-টিপটিপ হাসি।

কেন বলবে না? কেন সুপ্রভা ও-রকম করে দুঃখ দাও?

আপনি কেন দুঃখ দেন? সেদিন হাওড়ার ট্রেনে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন?

এসব তর্কে ভারি অপটু এই পাঁচালীকার। অপরাধীর মত তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

সান্ত্বনা দিল সুপ্রভা, যাক ওসব কথা এখন। আগে বাসায় চলুন দেখি।

এই সুন্দর বিকালে বাসায় নয়, পথে। চলো দুজনে হাঁটি।

কিন্তু সঙ্গের জিনিসপত্র রাখবেন তো।—বলেই সুপ্রভা লক্ষ্য করল ওঁর সঙ্গে কিছুই নেই। কিছু বলতে হোলডঅল-অ্যাটাশে এসব কথা ওর কল্পনার বাইরে। তবু সামান্য একখানা চাদর-গামছা অন্তত থাকবে তো! কোথায় সে-সব?

স্নো ভিউ হোটেলের কথা শুনে অভিমান হল সুপ্রভার। বাবা-মা-বোনেরা সব শুনলে কী ভাববে!

বিভূতিভূষণ বোঝালেন, কারো ঘরে থাকলে বাধো-বাধো ভাব। হোটেল থেকে যখন ইচ্ছে ঘোরো, বেড়াও—অনেক সুবিধে।

কথায় কথায় শহরের প্রান্তে এসে পড়ল দুজনে। সুপ্রভা বলল—এবার ফিরি?

না। এবারই ভালো লাগছে বিভূতিভূষণের। শহরটাকে তেমন পছন্দ হয়নি। 'এ বড় বেশি সাজানো, বেশি পুতুপুতু, সাজগোজ পরানো যেন আহ্লাদী পুতুলটি। আমি যা ভালোবাসি প্রকৃতির সে বর্বর বন্যরূপ এখানে নেই।'

তবে চলুন ক্রিনোলাইন ফলস ধরে স্প্রিঙ ঈগল ফলস-এর দিকে। দেখবেন সে রূপ।

সুপ্রভা প্রথমে ভরসা দিয়েছিল পথ সে চেনে। কিন্তু চলতে চলতে এক সময় নিবিড় পাইনবনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল।

নিবিড় অরণ্য, নির্জন পথ, ঘনায়মান সন্ধ্যা। দুটি পথহারা প্রাণী। খাসিয়া দস্যুর ভয়ে সুপ্রভার মুখ শুকিয়ে গেল।

ওকে ভরসা দিচ্ছেন বিভূতিভূষণ, আর সেই সময়ই দেখা গেল অন্ধকার বন চিরে দুটো ষণ্ডা মার্কা চেহারা ওদের দিকেই এগোচ্ছে। সুপ্রভা ভয়ে প্রায় চীৎকার করে ওঁকে জড়িয়ে ধরল।

মেয়েদের কাণ্ড দ্যাখো!

বনবাদাড়ে ঘোরা বিভূতিভূষণের জানা আছে কী করতে হয় এসব সময়। নিজের থেকেই এগিয়ে আলাপ জমিয়ে দিলেন তিনি ওদের সঙ্গে। দূরত্ব রেখে সুপ্রভা দেখছে, ওদের সঙ্গে নির্ভাবনায় কী সব কথা বলছেন বিভূতিভূষণ, বিড়ি বিনিময় করছেন—যেন কত দোস্তি! ওরাও 'ডাঙ্গরবাবু', 'বুঝবানবাবু' বলে ৮৩ 'হম্মান' দেখিয়ে বিদায় নিলে।

আপদ বিদায়। বাব্বা! সুপ্রভার গা দিয়ে ঘাম ছাড়লো। দুর্গা দুর্গা করে শহর

সীমান্তে যখন পেৌঁছলো, তখন বেশ রাত হয়েছে। একটা ট্যাক্সি করে সুপ্রভাকে তাদের 'সনৎ কুটিরে' পেৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরলেন বিভূতিভূষণ।

রাতে হয়ত দিদির পাশে শুয়ে চুপি চুপি আজকের কাণ্ড শুনতে শুনতে সুপ্রভার সঙ্গে তার ছোট বোন সেবাও কেঁপে উঠছিল ভয়ে। আর বিভূতিভূষণ?

তখন স্নো ভিউ হোটেলে নিজের বিছানায় আধশোয়া হয়ে পুলকিত শিহরণে দিনলিপিতে লিখছেন, 'কী ভালোই লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল ফোটা পাইন বনের পথে সুপ্রভার সঙ্গে বেড়ানোটা'।

পরদিনও একটা প্রোগ্রাম আছে বেড়ানোর। সুপ্রভা, সেবা, ওদের দু'একজন বান্ধবীর সঙ্গে যাবে সিলেটের দিকে গাড়িতে। বিভূতিভূষণকেও বলেছে সঙ্গে যেতে। ভাবতেই ও'র আনন্দ হচ্ছে।

সকাল থেকে সময় গুনে চলেছেন। আর ভুল হয়ে গেল কিনা ঠিক সময়টাতে। বেরিয়েছিলেন হোটেল থেকে হাতে বেশ সময় রেখে। কিন্তু এই হাতের সময়টাই সব গোলমাল করে দিলে। ভাবলেন, পথে গাছপালা, পাহাড় একটু দেখতে দেখতেই যাই। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ একটা বড় ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন। ইশ্ দেরি হয়ে গিয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি। সনৎ কুটিরে এসে শুনলেন, অনেকক্ষণ পথ চেয়ে এইমাত্র ওরা বেরিয়ে গেল। তবে স্নো ভিউ হোটেলের পথে দেখা হতে পারে, হোটেল ঘুরেই যাবে ওরা।

হোটেলের দিকে ট্যাক্সি ঘোরানো হল। না, সেখান থেকেও একটু আগেই মেয়েদের নিয়ে একটা ট্যাক্সি ফিরে গিয়েছে।

এখন? একবার ভাবলেন থাক। কিন্তু পরক্ষণেই ঝোঁক চেপে গেল—চলো সিলেটের পথে। জোরে চালাও ট্যাক্সি, দিদিমণিদের ধরে দিতে পারলে বকশিস।

ড্রাইভার ছুটল ও'কে নিয়ে। দু'একবার বিপরীত দিক থেকে আসা ট্যাক্সি থামিয়ে জেনে নেয়—হাঁ, একটু আগেই একটা ট্যাক্সি যাচ্ছে মেয়েদের নিয়ে।

মেয়েদের নিয়ে? 'চালাও, আরো জোর দাও, ত্রিশ কেন? চল্লিশ করো না স্পীড!'

স্পীড চড়িয়ে ড্রাইভার বললে, সামনে লেভেল ক্রসিং। ওটা যদি বন্ধ থাকে কথাই নেই।

তা তো নেই, যদি ওদের গাড়ি বেরিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়।

তবে মুশকিল।—আর কী বলে ড্রাইভার।

এসে গেছি! হাঁ, ওই তো লেভেল ক্রসিং। গেটও তো বন্ধ দেখছি। কিন্তু সুপ্রভাদের ট্যাক্সি? গেট কি ওদের বেরিয়ে যাওয়ার পরই বন্ধ হল?

টাইম-কীপারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এইমাত্র বন্ধ হল গেট। সুপ্রভাদের গাড়িখানা গেট পার হয়ে গিয়েছে আটটা বিয়াল্লিশ মিনিটে। আর এখন আটটা বাহান্ন মিনিট। ঠিক দশ মিনিট আগে বেরিয়ে গিয়েছে ওরা। ট্যাক্সি ফেরালেন বিভূতি-ভূষণ।

সেদিন সুপ্রভাও হয়ত বুঝেছিল চোখে চোখে না রাখতে পারলে এমনিই হয়ত হারিয়ে হারিয়ে যাবেন লোকটি। ফিরে এসে এক রকম জোর করে স্নো ভিউ হোটেল থেকে সনৎকুটিরে নিয়ে গেল ও'কে। সুপ্রভার বাবা অনুযোগ করলেন, ওভাবে হোটেলে ওঠায়। এবার তাঁরা সবাই খুশি। সুপ্রভার ছোট বোন সেবার তো কথাই নেই। বারে বারে বলে—কী, কেমন হল? হাসছেন বিভূতিভূষণও। তাঁর দুঃখ মুছে দিচ্ছে সুপ্রভা সেবাযত্নে, সঙ্গ দিয়ে, সঙ্গীতে। তার ফাঁকে ফাঁকে দু'জনে মিলে ঘোরা—লতা

ঝোপ, জঙ্গল, নিবিড় আন্ডার গ্রোথ—পরগাছা, চঞ্চল উচ্ছল ঝরনাধারা, শিলাখন্ড, বিরাট বনস্পতিদল, ফার্ন্, থুজা, প্রাইমুলারা তার সাথী হয়ে রইল। আর সাক্ষী ও'দের দুটি মন। সে স্মৃতিতে ভরে উঠল বিভূতিভূষণের দিনলিপির পাতা, মনের পাতাও। সেখানে সব ছাপিয়ে ভেসে ওঠে—'মননশীলা মেয়ে সুপ্রভা, তার দুর্লভ সেবা, সাহচর্য।'

এ সময়, উনিশ শ' আটত্রিশের ফেব্রুয়ারিতে বেরোল 'জন্ম ও মৃত্যু'। উপহার দিলেন সুপ্রভাকে।

সেবা-সাহচর্য ওর কলকাতাতেও। মেসে এসে ঘর গুছিয়ে দেবে। ও'র সঙ্গে বেড়াবে, গান শোনাবে।

আর এই গানের সময় আরও বেশি করে ভালো লাগে সুপ্রভাকে, গানপাগল বিভূতিভূষণের। গানের কান তৈরি হয়েছে ও'র শৈশবেই। জন্মের পর থেকেই গানের হাওয়ায় সুরের নিঃশ্বাস নিয়েছেন মহানন্দতনয়। আজও শহরের সকল কাজের মধ্যে গান তাঁকে নেশার মত টানে। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের বাড়িতে রাগসঙ্গীতের আসর বসে, পয়লাসারির শ্রোতা বিভূতিভূষণ। প্রতাপ মজুমদারের থিয়েটার রোডের বাড়িতে রাতে গান হবে দিলীপ রায়ের। বিভূতিভূষণ আগেভাগে হাজির। দুপুর রাত অবধি গান শুনে নেশাগ্রস্তের মত পথে নামেন। মেসের দরজা বন্ধ। পারকে বসেই রাত কাটে।

রত্নার স্বামী সমরেন্দ্রনাথ বাগচী জজিয়তি করতে বদলি হয়েছেন চাটগাঁয়, সেই রেণুমাদের দেশে। ওদের আমন্ত্রণ পেতেই চলে গেলেন সুদূর চট্টগ্রামে। ও'কে খুশি করার জন্য রত্নারা গোপাল দাশগুপ্তকে ডেকে এনেছেন গান শোনাতে। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়ে গেলেন ভদ্রলোক। সারারাত আটকে রাখলেন রত্নাদের ছাতে, একটার পর একটা ফরমাশ। আর সে কী প্রশংসা!

ভদ্রলোক করতেন ওকালতি। বিভূতিভূষণ বললেন, ছেড়েদিন ওসব, গান নিয়েই থাকুন আপনি।

ছেড়েই দিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত আদালত-মক্কেল। আকাশবাণীর সংগীত শাখায় একটি বিশিষ্ট পদে আসীন গোপাল দাশগুপ্ত নামটিও পরে সুপরিচিত।

মণি গান জানে, গান জানে রেণুমাও কিন্তু রোজ তাদের পান কোথায়? সুপ্রভাকে তো সব সময়েই পাওয়া যায়।

—একটা গান শোনাও সুপ্রভা। বটানিক গারডেনের একটা ঝোপের কাছে বসে সুপ্রভা ও'কে গান শোনালো—'রোদন ভরা এ বসন্ত'।

সুপ্রভার এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এবার শিলঙ যাবে' তার আগে ক'দিন ধরে খুব বেড়াচ্ছে আর গান শোনাচ্ছে ও'কে। তবু আজকের গানটায় যেন বিষাদের সুর মাখা! কেমন যেন লাগল বিভূতিভূষণের। বললেন, চলো, এগিয়ে গঙ্গার জলের কাছে গিয়ে বসি। স্রোত দেখতে ভালো লাগে।

জীবনটাও তো থেমে নেই কারো। স্রোতের মত এগিয়ে যাচ্ছে। সুপ্রভা সেখানে বসে হঠাৎ বললে, আপনি শিগগির কিন্তু একবার শিলঙ যাবেন।

যাবো, কিন্তু শিগগির কেন?

আমি বেশিদিন বাঁচবো না।

এ-জগতটার প্রতি কেন এমন অকরুণ বৈরাগ্য?

বৈরাগ্য কে বলছে? আমার আয়ু কম, জ্যোতিষী বলেছেন। কবে মারা যাবো আপনি টেরই পাবেন না।

জ্যোতিষী? আমি ভাল জ্যোতিষ জানি, দেখি তোমার হাত।

সুপ্রভার হাতখানি ওঁর হাতের মধ্যে রইল কিছুক্ষণ।

অকারণ বিষণ্ণ বিভূতিভূষণ। সত্যিই যদি কিছু ঘটে সুপ্রভার। বিচ্ছেদ আর মৃত্যুর সঙ্গে বারে বারে পরিচয় ঘটেছে। তাঁকে 'জীবনে বেধ হয় দীর্ঘদিন স্নেহ-মমতা-প্রীতি-সুধা ভোগের অধিকার দেননি বিধাতা।' 'আচ্ছা, ভগবান যাকে বেশি ভালবাসেন তাকেই কি ততো বেশি আঘাত দেন?' এসব ভাবনা দিনলিপিতে উৎকীর্ণ হয়।

এবার শিলঙে গিয়ে সুপ্রভা পর পর এমন কয়েকটি চিঠি দিল যে সত্যিই উদ্বেগ হল বিভূতিভূষণের। ক'দিন পরে স্কুলে ইসটারের ছুটি। শিলঙ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তিনি। তবে এবার একটা অন্য ব্যাপার ঘটল। সেই 'ভদ্রসদ্র' সাজার জন্য অমিয়ার কাছে হাজির হতেই সরাসরি একটি স্পষ্ট প্রশ্নের সামনে পাকা শিক্ষককে দাঁড় করালেন বন্ধু-পত্নী। কথাটা তুললেন সব গোছগাছ করে ঠিক যাওয়ার মুখে।—আচ্ছা, পটু ডাকলেই আপনি নাচতে নাচতে যান কেন বলতে পারেন?

ওই দ্যাখো। এ একটা কথা হল? মেয়েটা সত্যিই খুব ভাল। বড্ড সেবাপরায়ণা কিনা!

বেশ তো, কিন্তু ওই সেবাপরায়ণারও তো কিছু চাহিদা থাকতে পারে। তা ভেবে দেখেছেন?

মানে? ও তো কখনও কিছু বলেনি।

অনেক মেয়েই মুখে অনেক কথা বলতে পারে না, বলে না। কিন্তু আপনি সাহিত্যিক, আপনার নিশ্চয় বোঝা উচিত।

মস্ত একটা চোট খেয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ। সারা পথ পেরিয়ে গেল অমিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে। এই যে কত পথ বেয়ে সুদূর এক শৈলশিখরে পাইন আর বারচের ছায়ায় বসে থাকা একটি মেয়ের সান্নিধ্যে চলা, এই বা কেন? এই-ই কি প্রেম? ভালোবাসা? তিনি জানেন "ভালোবাসা 'পিটি' নয়, 'চ্যারিটি' নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়; ভালোবাসা—ভালোবাসা। এ এক গভীর সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অপরূপ আনন্দ"।

প্রেম, ভালোবাসা—এর মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় সেই আনন্দ। আর বিবাহের মধ্যে সে খুঁজে ফেরে সুখ। সে সুখ তিনি কেমন করে দেবেন কাউকে? বিভূতিভূষণ জানেন, আজ তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, শেষ পর্যন্ত বারাকপুরেরই বাসিন্দা হবেন। পাড়াগাঁয়ের সেই বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবন। ভোরে উঠে উঠোনে গোবরজলের ছড়া দেওয়া, নাইতে যাওয়া ইছামতীর ঘাটে, জল ভরে কলসী কাঁখে ঘরে ফেরা, ঘর-কর্না। বেলা পড়লে পানের বাটা সামনে সাজিয়ে জ্যেঠিমা-খুড়িমাদের সঙ্গে আড্ডায় জমা, পরচর্চা আর গ্রাম্য রসিকতায় গড়াগড়ি করা। আবার ঝিঁঝিডাকা সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপের সামনে বসে পাঁচালী পাঠ।—না, পারবে না সুপ্রভা। পারবেন না তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তীর্ণা একটি ধনীর দুলালীকে শৈলশিখরের রম্যভিলা থেকে এই দুঃখময় জীবনের মধ্যে নামিয়ে আনতে। তাছাড়া আর এক দুর্বল ভাবনাও বুঝি ভারী হয়। সুপ্রভারা কায়স্থ। বিভূতিভূষণের ব্রাহ্মণ-স্বজন পরিবৃত বারাকপুরের পল্লীসমাজ কি তেমন সহনশীল?

এ-রকম মানসিকতা নিয়ে সেবার শিলঙ পৌঁছলেন। অথচ ওদের অস্থায়ী আবাস পরীভিলায় গিয়ে যখন শুনলেন সুপ্রভা সেখানে নেই অমনি মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দরজায় কড়া নড়তেই বেরিয়ে এলো ওর ছোট বোন সেবা। বলল, দিদি নেই।

নেই মানে? প্রায় ভেঙে পড়ছিলেন আগন্তুক। এমন সময় হাসতে হাসতে সুপ্রভার প্রবেশ। মেঘ ভেঙে রোদ উঠল। যুক্তির সঙ্গে মন আড়াআড়ি চলছে যেন। ফলে সারা পথ ভেবে ভেবে যে সিদ্ধান্তই করুন সুপ্রভার চমকিত দর্শনে তা ভেসে গেল তখনকার মত। ওর সান্নিধ্যে, সঙ্গীতে, সহচারণে আনন্দময় বিস্মরণের ভেলায় ভাসা গেল কয়েক দিন। কিন্তু তারপর? ফেরার সময় কি কিছু কথা হয়েছিল দু'জনের মধ্যে?

অন্তত বন্ধুপত্নী অমিয়া দেবীকে এসে বলেছিলেন, না, না, আপনি যা ভেবে-ছিলেন, ও-রকম কিছু হচ্ছে না, অনেক কথাই হল ওর সঙ্গে। ওসব বাজে ভাবনা না করাই ভাল। আমি মুক্ত পথিক।

ও-রকম কিছু যে হয়নি তার প্রমাণ ক'দিনেই মিলল। ক'দিন পরেই তের শ' সাতচল্লিশের সেই বৈশাখের পনের তারিখে শৈলশিখরে সুপ্রভার বিয়ের গোধূলি লগ্নে বিভূতিভূষণ বারাকপুরের ইছামতীর তীরে বসে সূর্যাস্তের রূপ দেখছেন।

কিন্তু সত্যিই কি তিনি মুক্ত পথিক? পথে নেমেও কি মনে পড়ে না কোন গৃহাঙ্গনের কথা? ওই বিয়ের ক'দিন আগে নীরদ, সজনীকান্তদের সঙ্গে গিয়েছিলেন পাটনা সাহিত্য সম্মেলনে। সাহিত্যবাসর শেষে রাতের জ্যোৎস্নায় বাইরে এসে মনে পড়ে 'অনেক অনেক দূরের এক পাহাড়ে, পাইন আর বারচের বনকুঞ্জে ছোট একটি ঘর সনৎ-কুটিরেও হয়ত এমনি জ্যোৎস্না নেমেছে।

'এতক্ষণ কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে? ওরা সবাই? সুপ্রভাও?'

॥ তের ॥

জ্যৈষ্ঠের পড়ন্ত বেলা। আম-কাঁঠালের গন্ধ-মাতাল বারাকপুরের বন-পবন। খেলাত স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণ এখন বারাকপুরে। সালটা উনিশ শ' বত্রিশ।

রোয়াকে বসে বই পড়ছিলেন। পাশেই ছোট্ট পুকুর বিলবিলে, জলে টইটম্বুর। চারদিক নিঃঝুম। হঠাৎ মনে হল, ঝুপ করে একটা আম পডল জলে। আবার শব্দ। তারপর আবার একটা। আশ্চর্য। ভাবছেন, এত আম পড়ছে কোথা থেকে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন, কে যেন বিলবিলের ঘাট থেকে ডাল ছুঁড়ে মারছে।—কে ওখানে?

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো এক তরুণী। বললে, ইশ্‌ কবির তন্ময়তা ভেঙে দিলেম। কী খারাপ কাজই করেছি।

না। বিভূতিভূষণের মন বললে 'এই তো সুন্দর কবিতা। আর এ যদি কবিতা না হয় তবে কবিতা কী আমার জানা নেই।'

খুকু কাছে এসে দাঁড়াল। বিলবিলের জল থেকে তুলে আনা এক থোকা কচুরিফুল ছিল বিভূতিভূষণের পাশে। খুকুর খোঁপায় পরিয়ে দিলেন।

জগতে এমনি বিচিত্র যোগ ঘটিয়েই যেন কে আড়ালে বসে কৌতুকে হাসেন। ভিন গাঁ থেকে আসা সেই অঙ্কের মাস্টার প্রতিবেশী যুগলমোহন। যাঁর চতুঃসীমায় ঘেঁষতেন না বিভূতিভূষণ আতঙ্কে, অঙ্কাতঙ্কে। হাঁ, ও'র সেই ছাত্রজীবনের আতঙ্ক, বনগাঁ স্কুলের অঙ্কের মাস্টার যুগলমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ছোট মেয়ে খুকু,—

ভালো নাম প্রীতিলতা।

আজ আর ছাত্র নন বিভূতিভূষণ, স্বয়ং শিক্ষক। যুগলমোহনও অবসরপ্রাপ্ত। তাঁরই মেয়ে খুকু যখন ছাত্রীর মত শ্লেট-পেনসিল নিয়ে হাজির হল বিভূতিভূষণের কাছে, সে এক বিচিত্র যোগ বইকি!

ঘরে বসে স্বামী-স্ত্রীতে কথা। যুগলমোহন বলেন, মহানন্দদার ছেলে দ্যাখো, কতো বড় হয়েছে। আজ দেশজোড়া ওর নামডাক। কতো বই-পুস্তক লিখছে। সভা ডেকে সুখ্যাতি করছে লোকে।

খুকু অবাক হয়ে শোনে। কী বই, কী বৃত্তান্ত। অতশত বোঝে না সে।

মা স্নেহলতা বলেন, বুঝবি কি? 'ক' অক্ষর গম্যি হয়েছে তোর? তারপরে একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তা উয্যুগ থাকলে সবই হয়। সেদিন বিকেলে দেখলুম বকুল-তলায় শুয়ে আছে বিভূতি, জগা এসে কী সব লিখে নিচ্ছে। বাড়ি এলেই ওর কাছ থেকে কতো কী শিখছে জানছে পাড়ার সবাই। মাধবীকঙ্কণ আরও কতো কী সব পাঠ করে শোনায়। বাপ ছিলেন বড় কথক, তাঁর গুণ পেয়েছে ছেলে, কেমন সুন্দর করে বলতে, বোঝাতে পারে। ওসব শুনলেও অনেক শেখা হয়।

ভিড়ের মধ্যে শিখতে বসতে পারবে না খুকু। আলাদা করে শেখাবেন কি? খুকু জিজ্ঞেস করে।

মা চটে যান মেয়ের কথায়। জগাদের শেখাচ্ছে, আর তুই কি ওর পর?

সেদিন বিকেল। সইমাদের বকুলতলায় শুয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। খুকু এসে দাঁড়াল।

কী খবর খুকুরানী?

আমার বুঝি ভালো নাম নেই?—ভারিক্কী উত্তর।—আমার নাম প্রীতিলতা, প্রীতি—

চোট সামলে উঠে বিভূতিভূষণ বলেন, তা তো নিশ্চয়, তা তো নিশ্চয়, ভালো নাম তো থাকতেই হবে। তবে আগে দেখতে হবে মেয়েটি তুমি ভালো কিনা। এবং নামের মত প্রীতিপ্রদ কিনা, অর্থাৎ ভাল লাগবে কিনা।

উঁহু, ছাই লাগবে!

না না, তা বলিনি। ছাই হবে কেন—কেমন ফুটফুটে মেয়ে—

কাঁচপোকা।—ওঁকে বাধা দিয়ে খুকু তার মায়ের ভাষা নকল করে বলে, 'ক' অক্ষব গম্যি হয়নি। ছাই না তো কি?

তা শেখো না কেন লেখাপড়া?

শেখাবেন আপনি?

নিশ্চয়, এক্ষুনি শুরু হোক।—মাসটার বিভূতিভূষণ উঠে বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই খুকু ছুট। বাড়ি থেকে শ্লেট-পেনসিল নিয়ে হাজির।

পাঠ শুরু। শুরু এভাবেই দুজনের কাছে আসার পালা।

খুকু দেখল সকাল-বিকাল ওঁকে পাওয়া দায়। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান। জগো সে কথা বুঝে গিয়েছে। জগো, পাঁচির ছোট ভাই, পুঁটিদির ছেলে। বড় ছেলে গোষ্ঠ আজ কোথায়! জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে সে কিশোর আমের লোভে গাছে উঠেছিল। ডাল ভেঙে পড়ল। বুক ভাঙলো পুঁটিদির। সে কী কান্না তার। মাটিতে আছড়ে, বুক চাপড়ে কাঁদছে বিভূতির পুঁটিদি। কাঁদছে বিভূতি, কোলে নিয়ে গোষ্ঠর প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ।

অনেকদিন পরে এই জগো এসে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে পুঁটিদির বুকে।

বিভূতিও তাকে ভালোবাসেন ঠিক নিজের ভাগনের মত। জগোরও নিজের মামা নেই। ছিল—পুঁটিদির এক ভাই ভরত, খেলার সাথী বিভূতির। সেও সব খেলা ভেঙে দিয়ে পৃথিবীর ধূলি ঝেড়ে বিদায় নিল সতের বছর বয়সে। সেই থেকে সইমা কাদম্বিনী ছেলে বলতে জানে বিভূতিকে, পুঁটিদিও জানে ও তার মার পেটের ভাই। বিভূতিরও এক কথা। বারাকপুরে সইমা আছে। ওদের ঘরে খাবার নিমন্ত্রণের দরকার হয় না। আসন পাতাই।

জগোর ছোট থেকে পড়ার ঝোঁক। মামাবাড়ি এলে এবং মামাকে পেলে আর ছাড়া নেই—নেওটা হয়ে লেগে থাকবে। পরে সেই লোক চব্বিশ পরগনা-মালদা-বহরমপুর নানা জায়গায় বদলি হয়ে ছাত্র পড়ান বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে। ভাল নাম শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পাঁচি বলে ধরতে হলে দুপুরে। সেদিন মেঘলা দুপুরে পাঁচিকে নিয়ে খুকু এসে উঁকি দিল জানলায়। দেখল ঘুমুচ্ছেন। ডেকে তো আর তোলা যায় না। কিন্তু জগো এসে ঠিক ডেকে তুলল। খুকুরা এসে আবার জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াতেই বিভূতি-ভূষণ খুশি। পড়বে এসো।

খুকুর ওই কথা, মাথা নেই আমার, লেখাপড়া হবে কি করে।

নিশ্চয় হবে। না হলে আর মাসটার কিসের আমি।

আশ্বাসে-আশ্বাসে ওকে উৎসাহিত করেন বিভূতিভূষণ। তারপরে পড়ানোর অন্য কৌশল ধরেন। বলেন, এসো, আজ গল্প হোক। রোয়াকে বসে জগো পাঁচি, খুকুকে সূর্যের গল্প বললেন। খুকুর আগ্রহ বেশি। বললে, চাঁদের গল্প বলুন। শুরু হল গ্রহ-নক্ষত্রের নানা গল্প, যেমন করে মিতে-ছাত্র বিভূতি, শীতল, স্মৃতিদের কাছে বলতেন, তেমনি করে, বিজ্ঞানের তত্ত্বকে উপন্যাসের মত রসিয়ে সে বলা। বঙ্গশ্রী অফিসে বসে পক্ষীদ্বীপ বা কাঠবিড়ালীর আশ্চর্য ঘুমের ফিচার তৈরির মত সাজিয়ে সহজ সুন্দর ঢঙে বলা।

আকর্ষণ ওদের মধ্যে খুকুরই বেশি। সে-ই বড় সমঝদার। বলে, এ আমার বেশ লাগে। চাঁদ, সূর্য তারা তো রোজ দেখছি, এতো কাণ্ড কি জানতুম। উঠে যাওয়ার সময় বলবে, কাল আরও বলবেন।

মেতে যান বিভূতিভূষণও। যে ক'দিন বাড়িতে থাকেন, আর কেউ না আসুক খুকু ঠিক হাজির। দুপুরে এসে ঠিক ঠিক পাকড়াও করতে না পারলে দিনটাই বৃথা যায়। তবু নাগাল পাওয়া ভার। একদিন সন্ধ্যার পর দেখে ও-ঘরে যেন আলো জ্বলছে। বেড়ার 'পরে টোকা দিল।

কে?

দরজা খোলা। মুখে সাড়া না দিয়ে নেপথ্য থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো খুকু।

কী ব্যাপার। ক'দিন যে দেখাই পাইনি।

বা রে! নিজেরই পাত্তা নেই। আবার উল্টো কথা। রোজ খুঁজে যাই। সবাই বলে, যা, খুঁজে দ্যাখ, ইছামতীর পাড়ে না হয় নীলকুঠির জঙ্গলে।

তাই নাকি? তা গেলেই পারতে।

যেমন কথা! মেয়েছেলে না!

বাচ্চাদের আবার মেয়ে আর ছেলে।

ইশ্, বাচ্চা! খুকুর মর্যাদায় লাগে। বয়স কতো জানেন? বেশ বড়ো হয়েছি! কিন্তু পড়াশুনোটায় আর একটু যে বড় হওয়া দরকার।

তা হবে কী করে?—পাল্টা অনুযোগ খুকুর। একগাদা সেনটেনস তৈরি করেছি। দেখাবো কাকে!

ওঃ, সেই কথা। এক্ষুনি নিয়ে এসো।

বাড়িতে ছুটে এসেই মাকে বললে খুকু কথাটা। তা মেয়ের মতিগতির মোড় ঘুরছে দেখে স্বামী-স্ত্রী ওঁরা দু'জনেই খুশি। বিভূতির মত ছেলে! বইখাতা দিয়ে পাঠিয়ে দেন। এটা বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপ লেখার সময়। এ পর্যায়ে বিভূতিভূষণ ডায়েরীতে লিখছেন, 'খুকু রোজ সন্ধ্যায় আমার কাছে শ্লেট পেনসিল বই নিয়ে পড়তে আসে। আমি বসে মেটে প্রদীপের আলোয় দৃষ্টিপ্রদীপ লিখতুম।'

খুকুর খাতা দেখে নতুন পড়া দেন। নিজে দৃষ্টিপ্রদীপে মগ্ন হন। লিখতে লিখতে এক সময় চোখ তুলে দেখেন খুকু ওঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

কি গো, পড়া হয়ে গেল?

বা রে, ক-খ—ন!

বলনি কেন?

বাব্বাঃ, যা একমনে লেখেন। আচ্ছা, কী লেখেন অত?

শুনবে তুমি?

পড়ুন তো দেখি! গালে হাত, মস্ত সমঝদারের ঠাটে বলল খুকু।

শুনতে শুনতে দু'চোখ জলে ভরে যায়। জিতুদের দুঃখে কান্না আর সামলাতে পারে না। রুদ্ধ হয়ে আসে পাঠকের গলাও। খুকুরা বুঝলেই রচনা তাঁর সার্থক।

পথের পাঁচালী পড়তে গিয়ে তো খুকু আকাশ-পাতাল ভাবনায় অস্থিব। এ তো সবই আপনার নিজের কথাই লিখেছেন। কী দুষ্টুই ছিলেন আপনি ছোটবেলায়।

তুমি কী করে বুঝলে। তুমি তো আমার ছোটবেলা দেখোনি।

বাবা তো দেখেছেন। বলেন, সবই ওর কথা। সব সত্যি।

তাই নাকি?

না তো কী। এখনও কি বদলেছেন? সেই ইছামতী, নীলকুঠি আর বনজঙ্গল নিয়েই তো আছেন।

কোন জবাব দেন না বিভূতিভূষণ। ভাবেন, সত্যিই, বদলাননি তিনি এতটুকু।

খুকু বলে, চলুন, কুঠির মাঠে যাবো আপনার সঙ্গে।

গিয়ে খুকু অবাক হয়, গাঁয়ে এতদিন থেকেও কতো গাছ, ফুল তার দেখা হয়নি, যা এই কুঠির মাঠে সে দেখল, চিনল, জানাশোনা হল ওদের সঙ্গে—কেমন যেন একটা সম্পর্কের মত। ফিবে বিভূতিভূষণ বললেন, এসো, ইছামতীতে সাঁতার কাটি।

কী এক সম্মোহন যেন ছড়িয়েছেন খুকুর 'পরে বিভূতিভূষণ। সে আহ্বানে ও সাড়া না দিয়ে পারে না। গবমের জ্যোৎস্না রাতে দু'জনে মিলে স্নান-সাঁতারের পালা।

ক'দিনে এমন হল যে খুকু ছাড়া যেন সময কাটে না। সকালে এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে কাগজ-কলম গুছিয়ে দেবে খুকু। নাইতে গেলে সঙ্গ নেবে। বিকালের দূরপাল্লার ভ্রমণে অবশ্য সঙ্গে যায় না। সন্ধ্যার পব থেকে ঘরে বাতি জ্বললেই উঁকি দেবে—এলেন কি?

বনগাঁ গেলে মিতের সঙ্গে গল্পে গল্পে বারে বারে খুকুর কথা আসবে। কলকাতা এসে নীরদের বাড়িতে খই ফোটাবেন খুকুর নামে। তবে সাবধানে। নীরদের সামনে বেশি নয় সুবিধা হয় বধূপত্নী অমিযার কাছে। পাহাড় এবং শহরের মেয়ে অমিয়া একটি নদীলালিতা গ্রাম্যবালার কাহিনী শুনবে ওঁর মুখে। খুকুর খোঁপায় সেই

কচুরিফুল গুঁজে দেওয়ার গল্প। বলতে বলতে আবেগে নিজেই আপ্লুত হবেন, 'আহা! ফুলটা ভারি মানিয়েছিল ওর খোঁপায়।'

অমিয়াও মুগ্ধ, 'তাঁর মুখে এই কচুরিপানার ফুলের সৌন্দর্যের কথা শুনে আমার নিজেরও একটা অদ্ভুত আকর্ষণ হয়ে গেল এই ফুলটার ওপর।' অমিয়ার কথা, 'আমি পাহাড়ের মেয়ে, কচুরিপানা আগে আর কোথায় দেখব? কিন্তু আজকাল যখনি কোথাও জলের মধ্যে সেই বেগুনী রঙের সুন্দর ফুলের থোকাটি দেখি, তার সৌন্দর্য উপভোগ না করে পারি না।'

সুপ্রভার কাছেও না বলে পারেন না খুকুর কথা। খুকুর কাছেই কি লুকোনো চলে সুপ্রভা-প্রসঙ্গ?

জ্যোৎস্না রাতে বেড়ার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে খুকুর আগমন। বিভূতিভূষণ অপ্রস্তুত। খুকু হাত পাতে, ওটা কার চিঠি, দেখবো? মেয়েলি লেখা যেন?

সুপ্রভার লেখা চিঠিখানা পড়ে অবাক লাগে খুকুর। কতো কথা লিখেছে, ইশ্! আবার বলছে খামে করে বকুলফুল পাঠাতে! হু-ম্।—বলেই উঠে যাচ্ছিল। ধরে ফেললেন বিভূতিভূষণ, কী হল, কিছু বললে না যে!

না, না, কিছু না, বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে প্রথমে। না-পেরে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপরে বললে, আচ্ছা, মেয়েটা খুব সুন্দর দেখতে না?

না, তোমার মত চাঁপাকলি মোটেই নয়। আমার চাইতেও কালো।

যান আপনি! মিথ্যে কথা সব। আমি জানি, খুব সুন্দর সে। আর শিক্ষিতাও।

হাঁ, শিক্ষিতা। এম. এ. দিচ্ছে এবার।

সে কি আপনার চাইতেও বেশি পড়েছে?

অনেক বেশি।

তবে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায় কেন?

আমি কেন ভাব করতে চাইছি তোমার সঙ্গে?

ওমা, কী কথা! বলেই ছুট।

পরে এসে বলবে, আচ্ছা, ওই মেয়েটা আপনাকে খুব চিঠি লেখে, না?

কেন বল তো? বিভূতিভূষণ হাসেন।

কী যেন ভাবে খুকু। তারপর বলে, এবার একখানা চিঠি লিখব আপনি কলকাতা গেলে।

বেশ তো, ভালই হবে।

কলকাতা এসে অনেক দিন একটি কাঁচাহাতের লেখা চিঠির আশায় কাটালেন বিভূতিভূষণ। কোন চিঠি এলো না।

বারাকপুর ফিরেই অভিযোগ করলেন, কই, দিলে না তো চিঠি।

ক্ষমা চাইল খুকু। লেখা হয়ে আছে। কিন্তু ডাকে দেবে কি করে? কাউকে বললে যে জেনে যাবে সবাই।

তবে হাতেই দাও।

সে আমি পারব না।

কেন?

খুকু লজ্জায় রক্তিম।

আমতলায় চেয়ার পেতে বসে আছেন। পথের পাঁচালীর সেই সজতেখাগি আম-

গাছটা। নেপথ্যে সাড়া জাগিয়ে দু'বার খুকু এলো আর চলে গেল। এবার দৃষ্টি দিয়ে বেঁধে ফেললেন বিভূতিভূষণ, এসেই চলে যাচ্ছো কেন ওভাবে?

খুকু আস্তে এসে দাঁড়ায়। বলে, জানেন, যতবার ভাবি আপনার কাছে আসব, এক-পা এগিয়ে যাই তো দু'পা পিছুই।

কেন? বিভূতিভূষণ বিস্ময় প্রকাশ করেন।

জানি না।—বলেই ছুটে পালায় খুকু।

এ কেমন হেঁয়ালি মেয়েদের। কুলকিনারা পান না পথের পাঁচালীর নায়ক।

ক'দিন আর আসতে না দেখে নিজেই গিয়ে হাজির হন খুকুদের বাড়ি। ওদের সবাই খুশি। কতো সন্ধ্যায়, সীতানাথ রায়েদের উঠোনে বসে ও'র গল্প শুনতে খুড়িমা পর্যন্ত জমে গিয়েছেন। সে-লোক রোজ ঘরে এলে ভালোই হয়। খুড়িমা অনুযোগ করেন, তা বাবা আসোই না তো এ-বাড়িতে। খুকুটা তো তোমার নাম মুখ থেকে নামাতেই পারে না। তোমার খুড়োও কতো সুখ্যেত করেন তোমার!

খুড়ো ঘরে নেই। খুকু আড়চোখে তাকায়। বিভূতিভূষণ বলেন, খুকুর কথা বলছেন, ও তো আমাকে দেখলেই পালায়।

এই রে! সব কথা বলে দেবে নাকি! খুকু চোখ মটকায়, জিভ দেখায়।

খুড়িমা বলেন, ওর কথা ছেড়ে দাও। কতো বলি, যা ওর কাছে দু'কথা শিখে নে। মেয়ে-সন্তান মুকখু থাকলে এ যুগে আর কেউ নেবে না।

বিভূতিভূষণ আশ্বাস দেন। না, খুড়িমা, একেবারে মুখ্যু নেই আর। গরজ আছে ওর। যা পড়া দিয়ে যাই এসে দেখি সব তৈরি।

খুড়িমা বলেন, তবে বাবা তোমার কল্যাণে কিছু যদি হয়।

ততক্ষণে আড়াল থেকে খুকু আসবে, শতরঞ্জি বিছিযে বলবে, বসুন। আজ একটা গল্প।

গল্পে খুড়িমাও মজা পান। ক্লিওপেটরা, মেরি আঁতানেতোঁ, ইত্যাদির গল্প। একটার পর একটা বলে যাবেন মহানন্দতনয়। আর শ্রোতারা মগ্ন হয়ে শুনবে।

খুকু ভাবে ভালোই হল। রোজ সন্ধ্যায় ছুতো করে ন'দি, মানে শান্তশীলা দেবীদের বাড়ি আসবে। যাবার সময় বলবে, যাবেন কি?

ওই ডাকটিরই যেন পথ চেয়ে থাকে বিভূতিভূষণের মন।

কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে। খুকু লণ্ঠন ধরে ওদের বাড়ি নিয়ে যায। বলে, আজ খুব ভালো গল্পের দিন।

খুড়ো সাধারণত গোপালনগর হাট থেকে তাস খেলে বেশি রাতে ফেবেন। খুড়িমাও ঘরে নেই। ভাগবত শুনতে গিযেছেন। কেবল ও'রা দু'জন। অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প বলতে পারা যায়। ঠিক তা গল্প নয়। টুকরো টুকরো কথা, সে কথায় থাকে হৃদযের গাঢ় অনুভবের প্রকাশ। খুকুর ছন্দ-বর্ণহীন গ্রাম্যজীবনে ছোঁয়া লাগে পুষ্পসুবাসেব অনুষ্টুপ ছন্দের। বিভূতিভূষণের কাছেও যেন বেশি প্রাণময় হয়ে ওঠে ছুটির বারাকপুর-ইছামতী। 'গ্রীষ্মের ছুটি, রোজ সকালে উঠে মনে হয, আজ না-জানি কী ঘটবে। খুকু থাকে বলেই আনন্দটা ঘনীভূত হচ্ছে। আনন্দের উৎসমূল তো ও-ই! কিন্তু কেন, কিসে? দিনলিপি 'উৎকর্ণ'র পাতায় স্বীকার করলেন তিনি 'ভালো-বাসার প্রকৃত রূপ কি, তার কতকটা যে বুঝলুম!'

বুঝতে পারে খুকুও। বনশিমলতার ঘাটে ইছামতীতে নাইতে নামে দু'জনে। খুকু বলে, 'যা কিছু শিখেছি আপনারই জন্যে। আপনি কত বিদ্বান, আমি তো কিছুই

জানিনে। কি করে যে আপনার সঙ্গে এমন হল!

কী হল? বিভূতিভূষণের জানার কৌতূহল।

জানি না। বুঝি না কিছু।—বলেই থেমে যায় খুকু। তারপরে বলে, সংসারে কোন কাজে মন বসাতে পারি না। মন হু-হু করে। কেবল এ-সব কথা ভাবি।

আমারও তো ওই রোগ। অস্ভুত, অস্ভুত।—হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।

সুপ্রভা শহুরে, শিক্ষিতা, সম্পন্ন ঘরের আদরের দুলালী। আর খুকু? পল্লীগ্রামের দরিদ্র পিতামাতার বোঝা, উপেক্ষিতা। ওর জন্য দুঃখ-দরদ বেশি হয়। জীবনে কী দেখল, কতটা পেল, কতখানি প্রত্যাশা পূর্ণ হল এদের?

কলকাতায় সিদ্ধেশ্বর ঘোষের বাড়িতে সারারাত ধরে রাগসঙ্গীতের আসর চলছে। পয়লা সারির শ্রোতা বিভূতিভূষণ। 'বাঈ কেশরবাঈ কেরকার যখন বসন্ত বাহারে আলাপ আরম্ভ করল', তন্ময় আসর। আর প্রথম সারির শ্রোতা বিভূতিভূষণের 'মন তখন ফিরে গেল গ্রামের মধুর স্মৃতি ভরা একটি মেয়ের জন্যে।'

পরদিনই একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকরড যোগাড় করে বারাকপুরের উদ্দেশে যাত্রা। খুকুকে গান শুনিয়ে তবে ফেরা।

বীরভূম এসেছিলেন বিভূতিভূষণ সাহিত্য সম্মেলনে। সেখান থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর লাভপুরের বাড়িতে। ওঁকে পেয়ে ভারি খুশি তিনি। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে গল্প করছেন বাইরের ঘরে। বাড়ির সামনের উঠোনে, মাঠে, দূরের বনচূড়ায় থই থই জ্যোৎস্না। বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণ। এমন মায়াবী রাত্রি চিরদিন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওঁর আবিষ্ট ভাব দেখে সাহিত্যিক তারাশংকরও মুগ্ধ। নীরবে অনুসরণ করলেন বন্ধুকে। মাঠের একপ্রান্তে এসে বসলেন। উপভোগ করতে হবে দুচোখ মেলে পৃথিবীর এ অপার্থিব রূপ। কিন্তু দৃষ্টি মেলে দিয়ে বিভূতিভূষণ আজ কাকে দেখতে পেলেন চাঁদের আলোয়?

'দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খুকুর কথা ভাবলুম। ওর দ্বারা আমার যে অভাব পূরণ হয় তা আর কারো দ্বারা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। ওর স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, হাসি, চোখের চাহনি, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা—এ সবই আমার জীবনের একটা মস্ত অভাব পূরণ করেছে।'

ফিরে প্রথমেই যাবেন বারাকপুরে, এবং সবার আগে খুকুকে দেখতে। খুড়িমাকে প্রণাম করবেন। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে বলবেন 'কই খুড়িমা, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছিনে।'

'কাউকে' বলতে বিশেষ কাকে বোঝায় তা এ-বাড়ির সবার জানা। সে এবার আড়াল ছেড়ে বাইরে আসবে। বলবে, 'কেন, হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পাচ্ছেন না? তাড়াতে পারলে তো সব বাঁচেন!'

খুকুর এই শেষ কথাটারও যে একটা বিশেষ অর্থ আছে, একটা খোঁচা আছে অভিভাবকদের উদ্দেশে, তাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। খুড়িমা, বিভূতিভূষণ দুজনেই হাসেন।

ততক্ষণে বারান্দায় শতরঞ্জি বিছাতে বিছাতে ডাক দেবে খুকু, এখানে আসুন।

খুড়িমা বলবেন, ছোট করে পাত, ছোট করে পাত।

তা শুনবে না ও। দূরত্ব বাঁচিয়েও অন্তত দুজনের উপযোগী করে পাতা চাই তো! বিভূতিভূষণকে বসিয়েই নিজে পাশে বসবে, গল্প বলুন।

তখন ঈদের ছুটি। বেলা পড়ে গিয়েছে। বনশিমতলার ঘাটে এসে দেখল খুকু, ইছামতীতে ভাসান দিয়ে আছেন বিভূতিভূষণ। জলে ভেসে থাকার প্রক্রিয়াটি ওঁর রপ্ত করা অনেক দিনের। কান অবধি জলে ডোবা, চেঁচালেও শুনবেন না। আলতো করে কয়েকটা ঢিল ছুঁড়তেই ভাসান ভেঙে উঠলেন বিভূতিভূষণ। বেশ চটেছেন, কে রে!

খিলখিল হাসিতে একটা ঢেউয়ের মতই ছলকে পড়ল খুকু। বললে, আসুন সাঁতার কাটি।

পারবে আমার সঙ্গে?

হেরে যাবেন আপনি।

বলো কি! হো হো করে হেসে ফেললেন বিভূতিভূষণ।

ও কি, হাসচেন যে বড়, দিন না সাঁতার।

শুরু হতেই দেখা গেল, কেউ কমতি নয়, দু'জনেই সমান তালে এগোচ্ছেন। দম বাড়াতে চেষ্টা করেন বিভূতিভূষণ। দম বাড়ায় খুকুও। বুঝি পারছে না তবু বিভূতি-ভূষণের সঙ্গে পিছিয়ে পড়ছে যেন। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছেন বিভূতিভূষণ। হঠাৎ খুকু ডুব দিল। আর উঠছে না যে! এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন—কী হল ব্যাপার! কেমন ভয়-ভয়। অবাক কাণ্ড। দেখেন ওপারে একটা কাশঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে খুকু। ডুবসাঁতারেই ওপার পেঁছেছে।

হেরে গেলেন তো!

বিভূতিভূষণ সত্যিই অপ্রস্তুত। বললেন, আবার হোক।

খুকু বললে, দাঁড়ান, এদিক থেকে নয়, বনশিমতলার ঘাট থেকে।

ফিরে এলো দু'জনে ঘাটে। এবার আর কোন কায়দা চলবে না। বিভূতিভূষণ প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

আচমকা ডাঙায় উঠে পড়ল খুকু।

কী, উঠলে যে।

একটু মাটি আনছি।

কেন?

দরকার আছে, বুঝবেন না।

সাঁতারে মাটির কী দরকার সত্যিই তিনি বুঝলেন না। অপেক্ষা করে রইলেন ওর জলে নামার জন্য। ও-হরি, খুকু উল্টো ছুট। বলতে বলতে গেল, আর চান করব না, হেরে গেছেন, দুয়ো—।

এ ঘটনায় ভারি দুঃখ পেলেন বিভূতিভূষণ। অভিমানে মুখ ভার। স্নান সেরে উঠেই নিজের ঘরের দরজা টেনে চালকি জাফরির বাড়ি চলে গেলেন।

বারাকপুর ফিরলেন দু'দিন পরে। মেঘ তখনো কাটেনি। খুড়িমাদের বাড়ি যাননি। বসে আছেন ঘরে চুপচাপ। মন উদাস, বেদনা জাগে মাঝে মাঝে। উনিশ শ' আটত্রিশের সেই বৈশাখী বিকালে দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর'-এর পাতায় লেখা পড়ে—'কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্চে। যেন আর কেউ থাকলে ভালো হত।'

খুকু বুঝেছে মান ভাঙাতে কষ্ট হবে। সে এলো। কিন্তু বিভূতিভূষণ ডাকলেন না। সেও কথা না বলে মাথা নিচু করে ঘর-দাওয়া ঝাঁট দিয়ে আপন মনে বইখাতা সব গোছগাছ করে দিলে। হঠাৎ দেখলে, একটি গল্প লেখা শুরু হয়েছে খাতায়, নাম—খুড়িমা। কোন্ খুড়িমা? কৌতূহল হলেও মুড-মেজাজ না বুঝে ঠিক সাহস হল না

ওই সময়টায় কোন উপন্যাস লেখা হচ্ছিল না। দৃষ্টিপ্রদীপ সম্পূর্ণ হয়েছে, ছাপা হয়ে বেরিয়েও গিয়েছে। এ সময় চলছিল ছোট ছোট গল্প লেখা—যার অনেকগুলিই পরে 'জন্ম ও মৃত্যু' এবং 'কিন্নরদল' গল্পগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। 'জন্ম ও মৃত্যু' সুপ্রভাকে উপহার দেওয়া বই।

সব গুছিয়ে দিয়ে যেমনি এসেছিল, তেমনি আবার চলে গেল খুকু। যাওয়ার সময় একবার শুধু আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিলে ও'কে। বিভূতিভূষণ তখন রোয়াকে বসে আছেন উদাস দৃষ্টি মেলে।

পরদিন পাঁচির কাছে খবর নিয়ে খুকু জানলো, এখানেই রান্নাবান্না করছেন কাল থেকে। বোনের বাড়িও যাচ্ছেন না।

সে কী! কী রাঁধছেন, কখন রাঁধছেন, খাচ্ছেনই বা কখন?

পাঁচি বললে, তা ভাতে-ভাত, সিদ্ধ। আর খাওয়া তো সেই সন্ধ্যেব সময়, দেখলুম কাল।

কোন কথা না বলে হে'শেলে ঢুকে অবস্থাটা দেখলে খুকু। বাড়ি ফিরে গেল। বাটিতে করে ঝোল মাছ নিয়ে এলো। ততক্ষণে চান করে ফিরেছেন বিভূতিভূষণ। খোশমেজাজেই ফিরেছিলেন। খুকুকে দেখেই মেঘলা। চুপচাপ বসে রইলেন।

খুকু ডাকলো, খেতে চলুন।

নিরুত্তর।

ক'বার ডেকে ব্যর্থ হয়ে বাইরে গেল খুকু। কোন কথা না বলে, ওর দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে, ঝমঝমে রোদ মাথায় করে। একটু একটু করে সারা মুখ লাল হতে লাগল, পুড়ে যাচ্ছে যেন গা। তাপে পুড়ছে, তবু সে নিশ্চল। আর এক বিভূতিভূষণ—মহেশ্বর টলেছিলেন উমার তপশ্চরণে। বলেছিলেন—আর নয়।

একটু বুঝি টললেন বিভূতিভূষণও, বললেন, ছায়ায় এসো।

ব্যাস। খুকু বুঝল ওষুধ ধরেছে। বললে, না খেতে গেলে রোদেই পুড়ব।

অবাক লাগে বিভূতিভূষণের, 'সব মেয়ের মধ্যেই অল্পবিস্তব মা লুকিয়ে থাকে।'

হাব মানলেন। খেতে বসলেন। খুকুই বসে বসে দিলে, জিদ ধরে সব খাওয়ালে।

মুখ ধুয়ে ঘবে ঢুকে ডাকলেন, খুকু!

খুকু ইতিমধ্যে সরে পড়েছে আবাব। সে কি! তিন দিন, তিন রাত্রি পরে রৌদ্র যদি উঠল, আবার কেন মেঘলা হবে আকাশ? শুয়ে পড়লেন মনের দুঃখে। কিন্তু ঘুম হচ্ছে না। দারুণ অস্বস্তিতে এদিক-ওদিক করছেন এমন সময় আস্তে আস্তে খুকু এসে ঢুকল। বললে, একেবারে গা ধুয়ে এলুম। আপনার পাল্লায় পড়লে তো আর যেতে পারবো না।

কেন, আমি তো ধবে রাখি না। মাটি আনতে যাই বলে চলে যাবে।

ইশ্, হেরে গিয়ে আবার অভিমান। পুরুষের কতো বুদ্ধি দেখলুম। এমনি খোঁচা দিয়েই সুর বদলে নেয় খুকু।—আচ্ছা, আপনাদের অত বিদ্যে, কিন্তু এসব ব্যাপারে হেরে যান কেন? কিছু বোঝেন না আসলে, আমরা না ধরিয়ে দিলে।

স্বীকার করলেন বিভূতিভূষণ, সত্যিই মেয়েদের বোঝা ভার, কেন গেলে সেদিন অমনি করে বলো না।

বেলা পড়ুক, ছাদে গিয়ে বলব।

বেলা পড়ার অপেক্ষায় দু'জন। তারপরে ছাদে গিয়ে কতো কথা, সেদিন পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে ব্লাউজ ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাই খুকু অমন করে পালিয়েছিল—এই

সব গল্প। দু'জনেই হেসে কুটিপাটি।

ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে পশুপতি (ভট্টাচার্য) এলেন ক্যামেরা নিয়ে। খুকুকে বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলালেন। আর একটা তোলা হল ঘরের সামনের বেঁচিঝোপের কাছে। রাত ন'টার গাড়িতে কলকাতা ফিরলেন দু' বন্ধু। যাত্রার সময় খুকু এসে দাঁড়ালো। তার নতুন শেখা কায়দায় হাত নেড়ে বললে গুড বাই।

কিন্তু হাজার হোক, গ্রামের গরিব ঘরের মেয়ে।—বেশি কায়দা ভালো নয়। মার বকুনি খেতে হয় মাঝে মাঝে খুকুকে। খেয়ালহীন বিভূতিভূষণ বুঝবেন কী করে তা। সেবার বড়দিনের ছুটিতে কথাটা শুনে দুঃখ হল। এবার বাড়িতে সেই জাহ্নবীকে এনেছেন চালকি থেকে। 'নেশাব মত কেটেছে বড়দিনের ছুটি। সকালে উঠেই খুকুর সঙেগ দেখা করতে যেতুম। একদিন বাজার করব বলে তাড়াতাড়ি করছি। ও বল্লে, কেন এখুনি যাবেন? বললুম, বাজার না করলে বাড়িতে বকবে জাহ্নবী। ও বললে, আপনি একটু বকুনি সহ্য করতে পারেন না? আর আমি যে আপনার জন্যে কত বকুনি সহ্য করছি মার কাছে! আপনার তো বোনের বকুনি।'

নীরবে সব সহ্য করে যায় খুকু—ও'রই জন্য! বিনিময়ে কী তিনি দিতে পারেন ওকে? বড় বেদনাহত হলেন।

ইতিমধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায একদিন বিভূতিভূষণকে হাজির করলেন সুধীরচন্দ্র সরকারের মৌচাক অফিসে। মৌচাক শিশুদেব পত্রিকা। ও'রা সবাই বিভূতিভূষণকে পেয়ে ভারি খুশি। এবার থেকে এ-দেশের শিশুরাও ভাগ্যবান বলতে হবে। বিভূতিভূষণের মতো শক্তিমান লেখক শিশুদের জন্য কলম ধরবেন। হাঁ, বেশি অনুরোধ করা দরকার হয় না। একবার বলতে পারলেই রাজি। প্রথমে বিভূতিভূষণের শিশু উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়' বেরোতে লাগল মৌচাকে। এর মধ্যে, সুদূরেব হাতছানি। বাঙালী তরুণ শঙ্করের আফ্রিকায দুঃসাহসিক অভিযান। এই তমসাচ্ছন্ন মহাদেশটিকে পটভূমি করে এ-দেশে আজগুবি কাহিনী সহজেই রচিত হয়েছে অনেক। কিন্ত নীরদ চৌধুরীর বন্ধু, শিক্ষক বিভূতিভূষণ দিলেন নির্ভুল ভৌগোলিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত উপন্যাস।

রিখটারসভেলড পর্বতে ডিঙেগানেক দৈত্য আর জুলুল্যানড বুনিপদের অপদেবতার কথা যদিও আছে, তাও ওই দেশেরই কালোত্তর প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

আর আছে বিভূতিভূষণেব নিজস্ব বিশ্বাসের কথা। নায়ক শঙ্কব বিপদে পড়ার আগেই বুঝতে পারে তার আভাস। 'পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর একটা ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে, জাগিয়ে দেয় বিপদ এলে আগেই।' এ বিশ্বাস বিভূতিভূষণেব 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর।

'চাঁদের পাহাড়' বই আকারে বেরোল উনিশ শ' আটত্রিশে, আশ্বিনের প্রথম দিন। বইটি খুকুকে উপহৃত।

খুকু তো অবাক বইটা হাতে পেয়ে। প্রথম পাতায় ছাপার অক্ষরে লেখাটা জ্বল জ্বল করছে—খুকুকে দিলাম।—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখটা বাব বার বগড়ে নিলে। ভুল দেখছে না তো? এ গাঁয়ের তাবড়-তাবড় পুরুষদের নামই কি কোনদিন ছাপা হয়েছে? তা কিনা খুকুর?

সকাল থেকে সারারাত—একটানা পড়ে শেষ কবে খুকু এক শ' সঁতের পাতার সচিত্র বইখানা। মাঝে মাঝে চমকে ওঠে পড়তে গিযে। নায়ক শঙ্কর। কিন্তু আসল মানুষটিকে তার চিনতে একটুও অসুবিধা হয় না। বারড কোমপানির কাজ নিয়ে পরিচিত কে উগান্ডার গিয়েছে। সেও দক্ষিণ আফ্রিকা। তার সঙেগ আফ্রিকার বনজঙগল

দেখতে যাওয়ার ইচ্ছাটা অনেক বার খুকুর কাছে বলেছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু কী ভয়ানক জায়গা। কঙ্গো নদীর পারে বিষাক্ত লতার গন্ধ মাখানো হাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে শঙ্কর। পড়তে পড়তে গা শিউরে ওঠে। আবার আছে দৈত্য-দানো, অপদেবতার রক্তচক্ষু। না, খুকু ও-রকম জায়গায় ও'কে কিছুতেই যেতে দেবে না।

আচ্ছা, অমন উটকো ইচ্ছে কেন ও'র? ঘর বাঁধেননি বলে? তবে যে বলেন এই বারাকপুর, তার বনজঙ্গল আর ইছামতীকে তিনি সবচাইতে ভালোবাসেন!

ঠিকই তাই। পড়তে পড়তে আবার ভরসা পায়। এই তো, শঙ্কর বাড়িকে ভোলেনি। লেখা আছে—শঙ্কর ফিরছে। 'বাউল-কীর্তন গান মুখরিত বাঙলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল গ্রামটি সামনে আসচে। বসন্তকালে পল্লীপথে যখন সজনে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বউকথাকও ডাকবে ওদের বড় বকুলগাছটায়, নদীর ঘাটে লাগবে গিয়ে ওর ডিঙি।'

বাব্বা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল! বইটা শেষ করে আবার খুকু ফেরে সামনের পাতায়। দেখে—খুকুকে দিলাম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন রাত কি ঘুমোনোর!

পর দিন চাঁদের পাহাড় নিয়ে কতো কথা দু'জনের। খুকু বলে, সত্যিই কি আপনি কোন দিন যাবেন নাকি অমন দেশে?

বিভূতিভূষণ হাসেন, যেতে পারলে তো ধন্য হতুম।

ওমা, সেকি কথা! না না, খুকু মাথা নাড়ে, ওসব বাতিক ছাড়ুন তো। এই যে এত ঘোরে: এতে কী হয় বলুন।

সে কথা কী বোঝাবেন খুকুকে, জীবনে যে বারাকপুরের বাইরে বনগাঁর বেশি দেখেনি! খুকুরও দীর্ঘশ্বাস। তাই তো. শহর বলতে বনগাঁ, কলকাতা যে কী জিনিস তাতো ভাবতেই পারে না।

কথা হল, একবার কলকাতা দেখিয়ে আনবেন খুকুকে।

উনিশ শ' আটত্রিশ সাল। সইমাদের পোড়ো বাড়িটা কিনে রেজিস্ট্রি করে নিলেন মহালয়ার ঠিক আগের দিন। পরদিন খুকু আর খুড়িমাকে নিয়ে কলকাতা এলেন। মহালয়ার পুণ্যস্নান একসঙ্গে হ'ল গঙ্গায়, বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটে। তারপরে মদনমোহনতলায় এসে দর্শন হ'ল মদনমোহন ঠাকুর। মেস-এ গিয়ে চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে চিড়িয়াখানা, সেখান থেকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল। ঘোরা হল ট্যাকসি করে। একদিনে এতো ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। কিন্তু নতুন নতুন ব্যাপার দেখে খুকু-খুড়িমার ক্লান্তিবোধ লোপ পেয়েছে আজ।

সন্ধ্যায় খুকু বললে, টকি দেখাবেন?

গ্রামের মেয়ে খুকু এখনও সিনেমা বলতে শেখেনি। অত পরিশ্রমের পর আবার 'টকি'? কিন্তু সুপ্রভাকে দেখিয়েছেন, আর খুকুকে না? রূপবাণীতে ওদের নিয়ে সিনেমা দেখে সেই রাত দশটার মেলে বনগাঁ। ওদের পেশছে দিয়ে পরের ভোরবেলা আবার কলকাতা ফিরলেন বিভূতিভূষণ।

আসবার সময় খুকু বলে, আবার কবে আসবেন?

শিগগিরই, দু'চার দিনের মধ্যেই তো পুজোর ছুটি।

পুজো!—একটু কি ভেবে বললে, পুজোয় আমার জন্য কী আনবেন?

যা চাইবে।

টিপ আনবেন আমার জন্য।

বেশ।

আর কি আনবেন?

তুমিই বল না।

কী চাওয়া যায়?—ভাবলে খুকু, তারপর বললে, কলকাতায় আর একবার যেতে হবে।

যেয়ো, ভালোই তো।—বিভূতিভূষণ খুশি এ প্রস্তাবে। খুশি খুকুও।

কিন্তু ও'দের দু'জনের খুশি দেখে গাঁয়ের আর-পাঁচজনকেও খুশিতে ভাসতে হবে এমন কথা নয়। যুগলমোহন না হয় চক্ষু বুজে আছেন, তাই বলে চক্ষুষ্মান আর কেউ কি নেই পাড়ায়? বড্ড বেশি মাখামাখি হচ্ছে দু'জনের। সমাজহিতার্থে অন্য অনেককেই যে সজাগ থাকতে হয় সর্বদা চক্ষু খুলে। 'চাঁদের পাহাড়'ও দেখতে হয়েছে দু'একজনকে। তা গোটা বই ঘাঁটাঘাঁটি দরকার কি, সার কথা তো পয়লা পাতায়ই বলা আছে। কী? না, খুকুকে দিলাম—! কেন দেওয়া? কে হে তুমি দেনেওয়ালা?

যাক সে-সব। এখন যুগল বাঁড়ুজ্যেকে বলা দরকার কথাটা। কর্তব্য কাঁধে করে তাঁরা এগোলেন। তবে বিবেচনা করে নিলেন, বিভূতি ছাত্র ছিল যুগল বাঁড়ুজ্যের এবং তিনি মনে করেন সে নাকি গ্রামের গৌরব। তার উপর ছাত্র বিধায় পুত্রবৎ স্নেহ করেন ওকে। সুতরাং কথাটা তাঁরা ঘুরিয়ে বললেন প্রথমটায়। বললেন, অনূঢ়া, অরক্ষণীয়া মেয়েকে পাত্রস্থ করো। দু'চারটি সৎপাত্রের সন্ধানও তাঁরা দিলেন কৌশলে।

গ্রামের লোকের এ-রকম অযাচিত উপচিকীর্ষা দেখে যুগলমোহনও একটু ভাবিত হলেন। মেয়ে তাঁর সুন্দরী ষোড়শী। পাত্র জুটবেই। তবে আসল ভাবনাটা অর্থের। সেই সামর্থ্য হলে নিশ্চয় তিনি দেবেন মেয়ে। দু'চারটে কথাও বললেন আগন্তুকদের সঙ্গে।

বাপ তার বিয়ে দেওয়ার কথা চালাচ্ছেন শুনতে পেয়ে খুকুর মনটা কিন্তু কেমন হয়ে গেল। কলকাতা থেকে বিভূতিভূষণ যখন টিপ নিয়ে এলেন মুখটা তখনও ওর ভার।

ব্যাপার কি? ঘাঁটাতে সাহস করলেন না বিভূতিভূষণ। বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। সন্ধ্যায় আর ওদিক গেলেন না। সন্ধ্যা উৎরোতেই রোয়াকে জ্যোৎস্না পড়ল। চেয়ার টেনে বসলেন সেখানে। অনেক কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, 'খুকুরও তো বিয়ে হবে, চলে যাবে এই বারাকপুর ছেড়ে। তখন? আবার যে-নির্জন সে-নির্জন।'

হঠাৎ খুকু হাজির। সেই কথাই শোনালো সে, বাবা তো' পাত্র দেখছেন।

মনটাকে তৈরি করতে সচেষ্ট বিভূতিভূষণ। বললেন, পাত্রী যখন সুন্দরী, সুপাত্রও সহজেই জুটবে। ভাবনা কি?

ভাবনা? নাঃ। কী আর। আমি তো থাকছি না এখানে তখন।

কেউ-ই তখন থাকে না খুকু।

কেউ থাকে না! আমি চলে যাবো, আপনি সেখানে যেতেও পারবেন না। বেশ মজা হবে।

মজা বেরিয়ে যাবে। বুঝবে তখন।

তা বটে!

খুকু দীর্ঘশ্বাস ফেললে, 'ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কষ্ট হয় না?'

কী জবাব দেবেন বিভূতিভূষণ! তবু বললেন, 'সময়ের সার বর্তমান। ভবিষ্যতের ভাবনা মিথ্যে।'

বিভূতি-অনুরাগিণী খুকু। একই ছবিতে দু'জনে। বারাকপুরের বাড়ি—১৯৩৪। •
সৌজন্য : মোনা চৌধুরী।

'গৌরীকুঞ্জ'—ঘাটশিলার বাড়ি।

তাহলে এখুনি চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি আনন্দ করে।

এখুনি মানে? পুজোর আগেই?

হাঁ, কালকেই চলুন। জীবনে হয়ত অনেক বেড়াবো কিন্তু আপনাকে তো আর সংগে পাবো না!

একটু থেমে স্বগতোক্তির মত বললে খুকু, কী করে যে আপনার সংগে এমন হল!

কী এমন হল? বিভূতিভূষণ শুনতে চান ওর মুখ থেকে।

খুকুর পক্ষে তা নিজমুখে বলা সম্ভব নয়। বললে, জানি না। কাল যাওয়া হবে তো!

হবে।—বিভূতিভূষণের যেন বিচ্ছিন্ন সত্তা নেই সেই মুহূর্তে।

পরদিন, সোজা কলকাতা। নীরদ চৌধুরীর বাড়িতে এসে উঠলেন খুকুকে নিয়ে।

বন্ধুপত্নী অমিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন খুকুকে। এই, সেই খুকু! নিটোল স্বাস্থ্য, দোহারা গড়ন, মাজা রঙ। চোখে-মুখে গ্রাম্য সরলতার ছাপ. পরনে লালপেড়ে টিয়া রঙ শাড়ি। হাতে বেলোয়ারী বালা। খালি পা ধুলোমাখা।

আদর করে নিজের পরিচ্ছন্ন বিছানায় উঠিয়ে বসালেন ওকে অমিয়া। খুকু অপ্রস্তুত। নির্বাক। অমিয়া ঠায় তাকিয়ে আছেন। ওই একমাথা চুলের খোঁপা, তাতে একগুচ্ছ কচুরিফুল—কল্পনায় যেন দেখতে পাচ্ছেন তিনি। ঠিক ছবি, যে ছবি বিভূতিভূষণ এতদিন ধরে কথা দিয়ে এঁকেছেন ও'দের কাছে। সব মিলে যাচ্ছে। যত্নে আদরে অভিষিঞ্চিত করতে লাগল অমিয়া ওকে সারাদিন ধরে।

কিন্তু বসে থাকার জন্য ও'রা আসেননি। বেরিয়ে পড়লেন ওকে নিয়ে বিভূতিভূষণ। দু'দিন ধরে এদিক-ওদিক ঘুরে ঠিক ষষ্ঠীর দিন বারাকপুর ফেরা।

এদিকে হাওয়াটা যে গরম হয়ে আছে গ্রামে, তা ফিরেই টের পেলেন। ও'দের বাইরে যাওয়ার কান্ড দেখে, সমাজনেতারা মুখের ছিপি খুলে ফেলেছেন। যুগল বাঁড়ুজ্যেকে তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিলেন—এতোটা প্রশ্রয় ভালো নয়। এর পরে মেয়ে পার করা ভার হবে। তবে বাঁড়ুজ্যে যদি সৎ পরামর্শ নেন, পাত্র আছে, ছ'ঘরের চাটুজ্যে-বাড়িতে। এনট্রানস না কী একটা পাশ দিয়েছে এবার। রেল কোমপানিতে দরখাস্ত করেছে চাকরির।

যুগলমোহন কথা দিয়েছেন, ওদের দয়ায় যদি হয়ে যায়, তিনি আপত্তি করবেন না।

সেবার আশ্বিনের আকাশে যখন পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের সার, খুকুর দু'চোখ তখন ভেজা। রাতে ঠাকুর-দেখার ছল করে ঘরের বাইরে এলো সে। আকাশে তখন সপ্তমীর চাঁদ। একটা শিউলি গাছের তলায় দেখা হল দুজনের। না, সুপ্রভার মতো বলিষ্ঠ নয় খুকু। ভীরু পারাবতের মতো কেবল কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার যৌবন।

একদল ছেলেমেয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে এ-পথেই আসছিল। ত্রস্তে খুকু সরে গেল। কতো কথা বলার ছিল, হল না, হল না বিদায় নেওয়াও।

ঘরে ফিরে বিভূতিভূষণ মনের কথা লিখতে বসেন দিনলিপির খাতায়। কী বলে আজ সম্বোধন করবেন খুকুকে?—সখি? প্রিয়া? বন্ধু? সব লিখছেন তবু যেন মন ভরে না। কী বলে তিনি বোঝাবেন, খুকু তাঁর জীবনকে কী সুধা দিয়ে ভরে দিয়েছে! কলম আজ চলে না যেন। এই তো, এখানে, এসে বসত খুকু, এমনি জ্যোৎস্না রাতে।

'অতীতের কত মাধবী যামিনী—
অঙ্ক কষিবার ছলে আসিতে হেথায়,
বলিয়াছি দোঁহে দোঁহাকারে কতো কথা
হয়ত বা কটু কথা বলিয়াছি তার মাঝে
সে-সব করিও ক্ষমা।'...

বিভূ আছো।

যুগলখুড়োর ডাকে চমকে উঠে বাইরে এলেন বিভূতিভূষণ। বললেন, ঘরে আসুন।

কী করছিলে?

এই—একটু—। কী বলবেন। সামনে তখনও কাগজ-কলম খোলা। এদিকে অসমাপ্ত একটা গল্প। খুকুকে ফুটিয়ে তুলছেন 'কুমুদিনী' নামে একটি মেয়ের মধ্যে। এখানে জনৈক হীরেনের সে অনুরাগিণী। গল্পটির নাম—অরন্ধনের নিমন্ত্রণ 'নিমন্ত্রণ' নামে অনেককাল পরে যার চলচ্চিত্রায়ণ।

কোন বই নিশ্চয়। লেখো বাবা। লিখে যাও। অমর হয়ে রইবে তুমি। বিভূতিভূষণ নির্বাক। যুগলমোহন বলে যান, যে যা-ই বলুক, তুমি আমাদের গৌরব, গৌরব বারাকপুরের, বনগাঁর, যশোরের—সারা দেশের। আরও কিছু কি বলবার ছিল যুগলমোহনের? কী যেন কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপরে উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় বার বার বলে গেলেন—কাল যাবে কিন্তু আমাদের ওখানে।

কিছুই বললেন না বিভূতিভূষণ। গেলেনও না পরদিন খুড়োদের বাড়ি। ইছামতীতে নাইতে নামছিলেন। বনশিমতলার ঘাট দিয়ে তখন খুকু উঠে আসছে। খুকু! চোখাচোখি হল দু'জনে। মুহূর্ত মাত্র। দু'জনেই দু'মুখো সরে গেল। ইছামতীর ঘাটে ঘাটে তখন বউ, ঝি, ছেলেদের ভিড়। মাথা নিচু করে জলে নামলেন বিভূতিভূষণ। ভিজে শাড়ি নিঙড়োতে নিঙড়োতে খুকু চলে গেল আনমনা। একটি করুণ মূর্ছনা জাগে ও'র স্মৃতিলিপিতে—'এই বনশিমতলার ঘাটে অনাগত দিনেব তরুণী বধূ ও মেয়েদের জলসিক্ত পদচিহ্নে আঁকা থাকবে একটি অপূর্ব প্রণয়-কাহিনী—হয়ত কেউ কখনও বলবে, ছিল এরা দু'জন অতি প্রাচীনকালে—গ্রামেব স্নিগ্ধ বসন্তদিনের বাতাসে তার মূর্ছনা থেকে যাবে—।'

অষ্টমী পূজার দিন, খুড়িমা বললেন স্বামীকে, বিভূকে খেতে বলে এসো আমাদের এখানে। পূজাগণ্ডার দিন। কোথায় যাবে খেতে! হয়ত হাত পুড়িয়ে সেদ্ধ চাপাবে।

যুগলমোহন এসে দেখলেন ঘর বন্ধ। খবর নিয়ে জানারই বা উপায় কি? বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, কখন খায়, কোথায় খায়, কী করে কেউ বড় একটা খোঁজ রাখে না ও'র। তবু কেউ কেউ রাখে। পুঁটিদির ছেলেমেয়ে জগো, পাঁচি ওরা এখনও যায় মামার কাছে। বিভূতিভূষণকে ওরা মামা বলেই জানে। খুকু লুকিয়ে পাঁচিকে ডাকল —বলতে পারিস, কোথায় গেছেন।

পাঁচি বললে, বোনের বাড়ি, জাফরি মাসীর ওখানে।

খুকু ছাদে যায় বার বার। সারা বিকাল বসে থাকে—যদি দেখা পায়।

বেশ কিছুদিন পরে, এক বিকালে দেখা গেল ইছামতীর পার ধরে কে যেন এগোচ্ছে। কে? খুকু দু'চোখ যেন পাখির ডানার মত ছাদ থেকে উড়িয়ে দিলে। ঠিকই, যাকে ভাবছিলে, সেই মানুষটি। তিনিও ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু-

কালমাত্র। তারপরেই আড়াল।

পর পর এ-রকম ঘটল ক'দিন। এও এক নতুন পালা। অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি।

তবে ক'দিন আর! স্কুল খোলার দিন এসে পড়ে। ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আজই যাত্রা করতে হবে কলকাতা। সকালে কয়েকবার ওদের ছাদেব দিকে তাকালেন। কই, খুকু তো আসে না ছাদে! যাওয়ার আগে একবার দূর থেকেও দেখা হবে না? সেই-যে খুকু আগের বার হাত নেড়ে বলেছিল গুড বাই! ছবিটা ভেসে উঠতেই মন খারাপ হয়ে যায়। পাঁচিকে পাঠালেন খবর আনতে।

পাঁচি এলো, খবর নিয়েই, অসুখ করে শুয়ে আছে খুকু।

অসুখ? কী অসুখ? কেমন করে হল, কিছু বললে?

না, অত সব পাঁচি জানে না। খুকুর ধুম জ্বর। চোখ বুজে পড়ে আছে। ওর মা বললেন, ক'দিন ধরে কেবল সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত ছাদে বসে রোদ আর শিশির লাগিয়েছে। বারণ শোনেনি, এখন তার ভোগ।

বাবার মুখে শোনা দাদুর কবিরাজি শ্লোকটা মনে পড়ল বিভূতিভূষণের—শরৎ রৌদ্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ, ন গৃহ্ণীয়াৎ শরদ্ধিমম্। শরৎ কালের রোদ আর হিম—দুটোকেই এড়িয়ে চলবে, ও দুটি জিনিস—বিষ। তাই গ্রহণ করেছে খুকু ক'দিন ধরে, কারো বারণ না শুনে! কিন্তু তা কার জন্যে সে তো তাঁর জানা।

কী করবেন—ছুটে যাবেন খুকুর বিছানার পাশে? হাত বুলিয়ে দেবেন মাথায়? ওষুধের [illegible] করবেন ডাক্তার ডেকে? আবার ভাবেন, কে তিনি ওসব করবার? গাঁয়ের লোক বলবে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এক অসুখের ওপর আর এক অসুখ বাড়বে তাতে খুকুর। এগোলেন না। ভগবান ওকে ভালো করবেন নিশ্চয়। সেই বনশিমতলার ঘাট থেকে ইছামতীতে নৌকা ভাসালেন বিভূতিভূষণ।—

'পুজার ছুটি ফুরিয়ে গেল। নৌকা বেয়ে চলেছি বনগাঁয়। মনে কেমন একটা বিষাদ গ্রাম ছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে। তার উপর দেখে এলুম খুকুর জ্বর হয়েচে, আজ সকাল থেকেই শুয়ে আচে।...কিছু ভালো লাগচে না। কেন এমন হয়? যাদের ভালোবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলঙে, দেখবার ইচ্ছে করলেই কি উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু! এই যে ওর অসুখ দেখে এলুম, কিছু করার নেই আমার—করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানি হবে এই সব পাড়াগাঁয়ে।'

কলকাতা এসে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন স্কুল আর লেখায়।

সেবার বড়দিনের ছুটি এলো, চলে গেল, কিন্তু বারাকপুর, ইছামতী আব খুকুরা কেউ পেল না তাদেব সেই মানুষটিকে। তিনি এবার ঘাটশিলা। নট-যমুনা আছে সেখানে। আছে বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা। মনের সে এক বিরাট মুক্তি। ঘোরা আর লেখা। সেবাযত্নেরও অভাব নেই।

তাও তো স্থায়ী নয়। আবার কলকাতা খেলাত স্কুল, মেস। লেখাটা তো চলছেই অবিচ্ছিন্ন ধারায়। তার মধ্যেই খবর পান বনগাঁর, বারাকপুরের। খুকুর জ্বর ভাল হয়েছে। ভালো ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে। তবে বিয়ের তারিখ এখনও অনিশ্চিত।

আবার শুনছেন, অনিশ্চিত প্রায় বিয়েটাই।

কেন?

আগে সময় নিয়েছেন পাত্রপক্ষ। ছেলে চাকরির সন্ধান করছে, কাজ হোক, তারপরেই বিয়ে। কাজ হয়েছে ছেলের রেলে। কিন্তু এবার সময় চাইছেন পাত্রীপক্ষ। তাঁরা কন্যা

পাত্রস্থ করার উপযুক্ত অর্থের সন্ধান করছেন। খবরটা পেলেন, বনগাঁর মিতে বিভূতির কাছে। ছেলেপক্ষ নাকি এই জ্যৈষ্ঠের পর সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন বলছেন। বিপন্ন যুগল-খুড়ো বনগাঁ এসে মিতের কাছে ও'র খোঁজ নিয়েছেন—গরমের ছুটিতে বারাকপুর যাবেন কিনা। না হলে—কলকাতা এসে দেখা করবেন বলে মেস-এর ঠিকানা চেয়েছেন।

খুকুর করুণ মুখখানা ভেসে উঠল ও'র স্মৃতিপটে। সঙ্গে সঙ্গে খুড়োকে চিঠি দিলেন, টাকার জন্য আটকাবে না। আপনি তারিখ ঠিক করুন।

এই বিপদে অমন চিঠি পাওয়া, যেন স্বর্গ হাতে। কলকাতা চলে এলেন যুগল-মোহন। সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণ পাঁচশ' টাকা দিলেন।

যুগলমোহন বার বার বললেন, তুমি গিয়ে নিজে দিও তোমার খুড়িমার হাতে। আমি টাকা নিতে আসিনি। এসেছি তোমাকে দেখতে। তোমার কাছে অনেক ঋণ আমাদের তাই জানাতে। আমরা তো অপরাধী হয়ে রইলেম বাবা।

কোনো ঋণ'বোধ রাখবেন না খুড়োমশায়। কোন অপরাধ নয়। খুকুর বিয়েতে এটা আমার কর্তব্য। আমার এই গরমের ছুটিতে বাইরে যাওয়ার কথা বলে আপনার হাতেই টাকাটা দিলেম। দরকার হলে এমনি জানাবেন।

পরের ছেলেও নিজের ছেলের বেশি হয়। ভেজা চোখে বাড়ি ফিরলেন যুগল-মোহন। কথা আদায় করে এলেন, বিয়ের সময় থাকবেই বিভু।

সেই বছরই বিভূতিভূষণকে সম্পাদক করে লিপিকা নামে একখানি সাহিত্যপত্র বার করেন গোপাল ভৌমিক প্রমুখ একদল তরুণ। শ্রীভৌমিক আর ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য হলেন সহযোগী সম্পাদক। ও'রা নতুন পত্র লিপিকা বিভূতিভূষণের হাতে এনে দিলেন। খুকুর সেদিন বিয়ে। তের শ' ছেচল্লিশের আষাঢ়। পত্রিকাখানি হাতে নিয়ে বারাকপুরে যখন পে'ছিলেন, সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। বিয়েবাড়ি সরগরম।

সারাদিন পথ চেয়েছেন খুড়ো-খুড়িমা। আর-একজন। খবর পেয়েই চাঞ্চল্য জাগল বাড়িময়। খুকুকে বধূবেশে সাজাচ্ছিল পাড়ার মেয়ে-বউরা। সবাইকে ঠেলে আধো-সাজে উঠে দাঁড়ালো সে।

খুড়িমা পাশের ঘরে ডেকে নিলেন বিভূতিভূষণকে। খুকু এসে প্রণাম করল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'জনে। লিপিকাখানি ওর হাতে তুলে দিলেন বিভূতিভূষণ। না, 'খুকুকে দিলাম' লেখা নেই তাতে এবার। কিছু নেই।

খুকু বললে, এত দেরি করে এলেন যে!

এ কথার কী জবাব দেবেন বিভূতিভূষণ। বললেন, যাও ওঘরে। লগ্ন ঘনিয়ে এলো।

ততক্ষণে বরপক্ষ এসে গিয়েছে বাইরে। তাদের আপ্যায়ন, দেখাশোনা, হৈ-চৈ, ব্যস্ততায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন বিভূতিভূষণ। তারপর, কেউ জানে না, রাত তিনটের মেলে কলকাতা যাত্রা। একটা অধ্যায় শেষ। ডায়েরির পাতা খুলে বসলেন কলম নিয়ে—

> 'চেয়েছিনু শুধু তব প্রীতি ভালোবাসা—ভালো বেসো।
> দিয়েছ যা তাই সুধা মোর।
> আজি তুমি যেতেছ চলিয়া কঠোর সংসার পথে,—
> সুখী হও সেথা।—এই মোর আকিঞ্চন!'

খুকুকে আজ আর উপহার তিনি দেননি লিখে। এ তাঁর একান্ত নিজের। নিজেরই অন্তরালে ছন্দরূপে মূর্ত হয় বেদনা। সব স্মৃতি আজ যেন মুখোমুখি দাঁড়ায়। তিনি লিখছেন—

'কতকাল চলে যাবে—তখন খুকুও থাকবে না, আমিও থাকবো না—কে জানবে ইছামতীর তীরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শেফালী-বকুলগাছের নিবিড় ছায়ায় ছায়ায়, কত হেমন্তদিনের সন্ধ্যায়, কত শীত-শরতের জ্যোৎস্নায় দুটি প্রাণীর মধ্যে কী নিবিড় প্রীতির বন্ধন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল!

আকাশে তার বার্তা লেখা থাকবে। সে গ্রামের বাতাসে তার গানের ছন্দ অশ্রুত সুরে ধ্বনিত হবে, সেখানকার মাটির বুকে তাদের চরণচিহ্ন অদৃশ্য রেখায় আঁকা থাকবে চিরকাল অনাগত যুগের প্রণয়িণীদের উৎসাহ ও আনন্দ যোগাতে।'

বিভূতিভূষণের কবিতা শেষ হয় পূরবীর করুণ মূর্ছনায়—

বহুদূর ভবিষ্যত পানে চেয়ে দেখি
তুমি নাই, আমি নাই—আছে শুধু ওই
কলস্বনা ইছামতী, আছে বনশিমতলা ঘাট।
হয়ত বা আছে ওই আম্রতল,
ওই বৃদ্ধ বকুলের জীর্ণ কান্ডখানি। আছে তব,
পদরেখা আঁকা মৃত্তিকার পথ।
আর আছে এই বার্তা—তুমি আমি
দুইজনে বন্ধু বলেছিনু দোঁহাকারে।
সেই বন্ধুত্বের কথা, আঁকা থাক
চিরদিন এ গ্রামের আকাশে বাতাসে।
মনে রেখো, ভুলিও না,
হে বন্ধু, বিদায়।'

॥ চোদ্দ ॥

আঘাতে তিনি ভাঙেননি, আবেগে তিনি ভাসেননি তাঁর শিল্পসাধনার সত্তা হারিয়ে। দুই বিপরীত কোটি থেকে দুই নারীর তীব্র আকর্ষণের এই বছরগুলির মধ্যেও সাহিত্যকর্ম থামেনি তাঁর। এমন কি 'আরণ্যক'-এর ন্যায় বিস্ময়কর সৃষ্টিও তাঁর ওই সময়কার। উনিশ শ' আঠাশে ভাগলপুরে বসে বনবিচিত্রার পটভূমিতে উপন্যাস রচনার, 'একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল ব্রাত্যজীবনের ছবি' আঁকার সংকল্প নিয়েছিলেন বারো ফেবরুয়ারি। সে-কাজ চলছিল। প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে বই আকারে বেরোল উনিশ শ' আটত্রিশের চৈত্রে। উৎসর্গপত্রে লেখা—'গৌরীকে দিলাম'।

'স্মৃতির রেখা'য় যে ক্যানভাস তৈরি হয়েছিল, রঙতুলির টানে তাই দিয়ে এই আরণ্যক সৃষ্টি; সংকল্পের দশ বছর পরে! সুতরাং জীবনের ধ্রুবতারাকে হারাননি তিনি, ভিন্নমুখী হয়নি তাঁর তরণী কখনও।

ন'বছর আগে, পথের পাঁচালীর প্রথম প্রকাশকালে বাঙলাদেশের মানুষ যেমন বিস্মিত হয়েছিল তাদের ধারণাতীত এক সৃষ্টি দেখে, আর একবার তারা সবিস্ময়ে দেখল আরণ্যকের ন্যায় অভিনব আর মৌলিক গ্রন্থের স্রষ্টাকে। পথের পাঁচালীর বাঙালী গ্রামসমাজের ঘরোয়া গৃহস্থ পরিবেশ থেকে, বিভূতিভূষণ আরণ্যকে পাঠককে টেনে এনেছেন দিক-দিগন্তব্যাপী অরণ্যাবৃত এক রহস্যনিবিড় যাযাবর জীবন-পরিবেশে। এক বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায়, 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় বর্ণিত

সমুদ্র-মেখলা সেই নির্জন রহস্যমেদুর অরণ্যচিত্রের পর বাঙলা উপন্যাসে এমন নির্জন রহস্য-গম্ভীর অভিনব নিসর্গ পরিবেশ আর চোখে পড়েনি।' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, 'প্রকৃতির ইন্দ্রজাল লেখক কতো নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জনহীন বিশাল অরণ্যপ্রান্তরের জ্যোৎস্না রাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্ন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময় অপার্থিব স্বপ্ন সৌন্দর্য, কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে।'

লেখক জীবনের নিবিড় অনুভূতিই তো আরণ্যকের আসল সম্পদ। বিভূতিভূষণ মনে করেন, 'প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে। অন্য কোন দিকে মন দিয়াছ যদি, অভিমানিনী কিছুতেই অবগুণ্ঠন খুলিবে না।' এই রহস্য জানতেন বলে অত রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। বিভূতিভূষণ অধিকাংশ রচনায় নায়কের আড়ালে নিজে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। তবু একটা আড়াল আছে। এখানে তাও নেই, নায়ক 'আমি'। এই আমির মধ্যেই নায়ক-লেখক একাকার।

শুধু কি নির্জন অরণ্যবিলাস আরণ্যক? না, সেই বন-তমসার মধ্যেই প্রাণের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। সরল গণু মাহাতো, উদাস-ধার্মিক রাজু পাঁড়ে, টুলো পণ্ডিত মটুকনাথ, পল্লীকবি ভেঙ্কটেশ্বর, সুন্দরের পাগল যুগলপ্রসাদ, নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, অর্থপিশাচ রাসবিহারী সিং। আবার বাঈজির মেয়ে দুঃখিনী কুন্তা, মঞ্চী, অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী। সহচরীদের নিয়ে নির্জন সমাধিতে অনার্য-কন্যার ঝুলন-নৃত্য-গীত। ডায়েরির ভিত্তিতে লেখা, হয়ত টুকরো টুকরো ছবি। তবু সব মিলিয়ে সজীব সে আরণ্য পরিবেশ। উপনিষদের ন্যায় মহান এই আরণ্যক। সমালোচক গোপিকানাথের মতে, 'পরিবেশবৈচিত্র্যে, বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় ও সর্বোপরি শিল্পরসের আস্বাদে আরণ্যক ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও অনন্য।'

আর ডঃ শ্রীকুমারের কথা, 'প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে তো নাই-ই, ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।'

অথচ আশ্চর্য, এমন 'অনন্য' ও 'দুর্লভ' গ্রন্থের স্রষ্টার কিন্তু কোন খেয়াল নেই সেদিকে। তিনি নিরহঙ্কার, সেই ধুলোমাখা বাউল-ই।

আরণ্যক বেরোতে শুরু করে প্রবাসীতে উনিশ শ' সাঁইত্রিশে, দেশময় চাঞ্চল্য জেগেছে তখনই। আর লেখকের তখন অবস্থাটা? সেই সাঁইত্রিশের একটা ঘটনাতেই ফিরে যাই তাহলে।

উনিশ শ' সাঁইত্রিশের জানুয়ারি, একেবারে শেষের সপ্তাহ, তেইশ থেকে তিনদিন পাটনায় প্রভাতী সঙ্ঘের আমন্ত্রণে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। পৌরোহিত্য করবেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সাহিত্যিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গিয়েছেন যাওয়ার জন্য। বিভূতিভূষণকে তো বটেই, তাঁর বন্ধু যখন সভাপতি এ নিয়ে কথা কি?

হঠাৎ স্কুলে কি একটা ছুটি পড়ে গিয়েছে। ও সময়টায় বলা বাহুল্য বারাকপুরেই তিনি ছুটির সদ্ব্যবহার করতেন। সেবারও চলে গিয়েছেন। এদিকে নীরদ, সজনীকান্ত, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিমল গোস্বামী—এই সাহিত্যিক চতুষ্টয় কোমর বেঁধে তৈরি। বিভূতিভূষণই শুধু নেই। নীরদ বললেন, যাকগে। তিনি সভাপতিত্ব করবেন, এমন একটা অনুষ্ঠানে বিভূতিভূষণের ন্যায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদি অনুপস্থিত থাকেন,

কী বলবার আছে!

যাত্রার দিন সকালবেলা দেখা গেল জুতো, জামা, সর্বঅঙ্গে বারাকপুরের ধুলো-বালি নিয়ে নীরদের বাসায় মূর্তিমান সেই বন্ধু হাজির।

নীরদের তখন অভিমানের ভার। তির্যক প্রশ্ন করলেন নীরদ সি, মশায়ের কি আমার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে রাখা হয়?

না, না।—নিরাসক্তের ন্যায় উত্তর।

নীরদচন্দ্র কথা বাড়ালেন না আর। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। লোকটি উসখুস করতে লাগলেন। নড়ছেন, চড়ছেন, গলাখাঁকারি দিচ্ছেন।

নীরদ সকৌতুকে দেখছেন সব। বললেন, কী হল?

কী আর হবে। তবে কিনা,—বলেই একটু থামলেন। সামলে নিয়ে বললেন লোকটি—তা, নিয়ে গেলে কি আর যাবো না?

নীরদকে অনেক কষ্টে হাসি চাপতে হল। তিনি সবই জানেন। বললেন, তা নিয়ে যাওয়ার কী আছে। টিকেট কাটলে ট্রেনই পেঁাছে দেবে পাটনায়।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলেন লোকটি।

হাতের কাজ-টাজ সেরে নীরদ বললেন, চলুন।

কোথায়?

শনিবারের চিঠির অফিসে।

বন্ধুর পিছন পিছন উঠলেন অগত্যা।

সেখানে সবাই একসঙ্গে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন ও°কে খুশিতে।

নীরদচন্দ্র থামিয়ে দিলেন তাঁদের।—আগে ঠিক হোক উনি যাচ্ছেন কিনা।

আবার যাচ্ছেন কিনা মানে? সমস্বরে প্রশ্ন।

মানে—টিকেটটি কে কাটছেন? কোন্ ক্লাসের?

বন্ধুরা সব ইনটার ক্লাসে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। আর বিভূতিভূষণ ইনটার তো নয়ই থার্ড ক্লাসের টিকেটও নিজের পয়সায় কাটতে ইচ্ছুক নন।

ঠিক হল, সবাই তাঁরা থার্ড ক্লাসে যাবেন। আর ইনটার ক্লাসের বরাদ্দের পয়সা থেকে থার্ড ক্লাসেরও একখানা বাড়তি টিকেট হয়ে যাবে।

অল্প সময়ের মধ্যে এরকম একটা ব্যবস্থা সেরে ভারি খুশি লোকটি। বন্ধুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন নীরদ।

টিকেটের তো বিহিত হল, এবার পোশাকের কী হবে? পশ্চিমের জানুয়ারির শীত!

নীরদ তৈরি। নিজের যা আছে তো আছেই, অতিরিক্ত হিসাবে অমল হোমের কাছ থেকে তিব্বতী কম্বল, বালাপোশ, টুপি ইত্যাদিও এনেছেন। অন্যদেরও কিছু না কিছু আছে বাইরে বেরোনোর মত। কিন্তু কী আছে ওই বাউলের? বন্ধুপত্নী অমিয়া ভাবনায় পড়েন। চিনতে তো আর বাকি নেই তাঁর স্বামীর এই অন্তরতম সুহৃদটিকে।

যখনই আসবেন, ময়লা জুতোজোড়া ঘরের দেউড়ির বাইরে সন্তর্পণে রাখবেন। তারপর একটা বিড়ি টানতে টানতে ঢুকবেন, নীরদ কই হে। তাঁকে পেয়েই আনন্দে জড়িয়ে ধরবেন, উঁচুতে তুলে লাফাবেন। বলবেন—তুমি একটা বাঁদর—ইত্যাদি। তারপর যখন ধমক খাবেন নীরদের, হে-হে করে হাসতে হাসতে চুপ করে যাবেন।

নীরদ সঁরে গেলে অমিয়াকে বলবেন, ওর সঙ্গে আমার বনবে না। আপনি আসামের মেয়ে, বন-জঙ্গল-পাহাড়ের দেশের মানুষ, আপনার সঙ্গে বনবে আমার।

বনিয়ে নেন অমিয়াও। নীরদ ও°র বক্তৃতা বন্ধ করবেন ধমকে। ও°র নোংরা জুতো

দেখলে ফেলে দেবেন। ফেলে দেবেন ও'র মুখের পোড়া বিড়ি। বয়সে ছোট হয়েও বড়র প্রতি এইভাবে গারজিয়ানি যে করা হবে নীরদের, তাতে বড়টি কিন্তু খুশিই। আর উপায়ই বা কী!

একদিন দেখা গেল, নীরদের শিশু পুত্রটি উঠোনময় ঘুরছে আর বলছে, আমি বিভূতি জ্যেঠু হয়েছি।

সর্বনাশ! বিভূতিভূষণের একটা পোড়া বিড়ির গোড়া ছাইদানি থেকে তুলে নিয়েছে ওই শিশু, আর ঠোঁটে গুঁজে নকল করছে। নীরদ সি চৌধুরী দেখলে আর রক্ষে নেই। অমিয়া ছেলেকে ধরবার চেষ্টা করছেন, ছেলে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু যাঁর ভয়, সেই নীরদ এসে পড়লেন। সেদিন কড়া ধমক লাগালেন, ঠিক যেমন করে ধমকালেন শিশুটিকে। শিশুর মতই এসব ধমক মাথা পেতে নেন বিভূতিভূষণ। ওই বয়স্ক শিশুটির জন্যই আজ পাটনা সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করতে হয়েছে বন্ধুকে। বন্ধুপত্নী বিব্রত তাঁকে সাজিয়ে দিতে।

ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে ছোট দেবর বিনোদ চৌধুরীর ওভারকোট, মোজা ইত্যাদি পরিয়ে দেখলেন, মানাচ্ছে কিনা।

তা দেখবেন, সে তর সইলে তো। ঠিকমতো পরানো না হতেই অমিয়ার ওয়ার্ডরোবের আরশির সামনে দাঁড়িয়ে আহ্লাদে অস্থির। ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখছেন আর বলছেন, বাঃ, খাসা হয়েছে, বাঃ।

কিছু পরে হঠাৎ সব খুলে উঠে পড়লেন। বিকালে নাকি কোথায় যেতে হবে কার সঙ্গে দেখা করতে। অমিয়া বলে দিলেন, সন্ধ্যা হতেই চলে আসবেন। আমাদের বাড়ি থেকে একসঙ্গে খেয়েই রওনা হবেন দু' বন্ধুতে।

এতো উত্তম প্রস্তাব। ব্রাহ্মণ-ভোজনের দায় রক্ষা করাকে তিনি কর্তব্যের তালিকায় সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এখান থেকেই যাত্রা। অতএব সন্ধ্যায় জিনিসপত্র নিয়েই হাজির। অমিয়া দেবীর ভাষায়ই বলি,—

'সন্ধ্যেবেলা এসে দেখলেন ও'র (নীরদ সি চৌধুরীর) বিছানা ইত্যাদি হোলড-অলে ভরা হচ্ছে। পরিষ্কার চাদর, বেডকভার, বালিশ, সব চাকরকে এগিয়ে দিচ্ছি, সে ঢোকাচ্ছে। বিভূতিবাবু কাছেই খাটের উপর বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'নীরদ, যাচ্ছে যেন রাজাটা, আর আমি সঙ্গে যাচ্ছি চাকরটা।' তাঁর এই উক্তিতে হাসবো কি কাঁদবো? দুঃখ হল। তারপরে তাঁর সঙ্গে যে ছোট ব্যাগ ছিল তা খুলে দেখি একটি নোংরা লাল গামছা ও আধময়লা একটি ধুতি! তাড়াতাড়ি যতটা পারি তাঁকেও পরিষ্কার ধুতি, তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে যতটা পারা গেল সভ্যভাবে ফিটফাট করে পাঠানো গেল। তিনি কিন্তু নির্বিকার।'

আসলে তিনি জানতেন সমাজে রাজা-চাকর-অভিনয়ের যত প্রকরণ তার কোনটিই খাঁটি বস্তু নয়।

তিনদিনব্যাপী সেই সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম দিনে বিভূতিভূষণ পাঠ করলেন তাঁর নতুন লেখা গল্প 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ'। সমাগতজনের প্রশংসাধন্য হল তা। দ্বিতীয় দিন ছিল তাঁর ভাষণ—সাহিত্যের উপকরণ কী। কি কি উপাদান কীভাবে সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা থেকে রসসৃষ্টি করে, তা তিনি বিশ্লেষণ করলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

ওই ভাষণ সম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, 'যেমন বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তেমনি বাচনভঙ্গী। বিভূতিভূষণের উচ্চ অথচ মধুর কণ্ঠস্বর যাঁরা শুনেছেন—যাঁরা তাঁর ভাষা সম্পর্কে জানেন, তাঁরাই বুঝবেন কী অপূর্ব হয়েছিল সে ভাষণ।'

চলমান সাহিত্য-বাসর॥ পাটনার সাহিত্য সম্মেলন থেকে ফেরার পথে ট্রেনে—১৯৩৭। বাঁ দিক থেকে—বিভূতিভূষণ নীরদ চৌধুরী, সজনীকান্ত, বনফুল ও ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বনফুল তাঁর প্রথম গল্পের বই ('বনফুলের গল্প') প্রকাশের আগে বাছাই-করা গল্প যাচাই করে নিচ্ছেন। ফোটো : পরিমল গোস্বামী

অবশ্য সম্মেলনের তিনদিনই তিনি কাটাতে পারেননি এখানে। উঠেছিলেন সবাই মণীন্দ্র সমাদ্দারের বাড়িতে। আপ্যায়ন চলছিল যথেষ্ট। কিন্তু গোল বাধালো শহর-সীমান্তের সবুজ মেখলার হাতছানি। প্রথম দু'দিন সকালে উঠে বাইরে বাইরে বাগানে বসে ডায়েরি লিখে কাটালেন। তৃতীয় দিন উধাও। চিরদিন শহরের সাজানো সভা থেকে সবুজের অসম্বৃত শোভা তাঁকে বেশি টানে।

সাতাশ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় বিস্তারিত রিপোরট বেরোল সে সম্মেলনের। তাতে যেমন সভাপতি 'চিন্তাশীল লেখক' নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অভিভাষণকে অভিনন্দিত করা হল 'চিন্তার গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি' বলে, তেমনি করা হল 'শক্তিমান কথাশিল্পী' বিভূতিভূষণের গল্পটির সুখ্যাতি ও তাঁর 'অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্যের' প্রশংসা।

বোঝা যাচ্ছে, 'চাকরটা' হয়ে তিনি যাননি এবং ফিরেওছেন রাজার মত অসংখ্যের হৃদয় জয় করে। বিভূতিভূষণের ওই যে জীর্ণ ধূলিমলিন পোশাক, তা হল তাঁর অঙ্গে দরিদ্র পল্লীর নামাবলী। এতে যে অনেকে হাসতেন, অনেকে করতেন ব্যঙ্গ, সে কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। শিল্পীমন তাঁর ওতে বিচলিত হয়নি কখনও। তাঁর ব্যঙ্গ কৌতুক সৃষ্টিটা ছিল যেন 'মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে'—

খেলাত স্কুলে ক্লাস নিচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম। উনিশ শ' উনচল্লিশের একুশ নবেম্বর। বাঙলা তিন অগ্রহায়ণ।

স্কুল থেকেই বনগাঁর পথে ছুটলেন বিভূতিভূষণ। যখন পৌঁছলেন, বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। স্টেশনে নেমেই শুনলেন ব্যাপারটা।

খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল ছোট্ট শহরে। বিভূতিভূষণের একমাত্র বোন জাহ্নবী ইছামতীতে নাইতে গিয়েছিল সরকারি উকিল সত্য বসুদের ঘাটে। কিন্তু গিয়েছিল তো সেই সকালে, বেলা যে প্রায় দশটা ছাড়িয়ে যায়! এখনও আসছে না কেন? মায়ের দেরি দেখে ন' বছরের মেয়ে উমা বেরোয় খুঁজতে। ঘরে ততক্ষণে ক্ষিদে ক্ষিদে করে মায়ের খোঁজে অশান্ত হয়ে উঠেছে সাত বছরের শান্ত।

ঘাটে এসে উমা দেখে মায়ের শাড়ি, ব্লাউজ আর আঁচলের চাবির গোছা পড়ে আছে পাড়ে, মা নেই। ছোট মেয়ে ঘাটের কাছাকাছি পাড় ধরে 'মা মা' করতে করতে ছোটা-ছুটি করল। সাড়া এলো না। ছুটে এলো বাড়িতে। না, কোথাও নেই মা। আবার সে ছুটলো ইছামতীর ঘাটে—এবার কাঁদতে কাঁদতে। দিদির কান্না দেখে শান্তও কাঁদতে কাঁদতে—পিছন পিছন এলো। এলো আরও দু'চারজন। তারপর পাড়াসুদ্ধ, ক্রমে শহরসুদ্ধ ভেঙে পড়ল ইছামতীর তীরে।

বিভূতিভূষণ যখন নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালেন, পাড়ার ছেলেরা ততক্ষণে ইছামতী তোলপাড় করে তীরে উঠেছে। জেলেরা টানা জালে চষে ফেলেছে এপার ওপার। কিন্তু নদীর নামে নাম সেই মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে না নদী। অথচ দুটি শিশুসন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই জাহ্নবী একদিন বনগাঁ এসেছিল দাদার সঙ্গে।

তিন বছর আগে উনিশ শ' ছত্রিশের আগস্টে জাহ্নবীর স্বামী পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় যেদিন মারা গেলেন, সেদিনের কথা ভুলতে পারেননি বিভূতিভূষণ। কর্ণমূল হয়েছিল। সবাই বলছে অস্ত্রোপচার চাই। কলকাতার হাসপাতাল ছাড়া হবে না। জাহ্নবীর আপত্তি। ওর ধারণা, হাসপাতালে লোক বাঁচে না। বিভূতিভূষণই জোর করে ভগ্নীপতিকে কলকাতা নিয়ে আসেন। বোনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কাঁদিসনে

জাফরি, দেখবি ভাল করে নিয়ে আসব। পারেননি আনতে। হাসপাতালেই শেষ।

কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলেন, বোন তার সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গলগ্রহ। বিশেষ করে ভগ্নীপতির মৃত্যুকালে ভূমিষ্ঠ একটি মেয়ে যেন বাড়িয়ে দিল গঞ্জনার মাত্রাটা। বিভূতিভূষণের দিনলিপির পাতা দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায়—'ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে? ওর অপরাধ ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যি ওর হাসি কেউ চাইতো না। ওর বাবা তো মারা গেল, ওর মার সংকটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না। ওর খুড়িমা বললে, টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোল তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হত—কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারিনে।

'আনওয়ানটেড স্মাইল! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি। এছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায়নি ও। পুওর লিটল মাইট! কিন্তু আমি বলি এ হাসি শাশ্বত।'

তখন দৃষ্টিপ্রদীপ রচনা চলছে। এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়ল জিতুর ভাগিনেয়ীর কোলের সন্তানটির গলা শুকিয়ে মরে যাওয়ার দৃশ্যে।

কত সহ্য করা যায়? জাহ্নবীকে বললেন, চল জাফরি এখান থেকে। বনগাঁর ডাক-বাঙলোর পাশে দু' কামরার ছোট একটি ঘর ভাড়া নিলেন বার টাকায়। মেয়ে উমা আর ছেলে প্রশান্ত—শান্তকে নিয়ে জাহ্নবী সেদিন বাঁচতে এসেছিল এখানে। আর আজ? স্তব্ধ হয়ে ইছামতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিভূতিভূষণ। শিশুকাল থেকে তাঁকে অনেক দিয়েছে ইছামতী। অনেক সুখ, অনেক আনন্দ, স্বপ্ন-অঞ্জন, আবেগ-ঐশ্বর্যের ডালি উজার করে দিয়েছে এই ইছামতী। আজ এ কী অসহ্য যন্ত্রণার ভার সে তুলে দিল ও'র হাতে। জাফরি ছিল ও'র একমাত্র অবশিষ্ট বোন। আশ্চর্য, দেহটিকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখল ইছামতী। উমা-শান্তকে বুকে জড়িয়ে ফিরলেন বিভূতিভূষণ ডাকবাংলোর পিছনের সেই হাহাকার-ভরা শূন্য ঘরে।

সারা বনগাঁ শহরে সেদিন ওই এক কথা, এক আলোচনা। প্রতি ঘরে নাড়া দিয়েছে ইছামতীর জল-তোলপাড় ঢেউ। সেই একই ঘটনাকে কথার আঙুলে বারবার নাড়িয়ে-চাড়িয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে সবাই। বনগাঁর মত ছোট শহরে এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। তাই যখন ঘটল, সহজে তার জের ফুরোবার কথা নয়।

ঢেউ হারিজ মিঞার বাড়িতেও। না, হারিজ মিঞা কেউ না এখানে। তার এ বাড়ি, নতুন নাম—বীণাপাণি ভবন। নতুন ভাড়াটে এসেছেন সপরিবার ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, একসাইজ ইনসপেকটর। সেই একই প্রসঙ্গ চলছিল সে রাতে সেই বীণাপাণি ভবনে। মৃত্যুরহস্যের কোন কিনারাই যখন করা গেল না, কথা তখন পেঁছল অন্য তীরে। নির্মলা-পিসি বললেন, আহা, দু'দুটো শিশু অমন ভাইয়ের 'পরে চাপিয়ে মেয়েটা কিনা আত্মঘাতী হল? নিজের নেই চালচুলো। একলা মানুষ, বেচারা এখন কী করে সামলাবে কে জানে!—পিসি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভাবনাটা সহজ পথেই গড়ায়। ইছামতীতে কুমির আছে। দুর্ঘটনা যে সেদিক থেকেও ঘটতে পারে সে-কথা বড় ভাবলে না কেউ। তা হোক। চালচুলো নেই, একলা মানুষ, মানে? সন্ন্যেসী নাকি?—মায়া, কল্যাণী, বেলু-দনুরা উৎসুক।

ওমা, সন্ন্যেসী হবে কেন? কত বড় লেখক, নাম শুনিসনি!—ভাইঝিদের অজ্ঞতায় পিসি রুষ্ট হন।

সেকালে ছোটখাটো মফস্বল শহরে বিয়ের উপহার, নিমন্ত্রণপত্র বা হাতেলেখা ম্যাগাজিনে কিছু একটা লিখে যশ-খ্যাতির দাবিদার দু'চারজন লোকের সন্ধান সব সময়েই সুলভ ছিল। বালুরঘাট থেকে সদ্য আসা ওদের পক্ষে অত দ্রুত বনগাঁর সে-সব গুণীজনের সন্ধান রাখা সম্ভব নয়।

মেঝো মেয়ে কল্যাণীর কিছুটা ঝোঁক ছিল এ ব্যাপারে। বনগাঁয় আবার কে সাহিত্যিক তা ওর জানা দরকার। পিসির দিকে তাকিয়ে সে তির্যকভাবে প্রশ্ন করল, কী লেখেন গো ভদ্রলোক, নামটা কী শুনি!

তুই অবাক করলি কল্যাণী।—

এবং অবাক হওয়ার ভঙ্গীতেই গালে করতল ন্যস্ত করলেন নির্মলা দেবী। তারপর বললেন, বিভূতি বাঁড়ুজ্যের নাম শুনিসনি? পথের পাঁচালীর? বলে, কত নাটক, নভেল, গ্রন্থাবলী লিখছেন!

নাটক, নভেল, গ্রন্থাবলী থাক, কিন্তু পথের পাঁচালী! বিভূতিভূষণ এই বনগাঁয়ে! অপু, দুর্গা—সব স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, চমকে দেয় ওর চিন্তাজগতকে। লোকে বলে—লেখক যে, সে-ই অপু। অপু এত কাছে! এত পাশে! বিশ্বাস হয় না যেন। ভুল বকছে না তো পিসি?

কিন্তু না, সবাই ওই কথাই বললে। সেই বিভূতিভূষণই। এই তো তাঁর দেশ, বনগাঁর পাশে বারাকপুরে। এখানেই স্কুলজীবনের বোর্ডিং বাস। এই তাঁর তীর্থ। একে একে প্রায় সব মরে গিয়েছে। ছিল ছোট একটা বোন—এই বনগাঁয়। সেও গেল।

এই সেই পথের পাঁচালীর দেশ, অপু থাকে এখানে! বাবার সঙ্গে বালুরঘাটে থাকতে পথের পাঁচালী-অপরাজিত সবাই ওরা পড়েছে। কল্যাণীর নেশাটা একটু বেশি আবার। পথের পাঁচালী এক অদ্ভুত আবেশে মণ্ডিত করে রেখেছে তাকে। আরও হাজার হাজার পাঠকের মত তারও হৃদয়ের যোগ গড়ে উঠেছে অপুর সঙ্গে, অলক্ষ্যে। নির্মলা দেবীকে পাকড়াও করে কল্যাণী, চলো না পিসি একবার দেখে আসি।

আজ থাক, সদ্য শোক পেয়েছে লোকটা! দু'দিন যাক, জুড়োতে দে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন পিসি, কী জানি, বনগাঁর পাটই বোধহয় চুকে গেল ছেলেটার। বোনটা ছিল, টান ছিল একটা, ওখানেই আসত, থাকতো। সে-ই যখন রইল না!—আহাহা, দুধের বাচ্চা বলতে গেলে, ও দুটো—কী যে হবে! ভগবানই দেখবেন। পিসির প্রাণ যেন হাহাকার করে ওঠে।

পিসি আঁচল দিয়ে ভেজা চোখ মুছলেন। ওদের সবার চোখেই জল তখন। কল্যাণীরও। সে অধীর হয়ে বললে, কালকেই তাহলে চলো না পিসি, দেখে আসি, আবার কোথা থেকে কোথায় চলে যাবেন, যদি না-ই আসেন আর।

না, কালকে নয়, পরশু যাস।

পরশু। আজ তেসরা,—কল্যাণী মনে মনে হিসাব করে নিল, কাল চৌঠা, পরশু পাঁচ—পাঁচুই অঘ্রাণ,—সেই পরম লগ্ন!

হাঁ, অগ্রহায়ণের পাঁচ তারিখ, নির্মলা-পিসির সঙ্গে তাঁর ষোল বছরের ভাইঝি কল্যাণী চলল পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ-সন্দর্শনে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়াল বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে। ফুলো-ফুলো দুটি চোখ, একমাথা উড়ু-উড়ু চুল, মেয়েটি বললে, আসুন, বড়মামা শুয়ে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।

শান্তকে বুকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। উমার ডাকে গায়ে বাদামি

রঙের একটি চাদর জড়িয়ে উঠে এলেন।

মুখে-চোখে বিষন্ন বিকেলের ঢল। যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে লোকটার উপর দিয়ে। এ-দু'দিনে অনেকেই তাঁর কাছে এসেছে, আসছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে সাধ্যমত। কিন্তু সান্ত্বনাও যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত তিনি আজ।

তবু লোক আসবেই। সবার সামনেই দাঁড়াতে হয় সবিনয়ে। অপরিচিতা মহিলা দু'জনের সামনে এসেও দাঁড়ালেন। দু'হাত জোড় করে বললেন—নমস্কার, বসুন।

নির্মলা দেবীরা সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বসলেন।

বেশি কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বললেন, আমার বিপদের কথা সবই বোধহয় শুনেছেন। আপনাদের সঙ্গে মন খুলে যে দুটো কথা বলব, আপ্যায়ন করব—

না না, কী যে বলছেন! নির্মলা দেবী ও'কে থামিয়ে দেন। একলা পুরুষমানুষ এদের নিয়ে যে কী অবস্থায় পড়েছেন, তা কি বুঝতে পারি না!

দু'এক কথার শেষে ভাইঝিকে দেখিয়ে নির্মলা দেবী বললেন, ওর বড় শখ, আপনাকে দেখবে। ভালো ভালো বই পড়ার খুব ঝোঁক। তার মধ্যে আবার আপনার বই পেলে কথাই নেই।

তাই নাকি? অন্য সময় হলে আরো কিছু বলতেন হয়ত। কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত তিনি, বারে বারে উদাস হয়ে যাচ্ছে মন। কিছু সময় নীরব থেকে বললেন, ভালই করেছেন এসে। মনের আশা অপূর্ণ রাখতে নেই। কী জানি হয়ত সত্যিই দেখা হতো না আর। বনগাঁর পাট তো চুকলো।

ও কথা বলবেন না। আপনি এত ভালোবাসেন বনগাঁকে, পাট চুকোবেন কেন? নির্মলা-পিসি সান্ত্বনার সুরে বলেন। কিন্তু কী সান্ত্বনা দেবেন তিনি এই নীড়হারা মানুষটিকে!

বিভূতিভূষণ বললেন, ঠিকই বলেছেন আপনি. এই বনগাঁ, বারাকপুরকে আমি যে কত ভালবাসি সে কথা কেউ জানে না। কেউ নেই আমার বারাকপুরে। তবু ছিল জাহ্নবী, তখন চালকিতে, তার পরে এখানে। একমাত্র অবশিষ্ট বোন আমার, তাকেও হারালেম ওই ইছামতীতে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিভূতিভূষণ।

একটা স্তব্ধ পরিবেশ।

মাতৃপিতৃহারা দুটি কিশোর-কিশোরী মামার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তারা জানে না, কতখানি সর্বনাশ তাদের ঘটে গেল। তবু কি বুঝতে পারছে, মামা ছাড়া আজ আর তাদের কেউ নেই ত্রিভুবনে? তাঁকে দু'পাশ থেকে ছুঁয়ে আছে দু'জনে, দুটি মুখ যেন কী খুঁজে ফিরছে মামার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে।

কল্যাণীরও যেন কান্না পাচ্ছে এই করুণ দৃশ্যে। উমা-শান্তকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিল।

নির্মলা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, এদেরও কি কলকাতা নিয়ে যাবেন?

না।—বিভূতিভূষণ বললেন, কলকাতাতেও কেউ নেই আমার। নিজে থাকি মেস-এ। আমার ছোট ভাই নুটু আছে বউকে নিয়ে ঘাটশিলায়। ভাবছি সেখানেই রেখে আসব।

চমকে উঠে উমা-শান্ত একবার মামার মুখের দিকে তাকালো। ঠিক বুঝতে পারছে না যেন, কোথায় তারা দুটি ভাইবোন যাচ্ছে। কী তাদের ভবিষ্যৎ। ছোট-মামাকে তারা ক'বারই বা দেখেছে! বড় হয়ে তো আপন জানে বড়মামাকেই।

জানেন সে কথা বিভূতিভূষণও। বললেন, রেখে আসব ওদের। ছুটিছাটায় গিয়ে দেখে আসব। আগে আসতেম বনগাঁ—এবার থেকে ঘাটশিলা। তাই বলছিলেম, বনগাঁর পাট চুকল।

সত্যিই কী আসবেন না?

ম্লান হাসলেন বিভূতিভূষণ, কার কাছে আসবো? আমি যত চাই, বনগাঁ আমায় ততই যেন দূরে ঠেলে দেয়!

কেন, আমরা তো আছি। আমাদের কাছে আসবেন। বলুন আসবেন?

এত সহজে, এমন আন্তরিকতার অনায়াস আহ্বান! কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। বললেন, আসব।

খুশিতে উজ্জ্বল কল্যাণীর চোখমুখ। এবার ওঠার পালা। মায়ার অটোগ্রাফের খাতাখানার কথা কল্যাণীকে মনে করিয়ে দিলেন পিসি। দিদির খাতাটি সসংকোচে মেলে ধরল কল্যাণী ও'র সামনে। লিখেন বিভূতিভূষণ পথের কবির বাণী—'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু'।

ও'র ঘাটশিলা যাওয়ার আগে আবার এসে দেখা করে যাবে, কথা দিয়ে পিসিকে নিয়ে পথে পা বাড়ালো কল্যাণী।

শীতঋতুর পূর্বরাগরঞ্জিত অঘ্রাণ-অপরাহ্ণ। সোনারঙ রোদ বনগ্রামের আকাশে, গাছের চূড়ায়, বাড়ির ছাদে, পথের 'পরে ঝুরঝুর ঝরছে। তার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল ওরা দুজনে। অদৃশ্য হল কল্যাণী, তার নীল শাড়ি—সোনালী সীমান্ত। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিভূতিভূষণ। কল্যাণীর নীল শাড়ির সোনালী পাড়ের গায়ে সুন্দর রোদ্দুর! বেদনার নীল দিগন্তে অমলিন সূর্যের কনকদ্যুতি? সেদিন কানে ছিল ওর দুটি লাল পাথরের দুল। দুলে দুলে তা জীবনের কোন্ ছন্দোময়তার আশ্চর্য ইঙ্গিত দিয়ে গেল পথের বাঁকে 'হীরামহলের' পাশ দিয়ে আড়াল হয়ে!

ঘাটশিলাযাত্রার দিন ষোড়শীকান্তর ঘরের মেয়েরা এসে গোছগাছ করে দিলে সব। ওদের কানুমামা এ-ব্যাপারে অগ্রণী। সকাল করে এসে জিনিসপত্তর বেঁধেছেদে তৈরি। স্টেশন পর্যন্ত সবাই এলো ওরা। এই অল্প সময়ের মধ্যে উমা-শান্তকে একেবারে যেন আপন করে নিয়েছে। ওদের হাত ধরেই আছে দু' ভাইবোন। গাড়িতে উমা-শান্তকে বসিয়ে নামতে গিয়েই মায়া কেঁদে ফেললে। কান্না ছোঁয়াচে। কল্যাণী, বেলু-দনু সবারই চোখে জল তখন। অশ্রুধারা বিভূতিভূষণেরও বাঁধ মানল না। অথচ আশ্চর্য, যাদের জন্য বেদনাটা এত দুঃসহ, সেই দুটি ভাইবোন কিন্তু ভারি খুশি। রেলগাড়িতে 'বড়দার' সঙ্গে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে তারা। হাঁ, মা জাহ্নবীর দেখাদেখি ওরাও 'বড়দা' ডাকে বড়মামাকে।

গাড়ি ছাড়ল। সবাই ওরা হাত তুলল, হাতছানিতে ফিরে আসবার ইশারা।—আবার আসবেন কিন্তু—আসবেন—ঠিক?

অদৃশ্য হল গাড়ি। তার আগে পর্যন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে রুমালখানি উড়ছিল বিভূতিভূষণের হাতে—ওদের চোখের নীরব আমন্ত্রণের সামনে।

সেই আমন্ত্রণের মঙ্গলকলসসজ্জিত তোরণ দিয়ে ষোড়শীকান্তব পরিবারে আপন-জনের মত একদা প্রবেশ ঘটল বিভূতিভূষণের। অঙ্কুরটি যে প্রথম দর্শনেই দেখা দেয় সে-কথা বিভূতিভূষণ পরবর্তীকালে স্বীকার করেন। উনিশ শ' সাতচল্লিশের ছাব্বিশ জুলাই কল্যাণীর কাছে লেখা এক চিঠিতে তাঁর স্বীকারোক্তি—তুমি যেদিন আমার বাসায় অটোগ্রাফ নিতে যাও, সেদিন থেকেই এ বন্ধুত্বের প্রথম অঙ্কুর সকলের অলক্ষ্যে ফুটেছিল। ভবিতব্য বুঝি বিচিত্রভাবেই সব যোগাযোগ ঘটায়।

ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও এককালে সাহিত্যচর্চা করতেন। বইও দু'একখানা লিখে ছাপিয়েছিলেন। 'দশের পূজা' নামক তাঁর একখানি ভক্তিমূলক বইয়ের ভূমিকায়

গ্রন্থকারের লেখনীশক্তির প্রভূত সুখ্যাতি করেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এ ছাড়াও আছে তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের বই 'অঞ্জলি', ও ঐতিহাসিক কাহিনী 'ইতিহাসের কথা'। ছাত্রাবস্থায় দু'একটা প্রবন্ধও লিখেছিলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ম্যাগাজিনে। নানা ধান্দায় এদিকে আর বেশি কিছু করতে পারেননি ভদ্রলোক। তবে পোকাটা ভিতরে ছিল, এবং মাঝে মাঝে দংশন করত।

প্রথমত, নিজে যা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু কার্যকারণে পারেননি, বিভূতিভূষণের মধ্যে তারই পরমাসিদ্ধি ঘটেছে দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট হলেন ষোড়শীকান্ত।

দ্বিতীয়ত আর একটি কারণেও ও'র মনের আরও কাছে গিয়ে পড়লেন বিভূতি-ভূষণ। ষোড়শীকান্ত তান্ত্রিক ছিলেন। দীক্ষা নিয়েছিলেন এক ভৈরবীর কাছে। পরলোকতত্ত্বে তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস। দেহ ও দেহান্তরিত আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার শেষ নেই তাঁরও, বিভূতিভূষণেরও। এক আলাপেই ঘনিষ্ঠতা ঘটল দুই সমধর্মীর। এর পর আর বাধা রইল না কিছু। প্রেততত্ত্ব নিয়ে এক একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা। মাঝে মাঝে চক্রাধিবেশন। দু'জনেই মেতে উঠলেন নতুন উৎসাহে। গড়গড়ার নল চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে করে হাতে হাতে ঘুরে আসর জমাটি।

ষোড়শীকান্তর মা তখন বেঁচে। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, কেবল ষোড়শী-কান্তই নন, ওই বৃদ্ধাও বেশ ভক্ত হয়ে পড়েছেন বিভূতিভূষণের। হওয়ারই কথা। বুড়ো-বুড়ির ভালো লাগার মতন হরেক কথার অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবি তো মহানন্দ-তনয়ের মুঠোয়। বনজঙ্গল থেকে দেব-দেবী, তীর্থ-মন্দির, শাস্ত্র-পুরাণের নানা কাহিনী। আকর্ষণীয় করে বলার আশ্চর্য প্রসাদগুণে অল্পকালেই বৃদ্ধা বশ। ও'কে পেলে আর ছাড়তেই চান না তিনি। একেবারে থুরথুরি। আর ক'দিনই বা থাকবেন ইহলোকে। বড় সাধ হয়, ও'র মুখে গীতা পাঠ শুনতে শুনতে যদি চোখ বুজতে পারেন, তবে পরলোকে ঠাঁই হয়।

আর হলও তাই। বনগাঁর বাসায় সেই বৃদ্ধা যেদিন মারা যাবেন, কোত্থেকে হঠাৎ বিভূতিভূষণ হাজির। তখনও বৃদ্ধার জ্ঞান আছে। তাঁর শেষ মনোবাসনা পূর্ণ হল। বিভূতিভূষণ শিয়রে বসলেন। না, হাতে গীতা নেওয়ার দরকার নেই, অনেক অধ্যায়ই ও'র কণ্ঠস্থ। সব গল্পের শেষে আর এক মহত্তর গল্পের রাজ্যে বৃদ্ধা যখন যাত্রা করছেন, কানের কাছে তখন মৃদুকণ্ঠে গীতার পবিত্র শ্লোক আবৃত্তি করে চলেছেন বিভূতিভূষণ।

ষোড়শীকান্তর বড় মেয়ে মায়া তখন স্কটিশ চারচ কলেজে পড়ছে। ও'দের আগ্রহে কলকাতায় মায়ার লোক্যাল গারজিয়ান হলেন বিভূতিভূষণ। তা কে কার গারজিয়ান? নিজের নেই কিছুর হিসাব, আর ওই মানুষটি নেবে মায়ার খবর?

উল্টে মায়াকেই আসতে হয় ও'কে সামলাতে প্যারাডাইস লজে। রোজ আসা তো আর সম্ভব নয়। অথচ কাঁহাতক পারা যায় এমন করলে! ঘরময় পোড়াবিড়ির টুকরো, কলকের টিকে-পোড়া ছাই, ছেঁড়া কাগজ—সব ঝেঁটিয়ে বার করা, বই-বিছানা গুছিয়ে দেওয়া, ময়লা তোয়ালে-চাদর, কাপড়-জামা ধোবায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা—সব সেরে নিজেকে সাফ-সুতরো করে বলবে, চলুন বেড়িয়ে আসি।

ওর গারজিয়ানি অগ্রাহ্য করেন না, চুপ করে মেনে নেন বিভূতিভূষণ। শেষ পর্যন্ত বেড়াতেও বেরোন—পথে, পারকে কিংবা গঙ্গার ধারে। আর এইভাবে ওর সঙ্গে বেরিয়েই এক সময় তাঁর মনে হয়—'সত্যিই, শহরটাকে অবজ্ঞা করা ঠিক হয়নি। এই কলকাতারও একটা রূপ আছে।'

ষোড়শীকান্তর শ্যালক কানু, অর্থাৎ নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও মেঝো মেয়ে কল্যাণীর

মধ্যে একটা ব্যাপারে ভারি মিল, দু'জনেরই লেখার বাতিক। বনগাঁয় একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করতে লাগল দু'জনে মিলে।

এবার আর ভাবনা কি! কাঁচা লেখাগুলি উৎরে দেওয়ার দায় নিয়েছেন বিভূতি-ভূষণ স্বয়ং। তা খুব কাঁচা কই। কল্যাণীর লেখার সাবলীল ভঙ্গিটি ও'র বেশ লাগে। এই গুণটির সন্ধান কোথাও পেলেই হল। নিজে সাহিত্যসাধক। সতীর্থজ্ঞানে টেনে নেন, উৎসাহ দেন।

কল্যাণীরও সে কী আনন্দ! দুটি গল্প লিখে পাঠালো ও'র কলকাতার মেস-এর ঠিকানায়। একটির নাম 'নীলোৎপল', অপরটি 'শটিফুল'। 'ঘেঁটুফুলের' প্রেমিকের কাছে, 'মৌরীফুল'-এর লেখকের কাছে 'শটিফুল'-এর গল্প! নামটি দেখেই মন ভরে যায়। গল্পটি পড়ে আরও খুশি। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, দুটি গল্পই পর পর ছাপার হরফে বেরিয়েছে 'গল্পিকা' নামে একটি মাসিক পত্রে। সে পত্রিকা হাতে পেয়ে খুশি ধরে না আর কল্যাণীর। আনন্দ আরও পথের পাঁচালীর স্রষ্টার লিখিত স্বীকৃতি পেয়ে—'তোমার মধ্যে একটি কবি ও ভাবুক বাস করে।'

বলে রাখি, চিঠিতে কল্যাণীকে বেশ ভব্যভাবে 'তুমি', 'তোমাকে' ইত্যাদি সম্বোধন থাকলেও মুখে কিন্তু আদরের ডাক—'তুই'। ফরমাস হত তেমনি। পুজোর লেখা লিখতে লিখতে আঙুল টনটন। বনগাঁ এসেই হুকুম—চট করে গরম জল করে আন তো কল্যাণী। কল্যাণীও ছোট্ট মেয়ের মত ছুটবে গরম জল করতে। আঙুল গরম জলে সেঁকে আরম্ভ করতে বসবেন বিভূতিভূষণ। কল্যাণী বসবে পাশে। তারপর লেখার গল্প শুনবে। কত গল্প লেখার আগেই ওকে বলে মকশ করা হয় বিভূতিভূষণের। কল্যাণীকেও লেখার মশলা দেন।

ষোড়শীকান্ত লক্ষ্য করছেন, তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন যেন একটু একটু করে রূপ নিচ্ছে তাঁর সন্তানের মধ্য দিয়ে। আর তা ঘটছে যে জাদু স্পর্শে সে জাদু ওই বিভূতি। অমন একটা লোক আপন হল, গর্ব হয় বইকি। যেন তাঁর ঘরের ছেলে।

বিভূতি? কে বিভূতি? ষোড়শীকান্তর শ্বশুর নাম শুনেই ভুরু কোঁচকালেন। ভদ্রলোক দীর্ঘকাল পশ্চিমে চাকুরিতে কাটিয়েছেন। অবসর নিয়ে ফিরেছেন সম্প্রতি। দেশের খবর কালেভদ্রে যা পাওয়া। তা জামাতা বাবাজীর এমন আপন হয়ে গেল আবার কোন্ বিভূতি? নামটা যেন কেমন লাগছে। ষোড়শীকান্ত ওই আপন-হওয়া লোকটির কুল-শীল-খ্যাতি-পরিচয় ব্যাখ্যান করছিলেন শ্বশুরমশাই সমীপে। হঠাৎ বাধা পেলেন।—আরে থামো, থামো। বলে কার কাছে কার কথা! আর বলতে হবে না। কুঞ্চিত-ভ্রূ হাসির ছটায় ছড়িয়ে গেল সারদাকান্ত চক্রবর্তীর।

ইনিই সেই খেলাত ঘোষ এসটেটের ভাগলপুর কাছারির সুপারিনটেনডেনট সারদাকান্ত চক্রবর্তী, আরণ্যকের সারদাকান্ত, যাঁর অধীনে অ্যাসিসট্যানট ম্যানেজারের চাকরি করতে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ আর ফিরে আসেন পথের পাঁচালী লিখে। যোগাযোগটা বিচিত্রই বটে। ঘুরে ফিরে, কোথা থেকে কোথায়, আবার এক জায়গায়! না, পৃথিবীটা যে যথার্থই গোল তাতে আর গণ্ডগোল রইল না সারদাকান্তর। বিভূতি-ভূষণের চরিত্রগুণে সশ্রদ্ধ সারদাকান্ত এবার জামাইকেই কতো টুকরো টুকরো গল্প বলতে লাগলেন ও'র সম্পর্কে। অবাক ষোড়শীকান্ত। জানার কতটুকুই বা সুযোগ পেয়েছেন এই ক'দিনে!

অবাক বিভূতিও। নির্জন অরণ্য-জীবনে এই সারদাকান্ত তাঁকে ধন্য করেছেন স্নেহ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, অভিভাবকত্ব দিয়ে। তিনিই কিনা মায়া-কল্যাণীদের দাদু! তাহলে! চমকে উঠলেন একটা কথা মনে পড়ায়। এই সারদাকান্তর কাছেই ও'র তন্ত্র-

সাধক জামাতার কথা শুনে 'তারানাথ তান্ত্রিক-এর গল্প'টা লিখে ফেলেছেন। আর কেবল লিখে ফেলা কেন, ছাপিয়েও বেরিয়েছে 'জন্মমৃত্যু' গল্পগ্রন্থে। তাহলে এই কি সেই? ষোড়শীকান্তকেই তিনি তারানাথ তান্ত্রিক করে ছেড়েছেন? ফ্যাসাদ দ্যাখো। গল্পের খাতিরে শুরুতেই যে তারানাথ সম্পর্কে বেশ কিছু রসঘন কটাক্ষ রয়েছে! না, এখান থেকেও এবার পাততাড়ি গুটাতে হবে। বাস্তব চরিত্র নিয়ে কাহিনীতে কারবার করতে গিয়ে অনেক গুনাগার তাঁকে গুনতে হয়েছে। আর লুকোচুরিতে লাভ নেই। সামনাসামনিই যা হোক, হেস্তনেস্ত। আভাসে কিছুটা বলে রাখলেন কল্যাণীদেরও। তারপর নিজেই এনে ষোড়শীকান্তর নাম লিখে বইখানা ও'র হাতে দিলেন।

কী কাণ্ড। ষোড়শীকান্ত অবাক। বইয়ে শ্মশানচারিণী ভৈরবীর কাছে বসে শব-সাধনার ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলী থেকে বহু ব্যাপারই তো তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে অভিন্ন। কটাক্ষগুলি? থাক না, রসসৃষ্টি তো হয়েছে। সাহিত্যরসিক ষোড়শীকান্ত বরং কৌতুকই অনুভব করেন।

আর একজনও কৌতুক বোধ করছিল আড়ালে। কল্যাণী। কেমন মজা, বাঁধন ছেঁড়া অতো সোজা!

তাই বলে কি সহজ বাঁধা! বড় ছুটিতে ঘাটশিলা এবং তথা হতে যথা ইচ্ছে। ছোট ছুটির মধ্যে কিছু সময় বরাদ্দ বারাকপুরের জন্য। বনগাঁ শহর, কল্যাণীদের বাসা যেন পথের পাশের পান্থশালা। একটু ঘুরে আসবার নাম করে বেরোলে কখন বিকালটা ও'কে পথপ্রান্তরের হাতছানিতে ডাকে। একটু ঘুরে আসচি কল্যাণী। কল্যাণী এগিয়ে আসে। এদিক-ওদিক তাকায়। কেউ নেই। হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। বলে, গা ছুঁয়ে বলে যান, ঠিক সাতটার সময় ফিরে আসবেন।

কল্যাণীর হাতখানা মুঠির মধ্যে! বিভূতিভূষণ কথা দেন, কণ্ঠি দুলিয়ে পথে পা বাড়ান। কল্যাণী পিছু ডাকে। শুনুন, কথা না রাখলে কী হবে জানেন, আমি মরে যাবো।

ধ্যেৎ, যতো বাজে বকা হচ্ছে। আচ্ছা, একটু দেরি করেই আসা যাবে, দেখি কী হয়।

কল্যাণীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন ও'র কথা শুনে। তবে সে মেঘ কাটতে দেরি হয় না। দেখা যায় সাতটা কেন, একটু আগেই সেদিন ঘরে ফেরেন পথচারী। পথের প্রেমিক ঘরের প্রেমে ফেরেন। কল্যাণী ও'র সেবাযত্নে হৃদয় ঢেলে দেয়। কিন্তু ও যত করে, লোকটি ততো বলেন, সেবা করে মায়া, সে আমার এই করে দেয, তাই করে দেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। খই ফোটাবেন মায়ার নামে। যেন কল্যাণী কী আর করছে তেমন। কল্যাণীর মুখ ভার হয়। বক্তা কৌতুক অনুভব করেন। সব সময় তা চলে না। মনে হয় অযথা দুঃখ দেওয়া হচ্ছে। কাছে ডেকে কানের কাছে বলবেন, জানিস, তোর কাছে যা পাই তা কেউ দিতে পারে না। কলকাতা গিয়েও তোর কথা ভুলতে পারি না। সব সময় মনের মধ্যে কল্যাণী আর কল্যাণী।

কল্যাণী ঠোঁট ওল্টায়। থাক থাক, বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না। দেখতে পারেন না আমাকে। তাই এসেই পালাই পালাই করেন। একটু আড়াল হলেই বারাকপুর চলে যান।

বিভূতিভূষণ অপ্রস্তুতের হাসি হাসেন। কথা দেন, সামনের ছুটিতে একটানা অনেক দিন থাকব।

মুশকিল বিভূতিভূষণের। কল্যাণী ইতিমধ্যেই এক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে, সবার থেকে আলাদা হয়ে যেন নিজ বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় সমাসীনা। এত অল্প বয়সে, মনের অমন গভীরতা ও প্রসার, কথা গুছিয়ে বলবার অমন আশ্চর্য মুনসিয়ানা, কেবল কথা কেন,

কথায় সুর বসিয়ে কেমন মিষ্টি গান ফোটে তার কণ্ঠে! ওর মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে ওর দু'চোখে যেন মুক্তির আলো দেখতে পান বিভূতিভূষণ। কি করে তিনি ফিরিয়ে দেবেন ওর আমন্ত্রণ? মুশকিল তবু।

কল্যাণী বাঁধে বনগাঁয়, ভিটের বকুলগাছটি টানে বারাকপুরে। আবার পথ চেয়ে বসে থাকে ঘাটশিলায় দুটি অবুঝ প্রাণ—উমা আর শান্ত। ছোট মামা-মামী সেখানে থাকলেও মাঝে মাঝে 'বড়দা'কে না দেখলে কান্নাকাটি করে। গেলে আর ওরাও ছাড়তে চায় না। 'বড়দা' ওদের কচি হাতের আঁকশি থেকে ধুতির খুঁট পারেন না ছাড়াতে। মাঝে মাঝে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন মেস-এ। বসে থাকা তো সম্ভব নয় ওদের কোলে করে। স্কুলে যাওয়ার সময় সঙ্গে করেই নিয়ে যান। খেলাত স্কুলেও দুষ্টু ছেলের সংখ্যা কিছু কম নয়। মেয়ে মাস্টার আছেন একজন, ক্লারিজ সাহেবের কী রকম যেন কুটুম্ব মিস ব্লানট, নিচের ক্লাসে ওয়ারড বুক পড়ান। অবসর তাঁরই বেশি, তাঁর কাছে ওদের রাখেন বেশি সময়। কখনো বা নিজে ওদের নিয়েই ক্লাসে যান। তাতে পড়ানোর নানা বিঘ্ন, নানা উৎপাত ছাত্রদের। কেউ চকোলেট দেয়, কেউ জলছবি, কেউ লাল ফিতে। উমা লাজুক, বড় মামার গায়ের কাছে থাকে। শান্তটা দুরন্ত, জুটে যায় দুষ্টু ছেলেদের ভিড়ে। অগত্যা মাঝে মাঝে মেস-ঘরে ওদের দু'জনকে তালাবন্ধ করে দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে স্কুলে আসেন। আবার চাবি খোলেন স্কুল থেকে ফিরে। দারোয়ান দুপুরে খাবার দেওয়ার সময় চাবি খুলে দেয়। খেয়ে-দেয়ে উমা ঘুমিয়ে পড়ে, শান্তও শেষটা অনুসরণ করে দিদিকে। তবু তারা 'বড়দা'র কাছে থাকতে চায়, 'বড়দা'কে চায়!

কল্যাণীকে বললেন, মেস-এ এসো না।

সে কেমন করে হবে? ছেলেদের মেস না!

তুমিও তো ছেলেমানুষ। উমা তো থাকে।

কেমন করে থাকে সে কাহিনী শুনে ঘাবড়ে গেল কল্যাণী।—ওমা আমাকেও অমনি তালাবন্ধ করে রাখবেন নাকি।

হেসে ফেললেন বিভূতিভূষণ।—না না, মায়া আছে না, তার কাছে থাকবে গিয়ে।

কল্যাণী রাজি হল, কিন্তু হল না যাওয়া। ক'দিন পথ চেয়ে চেয়ে এক চিঠি ছাড়লেন বিভূতিভূষণ, উনিশ শ' চল্লিশের আগস্ট—'তোমার আসবার কথা ছিল ও-সপ্তাহে, রোজ চাবিটা দারোয়ানের কাছে রেখে যেতাম আর রোজ ভাবতাম আজ গিয়ে দেখবো ঠিক কল্যাণী এসেচে। তোমার জন্য রোনাট্রি চকলেট কিনে রাখ্‌তুম, ঘরে ফিরে রোজ নিরাশ হয়ে একদিন রাগ করে চকলেট নিজেই খেয়ে ফেললাম।' শেষে লিখলেন, 'তোমায় একদিন পত্র লিখবো ভেবেছিলাম; রাগ করে লিখিনি—এখন সত্যি আর থাকতে পারলুম না।'

চিঠি পেয়েই কল্যাণীর ক্ষমা প্রার্থনা—'আপনার কাছে কত অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন না?'

ব্যস, সব ঠাণ্ডা। উল্টো মনে কষ্ট হয়, রুক্ষ কথা বলে ফেললেম! অমন করে লিখবে না, দুঃখ পাই কল্যাণী।

কল্যাণী মজা পেয়ে যায়। বলে, দুঃখ না ছাই। মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখান যেন চিনতেই পারেন না আমাকে।

আমি তোমাকে চিনি না এমন ব্যবহার করি? বোলো না ও কথা কল্যাণী, অমন করে বললে আমার মনের কোথায় বাজে তুমি বুঝবে না তা।

তাহলে আমার কোনো কথা রাখেন না কেন?

কোনো কথা? কোন্ কথা বল কল্যাণী।

নামের সঙ্গে 'শ্রী' লেখেন না কেন চিঠিতে। কতো বলেছি 'শ্রী' দেবেন। দেন?

শ্রী তো লক্ষ্মীর প্রতীক। আমি লক্ষ্মীছাড়া-ঘরছাড়া—আমার ওতে মানায় কি?

একদিন তো মানাতো!

কিছু কি অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে কল্যাণী? ওর দিক চেয়ে থেকে হার মানলেন বিভূতিভূষণ। একটানা একুশ বছরের লক্ষ্মীছাড়া জীবনে লক্ষ্মীর ছাপ পড়ে। প্রতি চিঠিতেই নামের আগে বড় করে 'শ্রী' লেখা শুরু হল, আবার মাঝে মাঝে চিঠি শেষে পুনশ্চ দিয়ে বা বন্ধনী দিয়ে লেখেন, ''শ্রী' ছাড়া লিখি না, তুমি সেই বলেছিলে তার পর থেকে কোথাও না—ভাবি কল্যাণীর অনুরোধ, না রেখে পারি?'

অনুরোধ কল্যাণীর কি কেবল একটিই? সতের ভাদ্র তার জন্মদিন। অনুরোধ, 'আসবেন? কথা দিন। নাকি রাগ করেছেন চিঠি দিতে দেরি হল বলে?'

এই এক সমস্যা। বিভূতিভূষণ নিজে সপ্তাহে অন্তত একখানা চিঠি দেবেনই। আর তাও সুদীর্ঘ। কল্যাণীর কাছেও পত্রপাঠ চান উত্তর। তা হয় না। বিভূতিভূষণ দু'পাতা লিখবেন একটি অক্ষরও না কেটে, একটি কমাও বাদ না দিয়ে। আর কল্যাণীর দু' লাইন লিখতেই ভয়ে ঘাম ছাড়ে। একটু ভুল হলে স্কুল মাস্টারি। স, ন, র, ইত্যাদির কোনটির বানান ভুল হলেই চিঠি!—'র'-এর ব্যবহার ভুলে যাও। আমার চিঠি পেয়েই দশ বার প্রত্যেক বানানটি আয়ত্ত করে ফেলো কিন্তু, কেমন তো? (কল্যাণী ভাবচে, উঃ ভারি দেখচি স্কুল মাস্টারি!) জল পড়ে, মনে পড়ে, কাপড় পরে।

অমন চিঠির পরে উত্তর জোগায় না কল্যাণীর। তবু না লিখে পারে কই। জন্মদিনে ওই মানুষটি না এলে পুণ্য প্রণাম হবে না তার। একান্ত অনুরোধের চিঠি তাই।

চিঠি পেয়েই উত্তর দিলেন বিভূতিভূষণ, ছয় ভাদ্র, তের শ' সাতচল্লিশ।—'নিশ্চয়ই যাবো তোমার জন্মদিনে। তোমাদের সাদর নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারি কল্যাণী? অল্প দিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েচে—এখন মনে হয় যেন কতদিন থেকে তোমাকে জানতাম; বেলুকে জানতাম, মায়াকে জানতাম, ষোড়শীবাবুকে জানতাম। কি জানি কেন এমন হয়!

তারপরই এক ঝিলিক অভিমান, 'তোমার উপর রাগ করেছিই তো। নিশ্চয়ই করেছি। উচিত ছিল না তোমার একখানা চিঠি দেওয়া? কত আশা করে থাকতাম প্রতিদিন তা যদি জানতে! আমি মরে যাইনি কি করে জানলে? হায রে! আমি মরে গেলে কারই বা কি!'

ধরা পড়ে যান হৃদয়ের কাঙাল মানুষটি। এই ভুবনের পথে চলমান নিঃসঙ্গ পথের কবির একতারাতে কী কান্নার সুর বাজে তা বুঝলে কল্যাণী ওই চিঠির শেষ ছত্রটিতে—'আমার কেবল ভয় হয় বনগাঁ থেকে তোমরা যদি চলে যাও তবে কি দুঃখই পাবো! এমন বন্ধুত্ব চলে যাবে ভাবলে মন বড় খারাপ হয়ে যায়।—

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়—'

সেদিনের চিঠি পড়তে পড়তে দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল কল্যাণীর। এই বিরাট ব্যক্তিটির অন্তরে কী বিপুল বেদনার সমুদ্র! কেমন করে সে মুছে দেবে এত কান্না ও'র। কল্যাণী ভাবে আর ভাবে।

সেই জন্মদিনে তিনি এলেন, নতুন লেখা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' হাতে করে। বইটির প্রকাশকাল এক নবেমবর, উনিশ শ' চল্লিশ। ছোট ভাই নুটুকে উপহৃত। কিন্তু সে পরের কথা। বইটি তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। একটি বাস্তব চরিত্রকে ভিত্তি করে এবং মাতৃভূমি পত্রিকার সম্পাদকের বিশেষ দাবিতে লেখা এই

বইটির ইতিহাসও বিচিত্র। পরে তা বলা যাবে। মাতৃভূমিতে ধারাবাহিক বেরোবার পর বই আকারে প্রকাশিত হয় উনিশ শ' সাতচল্লিশের আশ্বিনের প্রথম দিন। তার আগেই প্রেসে তাগিদ দিয়ে সতের ভাদ্র কল্যাণীর জন্য বাঁধিয়ে এনেছেন এক কপি।

আরও একটা জিনিস ছিল বইটি ছাড়া। একান্তে ডেকে সন্তর্পণে হাতে তুলে দিতে হেসে ফেলল কল্যাণী। ওপাশে আড়ি পেতে ছিল বেলু-দনুর দল। কী লুকিয়ে দিলেন এই নামজাদা লোকটি? সবার জিদ, বস্তুটি দেখাতেই হবে। সামলানোর অনেক ব্যর্থ কসরতের পর কল্যাণীর হাত ফসকে দ্রব্যটি যখন বেরিয়ে পড়ল, সারা ঘর গড়াগড়ি হেসে।—একটি সাবানদানি!

জন্মদিনের বিশেষ সাজে কল্যাণীকে ও'র নতুন করে ভালো লাগে। পরদিন মঙ্গলবার স্কুলের জন্য কলকাতা আসতে হল, কল্যাণীর অনুরোধ ফেলে। বলে এলেন, কালই চিঠি দেবে, বৃহস্পতিবার পাই যেন।

বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় 'বারবেলা' ক্লাব থেকে মেসে ফিরে দেখেন, এসেছে কল্যাণীর চিঠি। সে কী আনন্দ! চিঠি হাতে নিয়ে বার বার করে পড়েন। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। মেস-এর ঠাকুর ভাত রেখে গেল, পড়ে রইল তা। প্যাড টেনে লিখতে বসলেন 'কল্যাণীয়াসু, তোমার এ চিঠিখানা কিন্তু ভারি চমৎকার লেখা হয়েচে। ছোট ছোট কথায় এমন সব ছবি, প্রাণরসে সিক্ত এমন সব চিন্তায় ও কল্পনায় চিঠিখানা ভরা যে একবার পড়লেই সব যেন শেষ হয়ে যায় না, বার বার পড়তে ভালো লাগে।' এর পর কল্যাণীর সাহচর্যে বনগাঁর ওই দিনটি কীভাবে কেটেছে তার বর্ণনা দিতে দিতে লিখলেন 'কেন যে তোমাকে ভালো লেগে গেল এত তা কি করেই বা বলি! অথচ তুমি ভাবো আমি তোমাকে দেখতে পারি নে—তাই না? মানুষ কি ভুলই করে! আমি কত সময় তোমার মুখ মনে করবার চেষ্টা করি, কিন্তু আবার দেখি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচ যেন! যার কথা বেশি ভাবা যায় তার মুখ শীগগির অস্পষ্ট হয়ে যায়, এ আমি জীবনে কতবার যে দেখলুম!'

দীর্ঘ পত্র শেষে পুনশ্চ—'জন্মদিনে বেশ সাজানো হয়েছিল তোমায়। কেমন চমৎকার দেখাচ্ছিল! কে বলে তুমি দেখতে ভালো না জিজ্ঞেস করি। সে মিথ্যে বলে বা তার চোখ নেই।'

প্রায় চিঠিতেই কল্যাণীকে লিখবেন, সবাই মিলে চলো বারাকপুর যাই। বনগাঁ এলে, খয়রামারির মাঠে, চাঁপাবেড়ের জঙ্গলে কিংবা নৌকো করে ইছামতী দিয়ে সাতভেয়ে তলার দিকে বেড়িয়ে আসবেন ওদের নিয়ে। একদিনের বদলে দুদিনও যদি সময় পান বারাকপুর যাওয়া চাই-ই। যাওয়া হয়নি ওদের নিয়ে। চিঠি দিলেন, এবার পুজোয় যেতেই হবে তোমাদের। আপন বলতে তো আর কেউ নেই আজ সেখানে, তবে কেন অত আকর্ষণ, কল্যাণী জানতে চায় চিঠিতে। উত্তরে বিভূতিভূষণ জানান—'আমার যখন তোমার বয়েস (সে যুগের কথা অবিশ্যি), তখন বনগাঁয়ের বোর্ডিং এ থেকে পড়ি, বারাকপুর ছেড়ে এসে মায়ের জন্যে বাবার জন্যে, বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরানো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্যে মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধহয় পথের পাঁচালীর উৎপত্তি।

'চিরকাল বারাকপুর ভালবাসি। কেউ নেই সেখানে আপনার বলতে, তবুও যে যাই সেখানে, সে শুধু বারাকপুরের প্রকৃতির টানে, কি জানি কি দিয়ে আমার মন বেঁধেচে ওখানকার পল্লী প্রকৃতি! যদি সম্ভব হয় একদিন পুজোর ছুটিতে তোমাদের ওখানে যাবো নিয়ে। আমার মনে হয়, তোমারও ভালো লাগবে।'

কল্যাণী জানতে চায়, বারাকপুরকে আমিও ভালোবাসি আপনার জন্মভূমি বলে। কিন্তু আপনি কি ভালোবাসেন আমার জন্মভূমিকে?

'নিশ্চয় বাসবো। তোমার যখন জন্মভূমি তখন সে আমার শ্রদ্ধার পাত্রী নিশ্চয়ই। তবে চোখে না দেখলে তো ভালোবাসা যায় না। একদিন সুতরাং দেখার আগ্রহ রইলো।'

ও'র একখানা ফটো চেয়েছে কল্যাণী।

বিভূতিভূষণ জানালেন, 'ফটো নিশ্চয় পাবে। আমার মনে আছে—তবে এই সময়টা বড় ব্যস্ত আছি বলে পরিমলকে দিয়ে ফটো তুলবার সময় পাচ্ছি নে। পুজোর সময় ঠিক পাবে।'

পুজোর সময়ের আরও অনেক দাবি আছে কল্যাণীর। তবু মেয়েদের মন সব যেন খুলে বলতে চায় না। অথচ মেয়েদের অত ছলাকলা বোঝেন না বিভূতিভূষণও। তিনি চিঠি দেন, "আচ্ছা, তোমার চিঠিতে 'পুজোর ছুটিতে যে আপনি—' এই পর্যন্ত লিখে বলেচ 'থাক সে বলবো না' ও কথার মানে কি? সত্যি কিছু বুঝতে পারিনি। পুজোর ছুটিতে আমি কি করবো বলেছিলুম? বলবে না কল্যাণী? আমি বুঝি রাগ করতে জানি নে, না? আমার ভারি কষ্ট হয়েচে ও কথা কেন লিখেচ 'আমার মত সামান্য মেয়ে কিজন্য আপনাকে তার কথা জানাবে' ইত্যাদি। কি কথা বল তো? কিছুই বুঝলাম না। কি করবো বলেছিলুম বলো তো? লক্ষ্মীটি, না যদি বলো রাগ করবোই—।"

চট করে কথার মোড় ঘুরিয়ে মানভঞ্জনে অবতীর্ণ দক্ষ কথার কারিগর, 'তোমার জন্যে ভাল কাঁচের চুড়ি নিয়ে যাবো। হাতের মাপ দরকার হবে না? সুতো দিয়ে হাতের মাপ পাঠালে কেমন হয়? এসব কারবার কখনও করিনি, জানা নেই মোটেই। তাই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য কোরো লক্ষ্মীটি।'

লোকটির অবস্থা ভেবে ব্যথা পায় কল্যাণী আবার কৌতুকও অনুভব করে। কৌতুক দেখছিল মায়া-বেলুরাও, কোথার জল কোথায় গড়ায়, দেখা যাক। ঘটনার এক দূরবিসর্পি পরিণতির দিকে সজনী-নীরদরাও নজর রাখছিলেন তির্যক হবে।

খ্যাতির শীর্ষবিন্দুতে উপনীত বিভূতিভূষণকে যেদিন বহু দুর্লভ রমণীহস্ত মালা পরাতে প্রস্তুত ছিল, সেদিন সেদিকে তাকাননি, আর সেই মানুষ আজ পঁয়তাল্লিশ বছরে পৌঁছে এক পল্লীশহরের অষ্টাদশীর হাতে চুড়ি পরাতে চান!

যাঁকে ঘিরে এত কৌতুক-কানাঘুষো, তিনি কিন্তু নির্বিকার। কল্যাণী ফটো চেয়েছে। পুজোর লেখাগুলি ছেড়েই পরিমল গোস্বামীকে পাকড়াও—জুতসই একটা ফটো তুলে দাও তো আমার। চেহারাটা যেন ভালো ওঠে বাপু। এতে তোমার আমার দু'জনেরই ইজ্জত জড়ানো জানবে।

পারপাস অনুযায়ীই পোজ এবং একসপোজার দেবেন পরিমলবাবু। তিনি কেবল কুশলী কথাকারই নন, দক্ষ শিল্পী, আলোকচিত্রশিল্পীও। হেতু জানতে চান অগ্রে। বিভূতিভূষণ জানালেন, এক তরুণীর জন্যে।

অ্যাঁ? কী বললেন? এক তরুণীকে উপহার দেবেন? চোট সামলে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন রসিক পরিমল গোস্বামী। কাজের কাজ আগে হোক। কালহরণ না করে ক্যামেরা প্রস্তুত করলেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের মৌখিক চেহারা দেখে চিন্তিত, দাড়িটা না কামিয়ে নিলে তো ভালো ফটো উঠবে না দাদা।

গালে খানিকক্ষণ হাত ঘষে বিভূতিভূষণ বললেন, না হে, এ দাড়ি তেমন বড় কই! তুমি তোলো ছবি।

পরিমল গোস্বামী রাজি হলেন না। ওতে মুখে কালো দাগ পড়বে। নিজের শেভিং সেট এনে দিলেন। শুধু কি তাই? দাদার অপটু হাতে রেজর চালাতে দেখে শেষটায় নিজেই ধরলেন তা। না, এতে কোন লজ্জা পাননি পরিমলবাবু। এই উদাসীন আপন-ভোলা মানুষটিকে সব সাহিত্যিকই একান্ত সুহৃদ জ্ঞানে ভালোবাসেন। ওঁর দাড়ি যে ও-রকমই থাকবে গালে, এটাই তো স্বাভাবিক। পরিমলবাবুর তো আর অচেনা নন লোকটি। তাঁর নিজেরই একটি উক্তি—'বিভূতিবাবু জুতো বাইরে রেখে ঘরে ঢুকতেন। আরো কেউ কেউ হয়ত তাই করতেন কিন্তু যেদিন বিভূতিবাবু আসতেন, সেদিন তাঁর জুতোই বাইরে থেকে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করত। আর কারো জুতোয় মালিকের পরিচয় বিশেষ থাকতো না। জুতো থেকে মাথা পর্যন্ত তাঁর সমান উদাসীনতা।' কে এসেছেন তা পরিমলবাবুর ছেলে হিমানীশ-শতদলরাও বাড়িতে ঢুকবার মুখে বাইরে ছেঁড়া জুতো দেখলেই ধরে ফেলত। যাক সে কথা। পরিমল গোস্বামী একসপোজার দিলেন। ফটোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটিরও একসপোজার ঘটল বন্ধু মহলে, পল্লবিত হয়ে।

সেবার পুজার সময় গোয়ালিয়র রাজদরবার থেকে আমন্ত্রণ এলো বিভূতিভূষণের। সেখানে সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন। মোহিতলাল, তারাশঙ্কর, সজনী, শৈলজা-নন্দরা যাচ্ছেন। ওঁদের কাছে মাফ চাইলেন বিভূতিভূষণ, যাওয়া তাঁর হবে না, পুজার ছুটিটা এবার কল্যাণীর কাছে প্রতিশ্রুত।

সজনীকান্ত রোমশভুরু কুঞ্চিত করলেন, ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার একটা চলছিল বইকি! জীবনে বোধহয় এই প্রথম পথের কবি পথের আহ্বান ফিরিয়ে দিলেন। ঘরের হাতছানিতে ধরা দিলেন পথের পাঁচালীকার।

বনগাঁ এলেন চলে। সঙ্গে কল্যাণীর কাঁচের চুড়ি তো বটেই, হালফ্যাশনের জিনিস মেয়েদের খোঁপার জাল আর কতকগুলি টিপ।—ললাট-তিলক!

ওদের নিয়ে গেলেন স্বগ্রাম বারাকপুরে। ইছামতীর তীরে চড়ুইভাতি। মায়া, কল্যাণী, বেলু, দনুরা সবাই গিয়েছে। যেন তীর্থস্থান। এ গ্রামের জলে স্থলে পত্রে পুষ্পে সেই ছোট্ট অপুর কৈশোর স্বপ্ন মাখানো। ধূলিতে যেন দুর্গার পায়ের ছাপ। কে যেন গায়—হলুদ বনে বনে/নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইক' মনে। বিভূতিভূষণ দেখান, ওদের আবেশ লাগে ঘুরে ঘুরে। এই সইমাদের হেলানগুড়ি চালতে গাছটা, ছোটবেলা এতে ঠেস দিয়ে বসে বাবার লেখা লুকিয়ে পড়া। ঘরের ডান দিকের ডোবাটি, বিলবিলে, তার পাড়ে বিশাল বকুল গাছটা—পথের পাঁচালীর বকুলগাছ। ওপাশের পোড়ো ভিটেয় মায়ের লাগানো সজনে গাছ, ওই বনশিমতলার ঘাটে আমরা নাইতুম। ঘাটের কাছে যেতেই থমকে দাঁড়ান। না, নেই সেই সলতেখাগি আমগাছটা। গায়ে সলতের মত দাগকাটা বড় বড় আম হতো ওই গাছটায়। ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে সে গাছ। পথের পাঁচালীতেও লিখেছেন এই সলতেখাগির কথা, সে ছিল অপুর অতি প্রিয় গাছ। বলতে বলতে চোখ ভিজে যায় বিভূতিভূষণের। ওঁর অবস্থা দেখে সঙ্গের সবাই হতবাক। কল্যাণীর ব্যথা বাজে ওঁকে দেখে।—কী হল আপনার! একটা গাছই তো, অমন করতে নেই।

'ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো নানা দিক থেকে। ওর তলায় ময়না-কাঁটা ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য মধুর সম্বন্ধ তাও নষ্ট হল!'

কল্যাণীও এবার নির্বাক। বিভূতিভূষণ বলে চলেছেন, 'সলতেখাগির সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানি করবে এবার হাজারি-কাকা।' সত্যিই চোখ দিয়ে ওঁর জল পড়ে গড়িয়ে। যেন আত্মীয় বিয়োগ ব্যথার অনুভূতি। দিনলিপিতেও

তাই লেখা 'আপনার নিকট-আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলুম।' তাঁর ক্ষোভ গ্রামের লোকদের ওপরে। 'এই যে এতদিনের সলতেখাগি যে ভেঙে গেল তার জন্যে তো পাড়ার একটি লোককে দুঃখ করতে দেখলুম না।'

ও'র সুরে সুর মিলিয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে সান্ত্বনা দেওয়াও কঠিন। তবু চেষ্টা করে কল্যাণী। বিভূতিভূষণের প্রশ্ন, 'পথের পাঁচালীতে এই সলতেখাগির কথা লিখেছি। লোকে কিছুদিনও কি ওকে মনে রাখবে না?'

দেখবেন, ঠিক মনে রাখবে, হাজারো লোক। অপুর সঙ্গে সবার প্রিয় হয়ে রইবে ওই সলতেখাগি। কল্যাণী আশ্বস্ত করে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি খুশি হয়ে ওঠেন বিভূতিভূষণ। কল্যাণী ভরসা পায়। আচ্ছা, আপনি এত ভালোবাসেন আপনার গাঁয়ের সব কিছুকে?

বাসি, কিন্তু আর কেউ বুঝল না এ গ্রামকে। কেউ এমন ভালোবাসলো না আমার বারাকপুরকে।

সবাই নির্বাক। এতটা আবেগ ওদের নেই। লোকটি দুঃখ পাচ্ছেন না তো এতে? হঠাৎ কী ভেবে কল্যাণী বললে, আপনি বুঝতে পারেন না, আমি কিন্তু খুব ভালো-বাসি আপনার গ্রামকে।

সত্যি বলছো! উচ্ছ্বসিত বিভূতিভূষণ। তোমার ভালো লাগে আমার বারাকপুর ইছামতী?

সত্যিই ভালোবাসি আপনার জন্মভূমিকে।

একটু থেমে কল্যাণী বলে, আপনিও তো চিঠিতে লিখেছেন, আমার জন্মভূমিকেও ভালোবাসবেন।

নিশ্চয় বাসবো, তোমার জন্মভূমি যে!

কথার গতি কোন্ দিকে মোড় নেয় অন্যরা তা লক্ষ্য করছিল এতক্ষণ। এবার হৈ-হৈ করে উঠল দলটি। বাঃ, চমৎকার, মেজদির জন্মভূমি বলেই বুঝি ভালোবাসবেন, আমাদের বলে নয়?

চমকে গিয়ে হার মানতে হল বিভূতিভূষণকে, ওদের আক্রমণে। কল্যাণী তো লজ্জায় আরক্তিম।

তারপর বিভূতিভূষণের আবৃত্তি—'অত চুপি, চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ!' এ নিয়ে কল্যাণীর অনুযোগ, আর কি কোন কবিতা নেই? গান গাইলো কল্যাণী, 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি যাই।' চড়ুইভাতি হল বনশিমতলায়, বুড়ি পিসিমার ছেলে নবীনবরণ আর মেয়ে উমারানী অর্থাৎ পাড়ার বুধো আর মানীও এসে যোগ দিল। তাদের সঙ্গে মিশে রান্না করল কল্যাণী কোমরে কাপড় বেঁধে। ঘাটেই পাতা পেতে খাওয়া-দাওয়া সারা। রাতের জ্যোৎস্নায় ইছামতীতে নৌকো ভাসিয়ে বনগাঁ ফেরা। সে রম্য অভিজ্ঞতার কথা ওদের ভুলবার নয়। কলকাতা এসে বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের কথা লিখে জানালেন কল্যাণীকে ছাব্বিশ কার্ত্তিক।—

'কল্যাণীয়াসু, তোমাদের কাছ থেকে এসে পর্যন্ত তোমার কথা সর্বদা মনে পড়চে। মন মোটেই ভালো নয়। বারাকপুরে সেই পিকনিক করার কথা বিশেষ করে সর্বদা মনে পড়চে—তুমি কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্না করচো, বনশিমতলায়, সেই তোমার চেহারাটা চোখে ভাসচে যেন। কি চমৎকার দিনটা কেটেছিল সেদিন বারাকপুরে! জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকোর বাইরে বসে আমাদের সেই নানা রকমের গল্প, সেই বাঁশি কি মধুর। জীবনের এই সব স্মৃতি মনের ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকে, তোমার

নতুন মনে তো আরও।

'সত্যি কল্যাণী, এত অল্প দিনের মধ্যে তোমার আমার মধ্যে এরকম বন্ধুত্ব কি করে গড়ে উঠলো, কতবার একথা ভেবেচি। এখন মনে হচ্ছে সবই ভবিতব্য। তুমি যেদিন আমার বাসায় অটোগ্রাফ আনতে যাও, সেদিনটি থেকেই এ বন্ধুত্বের প্রথম অঙ্কুর সকলের অলক্ষ্যে প্রথম ফুটেছিল। গল্পে উপন্যাসে এমন ঘটনা ঘটে, কিন্তু বাস্তব জীবনেও যে ঘটলো, তা আমার কাছেও সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা।'

এর পর চিঠির উপসংহারে কল্যাণীর পত্রপাঠ উত্তর দাবি করে লিখলেন, 'কিন্তু চিঠিতে কি হয়? দেখতে ও কথা বলতে ইচ্ছে করে বেশি। চিঠিতে তা কতটুকু পূর্ণ হয় বলো!'

তা তো নিশ্চয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা এবং কথা বলা যে সর্বদাই দরকার সে বিষয়ে কলকাতার সাহিত্যিকমণ্ডলীও একমত। তবে বিষয়টা ঠিক তাই কিনা, তাঁদেরও তা একবার ঠাহর করে দেখা দরকার যে!

উদ্দেশ্যটা ও'র কাছে উহ্য রেখে, বনগাঁয় একটা ছোটখাটো সাহিত্য-মজলিশের জন্য বলা হল। আয়োজনও হল ক'দিনের মধ্যে। বনগাঁর মিতে বিভূতি ও মন্মথদা এ ব্যাপারে উৎসাহী। কল্যাণীর কানুমামা তো খেটে গলদঘর্ম। সঙ্গে তাঁর বিভূতি-ভূষণের এক উদীয়মান ভক্ত চ্যালা চণ্ডীদাস। কল্যাণীর ভাই, ও'রা ডাকেন খোকা বলে। গভীর স্মৃতিশক্তি। একবার কিছু বললে বা ঘটতে দেখলে যে-কোন সময় সন-তারিখ-দিনক্ষণ সব নির্ভুল ফটোগ্রাফের মত তুলে ধরবার আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। ওই বিশেষ গুণটির জন্য বিভূতিভূষণ একটু বেশি স্নেহ করেন ওকে। সন-তারিখ বেভুল বিভূতিভূষণের পক্ষে ওই উদীয়মান শিষ্যটি যথেষ্ট দরকারী। তার মেজদি কল্যাণী বা বিভূতিভূষণের 'খোকা' বলে ডাকটি শুনলেই, সবকাজ ফেলে সে হাজির। মেজদির হুকুমমত সেও খাটছে দিবারাত্র। আব ঘরে মান্য অতিথিদের আসল সম্বর্ধনার ভার নিয়েছে কল্যাণী নিজে।

যে জিনিসটা বুঝতে এসেছিলেন, তা হয়ে গেল সজনীবাবুদের। সত্যিই কল্যাণী অন্য জাতের মেয়ে।

সেই কথাই সেদিন মোহিতলাল বলছিলেন সাহিত্যিক আড্ডায়, 'শিল্পী বলো, সাহিত্যিক বলো, সকল প্রতিভার মধ্যেই একটা দুরন্ত কান্না লুকিয়ে থাকে। আব নারী আসে নানারূপে সে বেদনা মুছে দিতে, কেউ কেউ ওই কাজটির জন্যে হৃদয় পর্যন্তও পণ করে বসে। তখন, দেহ-অর্থ-ঐশ্বর্য তুচ্ছ সব তার কাছে। বড় জয় তার, প্রতিভাকে বরমাল্য পরানো—এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে পৃথিবীতে।'

সজনীকান্তও ভাবেন, পথের পাশে, বাউলেরও বটের ছায়া আছে, কিন্তু বাউল বিভূতির কী আছে ওই কল্যাণী ছাড়া?

বিভূতিভূষণকে পাকড়াও করলেন সজনীকান্ত, পথের পাঁচালী তো শেষ হল, এবার ঘরের পাঁচালী শুরু করুন।

ঘরের পাঁচালী!

হাঁ, ঘরের পাঁচালী।

না, সজনীকান্তর কথায় আর কোন রাখ-ঢাক রইলো না। তিনি সরাসরি প্রশ্নে উদ্যত, আচ্ছা কল্যাণীকে আপনার কী মনে হয়?

কল্যাণী! বিভূতিভূষণের চোখমুখ যেন আলোকিত হয়ে উঠল ও-নামে। বললেন, দেবীর মতন মেয়ে।

বেশ তো, সেও আপনাকে 'দেব' ভেবে বসে আছে। সজনীকান্ত দ্ব্যর্থক। কুশলী

কথাকার বিভূতিভূষণের কষ্ট হল না ইঙ্গিতটা বুঝে নিতে। মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। কেউ কি জানে, এই নিয়ে ও'র হৃদয়ে কত দ্বন্দ্ব! কল্যাণীকে তিনি জানেন, জানেন নিজের মনকেও। কিন্তু দু'জনের বয়সের এই যে বিরাট ব্যবধান, কী দিয়ে তা ঘোচাবেন? সমস্যাটার কোন সহজ সমাধান না পেয়ে একদিন প্ল্যানচেটে বসলেন বাবার মত নিতে। মহানন্দর আত্মা নাকি অমত করলেন বিয়েতে। তবে আর এগোনো নয়। কিছুদিন চুপচাপ রইলেন।

তাই বলে সজনীবাবুদের চুপ করে বসে থাকবার কথা নয়। বসে থাকলেন না বনগাঁয় সতীশমামা, মন্মথদা, মিতে বিভূতিরাও। কথাটা ষোড়শীকান্তর কানেও এলো।

তিনিও ভাবছিলেন না তা নয়। বিভূতিভূষণকে আত্মীয়রূপে পাওয়া যে-কোন বাঙালী পরিবারের গৌরব। কিন্তু, আশঙ্কা, তা হয়ত পাওয়া সম্ভব নয়। অত সহজ, সরল আর হৃদয়বান বলেই সবাই তাঁকে চাইলেই পায়। বিমুক্ত মন বলেই সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাই বলে বাঁধতে গেলেই কি ধরা দেবে?

তাছাড়া কল্যাণী? সে কী চায়? পিতা ষোড়শীকান্তর দ্বিতীয় ভাবনা, বিভূতি পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে, আর কল্যাণী তাঁর আঠারো বছরের মেয়ে মাত্র।

ভাবনা আরও কত। কল্যাণী তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। প্রথমা মায়া এবার বি. এ. পাশ করেছে, এম. এ. পড়তে চায়। তার আগে তো নয়ই, এমনকি বিয়েতেই তার আপত্তি। কল্যাণীও যদি সে-পথ ধরে শেষটায়। যদি বলে.. । আসল কথা, কল্যাণী কী চায় জানা। ভাবতে ভাবতে ষোড়শীবাবুর কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ে, তাঁর ও কল্যাণীর জীবনের সঙ্গে যা জড়িত।

সে উনিশ শ' চব্বিশ সালের কথা। তখন থাকতেন বারাসতে। এত ঘর-বাড়ি ছিল না সেদিন শহরে। বিজলীবাতিহীন প্রায়ান্ধকার সেই মফস্বল শহরের এক প্রান্তে বারাসত শ্মশানভূমিতে তখন তান্ত্রিকদের একটা আড্ডা জমত। তান্ত্রিক ষোড়শীকান্ত তার অন্যতম। কোথা থেকে এক ভৈরবী এলেন সেখানে। তাঁর গতিবিধি সাধন-ভজনের মধ্যে একটা কেমন বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে ষোড়শীকান্ত বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। ষোড়শীকান্তকেও যেন স্নেহদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন ভৈরবী। অথচ দীক্ষা দিতে রাজী নন। কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন ষোড়শীবাবু। যেদিন চলে যান, সব শুনেটুনে ষোড়শীবাবুকে বললেন, তোর ছোট মেয়েটা সৎপাত্রে পড়বে। আর কিছু চাইতে দিলেন না ভৈরবী।

ছোট মেয়ে বলতে তখন কোলের কল্যাণী, তিন বছর বয়স। ষোড়শীকান্ত অবশ্য রমা বলে ডাকতেন।

ঠিক একটি বছর পর। ও'দের বাসাবাড়ির কাছেই একটা নির্জন বাগানের মধ্যে টলটলে জলের পুকুর। রোজ যান না, কিন্তু সেদিন কী মনে কবে কল্যাণীকে নিয়ে তার মা সাধনা দেবী ওই পোড়ো বাগানের পুকুরে গেলেন স্নান করতে। মা জলে, পাড়ে কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে চার বছরের মেয়ে কল্যাণী। ডুব দিয়ে উঠেই চমকে গেলেন সাধনা দেবী। ঝাঁকড়া চুল, সিঁদুর-লেপা কপাল, হাতে ত্রিশূল এক পাগলী যেন ঠিক কল্যাণীর পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। মেয়েটারও দ্যাখো কাণ্ড, কোন ভয়ডর নেই, খুশি খুশি ভাবে ওর কাছ ঘেঁষে রয়েছে। তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে ছুটে এলেন মা। পাগলী হেসে বললে, ভয় নেই, এই পুঁটি মেয়েটাকে দেখতে এসেছিলুম। ওকে যত্ন করিস, ওকে ইচ্ছেমত বড় হতে দিস, কখনও দুঃখ দিবি নে।—বলেই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হল সে মূর্তি।

সাধনা দেবী ঘরে এসে সব ব্যাপার বললেন।

পাগলী! ষোড়শীকান্তর বুঝতে কষ্ট হল না কে ওই পাগলী। সেই থেকে তিনি তাঁর এই মেয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। আজ সে-সব কথা তাঁর মনে পড়ে। বারাসতে ভৈরবী বলেছিলেন, ও তোর অন্য জাতের মেয়ে। দেখবি তোর ঘরে মানের ছোঁয়া আনবে ওই মেয়ে। সব ভেবে ষোড়শীকান্ত স্থির করলেন, কল্যাণী যদি চায়, হবে। ওর বিভূতির মত তিনি চাইতে পারেন না।

সেজন্যে অবশ্য ষোড়শীকান্তর ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। এদিকে মেয়েমহল, ওদিকে সাহিত্যিকমহলে সাজো-সাজো রব। সজনীরা চান ষোড়শীর ঘরের 'ষোড়শী'টির খবর।

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বিভূতিভূষণ বন্ধুদের বোঝাতে চাইলেন, তোমরা ভুল করছো। মেয়েরা মায়ের জাত, মায়া-মমতা ওদের সহজাত। সেবাপরায়ণাতাকে ভালোবাসা বলা অন্যায় হচ্ছে তোমাদের।

কিন্তু ও'রাও নাছোড়। কলকাতা-বনগাঁর সবাই জানে। জানেন ষোড়শীকান্ত, তাঁর স্ত্রী সাধনা দেবী, এমনকি কল্যাণীও। আর ইনি বলছেন ভুল করছি আমরা?

ভুল যে নয়, সে-কথা ইদানীং উপলব্ধি করছিলেন বিভূতিভূষণও। দুজনেরই মেলামেশায়, আচরণে যে-সত্য সহস্রদল পদ্মের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে হৃদয়ে, সে খবর ও'র চাইতে আর বেশি কে জানে! তবু, সত্য যত সুন্দরই হোক, সব সময়ই তার পরিণাম সুখকর না হতেও পারে। নিবিড় সত্য বলেই তো আরও একটা যন্ত্রণাদায়ক চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় মানুষকে। কাছে গেলে প্রাণের পাত্র পূর্ণ হয় জেনেও দূরে ঠেলে দিতে হয় অনেক ভালো লাগা. ভালোবাসাকে।

কল্যাণী ভাবে, সত্যিই কি সে পাবে বিভূতিভূষণকে! তার মত সামান্য মেয়ের কী শক্তি আছে ও'কে বাঁধবে?

বিভূতিভূষণ ভাবেন. যৌবনবতী কল্যাণী কেন বরমাল্য দেবে এই প্রৌঢ়ের গলায়? দিলেও কি সইবে তাঁর অত সুখ!

ভাবনার যখন আর খেই পান না. তখন একদিন চলে এলেন বনগাঁয়, সেই কল্যাণীরই সঙ্গে পরামর্শ করতে। বললেন, চলো একটু বেড়িয়ে আসি শহরের বাইরে কোথাও।

বাইরে যেখানে আদিগন্ত শ্যামল, চারদিকে ঝাড়ে ঝাড়ে ঘেঁটু ফুলের মেলা, তার মধ্যে বসলেন দুজনে। এসেছেন এখানে আরও অনেক দিন' কিন্তু আজ অন্য মনে. অন্য কারণে। এক চরম মুহূর্ত কাঁপছে ও'দের ঘিরে। নিস্তব্ধতা। কিছু পরে বিভূতিভূষণই শুরু করলেন. ওদের কথা নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ কল্যাণী?

কল্যাণী মাথা নিচু করে আনমনে একটা ঘাসের ডগা কাটছিল আঙুলে। মুখ না তুলেই বললে. ওরা তো সত্যি কথাই বলছে।

চকিতভাবে ওর মুখের দিকে চাইলেন বিভূতিভূষণ। শরীর-মনে শিহরণ জেগে ওঠে ও'র মুখে এ-রকম কথা শুনলে। তবু কতকগুলো কথা আজ তাঁকে বলতেই হবে। মন স্থির করে নিলেন। বললেন. আমার সব কথা শুনে. জেনে, তারপর তুমি আবার ভেবে দেখো লক্ষ্মীটি।

একবার নয়. হাজার বার ভেবে দেখেছি।—কল্যাণীও নিজেকে দৃঢ় করে নিয়েছে আজ।

তবু আমার কিছু বলবার আছে।

কিছু কেন? কিছুই না বলেও তো 'না' বলা যায়।

কী বলছ কল্যাণী? তোমায় 'না' বলতে ডেকে এনেছি! কণ্ঠ আড়ষ্ট। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। আস্তে আস্তে শুরু করলেন, জীবনে কত দুঃখ পেলাম। সেই গৌরীর মৃত্যুর পরে আর আমি ঘর বাঁধতে চাইনি। শান্তি তাতে পেয়েছি তা নয়। তবু মনে হয়েছে সে-সুখের অধিকার বুঝি নেই আমার। যখনই ভুল করে হাত বাড়িয়েছি, আঘাত পেয়েছি। তারপরে একদিন তোমায় পেলাম। তুমি আমায় সব সুখের অধিকারী করেছ। তোমায় আমি দুঃখ দিতে পারবো না কল্যাণী। এই চেয়ে দ্যাখো!—

কল্যাণীর হাতখানা মাথায় টেনে ধরে বললেন, দ্যাখো এই চুলগুলো সরিয়ে, ভিতরে সব সাদা।

কল্যাণী হাত সরালো, মুখ ঘোরালো, চুল দিয়ে হৃদয়ের মূল্য বিচার করতে আমি জানি না। ও আমায় বলবেন না।

বিভূতিভূষণ তবু বলে যাচ্ছেন, তুমি ঠিক বুঝছো না কল্যাণী। অনেক বয়েস হয়েছে আমার। কে জানে, তোমাকে ফেলে হয়ত অনেক আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। সে-দুঃখ তোমাকে দিতে চাইনে কল্যাণী।

কণ্ঠ আর্দ্র বিভূতিভূষণের।

জল কল্যাণীর চোখেও। হাতের উল্টোপিঠে চোখের পাতা মুছতে মুছতে বললে, সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনায়, আজকের সত্যকে অস্বীকার করবেন? ফিরিয়ে দেবেন ভালোবাসাকে?

ফিরিয়ে দেবো? হাতখানা ওর টেনে নিলেন নিজের হাতের মুঠোয়। বললেন, জানো কল্যাণী, মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের বংশটা বোধহয় শেষ হয়ে গেল। নুটুকে বিয়ে করালেম, আজও কোন সন্তান এলো না ওদের। একটা ধারার অবলুপ্তি ঘটছে, দেখে যেতে হবে। আজ যখন জীবনে তুমি এলে, বেশি করে বাজছে সে দুঃখটা। কিন্তু মনে হচ্ছে, বড় দেরি করে ফেলেছি আমি, বড় দেরি...!

ও'র মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিল কল্যাণী। এবং শুনতে শুনতে কী এক স্বপ্নে, সংকল্পে, যেন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। বললে, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?

করি। কিন্তু তিনি তো দুঃখের টিকা পরিয়েই আমায ঘর ভেঙে পথে নামিয়েছেন।

তবু যখন বিশ্বাস হারাননি, দেখবেন তিনিই সব আশা পূর্ণ করবেন একদিন।

চমকে উঠলেন বিভূতিভূষণ, তুমি বলছো কল্যাণী? সত্যি?

মুঠির মধ্যে ওর হাতটা নিয়ে ঝাঁকুনি দিলেন বিভূতিভূষণ।

হাতটা ছাড়ুন, আপনাকে একটা প্রণাম করি।

গলায় আঁচল জড়িয়ে সেই নির্জন সবুজের মধ্যে ভক্তিমতী কল্যাণীব ভালোবাসা লুটিয়ে পড়ে তার নবীন দেবতার চরণপ্রান্তে।

ঘরে ফিরে আবার প্ল্যানচেটে বসলেন বিভূতিভূষণ। এবার এলেন মা মৃণালিনীর আত্মা। মৃণালিনী মত দিলেন এ বিয়েতে। ব্যাস, সবুজ সংকেত।

এবার যুগ্ম প্রণাম, মিলিত শুভাশিস কামনার দিন। বনগাঁয় বিজয়ার দিন কল্যাণী-বিভূতিভূষণ দু'জনেই নবজীবনের শুভযাত্রার আশীর্বাদ চেয়ে প্রণাম করলেন ষোড়শীকান্ত-সাধনা দেবীকে। কল্যাণীর মা সাধনা দেবী বিভূতিভূষণের চাইতে দু'তিন বছরের ছোটই হবেন। সংকোচ ছিল বইকি ও'র প্রণাম নিতে। তাই বলে এদিন তো আর দূরে সরে থাকবার নয়। সামনে এসে দাঁড়ালেন, ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ওদের শুভযাত্রার সংকল্পকে।

ষোড়শীকান্ত পঞ্জিকা দেখলেন। তের শ' সাতচল্লিশের সতের অগ্রহায়ণ, ইংরাজি তিন ডিসেমবর, উনিশ শ' চল্লিশ, গোধূলি লগ্নে বিয়ে।

দু'বছর আগে এক অগ্রহায়ণে দু'জনে পরিচয়, আজ আর এক অগ্রহায়ণে দু'জনের পরিণয়। আনন্দ আজ দু'জনেরই। কল্যাণীর প্রেমকে অগ্নিসাক্ষী করে বরণ করতে বিভূতিভূষণও প্রস্তুত।

প্রস্তুত? বিয়ের ঠিক আটদিন আগেকার, আট অগ্রহায়ণের কল্যাণীর কাছেই লেখা তাঁর চিঠিখানা তাহলে আদ্যোপ্রান্ত পড়ে দেখতে হয়।—

৪১, মির্জাপুর স্ট্রিট
কলকাতা, রবিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৯৪০

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এবারকার পত্রখানা চমৎকার হয়েচে কল্যাণী। শেষের কবিতাটি কার—রবীন্দ্রনাথের? কোথায় যেন দেখেচি, অথচ ঠিক মনে করতে পারচি নে! কানু শনিবারে বা শুক্রবারে এখানে এসেছিল, সে বোধহয় রবিবার বনগাঁ যাবে। তার কাছে কয়েকটি দরকারী কথা বলে দিয়েচি। আমার অত্যন্ত ভয় হচ্চে যত বিয়ে এগিয়ে আসচে। আমি রইলুম কলকাতায় বসে, নুটু বসে রইল ঘাটশিলায়। কাজকর্মের কিছুই ঠিক হোল না এখনো। অনেক কিছু অনুষ্ঠান আছে বিয়ের, পিঁড়ি চিত্র করা, শ্রী গড়া, ডালা সাজানো এসব কে করবে বুঝতে পারচি নে। কানুকে বলে দিয়েচি বিভূতি মুখুজ্যেকে বলে কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা ঠিক করতে।

আমারও খুব আশ্চর্য মনে হয় তোমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সব কথা ভাবলে। এখন মনে হচ্ছে হয়তো অনেক জন্মের বন্ধন ছিল তোমার সঙ্গে—নয়তো এমন হবে কেন? কল্যাণী, তুমি আমার অনেক দিনের পরিচিতা, এবার এত দেরিতে দেখা হোল কেন জানি নে, আরো কিছুকাল আগে দেখা হোলে ভাল হোত। যাক, তার আর কি করা যাবে—ভবিতব্য সেই মুহূর্তে আসবে যে মুহূর্তে তার সময় হবে। আমি এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের আয়ুদ্বারা মানুষের বৃহত্তর জীবন মাপা যায় না, এ একটা বিরাট বৃত্ত, হাজার হাজার বছর এর পরিধি। তুমি নেই, আমি নেই। আছে তোমার আত্মা, আমার আত্মা—লক্ষ বছর আগেও তাদের স্থিতিকাল। সে বিরাট 'ভিশন' দিয়ে জীবনকে যে দেখচে, জীবনকে সত্যিকার সে-ই চিনেচে।

আমি তোমার সঙ্গে হৃদয়হীন ব্যবহার করবো কেন জীবনে? তা বুঝি কেউ করে? আমি তোমায় ভালবাসবো যেমন বাসি—স্নেহ করবো যেমন করি। এ থেকে এক তিল ভালবাসা কমবে না, বাড়বে বই কমবে না। তুমি ভালবেসে আমার ঘরে আসতে চাইচ, তোমার কত ভাল পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারতো—কিন্তু তা যখন তুমি ফেলে আসতে চাইচ—তখন তোমার ভালবাসার মান আমায় রাখতে হবে বইকি। তোমাকে ভালবাসি ও স্নেহ করি বলেই বিবাহে মত দিয়েছিলুম। নইলে কেউ কি আমায় আবার বন্ধনের মধ্যে ফেলতে পারতো?

আশীর্বাদ করি তুমি ভালবেসে তৃপ্তি পাও। সুখী হও জীবনে। আমাকে তোমার ভক্তি করার লাগবে না (পূর্ববঙ্গের টান এসে পড়েচে ইতিমধ্যে দ্যাখো কান্ড!)। ভালবেসো, তা হলেই আমার আনন্দ। শ্রদ্ধা, ভক্তি ওসব দেবতাদের প্রাপ্য, মানুষে কি পায়? মানুষের কত ত্রুটি-বিচ্যুতি, কত ভুলচুক—তারা কি ভক্তির পাত্র? আমার মধ্যে কত হীনতা দেখবে, কত কি খারাপ দেখবে, তখন কি ভক্তি হয়? তা হয় না। হ্যাঁ, তবে ভালবাসা অন্য জিনিস। যে যাকে ভালবাসে, তার শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও

সে ভালবাসা কমে না বরং বাড়ে। ভালবাসাকে বড় বলেচে এইজন্যে—'লভ ইজ গড'—মানুষের যে হৃদয়ে বন্ধুত্ব, ক্ষমা, করুণা ও স্নেহের সিংহাসন পাতা—ভগবানের সিংহাসনও সেখানে।

সুতরাং তুমি নিঃসন্দেহে থাকতে পারো, ভালবাসব চিরকালই তোমায়। তোমার ওপরে নিষ্ঠুর হতে বুঝি পারবো কোনদিন? খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার জীবনে কারো সঙ্গে কোনদিন করিনি, যতদূর আমার মনে হয়। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে, সেগুলো ফুটিয়ে তোলা আমার একটা বড় কাজ হবে সর্বাদক থেকে। কল্যাণী, আমি জানি, তুমি ক্লিওপেটরা বা নূরজাহান নও, কিন্তু বাইরের রূপ ক'দিনের? অন্তরের যে রূপ চিরদিনের, তোমার মধ্যে আমি তা প্রত্যক্ষ যদি না করতুম, তবে কি আমি তোমার সঙ্গে অত মিশতাম?

নুটুকে চিঠি লিখে দিয়েচি, সে বৃহস্পতিবার সম্ভবত বনগ্রামে গিয়ে পেঁছুবে। আমি যাবো রবি বা সোমবার। তুমি সুরেনকে বলেছিলে বারাকপুরে পুরোহিত ঠিক করার কথা? সে কি গিয়েছিল?

আমার প্রীতি ও ভালবাসা নিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

('শ্রী' ছাড়া লিখি না, তুমি সেই বলেছিলে তারপর থেকে কোথাও না—ভাবি কল্যাণীর অনুরোধ, না রেখে পারি?)

পুঃ তুমি ৪।৫টা গান ভাল করে তৈরি রেখো। কথা ও সুর সুদ্ধ। মামার বাড়িতে বা অন্যত্র তোমার গান শুনতে চাইবে। হারমোনিয়ামের সঙ্গে সেট করে রাখতে যদি পারো তো ভাল হয়। কারো উপর নির্ভর না করে যাতে গাইতে পারো, এজন্যে কথাগুলো জানা দরকার। এটি বিশেষ দরকার—মনে থাকবে?

বরের চিঠিতে ভাবী বধূকেই বরপক্ষের পুরুত ঠিক করার জন্য বলতে দেখে ঘাবড়াবার কারণ নেই। ছোট ভাই নুটু ঘাটশিলা থেকে যথাকালে পেঁছে গিয়েছে বনগাঁয়। সতীশমামা, মন্মথদা, মিতে বিভূতিরাও বসে নেই। বিয়ের দু'দিন আগে বিভূতিভূষণ এসে দেখেন সব আয়োজন 'পূর্ণ' অর্থাৎ অনেক কিছুই ফর্দ থেকে বাদ এবং যথাকালে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে বিয়েবাড়ি জমিয়ে তোলার মত আয়োজন পূর্ণ।

পাত্রের অভিভাবক কে আছেন এখন? বড়মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নামেই প্রজাপতিমার্কা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র গেল সব ঠিকানায়।

বিয়ের দিন সন্ধ্যায় ইছামতীর ওপারে দূর সম্পর্কের সতীশমামার বাড়ি থেকে বরানুগমনের উদ্যোগ হচ্ছে, এমন সময় সজনীকান্ত দাস-এর নেতৃত্বে কলকাতার একদল সাহিত্যিক এসে বরযাত্রীর দলে ভিড়লেন। হাতে তাঁদের 'শনিবারের চিঠি'। তাতে ঘোষিত হয়েছে—পথের পাঁচালী শেষ করিয়া বিভূতিভূষণের ঘরের পাঁচালী শুরু।

বিভূতিভূষণের ললাটে চন্দনতিলক। মাথায় শোলার টোপর। চোখে-মুখে আনন্দের উদ্ভাস।

ব্রজেন্দ্রভবনে মঙ্গলশঙ্খ আর উলুধ্বনি। হারিজ মিঞার সে বাড়ি ছেড়ে এখন ব্রজেন্দ্রভবনে থাকেন ষোড়শীবাবুরা। বিয়ে সেখানে বসেই। নববস্ত্র-পরিহিত বিভূতিভূষণ, নবসাজে সজ্জিতা কল্যাণীর সামনে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। সম্প্রদান করলেন ষোড়শীকান্ত। শাস্ত্র-মন্ত্র থেকে স্ত্রী-আচার কোনটাই বাদ গেল না। বিভূতিভূষণও

বাধা দিলেন না কোনটিতে। এ-অনুষ্ঠানকে আনন্দমুখর, পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ করতে চান তিনি।

বন্ধুরাই বা ত্রুটি রাখবেন কেন? সজনীবাবু ছড়া ছাপাতে পারেন তাঁর শনিবারের চিঠিতে, বনগাঁর বন্ধুরা কি উপহার ছাপাতে পারবেন না? মন্মথদা কবি-মেজাজের লোক। ছড়া বেঁধে উপহার ছাপিয়ে আনলেন বনগ্রাম পল্লীবার্তা প্রেস থেকে। হাতে হাতে তা বিলি হল বিয়ের আসরে।

লাল নীল হলদে সবুজ নানারঙের কাগজ, চারদিকে ফুলকাটা মার্জিন। তারপবে যেমনটা হয়, দু'পাশে মালাহাতে উড়ন্ত পরী, প্রজাপতি, নীচে শঙ্খবাদনরতা নারী কলাতলায় দাঁড়িয়ে, সেখানে নারকেলশোভিত মঙ্গলকলস।

প্রথমে বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের দু' লাইন করে কবিতার অনুষ্ঠানো-পযোগী উদ্ধৃতি। পবে, মন্মথদার স্বরচিত কবিতা—

স্বর্ণাসনে সরস্বতী স্বর্ণবীণা করে
উল্লাসে দেখিলা চাহি আনন্দ সবার
নাচিছে হৃদয় আজি সন্ধ্যা সমীরণে
হে উদাস কবি! ফুল ফুটিছে তোমার।

হেমন্ত শিশির সন্ধ্যা আজি শুভক্ষণে
তোমার জীবনমরু করিলা শীতল
সংসার সাগর মাঝে পুণ্য সমীরণে
স্বর্ণতরী তব কবি ভাসিল অমল।

॥ পনের ॥

'কল্যাণীয়াসু' হল 'প্রিয়তমাসু'—সম্বোধনটাই বিলকুল বদল! সতীশমামার বাড়িতেই ফুলশয্যা যাপন করে কলকাতার মিরজাপুরের মেস-এ চলে এলেন বিভূতিভূষণ; কল্যাণী গেল ব্রজেন্দ্রভবনে বাবার কাছে।

সপ্তাহ না যেতেই মেস-এর চিঠি, সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের নয়, স্বামীর প্রথম পত্র। বিয়ের পিঁড়িতে বসবার আগে শেষ 'কল্যাণীয়া' সম্বোধনের চিঠিখানা কল্যাণীর চিঠির ঝাঁপি থেকে এনে আগে পড়া হয়েছে। তেমনি ফুলশয্যার পরে 'প্রিয়তমা' সম্বোধনের সযত্নে রক্ষিত প্রথম চিঠিখানিও পড়া যাক।

৪১, মির্জাপুর স্ট্রিট
বুধবার, ১১।১২।৪০

প্রিয়তমাসু,

উঃ কল্যাণী দেখে কি হাসিই হাসবে! 'কল্যাণীয়াসু' পাঠ চলে গেল কি করে এ-ক'দিনের মধ্যে—হয়ে পড়লুম 'প্রিয়তমাসু'! কিন্তু তাই তো হয়ে উঠেচ কল্যাণী, লক্ষ্মীটি—তোমার কথা সব সময়েই মনে পড়চে যে এই ক'দিনে! মন থেকে একদণ্ডও তুমি কোথাও যাও না, বলরাম সরকারের ঘাটে সেই তুমি আর আমি যখন বসেছিলুম সেদিন, সে-কথা মনে পড়চে, ট্রেনে যখন আসছিলুম সে-কথা মনে পড়চে—তোমার অলস স্বপ্নমদির চোখ দুটির ভাবময় দৃষ্টি, শেষ রাত্রের শুভ শয্যায় বাহুবন্ধনের আকুল

বন্ধুত্ব, এ সব আমার মন থেকে মুছে যাবে না কোন দিন। তাই তোমার কথা সব সময়েই মনে পড়চে। কেন, আগেও তো পড়তো, এখন সেই চিন্তাই যেন আরও স্নেহময় ও প্রাণময় হয়ে উঠেচে, কেন, কি করে বলি?

সত্যি, তুমি আর আমাকে 'আপনি' বলে ডেকো না, সব মেয়েই তো 'আপনি' বলে—খুকু, সুপ্রভা, খিণু সকলে। আমায় 'তুমি' বলে ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করবে কেউ, এ সাধ আমার কতদিন থেকে ছিল—দয়া করে আমার জীবনে লক্ষ্মীর মত এলেই যদি, তবে আমার সেই অনেক দিনের সাধ পুরতে দাও, লক্ষ্মীটি। এখন থেকে তোমার মনের সব কষ্ট বুঝবার দায়িত্ব আমার, তোমাকে সুখী করবার ভার এখন আমার—আমি সে ভার সানন্দে ও স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্চি। অবিশ্যি যতদূর আমার সাধ্যিতে কুলোয়।

অতএব তুমিও আমার মনের স্বাদগুলো পূর্ণ করবার চেষ্টা করবে নাকি লক্ষ্মী? 'আপনি' বল্লে আমার যেন কোথায় লাগে, ঠিক বোঝাতে পারিনে। আমারও স্বভাব, কখনো অভিযোগ করিনে, কারো বিরুদ্ধে নয়, নিজের সুখের জন্যেও নয়—কিন্তু কখন করি জানো, যখন চোখের সামনে কোন অন্যায় কি অবিচার দেখি, কিংবা কেউ খারাপ হয়ে যাচ্চে পড়াশুনো না করে কিংবা কুসঙ্গে মিশে এমনতর দেখি।

তোমার জন্যে মন সর্বদাই উড়ু উড়ু করচে। হয়ত শেষ পর্যন্ত শনিবারেই যেতুম, কিন্তু সিটি কলেজে ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে হবে ওদিন, অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী কাল এসে বলে গিয়েচে।

তোমার গল্প যে কত জায়গায় আমায় করতে হচ্চে! শোনো, সেদিন, অর্থাৎ আমাদের বিয়ের দিন কি হয়েছিল জানো? মণি বোস ও তার স্ত্রী সবিতা মোটরে বেরিয়েছিল বনগাঁয়ে যাবে বলে বেলা ৫টার সময়, দত্তপুকুরের এধারে কি একটা গ্রামে যশোর রোডের ওপর ওদের মোটর বিগড়ে যায়। বেচারীরা ঘণ্টা দুই সেখানে থেকে তারপর একখানা লরি ডাকিয়ে তাতে কলকাতা ফেরে ড্রাইভারকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে। এখানে এসে এ গল্প শুনলুম। ওরা ভারি দুঃখিত হয়েচে না যেতে পেরে। সবিতার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার বিবাহসভার উৎসবে যোগ দেবার।

তোমার লেখা গল্প পাঠিও যত তাড়াতাড়ি পারো। 'তরুণ-তরুণী'র সম্পাদক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তোমার লেখা চেয়ে গিয়েচে। মাঘ মাসেই যাতে বের হয় সেজন্যে বলেও গিয়েচে।

তাই তো কল্যাণী, তুমি শেষকালে আমার স্ত্রী হয়ে পড়লে? আমার যে স্ত্রী আছে এখনও যেন সে-কথা আমার মনেই হয় না, যেন বিশ্বাস হয় না। এত আপন হয়ে উঠলে তুমি, একি সত্যি? 'স্বপ্নোনু, নায়নু' কীটসের ভাষায় 'ইজ ইট এ ভিশন অর এ ওয়েকিং ড্রিম?' মনে মনে কতদিন থেকে তোমার মতই মেয়ে চেয়েছিলুম—স্নেহময়ী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী, সেবাপরায়ণা, সুরসাধিকা—(সুর এখানে শুধু সঙ্গীতের সুর নয়, যে কোন কলা, যে কোন সৃষ্টির একটি নিজস্ব সুর বর্তমান, সাধনা দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে হয়, সুরলক্ষ্মী বড় অভিমানিনী নায়িকা, কত সাধ্য সাধনা করে যে তাকে বশ করতে হয়!)—হয়তো বা বহুদূর অতীতের কোন জীবনে মধুর অলস দিনগুলিতে, অজ্ঞাত পথতলে, ভুলে যাওয়া গ্রামসীমার বেষ্টনীর মধ্যে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী, কি জানি কি রঙের কাপড় পরতে, কত কি ছলাকলায় মন আমার ভুলিয়েছিলে সেবারও; কি জানি কত যুগ ধরে এমনি হয়ে আসচে, আরও কত যুগ ধরে চলবে।

আমি একটা কবিতা লিখেচি তোমাকে নিয়ে, হয়তো কাগজেও দেবো, তবে তার আগে তোমায় দেখিয়ে নেবো বড়দিনের ছুটিতে। কারো নাম নেই কবিতায়, সম্পূর্ণ 'অ্যাব্‌সট্রাক্‌ট' ধরনের কবিতা, অথচ যে বুঝবে সে ঠিকই বুঝবে।

চিঠির উত্তর দিও খুব তাড়াতাড়ি।

বারাকপুর যাবো কিন্তু বড়দিনের ছুটিতে। ৭।৮ দিন পল্লীজীবন যাপন করতে আমার মনে হয় তোমার খারাপ লাগবে না। গল্প লেখার দিক থেকেও নতুন উপকরণ পেতে পারবে।

আজ আসি। দশটা বেজে গেল। প্রাইজের জন্যে ছেলেদের আবৃত্তি শেখাতে হবে স্কুলে। টেসট পরীক্ষার একগাদা খাতা জমে আছে তার ওপর।

প্রীতি ও ভালবাসা নিও। বেলু ও খোকা-খুকীদের স্নেহাশীর্বাদ জানিও। মা ও শ্বশুরমশায়কে আমার সভক্তি প্রণাম জানিও। আশা করি সব কুশল। তোমার ব্লাউজ আজ করতে দিয়েচি দোকানে। ইতি—

তোমার প্রীতিবদ্ধ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানকু, এখানে বসবো?

কোথায় মানকু তুমি?

লতাঝোপের আড়াল থেকে একটি মিষ্টি গলার হাতছানি।

ক্ষণিকেব হারানো দিয়ে মিলনকে বারে বারে মধুর করে তোলার এ লুকোচুরি খেলা। ফুলডুংরি পাহাড়ে তখন পুষ্পোৎসব শুরু হয়েছে প্রথম ফাল্গুনের। কল্যাণীর নতুন জীবনেরও প্রথম ফাল্গুন। বিভূতিভূষণের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছে সে ঘাটশিলায়। ফেবরুয়ারির শেষ, উনিশ শ' একচল্লিশ। বিকালে দু'জনে ছুটো-ছুটি করছে বিভূতিভূষণের প্রিয় ফুলডুংরি পাহাড়ে। লতাঝোপের আড়াল থেকে কল্যাণীর ডাক শুনেই এগিয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ।

মানকু ওদের নতুন নাম। দু'জনেরই কানে-কানে-ডাকা নাম।

অজস্র ল্যানটানা ফুল ফুটেছে গাছে। কাছেই এক শিলাসন। ছুটে ছুটে ক্লান্ত কল্যাণী বললে—এখানে বসবো?

দু'জনে বসেন একটি শিলাসনে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দূরে বুরুডি ও বাসডেরা পাহাড়—তার অরণ্যানী। আরও দূরে ওই অরণ্যের উপরে একটি নক্ষত্র যেন অনন্তের হৃৎস্পন্দনের মত জ্বলে। বিভূতিভূষণ বলেন, সেই গানটা গাওনা মানকু—'যো দেবাগ্নো যোঽপ্সু—'

কল্যাণী গায়, 'যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি শোভন ক্ষিতিতলেতে'।

অনেক রাতে জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে দু'জনের ফেরা সুবর্ণরেখার তীরে, ডাহিগড়ার শালবীথির কুটিরে।

আবার ভোরে বেরোন। শুধু কি ফুলডুংরি? সিদ্ধেশ্বরডুংরি, উলদাডুংরি, এদেলবেরা অরণ্যে, ঝরনাধারার ধারাগিরিতে। এ তল্লাটের সব চেনা বিভূতিভূষণের। ও'কেও চেনে সবাই। কাঠ কাটতে লরি যায় দূর দূর বনপাহাড়ে। ও'কে দেখলেই লরি থামবে। চালক ডাকবে—চলুন বাবু। এদের মধ্যে একজন ছিলো বাঁধাধরা,—মুকুল চক্রবর্তী। কোলাঘাটের ঝড়ে সর্বস্বান্ত মুকুলকে বিভূতিভূষণই ঘাটশিলায় নিয়ে আসেন। এখন তো কাঠের ব্যবসায়ী। জঙ্গল ইজারা নেয়। নিজের লরি নিয়ে

জঙ্গলে যায়। এবং যাওয়ার পথে ডাহিগড়ার মোড়ে বড় আমগাছটার তলে বিভূতিদার জন্য লরি থামাবে। কখনো বা দাদা আগে থেকেই হাজির। লরি দেখলেই ছড়ি দিয়ে ইঙ্গিত, থামাও। খুব সকালে ওঠা, আর সেই সন্ধ্যার পর ফেরা। লরিতে তিনি চালকের পাশে গদিতে কোনদিন বসবেন না। উপরে উঠে চালক-কেবিনের ছাদ ধরে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে যাবেন। দিনমানে খাবেন কী? ভাত কি রোজ জুটতো জঙ্গলে? না। বন্য আমলকি, কুকড়ো কুমরো—এসব, ঝরনার জল, ব্যাস, তৃপ্ত। মুকুল কাঠ কাটার তদারকি করবে। উনি যাবেন হাওয়া হয়ে। হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত সে-অরণ্যের কোন শিলাসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকবেন নিরুদ্বেগে ধ্যানমগ্ন হয়ে। উদ্বেগ যা মুকুলদের। খুঁজে খুঁজে ওঁকে সন্ধ্যায় তুলে আনা। ওরা বেশি উদ্বেগ দেখালে, ওদের ছেড়ে পায়ে পায়েই বের হতেন একলা। কোথায় শতগুড়ুম নদী পেরিয়ে ভয়ঙ্করী রঙ্কিণী মন্দির। কোথাও শত শত গর্ত থেকে মুখ বার করা গোখরো সাপ ঘেরা ভৈরব মন্দির। পাহাড়ী সরদারদের বাড়ি গিয়ে তার সন্ধান নেবেন—'কোন ঠিনে ভৈরবনাথ পরধান?'

অ্যাদ্দিন, এসব চলত একলা। এবার কল্যাণী সঙ্গিনী। ক্লান্ত হলেও এসব ভালো লাগে কল্যাণীর। এই তো সে আশা করেছিল ও'র কাছে। এখানে এলেই আসল মানুষটিকে চেনা যায়। বয়স্ক বিভূতিভূষণ কোথায় হারিয়ে যায় এই পথে, পাহাড়ে, অরণ্যে! পথের কবির দুরন্ত সত্তা জেগে ওঠে এই পথে, প্রকৃতির জগতে। মধুচন্দ্রিমার রোমাঞ্চিত দিনগুলির স্মৃতি নিয়ে বনের জগৎ ছেড়ে সভ্য জগতে ফিরে আসেন দু'জনে মারচের শুরুতে।

এপরিলে আগমনী সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বানে শিল্পনগরী বারনপুর, মে-তে দারজিলিঙ। কল্যাণীও সঙ্গে গেল। দেখল, বনের মানুষটিকে শহরও মালা পরায়। তারই হৃদয় দিয়ে মালা পরানো মানকু!

তাই বলে কেবল মালা-পরা আর ঘোরায় মেতে নেই লোকটি। সঙ্গে আছে নোট-বই—ডায়েরি আর খাতা। নিকটকে নিয়ে লিখছেন ডায়েরি, দূরকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী। কল্যাণীর প্রেম তাঁকে ঘরকুনো করেনি, করেনি বিলাসমন্থর। বরং উদ্দীপিত করেছে ও'র জীবনকে। চল্লিশের ডিসেমবরে বিয়ে। বিবাহিত জীবন শুরু বলতে একচল্লিশে, আর এই একটি বছরেই ভ্রমণ-কাহিনী, দিনলিপি, গল্প, উপন্যাসের প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার মুদ্রিত সাহিত্যকীর্তি প্রকাশ, আর ক'জন পেরেছেন? এক বছরে পুরো পাঁচখানা বই?

বছর না পড়তেই বেরিয়েছিল যুদ্ধের মশলা দিয়ে তৈরি শিশু উপন্যাস। মরণের ডঙ্কা বাজে। উনিশ শ' একচল্লিশের বাইশ মারচ বেরোল গোরক্ষিণীসভার কাজে প্রচার অভিযানের অভিজ্ঞতার বই 'অভিযাত্রিক', বইটি উপহার দিলেন ভাগনী 'কল্যাণী উমাকে'। পঁচিশ এপরিল বের হয় গল্পগ্রন্থ 'বেণীগির ফুলবাড়ি'। উৎসর্গ, বোন জাহ্নবীর উদ্দেশ্যে। জুনে, ভাগলপুর জঙ্গলমহালের দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'—আরণ্যকের কাঠামো। এর উৎসর্গপত্রে লেখা—'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে।' তারপর উপন্যাস—'দুই বাড়ি'। এ বই উপহার দিলেন ভ্রাতৃবধূ যমুনাকে। উপন্যাস বেরোয় আরও একখানা 'বিপিনের সংসার'। বইটির একটা ছক নিয়েছেন বিভূতিভূষণ তাঁর বাড়ির সামনের ইন্দুর বাবা জমিদার সীতানাথ রায়ের সংসার থেকে। বইটি উৎসর্গ করেছেন, যাঁর কাছ থেকে পিতৃতুল্য স্নেহ পেয়ে কৈশোরে পালিত হয়েছিলেন বনগাঁ বোরডিং-এ, সেই হেডমাস্টার চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। উৎসর্গপত্রে

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyaya.

41 Mirzapur Street,
CALCUTTA রবিবার, [illegible]......1940

কল্যাণীয়াসু,

[illegible]

বিয়ের আট দিন আগে ভাবী পত্নী কল্যাণী দেবীকে লেখা চিঠি।

Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay. 41 Mirzapur Street,

CALCUTTA শুক্রবার, ১১/১২/৪০ ইং

প্রিয়তমাসু,

'কল্যাণীয়াসু' থেকে 'প্রিয়তমাসু'—বিয়ের পর বিভূতিভূষণের প্রথম চিঠি।

লেখা, 'চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইল'। বিস্মৃত হননি অতীতকে এক মুহূর্তের জন্যেও।

বিশ্রামও নেই মুহূর্তের। এত কাজের মধ্যেই খেলাত স্কুলের ওয়ারনিং পড়ে, ঘণ্টা বাজে। খাতাকলম রেখে, মেস-এর আধসিদ্ধ ভাত গিলে ছুটতে হয়। কেবল পড়ানোতেই কি দায় ঘুচলো? ভক্ত ছাত্রের দল আছে না? পিকনিকে, বটানিকাল গারডেনে, চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে যেখানেই স্কুলের ছাত্রদল যাবে ব্যানারজি স্যারকে চাই-ই ওদের। এড়াতে চান না তিনিও। এমনকি জীবনে যা করেননি সেই ফুটবল নিয়েও কলকাতার ময়দানে নামতে হয় ওই বয়সে। একদিনের খেলার চমৎকার বর্ণনা আছে কল্যাণীর কাছে লেখা এক চিঠিতে।

'হাঁ, খেলার কথা জিজ্ঞেস করেচ। ভাল খেলিনি ভাবচো বুঝি? আমরা একগোলে জিতেছি। 'আনন্দবাজারে' রিপোরট বেরিয়েচে। সেদিন মাঠে ভীষণ কাদা, দৌড়ুনো যায় না—তবুও বল নিয়ে কিছু কিছু ছুটতে হয়েছিল। আমাদের হেড পণ্ডিত বেচারী বৃদ্ধ ভদ্রলোক, গোলে দাঁড়িয়ে তাঁর কি বিপত্তি! গোলের সামনে কাদার হাবড়, বল আসে, ধরতে যান আর সপাটে ও সশব্দে আছাড়! বল ঢুকলো নির্ব্বিবাদে গোলের মধ্যে। চারিদিক ছাত্রদের হাসি ও হাততালি। বৃদ্ধ বয়সে কি বিড়ম্বনা (৫৭ বছর বয়েস) বেচারির! আমিও ছুটি বটে কিন্তু বল প্রায়স পাইনে—সাধ্য কি আমার ছোকবা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বল কেড়ে নিই! সব মাস্টারেরই সমান দুর্দশা। কেবল মৃত্যুঞ্জয় বলে একজন তরুণ অঙ্কের মাস্টার ভাল খেলে আমাদের মান রেখেছিল। প্রথমে তো ছাত্রেরা চক্ষের নিমিষে পর পর তিনটি গোল দিলে, আমরা হতাশ হয়ে গেলাম, বিশেষতঃ গোলকীপার বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায়ের অবস্থা দেখে বুঝলুম আজ রক্ষে নেই, ক'ডজন গোল খেতে হয় তার হিসেব থাকবে না আজ। এই সময় ছেলেদের ক্যাপটেন খেলোয়াড়দের বলে দিলে মাস্টারমশায়দের সঙ্গে অত চেপে খেলো না, ছেড়ে দিও (পরে এ-কথা শোনা গেল)—তাই আমরা গোলগুলো শোধ দিয়ে আবার একটা গোল বাড়তি হিসেবে দিয়েও দিলেম। পরদিন (বুধবার) ছুটি ঘোষণা করলেন হেডমাস্টার মাঠে দাঁড়িয়েই। আমরা তাঁবুতে ঢুকে হাত-পা ধুয়ে (হাইকোরট গ্রাউন্ডে খেলা হয়েছিল) লুচি, মাংস, মিষ্টি খুব খেলাম (স্কুলের খরচ)—ছেলেরা আমাদের ছাড়তে চায় না, তারা গান শোনালে, একজন নাচলে, কবিতা আবৃত্তি করলে—রাত সাড়ে আটটার সময় বাসায় ফিরি।'

বাসা কোথায়? মেস বলুন। চিরকালটা মেস-বোরডিং-এ কাটিয়ে অভ্যাসটা দাঁড়িয়েছে এমন, মেসকেই সংসার মনে হয়। কল্যাণী রইলো বনগাঁ তার বাবার কাছে। চুক্তি হয়েছে সপ্তাহে অন্তত একবার দেখা হওয়া চাই-ই দু'জনের। তবে সে একবার তো মাত্র একদিন—রবিবার। তা সেপটেমবরে ষোড়শীবাবুও বদলি হয়ে যাবেন কোলাঘাটে, তখন?

সাহিত্যিক বন্ধু প্রবোধ সান্যাল জোর চেপে ধরলেন, এবার মেস ছাড়ুন তো, আর মাস্টারিতেও কাজ নেই। ঘর বাঁধুন বউদিকে নিয়ে। স্বাধীন শান্তির জীবন যাপন করুন এবং যত ইচ্ছে লিখে যান।

বিভূতি-সাহিত্যের মুখ্য প্রকাশক 'মিত্র ঘোষের' গজেন মিত্রও সমর্থন করলেন প্রস্তাবটা। বেশি লেখা বেরোলে তাঁরও বৈষয়িক লাভ। প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে মিলে অনেক পরামর্শ দিলেন বড়দা বিভূতিভূষণকে। বিভূতিভূষণেরও পছন্দ হচ্ছিল ও'দের কথা। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন, স্কুল মাস্টারির এ দাসত্বের জোয়াল

নামিয়ে স্বাধীন জীবন যাপনই তাঁর পক্ষে ভালো। অনেক রাত পর্যন্ত অনেক পরামর্শ হিসাব-নিকাশ ফর্দ সব তৈরি হল তিনজনে বসে। পরদিনই কল্যাণীকে চিঠি দিলেন। বিস্তারিত সে পরিকল্পনা জানিয়ে মত চাইলেন তার। বিভূতি-জীবনের এই মূল্যবান চিঠিখানার তারিখ ষোল আগস্ট, উনিশ শ' একচল্লিশ।

"প্রিয়তমাসু,

কল্যাণী, ভালো আছি সেই কথাটা আগে বলি। ওখান থেকে এসে এখনও পর্যন্ত শরীর সুস্থই আছে।

অন্য একটা কথা লিখি আমার চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে। ভালো করে বিবেচনা করে দেখলাম চাকুরী ছাড়াই আমার পক্ষে সংগত। কাল এ সম্বন্ধে প্রবোধ সান্যাল ও গজেন মিত্রের সংগে কথা হোল। ওরাও বললে, 'আপনার মত সুবিধে আমাদের যদি থাকে তবে এতদিন চাকুরী ছেড়ে দিতাম'। অর্থাৎ ওরা বলে, বারাকপুর সস্তার জায়গা এবং কলকাতার নিকটে। ওখানে বসে লিখলে এবং কলকাতায় বইয়ের দোকানে দিলে আমার যা আয় হবে তা বর্তমান আয় অপেক্ষা কম নয়। প্রবোধ সান্যাল ও গজেন দু'জনেই বারাকপুরে জমি নিয়ে বাস করতে চায়। আমায় জমি দিতে বলেচে। ওরা খুব উৎসাহ দেখিয়েচে এবং ওখানে একটা সাহিত্যিক উপনিবেশ করতে চায়। আমি গেলেই ওরাও যাবে। আমি হিসেব করে দেখলাম, রোজ যদি ৩ পাতা লিখি তবে ৩৬০ দিনে (এক বছর) আমি লিখবো ৩×৩৬০=১০৮০ পাতা। ৪ খানা বড় উপন্যাস। সেই জায়গায় বাদ দিয়েও লিখব তিনখানা উপন্যাস—ধরো যদি সব দিন তিন পাতা লিখতে নাও পারি। তাতে ২০০০৲ টাকা থেকে ২৫০০৲ টাকা বইয়ে আয় দাঁড়ায়। তার ওপর যদি আমি কিছু ধানের জমি করি, তবে ঘরের ভাত ঘর থেকেই হোল। রোজ সকালে উঠে বেলা ৯টা ৯৷৹-টার মধ্যে ২ পাতা এবং রাত্রে এক ঘণ্টার মধ্যে এক পাতা লেখা আমার পক্ষে খুব সহজ কাজ। এই লিখেই উক্ত আয় হোতে পারে। ২০০০৲ টাকাও যদি বছরে আয় হয়, তবে বারাকপুরের মাসিক খরচা মাসে মাত্র ২৫৲ টাকা কি ৩০৲ টাকা হিসাবে ৩৬০৲ টাকা বছরে। নুটুকে ৪০৲ টাকা ধরে ৪৮০৲ টাকা। মোট ব্যয় ৩৬০+৪৮০=৮৪০৲ টাকা। অতএব খরচ বাদে বছরে হাতে জমবে ২০০০—৮৪০=১১৬০৲ টাকা। এর উপর যদি ধানের জমি থাকে, তবে খরচ আরও কম পড়বে, কারণ চাউল কিনতে হবে না। বছরে ১১৬০৲ টাকা বা ধরো ১০০০৲ টাকা জমা য়োজা কথা নয়। দশ বছরে দশ হাজার টাকা হাতে জমে যাবে। ওরাও তাই করবে বলচে। প্রবোধ তো খুব উৎসাহিত—শীগগিরই ওরা আমাদের ওখানে গিয়ে সব দেখে আসবে।

অতএব মিছেমিছি চাকুরী করে ভূতের বেগার কেন খাটি? আমার বর্তমান আয় বছরে ২৫০০৲ টাকার বেশি নয়। স্বাধীনভাবে যদি ওই টাকাই পাই তাতে কলকাতার খরচ লাগবে না অথচ ভালো খাবো ও থাকবো। স্বাধীনভাবে থাকলে লেখার দিকও ভালো হবে। প্রবোধ বললে—'আপনি এখনই ছেড়ে দিন চাকুরী। আপনার মত অবস্থা আমার হলে সামান্য ৪০৲ টাকা মাইনের চাকুরী কোন কালে ছেড়ে দিতাম'। কাল গজেনের দোকানে বসে সব হিসেব খতিয়ে দেখে মনে হোল অনর্থক পরের দাসত্ব করচি। ওতে আমার টাকার দিক থেকে কোন সুবিধেই নেই। অবশ্য তিন পাতা করে লেখা কিছু কঠিন নয় আমার পক্ষে। তোমাকে সেই সময়টা আমায় দিতে হবে। একমনে যাতে লিখতে পারি ওই সময়টা।

হিসেব করে এতদিন দেখিনি। দেখে আমার চোখ খুলে গিয়েচে। কি বোকামিই

করেচি বছর দুই আগে চাকুরী ছেড়ে না দিয়ে। হাতে আরও অনেক টাকা জমতো। শুধু বারাকপুর কেন, আমরা যে কোন ভাল জায়গায় থাকতে পারি—কলকাতা সহর বাদে। এখানে থাকার বাধা প্রথম তো খরচ বেশি হয়, বড় ভিড় লোকের। সর্বদা আসবে আমাকে বিরক্ত করতে। তাতে ৩ পাতা লেখার সময় পাবো না। সময় নষ্ট হবে বড়। 'টাইম ইজ মানি উইথ মি নাউ'—তাছাড়া নির্জন নিরিবিলি স্থান ভিন্ন একমনে সাহিত্য সৃষ্টি করার অবকাশ ও সুযোগই বা কোথায়?

অবিশ্যি আমি যা হিসেব করে দেখলুম—আমরা এতে করে বারাকপুর কেন, যে কোন ভালো জায়গায় থাকতে পারি—ঘাটশিলা, মধুপুর, শিমুলতলা, ভাগলপুর এমন কি দারজিলিঙ। তবে কলকাতার কাছে থাকাই সংগত। কারণ এ ব্যবস্থা চলবে না কলকাতার কাছে না থাকলে। ভাগলপুর থেকেও চলতে পারে—কারণ 'বনফুল' ওখান থেকেই চালাচ্ছে। তার চেয়ে দূরের কোন জায়গায় গেলে ব্যবসা চালানো কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। কলকাতা যাতায়াতে বহু সময় ও অর্থব্যয় হবে। ঘাটশিলা থেকে অনায়াসে চলতে পারে; মধুপুর থেকেও চলতে পারে। বারাকপুরের তো কথাই নেই, মাত্র ৷১০ আনা যাতায়াত ভাড়া। সকলের চেয়ে এই জন্যে সুবিধে বারাকপুর। তাছাড়া ধানের জমি বা বাগান অন্য কোথাও থাকলে পাবো না।

এই সব কথা ভাববে বেশ করে। শনিবারে গিয়ে আমি যেন তোমার মুখ থেকে সৎ পরামর্শ পাই। দু'জনে এ-কথা সেদিন রাত্রে আলোচনা করবো। গজেন বলচে—আপনি যেখানে যান, মাসে ৫০৲ টাকা আপনাকে খরচের জন্যে দোকান থেকে দেবো—আপনি বই লিখে তা শোধ করবেন। ও টাকা দেওয়া বাদে যা বেশি পাওনা হবে আপনার, তা বছরের শেষে দেবো। ও-টাকা দেবো শুধু আপনার সংসার খরচের জন্যে।

কি বল তুমি?"

কল্যাণী আর বলবে কী। কতো রাত্রের বিছানায় নিজের আঁচলে বেঁধে রেখেছে ও'র ধুতির কোনা, যাতে ঘুম ভেঙেই কলকাতার গাড়ি ধরতে না ছোটেন উনি! তবু খুলে দিতেই হয়েছে বাঁধন। আজ তিনি নিজেই চান ধরা দিতে! খুশিতে মন ভরে কল্যাণীর।

তবে চিঠিতে যত রাজ্যের যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ কষা হয়েছে ওগুলো যে উল্টে যাবে তা জানা। ঠিক থাকবে শুধু লেখা আর ঘোরা, তাছাড়া টাকাপয়সা জমাজমির যে হিসাব তা মিলবে না কোন দিন। চিঠিখানা দেখলে মনে হবে লোকটি বেশ বৈষয়িক। কল্যাণীর মতো ঘনিষ্ঠরা জানে, মাঝে মাঝে ও-রকম একটা ভাব দেখাতেন বটে, মূল চরিত্রটা বিপরীতধর্মী।

না-জানা বা কম-জানা মানুষেরা এইখানেই ভুল করেছেন ও'র সম্বন্ধে। হঠাৎ কোন কথা শুনে বা কাজ দেখে মনে হয়েছে লোকটি বৈষয়িক বেশ, এমন কি সাধারণ পোশাক, বিড়ি খাওয়া, থারড ক্লাসে চলাফেরা ইত্যাদি দেখে কৃপণ ভাবতেও বাধেনি অনেকের। হায়, তাঁরা যদি জানতেন, উনিশ শ' একচল্লিশ-এ সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা সত্তর টাকার কম না পেলেও রাজা খেলাত ঘোষের স্কুলের মাস্টার পেতেন চল্লিশ টাকা মাত্র! মাস্টারি, ট্যুইশানি, খাতা দেখা এবং দিবারাত্র লিখেও পথের পাঁচালীর লেখকের মাসিক আয় সব মিলিয়ে দু' শ' টাকা ছাড়ায় না! এটাই তাঁর বাড়তি আয়ের সময়। এর আগে তো এক শ'ও উঠতো না। তাই দিয়ে নিজের মেস-

খরচা, ছোট ভাইয়ের মেস-খরচা, তাঁকে ডাক্তারি পড়ানো, বিধবা বোনের সংসার চালানো। তার উপর এদিক-ওদিক যাতায়াত—ছুটি পেলেই পালানো শহর ছেড়ে। নাগাসন্ন্যাসী নন, টিকেট-কাটা, খাইখরচা সবই লাগে। কী করে চালান বিভূতিভূষণ, হিসাব করে দেখেননি সেদিন অনেকেই। তাঁরা দেখেছেন, কার্পণ্য। ও'র কর্তব্য-পালনের দায় জানতেন ক'জনে! ডাক্তার ছোট ভাইকেও যে মাসিক চল্লিশ টাকা পাঠাচ্ছেন বড় ভাই বিভূতিভূষণ, ক'জনে জানতেন সে-খবর? ও'র গায়ে জড়ানো দারিদ্র্যের নামাবলীখানাকে কেউ ভেবেছেন ভেক, বিভূতিভূষণ হাসতেন—ভাগ্য এ তাঁর।

সারা জীবন সংগ্রাম করে আজ একটু শান্তি, কিছুটা মুক্তি, খানিক সাচ্ছল্যের স্বপ্ন দেখছেন। পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকায় সংসার চালিয়ে দশ হাজার টাকা জমানোর স্বপ্ন, তাও দশ বছরে, দু'-দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

তা, পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এসেই গিয়েছে, চাকুরিটায় ইস্তফাই দিলেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নয়, ক'মাস সময় লাগলো মায়া কাটাতে, বাঁধন ছিঁড়তে। হেড মাস্টার ক্লারিজ, ফণীবাবু, সুরেশবাবু, বিরাজমোহন, উমাপদ কাব্যতীর্থ—সকল শিক্ষকের সঙ্গেই যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। দূরে থাকতে পারেননি তো ছাত্রদের কাছ থেকেও বেতের ব্যবধান রচনা করে। দেবব্রত, অমিয়, বিমলেন্দু, পঙ্কজ, মিহির, সাধন, বিমল, সুনীল, দেবেন—কতো নাম, কতো প্রিয় ছাত্রদল! পরবর্তীকালের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক এই পঙ্কজ দত্ত দশম শ্রেণীতেই কিন্তু হাত পাকা করে ফেলেছে সাময়িক পত্রে লিখে লিখে। তার সঙ্গে আব ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক থাকবে কী করে। যেন সম-বয়সী বন্ধু। সিনেমাবিমুখ বিভূতিভূষণ তাঁর ছাত্র পঙ্কজের বায়নায় সিনেমা পত্রিকা 'চিত্রলেখা'র সম্পাদক পর্যন্ত হলেন। পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামানন্দতনয় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বি এম সরকার। সে আজ থেকে প্রায় কয়েক দশক আগের কথা। স্কুল শিক্ষকের পক্ষে সিনেমা পত্রিকায় সম্পাদক হওয়ায সামাজিক প্রশ্ন ছিল। বিভূতিভূষণকে আত্মগোপন করতে হল 'বি ব্যানারজি'র আড়ালে। তবু 'না' বলতে পারেননি পঙ্কজকে।

টিফিনের ঘণ্টায় এসে বসেছেন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। পাশে এসে বসেছে বিনয়, দেশবিদেশের গল্প বলতে হবে। রাজা সুবোধ মল্লিকেরই ছেলে বিনয়। স্কোয়ারটার তখন নাম ওয়েলিংটন স্কোয়ার। দু' দণ্ড একলা থাকতে দেয়নি নাট্যোৎসাহী ছাত্র সাধন ভট্টাচার্য, সাহিত্যসাধক বিমল বসু, শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের পুত্র দেবেন। ওরাও যেন বন্ধু ভাবে বিভূতিভূষণকে।

ছাত্র মাসটার সবাই কত কিছু কিনে টিফিন করে। বিভূতিভূষণের ছোট্ট একটি কৌটো থাকে দারোয়ান কালুয়ার কাছে। তাতে দুটি সিঙাড়া নয়তো একটি নিমকি, একটা দানাদার। মাঝে মাঝে পঙ্কজ বিনয়েরা মাসটারমশায়ের নাম করে তা এনে লুকিয়ে রাখে। ব্যানারজিবাবুর প্রিয় ছাত্রদের কালুয়া কোন সন্দেহ করে না। অভিযোগ করেন না তিনিও। জীবনে এক অতৃপ্ত স্বাদ মেটে এই শিশু তরুণ ছাত্রদের মধ্যে। বিশেষ করে ছোটদের মধ্যে। স্কুলটা তাই ভাল লাগে। দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর'-এ আছে—"অপরাজিত'র শেষটা ভাল ক'রে দেখবার জন্যে তিনদিন ছুটী নিয়েছিলাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম—ছুটী ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলে-পুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু, সত্যব্রত এদের সঙ্গে বেশ লাগে।"

এই সঙ্গ বেশ লাগার মধ্যে যে অতৃপ্ত স্বাদটা তাঁর পূর্ণ হত ছাত্র বিভূতি বসুকে

দিয়ে, এখানেও একই ব্যাপার। তৃণাঙ্কুরেই তিনি লিখেছেন—দেবব্রতকে তিনি বললেন —তুই আমার ছেলে ত? সে বল্লে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ! ও কখনো একথা বলেনি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

এমনি কতো স্মৃতির বাঁধন ছিঁড়তে সময় লাগবে বই কি। তবু ছিঁড়লেন। ছাড়লেন স্কুল একেবারে বছরের শেষে ডিসেমবরের প্রথম দিন, উনিশ শ' একচল্লিশেই।

॥ ষোল ॥

ওই দ্যাখো, সেই খোকা কতো বড় হয়েছে।—সবাইপুরের কাছে আসতেই প্রাচীন অশ্বত্থগাছটা যেন ও'কে দেখে কথা কয়ে উঠল।

এই তাঁর পল্লী, এখানে সবাই তাঁকে ভালোবাসে। সবার সঙ্গে জানাশোনা তাঁর। অনেকদিন পরে ঘরে ফিরতে দেখে ও'র মতই আজ সবাই খুশি।

কিন্তু সে কেন অমন মুখ ফিরিয়ে রইলো? এ-গাঁয়ে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে হাওয়ায় ও'র গন্ধ পেত। বলত এসে, 'গোপাল আমার এয়িলি?' তার পর আঁচলের খু'ট খুলে একটা নোনা, আতা বা পেয়ারা রেখে মায়ের মত স্নেহে বলত, 'তোর জন্যি নিয়ে অ্যালাম'—সেই জামির করাতির বউ আজ দাড়িঘাটার পুলের কাছে অমন অভিমান-ভরা মুখে ও'র দিকে চেয়ে রইলো—একটা কথা বললে না অত ডাকেও! বড় আঘাত পেলেন মনটায় বিভূতিভূষণ গাঁয়ে পা দিতেই।

ওর ছেলে খালেদ ছিল খেলার সাথী ছোটবেলার। সে হঠাৎ গেল মরে। সেই থেকে আরও বেশি করে বিভূতিকে আঁকড়ে ধরেছিল জামির করাতি আর তার বউ। গাছের আম, কলা, আতা, মুরগীর ডিম, গরুর দুধ যখন যা সম্ভব করাতির বউ নিয়ে বেরোবে, 'যাই দিনি বাওনপাড়ার দিকি, মোর গোপালকে দিয়ে আসি।'

সে অনেক দিনের কথা। জামির আজ বে'চে নেই। সত্তর বছরের বুড়ির আজ ভিখারী দশা। লাঠিভর করে মাঠে ছাগল চরায়। কেউ ডাকলে প্রথমে বলে, কে বাবা তুমি? চিনতি পারলাম না তো কেডা! ঠাওর পাইনে।

তার 'গোপাল' বিভূতিভূষণ গাঁয়ে এলেই সে লাঠিভর করে হাজির হবে, গোপাল আমার এয়িলি? আর আজকে সে অমন করলে কেন? যেন চেনেই না! ভাবতে ভাবতে মন ভারি হয়ে ওঠে।

ইদানীং বুড়ি নিজের দুঃখের কথা বলত খুব। বিভূতিভূষণ দু'একটা টাকা দিলেই বলত, আমার খালেদ নেই, তুই আমার ছেলে। মরলে, তুই আমার কফিনের কাপড় দিস। কবরে তোর হাতের মাটি পড়লেই আমি শান্তি পাবো।

এ কথা যে বুড়ি প্রাণের থেকেই বলত বিভূতিভূষণ তা বুঝতেন। তাহলে আজ কেন অমন করল সে? কী এমন খারাপ ব্যবহার করলেন তিনি?

অনেকদিন অবশ্য আসা হয়নি বারাকপুর। আজও আসবার কথা ভাবেননি আগে। ষোড়শীবাবু বনগাঁ থেকে কোলাঘাটে বদলি হয়ে গিয়েছেন। কল্যাণী আছে ঘাটশিলায়। শনিবার সেখানেই যাবেন ঠিক। হঠাৎ কী মনে করে আগের দিন শুক্রবার টিকেট কেটে উঠে পড়লেন বনগাঁর ট্রেনে। এ বুঝি বারাকপুরের অদৃশ্য হাতছানি!

বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁ স্টেশনে নামলেন সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে-বারাকপুরের পথে চলেছেন। এ-রকম সময় প্রায়ই পথে হাটুরেদের সঙ্গে

দেখা হয়। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যায়। কিন্তু এদিন, প্রথমটায় দু'একজন পথচারী পেলেও ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। একাই চলেছেন এবার। ওই তো সামনে বারাকপুর। গ্রামে ঢুকবার মুখে দাড়িঘাটার পুল। সেখানে যখন পৌঁছুলেন, সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। পুলটা পেরোতেই বিভূতিভূষণ পরিষ্কার দেখলেন, পুলের একপাশে জামির করাতির বউ দাঁড়িয়ে।

করাতির বউ না? কি করছ এখানে?—একবার, দু'বার জিজ্ঞেস করলেন—কোন জবাব নেই।

কী ব্যাপার? কথা বলছে না যে! আর সন্ধ্যার পরে একলা এখানে করছেই বা কী বুড়ি? ছাগল খ'ুজছে নাকি? ও করাতির বউ!

ইদানীং বুড়ি চোখে কম দেখছিল ঠিক। কানেও বোধহয় ঢিলে। কিন্তু তাকিয়ে তো আছে ও'র দিকেই! দেখল, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, এক পা এগোল না, একটা কথা বললে না!

ভারি দুঃখ হল ও'র। অভিমানও। ক'দিন না আসায় গোটা গ্রামটাই কি ভুলে গেল তাঁকে? ভাবতে ভাবতে হাঁটেন। তারপর?

রাতে ইন্দুদের ঘরে বসে জামির করাতির বউয়ের কাণ্ডটা বলতেই চমকে উঠল সবাই।—জামির করাতির বউ? দাড়িঘাটার পুলের কাছে?

কেন? চমকে উঠছে কেন ওরা?

যা শুনলেন তাতে চমকে উঠলেন বিভূতিভূষণ!—শুনলেন, ওই দিনই দুপুরে মারা গিয়েছে জামির করাতির বউ। আর তাকে কবর দেওয়া হয়েছে ওই দাড়িঘাটার পুলের পাশেই।

তবে কি সে-ই বিভূতিভূষণকে আজ ডেকেছিল বারাকপুরে? ইশ, বড্ড দেরি হয়ে গেল, বড্ড দেরি। শেষ ইচ্ছাটা তিনি পূর্ণ করতে পারলেন না বুড়ির। কাল সকালে উঠেই একমুঠো মাটি দিয়ে আসবেন ওর কবরে। ওর স্মৃতিতর্পণ করবেন। লিখে রেখে যাবেন ওর কাহিনী।—নাম দেবেন 'আহ্বান'। তবু যথাকালে আসতে পারলেন না বলে কান্না পেল। বড্ড দেরি করে ফেলেছেন।

কে তাঁকে ফিরিয়ে দেবে পিছনের দিনগুলিকে? সেই বারাকপুরকে? ওই যে সদাচঞ্চল অন্নপূর্ণা মেয়েটি ছিল, বিভূতিভূষণের পাঁচি. পুঁটিদির মেয়ে, পালকি চেপে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল সেদিন। দুটো বছর না ঘুরতেই হাতের নোয়া. সিঁথির সিঁদুর মুছে মূর্তিমতী কান্নার মত এসে দাঁড়ালো 'মামা' বলে। ওর দিকে তাকাতে পারছেন না যেন বিভূতিভূষণ।

খুকীকেও মনে পড়ে আজ। খুকী নেই—বারাকপুরে। নেই নাকি সে আর সেই চকিত হরিণীর মত মেয়েটিও।

বদলায় সবই। শৈশবের খেলার সাথী পরেশ আজ অন্ধ। স্ত্রীর হাত ধরে ঘাটে নামে, হাটে যায়। প্রায় নিরন্ন দিন কাটে।

কেমন আছে আইনদ্দী—বেলেডাঙ্গার সেই আইনদ্দী মণ্ডল? আছে তো আদৌ! সেই আইনদ্দী মণ্ডল। এখন ওর বয়েস নব্বুইয়ের কাছাকাছি—বিভূতিভূষণের সমবয়সী তার সেই ছেলে আহাদ আর নেই। আহা, অমন আমুদে লোকটা এমন আচমকা চলে গেল। তবু, আশ্চর্য, অপরিবর্তিত আছে আইনদ্দী। এ-বয়সেও নিজেই চাষ-

বাস দেখে। বিভূতিভূষণকে পেয়ে মহাখুশি। সেই গল্প-শুনতে-আসা খোকা কত বড় হয়েছে! গল্পের নেশা এখনও তেমনি!

আইনদ্দীও সেই আগের মতই বলে, তা আমোদ-ফুর্তি এককালে কম করিনি। যাত্রার দলে গাওনা করিচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি।

একটু থেমে মুখে একটা অহঙ্কারের ভাব খেলায়, আপনাদের শাস্তরডাও খুব পড়িচি। ধরো গিয়ে বেরষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর—সব আমার মুখস্থ'

তারপর বিদ্যাসুন্দর থেকে খানিকটা মুখস্থ বলে, মহাভারত থেকে দাতা কর্ণ শোনায়।

শ্লোকগুলি একটু উল্টেপাল্টে যায়, ভুল করে উচ্চারণে। তা করুক, তবু সে যে এত জানে, এখনও শোনায় সেই আগের মত, এতেই ভালো লাগে বিভূতিভূষণের। সেই ছোটবেলা গল্প শুনে অন্ধকার কুঠির মাঠ দিয়ে ফিরতেন, বাঘের ভয় করত—সে-সব কতো দিনের কথা! আজও তাই নবীন মনে হয় আইনদ্দীকে দেখে। আজও কুঠির মাঠে অন্ধকার নামে সেই আগেকার মত, সেই বাঘের ভয়ও তেমনি আছে। একটু বদলায়নি। 'বিপিনের সংসার'-এ আইনদ্দী চাচার কথা তিনি লিখে রেখেছেন। আছে সেই শৈশবের প্রকাণ্ড বকুলগাছটা তেমনি ডালপালায় সতেজ, সবুজ প্রাণের বার্তা ঘোষণা করে। আছে ইছামতী—তেমনি স্রোতস্বিনী। আবার ভালো লাগে বারাকপুরকে।

যুদ্ধ অনেক দূরে হলেও শহরের আকাশে যেন বারুদের গন্ধ। এখানে আকাশ তিসির ফুলের মত নীল, বোমারু বিমানের মহড়া নেই এ-আকাশে, এ-আকাশে সাদা ডানামেলে বেড়ায় শান্ত বকের দল। এ-গ্রাম আজও পাখির কূজনে, পুষ্প-সুবাসে, সবুজ স্নিগ্ধতায় ভরা। এখানেই ঘর বেঁধে থাকবেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভূতিভূষণ। কল্যাণীকে নিয়ে এলেন।

'বৈশাখ মাসে প্রথম এখানে এলুম। এর আগে চালকিতে ছিলুম। এখানে সংসার করচি বহুদিন পরে। নতুন সংসার, নতুন ঘর করা। এই চেয়েছিলুম বহুদিন ধরে।' দিনলিপি 'উৎকর্ণ'-র একটি স্বীকৃতি। সালটা ইংরাজি উনিশ শ' বিয়াল্লিশ।

এলেন দুজনে ফেবরুয়ারিতে। কিন্তু রইলেন পাশের গ্রাম চালকিতে সেই জাহ্নবীদের পড়ে থাকা বাড়িতে। বারাকপুরে নিজেদের পুরনো ভিটের পাশেই সইমাদের যে ঘরসুদ্ধ বাড়িটা কিনে রেখেছিলেন তাকেই সংস্কার করে সংসার পাতানো। কিছু সময় গেল।

নতুন গৃহসঞ্চার—নবগৃহপ্রবেশ। দুদিনেই ঘরখানা খেলাঘর দুজনের। সারা বারাকপুর ও'দের রম্যোদ্যান। ফুলে ফুলে ভরা বসন্তের বনবনান্ত, কোরকে কোরকে ফলের স্বপ্ন। পুষ্পসুবাস সেই স্বপ্ন বয়ে আনে ও'দের মনে। ইছামতী মাতাল করে সাঁতার কাটেন দুজনে। কল্যাণীর খোঁপায় নতুন ফোটা কুসুমগুচ্ছ পরিয়ে দেন।

ইছামতীতে নাইতে চলেছেন। পথে বাঁশবনের পাশে নিজেদের পুরনো ভিটের কাছে এসে চমকে গেলেন বিভূতিভূষণ, দেখেছ কল্যাণী!

মাটির সঙ্গে মিশে আছে একটা উপুড় করা লোহার কড়াই। ফেটে চৌচিড়। তাই দেখিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, মা রেখেছিলেন! দীর্ঘশ্বাস পড়ল।—এক সময় রাজপুর থাকতেম, বউদি নিভাননীর কথায় মাকে নুটুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। যেতে চাননি মা। এই ভিটে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না তিনি। শেষটায় যখন গেলেন, ওই কড়াটা দিয়ে উনুন ঢেকে রাখলেন, আবার এসে তুলবেন! হায় রে

আশা!

মার কথা বলতে বলতে ছেলের কণ্ঠ আটকে যায়। কল্যাণী বলে ওঠে, ওই কড়া আমরা ঘরে নিয়ে যাবো মানকু! মায়ের হাতের কড়া, আমাদের সংসারে থাকবে লক্ষ্মীর আসনে।

মানকু!—আবেগে কল্যাণীর দু'হাত মুঠিতে টেনে নিলেন বিভূতিভূষণ।—তাই করব আমরা। আগে চান করে নিই চলো। তারপর দু'জনে ওই ভিটেয় প্রণাম করে মায়ের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করব ঘরে।

নঁদি, পুঁটিদি, খুড়িমা, কাকিমারা সব দেখতে আসেন ও'দের নতুন সংসার। বউমাকে দেখে তাঁরাও খুশি। বেশ শান্ত লক্ষ্মীমতী বউ! মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। শহুরে শিক্ষিতা বলে কোন নাক সিটকানো নেই গেঁয়ো বউ-ঝিদের দেখে; বরং বড়দের ভক্তি করে, ছোটদের স্নেহ। সমবয়সীরা উঠতে পারে না ওর টান ছিঁড়ে। এমনি বউ না হলে বিভূতির আর ফেরা হতো গাঁয়ে? কলকাতাবাসী করে ছাড়তো। না, বেশ মানিয়েছে দু'জনে। ইছামতী, গাছ-ফুল, ঝোপ-জঙ্গল দু'জনেই ভালোবাসে।

গাঁয়ে সুখ্যাতি ছড়াতে, শ্যামাচরণদাদারাও পরীক্ষা করে গেলেন। না, দু'জনে মিলে যতই নৌকো বাচ করুক, বন-বাদাড়ে ঘুরুক, গুরুজনে মান্যিগন্যি আছে। ভালোই হল—মহানন্দ বাঁড়ুজ্যের বংশটা এবার রক্ষা পাক।

কল্যাণীকে পেয়ে খুশি পাড়ার বিভূতি-ভক্ত ছেলেরাও। 'ফুচু, হাবু, বুধোরা ওকে নিয়ে নৌকো বায় ইছামতীতে। দু'পাশে দীর্ঘ নলবন, শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোয়ারালতা, বন্যবুড়ো গাছের সারি, জলজ ঘাসের ঝোপ, কষাড় ঝাড়, এরাণ্ডির বন। সবুজ, সবুজ, এত সবুজ আছে এদেশে?' কল্যাণীরও নেশা লাগে সবুজে। সবুজ সৌন্দর্যের ফুলঝুরি যেন তাকে ঘিরে।

সেদিন কুঠির মাঠ থেকে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে মরাগাঙের খাল পেরিয়ে একেবারে আরামডাঙায় হাজির। খেজুর বনে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর এক মুসলমানপল্লী এই আরামডাঙা। এ-গাঁয়ের মুসলমানেরা ভক্তি করত কথকঠাকুরকে। তাঁর ছেলে-বউ এসেছে এই গাঁয়ে শুনে গৃহস্থেরা ছুটে এলো। এক বাড়িতে কল্যাণীকে নিয়ে মেয়েরা খুব যত্ন করে পিঁড়ি পেতে দিলে, পান দিলে, তার পরে একটা ছোট ছেলেকে এনে বসিয়ে দিলে ও'র কোলে। এই স্ত্রী-আচারের অর্থ নাকি শুভকামনা—পুত্রবতী হও মা-লক্ষ্মী।

মানে বুঝলে কিছু, কেন ওসব করলে ওরা?—পথে নেমে প্রশ্ন করেন বিভূতিভূষণ। চোখে কৌতুকের হাসি। বুঝতে পারে কল্যাণী ওর অর্থ। সেও দুষ্টুমি করে বলে, জানি না।

আমি জানি, বলব?

পুরুষের কিছু আটকায় না মুখে। লজ্জিতা কল্যাণী ও'কে থামাতে হঠাৎ আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই দ্যাখো কেমন সুন্দর একটা তারা আকাশে। ওর নাম কি মানকু?

বিভূতিভূষণ তাকিয়ে একটু ভেবে বলেন, ব্রহ্মহৃদয়—চিত্রা।

বড় সুন্দর নাম কিন্তু।

আরও সুন্দর একটা কাহিনী আছে, তবে বলব না।

বলবে না? বল মানকু!

বলছি, তবে মাঝখানে কথা বলবে না।

বেশ বলব না; তুমি বলো।

বিভূতিভূষণ শুরু করেন মহাকবি কালিদাস বর্ণিত রঘুবংশের এক কাহিনী—মহারাজ দিলীপ পুত্রকামনায় রানীকে নিয়ে ঋষির আশ্রমে যাচ্ছিলেন। পথে এমনি রাত হয়। আকাশে দেখলেন, চিত্রা আর চাঁদের মিলন। তারই ফল—রঘুর জন্ম। আজও আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে আকাশে। দেখবে নাকি—ওদের মিলন ঘটে কিনা?

আবার দুষ্টু কথা!

হঠাৎ ঝিঙে-পটলের ক্ষেতের মধ্য থেকে হাঁক ওঠে—কে যায়?

আমি, বিভূতিভূষণ জবাব দেন।

ও, বট্‌ঠাকুর! আমি গুড়ো জেলে, ক্ষেত পাহারা দিচ্ছি।

ঘেঁটুবনের গন্ধ মেখে দু'জনে রাতের ঘরে ফেরেন। জন্ম থেকেই এই ঘেঁটুফুলের প্রতি এক বিশেষ টান ও'র। বাবা বলতেন, দাদু তারিণীচরণ এই দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদটি দিয়ে নানা ওষুধ বানাতেন। এর তেতো পাতা ক্রিমিনাশক নাকি। কবি-কবিরাজ সবারই প্রিয় ঘেঁটু। সাহেবরাও নাকি আদর করে এই ঘেঁটুর নাম দিয়েছে ক্লোরোডেনড্রন। হিন্দী নাম বারাঙ্গী। ওড়িশীরা বলে কুন্তী। কতো নাম এই ঘেঁটুর। বাংলাদেশে এর আরও নাম আছে—ভাট বা ভাঁটি। রবীন্দ্রনাথ দারজিলিঙ থেকে তাঁর মেয়ে মীরাকে লিখছেন—'ভাঁটিফুল বোলপুরের কাছে ঢের আছে, লাগাসনে কেন? ওরা বৈষ্ণবপদাবলীর ফুল, রূপে ও গন্ধে আদরের যোগ্য।'

কালিদাসের কাব্যে প্রায় অর্ধশত ফুলের কথা থাকলেও পদ্মই প্রধান। তারপর গুরুত্ব পেয়েছে অশোক, শিরিষ, আমের মঞ্জরী। তেমনি বিভূতিভূষণের বর্ণনায় শতাধিক ফুলের মধ্যে বৈঁচি, সোঁদালি, সাঁইবাবলারা গুরুত্ব পেলেও প্রধান হল ঘেঁটু বা ভাঁটি।

বিভূতিভূষণ আদর করেছেন জন্ম থেকেই। বাড়ির উঠোন ভরতি থাকবে ভাঁটির ঝাড়ে। জংলা হোক তবু। কেউ উপড়াতে গেলে রক্ষা নেই। এখন ও'রা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের আদর পেয়ে ঘেঁটুবনও যেন বেড়ে উঠেছে। এদের মধ্যেই ও'দের জীবন যাপন।

এমনি ও'দের দিন কাটে। কলকাতার সাহিত্যিক বন্ধুরা অনেকেই এলেন, ইছামতীতে চান করলেন, খেলেন-দেলেন, বেড়ালেন, তারপর যথারীতি চলে গেলেন কলকাতা। গণ্ডগ্রামে সাহিত্যসাধনার আশ্রম খুলতে উৎসাহ পেলেন না। কী আছে এখানে? ঘেঁটু?

বিভূতিভূষণের কিন্তু অনেক আছে। এই গ্রামের মানুষ, প্রকৃতি—সব কিছুই সাহিত্যের সম্পদ হতে পারে, শুধু চাই সে অনুভূতি।

এই পুঁটিদির মেয়ে পাঁচি—বালবিধবা অন্নপূর্ণা সব সময় মামা মামা করে কাছে আসে, ওর সামান্য জীবনকথাই অনুভূতি থাকলে অসামান্য মনে হবে। নসুমামার কথা বলতে বলতে বালবিধবা যুবতী নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে বিভূতিভূষণকে—এতে কি পাপ স্পর্শ করে মামা?

সেদিনের ছোট্ট রোগা কিশোরীটি। দুর্বল বলে কেউ খেলতে নেয় না, জুটি হিসেবে কারো পছন্দ নয়। গ্রামের খেলা, দৌড়ঝাঁপ থেকে গাছ বাওয়া সবই আছে। অন্নপূর্ণা ঠিক পেরে ওঠে না। অবুঝ মেয়েটি তবু রোজ বিকেলে নেশার টানে খেলুড়েদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। ওরা একপাশে ঠেলে দিলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে কালো মুখ করে।

একদিন বেশ বড়োসড়ো জোয়ানমত একটি ছেলে এসে ওর দুঃখ মুছে দেয়। খেলুড়েদের ধমক দিলে, ওকে না নিলে খেলতে পাবে না কেউ। বিভূতিভূষণের বন্ধু

সুরেন চ্যাটারজির ভাই এই নসুমামা। তাকেও পরিচয়ের পর মামা বলতে শুরু করল অন্নপূর্ণা। প্রতি বিকালে ও সেজে আসে ইছামতীর পারে। নসুমামার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে। ওকে কেউ নেবে না নসুমামা না এলে। সেই নসুমামার কষ্ট দেখলে দুঃখ হয় না?

বাড়ির সবাই পড়াশুনোয় ভালো, নসুমামার মাথা নেই। বোকাসোকা নসুমামা, যে কোন কাজে কাউকে খুশি করতে পারলেই নিজেকে ধন্য মানে। বাড়ির বউঝিরাও ওর ব্যাপারে বেহায়া। নিজেদের কাপড়-জামা পর্যন্ত ওকে দিয়ে ঘাটে পাঠায় ধুয়ে আনতে। অন্নপূর্ণার দুঃখ হয় দেখে। বলে, দাও নসুমামা, আমি ধুয়ে দি।

একদিন বিয়ের কথা হল অন্নপূর্ণার। গ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে। যত দ্রুত পরের হাতে দেওয়া যায়। কিশোরী বয়সেই সম্বন্ধ পাকা।

বিয়ের কিছু না বুঝুক, একটা পুলক আছে বইকি। কিশোরীও গোপনে গোপনে পুলক-শিহরণ অনুভব করে। মা বলেন, কার্তিকের মত বর হবে। ছেলের নাকি অবস্থা ভালো। হার দেবে, চুড়ি দেবে—ওরাই।

হার চুড়ি। সুন্দর সুন্দর শাড়ি!—অন্নপূর্ণা ভাবতেই পারে না।

পাড়ার মেয়েগুলো যত হিংসুটি! দু'একজনকে লুকিয়ে বলতে গিয়ে ঘা খেল অন্নপূর্ণা। ওরা বলে, রেখে দে, রেখে দে।

ওদের কাছে বলবে না আর। ওর ভালো নসুমামা ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারে না। নসুমামার কাছে গেল গোপন পুলক প্রকাশ করতে।

কিন্তু ফেরার পথে গতি মন্থর কিশোরীর। অমন চুপ করে রইলো কেন নসুমামা। মুখটা কেন কালো হয়ে গেল? কিছু বোঝে না কিশোরী।

ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণার বাবা পাশের স্টেশন মাঝেরগ্রামে বাড়ি করে উঠে গিয়েছেন ওদের নিয়ে। মেয়ের বিয়ে দিলেন সেখানে বসেই। অন্নপূর্ণা পালকি চেপে বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গেল—দুধ-আলতায় পা ভিজিয়ে বধূ ঘরে নিলেন তাঁরা। চার বছর। ঠিক যৌবনের মুখে হাতের নোয়া ভেঙে, সিঁথির সিঁদুর মুছে বাপেরবাড়ি ফিরে এলো সেদিনের কিশোরী।

তারপর আরও দু'বছর—এই শ্রী নিয়ে আর মা'র সঙ্গে মামাবাড়ি আসতে ইচ্ছে হয়নি অন্নপূর্ণার। এবার পুজোর সময় পুঁটিদি মেয়ে-সঙ্গেই এলেন বারাকপুর।

সাদা থানে ঘেরা অন্নপূর্ণার পূর্ণ যৌবন একটি শুভ্র পুজোর ফুলের মত হয়েছে। মায়ের সঙ্গে মণ্ডপের সামনে। ঠাকুরের সামনে প্রণাম করে উঠেই চমকে গেল অন্নপূর্ণা, কে ওপাশে আনমনা দাঁড়িয়ে? নসুমামা? কতোকাল পরে—সেই—? ছুটে গিয়ে হাতখানা ধরল—ও নসুমামা।

কিন্তু একী, নসুমামা যেন চিনল না ওকে। হাত ছাড়িয়ে আবার অন্যদিকে হাঁটতে লাগল। চোখে-মুখে কোন ভাবান্তরও নেই।

অন্নপূর্ণা ভাবতে পারে না এ অবস্থা। এতদিন বাদে দেখা—নসুমামা—কথাই বললে না! আবার ছুটল—ও নসুমামা, একটা কথা শোন!

কে কার কথা শোনে! লোকটা যেন নসুমামা নয়, অন্য কেউ।

না, অন্নপূর্ণা ভুল করেনি চিনতে। সে আবার ছুটলো। ছুটলো নসুমামাও।

নসুমামার ঘরের লোক ওকে থামালো। বোসো, পাগলের পিছনে অমনি ছুটতে আছে!

পাগল! নসুমামাকে ওরা পাগল বলে?

বলে না, সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছে। সেই অন্নপূর্ণার বিয়ের পর থেকে—মস্তিষ্কবিকৃতি। বাপ ডাঃ গিরীন চ্যাটার্জি অনেক চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারেননি।

এ-দায় কি তার? এতে কি পাপের স্পর্শ আছে—বিভূতিমামা?

না, তুই নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক তোর এ-ভাবনা। আমি গল্প লিখে সেটা বুঝিয়ে দেবো সবাইকে। এ সত্য লুকাবার নয়।

বিভূতিভূষণ গল্প লিখে তাঁর বারাকপুরকেই নয়, সারা বাংলাদেশকে বললেন একটি নিষ্পাপ প্রেমের করুণ কাহিনী তাঁর 'উপলখণ্ড'র 'নসুমামা ও আমি'তে। একটি কথা : বিভূতিভূষণের নানা লেখায় আরও দুজন পাঁচির কথা আছে। একটি, পাড়ার এক ব্যক্তির রক্ষিতা। অপরটি জেলেপাড়ার বেরিয়ে যাওয়া একটি মেয়ে। অনেকেই পুঁটিদির মেয়ে পাঁচির সঙ্গে ভুল করে ওদের জড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু হলে এদের পার্থক্য বোঝা যায়।

পুঁটিদির মেয়ে পাঁচির জীবন নিয়ে এমনি আরও গল্প লিখেছেন তিনি। শ্বশুর-বাড়ি থেকে, বিতাড়িত বিধবা জীবনের বিড়ম্বনার দুঃখ নিয়ে রানাঘাট স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল পাঁচি। দারজিলিঙ মেল দেখে সব দুঃখ ভোলার এক আশ্চর্য অনুভূতি হল ওর। তাকে রূপ দিয়েছেন বিভূতিভূষণ তাঁর 'ডাকগাড়ি' গল্পে। গল্পটি তাঁর 'জন্ম-মৃত্যু' গ্রন্থে সংকলিত।

কল্যাণীর দিদি মায়ার সুটকেস কেলাঘাট থেকে কলকাতা আসবার ট্রেনে বদল হওয়ার ঘটনা নিয়ে লিখলেন 'বাকস বদল'।

আসল কথা, হৃদয় দিয়ে অনুভব। ঘরের কাছে, পথের পাশে এমনি অজস্র চরিত্র, অসংখ্য কাহিনী, আশ্চর্য পরিবেশ ছড়িয়ে আছে। শুধু একটু দরদ দিয়ে ক্যানভাসে এঁকে রাখলে অনন্য শিল্প হতে পারে। হতে পারে অবিস্মরণীয় সাহিত্য। কিছুকাল আগে প্রকাশিত তাঁর 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'ও তেমনি বারাকপুরের পথ থেকেই তুলে আনা বাস্তব চরিত্র নিয়ে তৈরি। ভাই নুটুবিহারীকে উপহার দেওয়া এই বইখানির কাহিনী এখানে বলা যাক। দুটি ঘটনা যুক্ত এই বইয়ের সঙ্গে।

কাঁচিকাটার পুলের কাছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বয়েস ষাট-বাষট্টি, রঙ বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁটলা, কাঁধে ছাতা। বিভূতি-ভূষণ আকৃষ্ট হলেন, কোথায় যাবে হে?

প্রশ্নটাও যেন চেনা মানুষকে করা, উত্তরটাও তেমনি চিরপরিচিতের মত একগাল হেসে, আজ্ঞে দাদাবাবু ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাবো। বাড়ি শান্তিপুর, গোঁসাইপাড়া।

গোঁসাইপাড়ার লোক না হলে এমন জবুজবে ভেজা মানুষ হয়! বিভূতিভূষণ জমে গেলেন লোকটার সঙ্গে। কথায় কথায় লোকটা বললে, একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।

বিড়িটা দিয়ে আর নিয়ে দুজনেই কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ।

তা দাদাবাবুর কী করা হয়?

এই ছেলেদের পড়াই, আর একটু লিখি।

পড়ান আর লেখেন? তা গাঁয়ের পাঠশালায় পড়ান, দোকানে খাতা লেখেন—একসঙ্গে দুটো কাজ কেন, সেই সঙ্গে মাঠে হাল দেওয়া, হাতে তাঁত বোনা, দোকান চালানো, এ-রকম অনেকগুলো কাজই করা যায়—তার গাঁয়েও কেউ কেউ করেন। তা করা উচিত। গরিব লোকের আর কী করা?

তা তো নিশ্চয়।—ওর সহানুভূতিতে তৃপ্ত বিভূতিভূষণ। লোকটিও ও'র প্রতি খুশি কৃতজ্ঞতা করলে। বললে, তবে যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিইনি কারণ পথেঘাটে নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভালো।

তা ঠিকই করেন।—বিভূতিভূষণ সমর্থন জানান। সবাই সকলের মূল্য বোঝে নাকি? আমিও কি সবার সঙ্গে কথা বলি! এই আপনাকে দেখেই যেন ইচ্ছে হল একটু আলাপ করি। আপনার পরিচয়টা?

দিয়ে কী হবে? লোকটি মুখে একটা অহঙ্কার ফুটিয়ে ও'র দিকে তাকালে। তার পর বললে, আমার নাম ন'দে-শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে—আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ—হাসির সঙ্গে কালো ভুঁড়ি দুলতে থাকে ওর।

ওর মুখের দিকে চেয়ে কৌতূহল আরও বেড়ে যায় বিভূতিভূষণের। লোকটির কিন্তু রসজ্ঞান আছে। নাম তখনও প্রকাশ করেনি। কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ পথ চলার, কথা বলার সৌভাগ্য ঘটচে না-জানি!

ও'কে অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে লোকটি। বললে, আমার নাম দাদাবাবু—হাজারী পরটা!

অবাক বিভূতিভূষণ, হাজারী—?

আজ্ঞে হাজারী পরটা।

হাজারী পরটা?

আজ্ঞে সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে ও'র মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্য অনেকক্ষণ ও'র দিকে চেয়ে রইলো—বোধহয় ও'র বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্য। বিভূতি-ভূষণকে তখনও অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে বললে, যদিও আমরা ভটচাযি্য, তবে উপাধি আমার পরটা। মানে এমন পরটা আব কেউ তৈরি কবতে পারতো না ন'দে-শান্তিপুরের মধ্যে। পুরো পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে আসবে। দোকান ছিল গ্রাম-চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি। পরটা, লুচি, আলুরদম, ডিম, মাংস। যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে কখনও ভুলতো না। কলকাতা পর্যন্ত নামডাক। খ্যাদা মিত্তিরের বাড়ি রসুই করেচি এক হাতাবেড়িতে পাঁচ বছর।

চমৎকার। এ চরিত্রটিকে তো ফসকে যেতে দেওয়া যায় না। গল্প করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত চলেন বিভূতিভূষণ। মাঝপথে ডাক—এই যে, বেহাইমশাই যে।

পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় নিলে হাজারী পরটা তার কুটুম্বের সঙ্গে।

দেশময় তখন চলছে উপন্যাসেব নামে কদর্য কামবিলাস। 'মাতৃভূমি' পত্রিকা চালাতে গিয়ে ঘেন্না ধরে গিয়েছে মালিক তথা সম্পাদক হেমেন দত্তর। একদিন তিনি সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত গোপাল নিয়োগীকে ডেকে বলে দিলেন, উপন্যাস-ট্যাস বন্ধ করে দিন, ওসব আমরা আর ছাপবো না। গোপাল নিয়োগী চুপ করে রইলেন। হেমেন দত্ত প্রশ্ন করলেন, প্রেম নামে কাম-কেচ্ছা ছাড়া কি উপন্যাস হয় না মশাই?

গোপালবাবু একটু ভেবে বললেন, নিশ্চয় হয় এবং একজন যে তা' ভালোভাবেই পারেন তা আপনারও জানা।

কে?

গোপালবাবু বললেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাঁ হাঁ, পথের পাঁচালী, আরণ্যকের লেখকই পারবেন। ঠিক বলেছেন। আপনি তাঁকে বলুন।

গোটা বৃত্তান্ত বলে বিভূতিভূষণের কাছে অল্প দিনের মধ্যে একটা উপন্যাস চাইলেন গোপালবাবু।

নিশ্চিন্ত করলেন তাঁকে বিভূতিভূষণ। হাতের মধ্যে হাজারী পরটা থাকতে ভাবনা? অমন রসুইয়ের রান্নায় বিভূতিভূষণের ভিয়েন পড়লে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' চলবে না? সাহিত্যের বাজারে এক আশ্চর্য ভোজ পরিবেশন করলেন তিনি 'মাতৃভূমি'র মাধ্যমে।

এমনি, গোরক্ষিনী সভার প্রচারক হিসাবে পথে ঘোরার সময় আগরতলার সেই পাগলা ভূতাত্ত্বিককেও ছাড়লেন না। তাকে দিয়েই দাঁড় করালেন জ্যোতিরিঙ্গনের 'থনটন কাকা'র চরিত্রটি।

তবে ক'বছর আগেকার কথা এ। এখন লিখছেন অন্য বই। খেলাত স্কুলের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস। হেডমাসটার ক্লারিজ সাহেবের নামের অনুকরণে বইয়ের নাম দিলেন 'ক্লারকওয়েল সাহেবের স্কুল'। প্রকাশকদের পছন্দ হল না নামটা। নামের উপর নাকি বইয়ের কাটতি নির্ভর করে। তাঁদের পরামর্শে হল 'অনুবর্তন'। সামান্য রঙচঙ আর পাত্র-ছাত্রের নামধাম ছাড়া ক্লারিজ সাহেবের স্কুলের বাস্তব ভিত্তি অনেকটাই থেকে যাচ্ছে বইয়ে। শিক্ষক নারাণবাবুর চোখ দিয়ে লেখক তাঁর নিজ শিক্ষকজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। এতে অবশ্য মাঝে মাঝে খেলাত স্কুলের সঙ্গে জাঙ্গিপাড়ার প্রথম শিক্ষকতার কথাও এসে পড়ে। দীর্ঘ জীবনের শিক্ষকতার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি ছাড়লেন স্কুল-শিক্ষকতা।

ছাড়লেন? ছাড়তে দিচ্ছে কে! ওই সেই কথা, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও—।

একদিন গোপালনগর হাট থেকে ফিরে কল্যাণীকে কথাটা জানালেন বিভূতিভূষণ, জানো, ওরা আমাকে গোপালনগর স্কুলে পড়াতে বলছে।

ওরা মানে, সম্পাদক হাজারী প্রামাণিক, সুধীর মজুমদার, মল্লনাথ মুখার্জি প্রমুখ মাসটারেরা।

কল্যাণী বলে, আর মাসটারি করবে না যে বললে। এখন কেবল বই লিখবে!

কলকাতার প্রকাশকরা সেই দাবিই জানিয়েছেন। দাদা, মাসটারিই যখন ছাড়লেন, এবার আমাদের দিকে একটু মুখ তুলে তাকান। পদ্মপুকুর স্কুলের হেডমাসটার সজনী-কান্তকে ধরেছিলেন, বিভূতিবাবুকে পাইয়ে দিন। পারবেন না বলেছেন সজনী দাস। বনগ্রাম মেযে স্কুল চেয়েছিল একেবারে হেডমাসটাব করে নিতে। তাও রাজি হননি।

না, গোপালনগর তাঁকে প্রধানশিক্ষক করছে না। মাত্র বি. এ. তিনি। নরেন ঘোষ এম. এ বি. টি. আছেন ওই আসনে। সহকারী প্রধান শিক্ষক সুধীর মজুমদার। তবু বিভূতিভূষণকে তাদের দরকার বইকি। ও'র বন্ধু জ্যোতির্ময় লাহিড়ী তখন এ. ডি পি আই। বিভূতিভূষণ ম্যাট্রিকের প্রশ্নকর্তা পরীক্ষক। যে বনগাঁর এস. ডি. ও. পদাধিকারবলে স্কুল কমিটির সভাপতি তিনি ও'র ভক্ত। হেড একজামিনার সুনীতি-কুমাব চট্টোপাধ্যায়েরা এই বারাকপুর আসেন কাদা ভেঙে ও'র সঙ্গে দেখা করতে। এমন লোককে গ্রামের স্কুল ছাড়তে পারে না। ও'রা জোর চাপ দিচ্ছেন।

নিজেরও যে অনাগ্রহ তা নয়। হাজারীর শ্বশুর হরিপদ প্রামাণিক। তাঁর নামে হরিপদ ইনসটিটিউশন। কেবল নামে নয়—কাজেও। ওই স্কুল সেই মহান ব্যক্তির সাধনার

ফল। তাঁরই দানে গড়ে উঠেছে ওই গণ্ডগ্রামে অত বড় স্কুল, বোরডিং, কমপাউণ্ড। ছোটবেলা কত কষ্ট হয়েছে গাঁয়ে বড় স্কুল না থাকায়। আজ যখন হয়েছে, এবং ওরা যখন বলছে—।

কল্যাণী আর কী বলবে! ও'র যখন ইচ্ছে।

স্কুল কমিটিও ইতিমধ্যে ও'র দরখাস্ত ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাজারী প্রামাণিকের ভাইপোর বিয়ের বৌভাতে গিয়েছিলেন। সেখানে শিক্ষকেরা সবাই উপস্থিত। মাসটার মন্ল মুখারজি ও'র হাতে একখানা কাগজ দিলেন. নিয়োগপত্র।

ঘুম থেকে উঠবেন খুব সকালে। উঠেই চিৎকার পেড়ে ডাকতে থাকবেন. নলে—নলে-এ—

নলিনী পরামাণিক ওরফে নলে বাড়ির পাশেই থাকে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে 'অন্তর' নিয়ে হাজির হবে ক্ষৌরি করতে। এই কাজটা কোন কালে নিজে পারেন না। অপরের উপর ভরসা। তারপর তেল মেখে ইছামতীতে স্নান। জলযোগ হবে চিড়ে-গুড়-নারকোলে। এবার লেখার পালা।

তারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ঘরে বসে হবে না, উন্মুক্ত পরিবেশ চাই। সকালে বারান্দার ডানদিকে বাঁধানো বেঞ্চিটায় খাতা বা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দিস্তা নিয়ে বসবেন। কাছে থাকবে দুটো বা তিনটে কলম—সব-ক'টা পারকার। কালিও পারকার। নীলের উপর সাদা ডোরাকাটা সেই পারকারটাও আছে—নিবটা একটু মোটা হয়ে গিয়েছে আজকাল. তবে আদরটা কমেনি একটুও। ওই কলমটা দিয়েই জীবনের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' লেখা। মাঝে মাঝে কলম বদলে লেখেন. তাই হাতের কাছে রাখেন সব-কটা।

আর আছে একটা চামড়ার সুটকেস বহুদিনের। লেখার দফতর ওটি। বাইরে গেলেও সঙ্গে ওই সুটকেসের অনিবার্য উপস্থিতি। ভিতরে সব সরঞ্জাম নেওয়ার সুবিধে ছাড়া টেবিলের চমৎকার কাজ করে ওটি পথেঘাটে বনে-পাহাড়ে। বাড়িতেও ওকে বেঞ্চির উপর চাপিয়ে কাগজ রেখে লেখা। লেখা চলে সকাল থেকে বেলা সাড়ে ন'টা দশটা পর্যন্ত। তারপর খেয়েদেয়ে স্কুল।

সেই কিশোর বদলায়নি। ছাত্র বিভূতির মতই মাসটার বিভূতির চলার পথ সদর সড়ক ছেড়ে বনবাদাড় ধরে. ইছামতীর তীরে তীরে।

স্কুলে যাতায়াতের একটি সঙ্গী জুটল। পাড়ার মুখুজ্যে মশায় গছালেন। তাঁর ছেলেটা বড় অবাধ্য. তাই শিক্ষকের সঙ্গে দেওয়া।

তা ভালোই হল। মাঠ-বন. কাদা-কাঁটার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশের জায়গা দু'ক্রোশ করে ও'র চলা। জুতো রাখেন স্কুলে। সেখানে পেৌঁছে পা ধুয়ে কেতাদুরস্ত হওয়া। ছাত্রের অবশ্য জুতোর বালাই নেই। তাই বলে ও-রকম পথে কি চলা যায়? সঙ্গীটির অবস্থা দু'দিনেই সঙ্গীন। একদিন তো কাণ্ড! বিশাল এক বটবৃক্ষের তলে এসে গুরু স্তব্ধ। অনেকক্ষণ সেভাবে কাটিয়ে নমস্কার করলেন দু'হাত তুলে।

এ আবার কাকে নমস্কার। কোনকালে কোন ঠাকুর-দেবতার 'থান' তো নেই এখানে। তবে? ছাত্র হতভম্ব। নির্ঘাৎ ক্ষেপে গিয়েছেন মাসটার। ক'দিন ধরে যা সন্দেহ করা গিয়েছিল তাই—মাথায় গোলমাল। গুটি গুটি সরে পড়বার চেষ্টা করছিল সে। শিক্ষক বাগিয়ে ফেললেন—নে, প্রণাম কর, তোর সাতপুরুষের সাক্ষী এই গাছ। এ-গাঁয়ের সবচেয়ে প্রাচীন. পবিত্র এই বৃক্ষদেবতা।

সেদিন সে ভয়ে ভয়ে নমস্কার করল বটে, কিন্তু সেই ইতি। বাড়ি এসে বললে.

ও পাগলা মাসটারের সঙ্গে আর যাচ্ছে না।

না যাক, তাতে মাসটারেরও কিছু যায় আসে না। গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেল স্কুলে। ছাত্রটির সঙ্গ-অভাবও বুঝতে হল না তাঁকে।

এ ছুটিতে তিনি বাইরে যাচ্ছেন না। প্রথমত, কল্যাণীর শরীরটা খারাপ। দ্বিতীয়ত, এটা আমের মাস। বারাকপুরের বনপথ তখন পাকা আমে ছেয়ে আছে। একটু হাওয়া উঠলেই টুপটাপ শব্দ। পাড়ার ছোটরা, বউ-ঝিরা বেরিয়ে পড়ে হুটপুট। মৃণালিনীর ছেলে-বউও আম কুড়োতে বনপথে লুটোপুটি। খাওয়ার চাইতেও আম কুড়োতে আমোদ বেশি। খুব সকালে উঠলে আম বুঝি বেশি পাওয়া যায়। এক-একদিন বেশ রাত থাকতেই উঠে পড়েন দুজনে। কিন্তু সকালে উঠলেই কি সব দিন আম পাওয়া যায়? তেঁতুলতলায় গিয়ে দেখেন হাজারী জেলেনী আর পাগলা জেলের মা আম কুড়োচ্ছে! কল্যাণী একটা আমের কাছে যেতে না যেতেই হাজারী জেলেনী খপ করে সেটা তুলে নেয়। ব্যাপার দেখে ফোকলা মুখে হেসে ফেলে পাগলা জেলের মা। আদর করে নিজের খুপরি থেকেই একটা আম তুলে দেয় কল্যাণীর হাতে। কিন্তু অত রাতে ওরা ওঠে? আম কুড়োবার উদ্বেগে বোধহয় ঘুমোয় না রাতে!

তবে কল্যাণীরা ঘুমিয়ে-গড়িয়েও যা পাবে, তাই বা কে খায়! উমা, শান্ত এসেছে বড়মামার কাছে। ওরাও খাচ্ছে দেদার। বড়মামার তো কথাই নেই—হাতে দিতেই সাবাড়।

হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিভূতিভূষণ। আম খেয়ে উদরাময়। কলেরার সব লক্ষণ প্রকাশ পেল। দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় দিনে কল্যাণীকে ডেকে বললেন, আমার কিছু ঘটলে তুমি কোলাঘাটে চলে যেও বাবার কাছে।

কী সব কথা, কল্যাণী হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। উমাকে ডেকে বন্ধুদাকে খবর দিতে পাঠায়। ক্যাপটেন সুরেন চ্যাটারজি বিভূতিভূষণের বন্ধুদা। নামকরা ডাক্তার এখন সুরেন। তিনিও বন্ধু ডাকেন বিভূতিভূষণকে। 'অথৈ জল' এঁকেই উপহার দেওয়া। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। পুঁটিদিরা পাঁচজন এসে পাশে দাঁড়ালেন কল্যাণীর। সবাই বলছেন ভয় নেই! আশ্বাস দিচ্ছেন নানাভাবে। ক্যাপটেন চ্যাটারজি আশ্বাস দিলেন তৃতীয় দিন, বিপদ কেটে গিয়েছে। বিকালের দিকে সত্যিই চোখ মেলে চাইলেন রোগী। এ-যাত্রা রক্ষা!

ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা? পুঁটির মন কী এক আশঙ্কায় ভারী। বিভূতি পুরো সুস্থ হয়ে উঠলে কল্যাণীকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিলেন পুঁটিদি—সুনয়নী দেবী। না, কথাটা তাঁর বলাই ভালো। অল্প বয়সের বউ। প্রথমেই ঘাবড়ে না যায় তাই একটু ভূমিকা সেরে শুরু করলেন তিনি, ভালোই হল রমা। সইমার বড় স্বাদ ছিল খোকা আবার বিয়ে করুক, সংসারী হোক। কী খুশিই হতেন সইমা আজ যদি থাকতেন বেঁচে! তা মানুষ তো কেউ চিরদিনের নয়। তবু স্বর্গে থেকে তিনি দেখুন তোমাদের সুখের সংসার।

তারপরে একটু থেমে অন্য একটা আভাস দিলেন, এবার যদি তোমার কোলে একটি দেব্য খোকা আসে!

কল্যাণী লজ্জা পেল। তা পাক, সুনয়নী যে ও'র বড়দি! মায়ের স্নেহ দিয়ে ওই মাতৃহারা ভাইকে তিনি ভালোবাসেন। তাঁর ভালোমন্দ বলবেন না? বললেন, এ সময়ে একটু সাবধানে থাকবে। শুনতে শুনতে কী যেন কল্পনায় দেখতে পায় কল্যাণী। গুরুজনের সামনে প্রকাশ পায় না সে কল্পনার শিহরন!

কিন্তু ওই কথার জন্যই কেবল একান্তে ওকে ডাকেননি পুঁটিদি। যে কথাটা তিনি

বলতে চান একটু থেমে তা শুরু করেন, কী জানো বউ, ও বিয়ে করবে আর সংসার পাতবে জানলে ওর কাছে বেচে দিতুম না আমাদের এ বাড়িটা।

কেন দিদি? কল্যাণী চকিত প্রশ্ন করে।

না ভাই, আমরা ভাবতুম একলা মানুষের আর পয়-অপয় কী? ওকেই দিলুম। আজ তোমরা সংসার পাতলে দেখেই ভাবছিলেম। তারপর বিভূতির অমন অসুখটা দেখে কথাটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

কী কথা? কল্যাণী আতঙ্কিত।

বাড়িটা ভালো মনে হয় না, অলক্ষুনে।

অলক্ষুনে? কল্যাণীর বুক কেঁপে ওঠে।—কেন?

পুঁটিদি বললেন, কী জানি, অনেকে বলে বাড়িটার ভিটেয় নাকি বিড়ালের হাড় পোতা আছে।

—তাতে কী হয়? কল্যাণীর উৎকণ্ঠা।

কী হয়, কেন হয় জানি না। আমার বাবাও কিছু মানতেন না। এ বাড়িটা নিয়েছিলেন তাই। তারপর আমার একমাত্র ভাই ভরত, বিভূতির খেলার সাথী, অকালে মারা গেল। নির্বংশ হল বাপের গোষ্ঠী। পেলাম আমরা। তোমার জামাইবাবুর আগ্রহ থাকলেও আমার কিন্তু ভালো লাগছিল না। তবু ওর গরজে এলাম। জগো তখনও জন্মায়নি। গোষ্ঠ ছিল আমার বড় ছেলে। আম গাছ থেকে পড়ে গোষ্ঠ আমার চলে গেল।

বলতে বলতে স্মৃতির বেদনায় চোখ জলে ভরে গেল পুঁটিদির। তবু স্মৃতিচারণ করতেই হয়। ওই বিভূতিই দৌড়ে গিয়ে প্রথম তাকে কোলে তোলে। গোষ্ঠর রক্তে ওর কাপড় লাল হয়ে গেল। সে-ই জল দিলে ওর মুখে। আমি গিয়ে আর পেলুম না কিছু গো—পেলুম না গোষ্ঠকে! কাটা পাঁঠার মত বিভূতিও সেদিন ধুলোয় গড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদেছিল! কাঁদতে কাঁদতেই শেষ করলেন সুনয়নী। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কান্না কল্যাণীর চোখেও।

একটু জিরিয়ে তিনি বললেন, তারপর পাঁচির সম্বন্ধ এ বাড়িতে বসেই। বিয়ের আগে তবু এ বাড়িটা ছাড়লুম। তাতেও দেখ পাঁচির কপাল পুড়লই। ভালো নয় এ বাড়িটা।

বিভূতিভূষণের সদ্য-ধরা অসুখটার কথা এই পরিবেশে ভাবতে গিয়ে কেঁপে উঠল কল্যাণী। ঠাকুর, তুমি রক্ষা কোরো ও'কে। আর কাকেই বা বলবে! জানে, ও'কে বললে আমলই দেবে না। বাধা পেয়েছিলেন ঘাটশিলার বাড়ি কিনতে। এখনও ছায়া ছায়া কী সব দেখা যায় মাঝে মাঝে। তবু ছাড়বেন না বাড়ি। এখানেও তাই। সুতরাং শুনবেন যিনি সেই ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রার্থনা জানালে। ও'র যেন কিছু হয় না ঠাকুর!

হল কল্যাণীর। আষাঢ়ের শেষ দিকটায়, প্রথমে জ্বর এবং তা থেকে গড়ালো টাইফয়েডে।

পুরো শ্রাবণ মাসটা শয্যাশায়ী হয়ে কাটাতে হল কল্যাণীকে। ভাগনী উমা দিন-রাত অক্লান্ত সেবা করছে মামীমার। ওষুধ পথ্যি, জল-হাওয়া—রোগীর সাত-সতের কাজ ওই উমার কাঁধে।

তাই বলে বিভূতিভূষণ কিছু করছেন না বলা যাবে না। এ-সময় ও-রকম অসুখটা, ভারি ভাবনার কথা, সবাই সাবধানে রাখতে বলছেন বউকে। অতএব, ভাবনা-

চিন্তা অর্থাৎ দুশ্চিন্তা যতো কাঁধে নিয়ে আছেন নিজে। সাবধান থাকার উপদেশ-বাহুল্যে প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলেছেন কল্যাণীকে। তা হলেও কর্তব্যকার্যে ফাঁকি দেওয়া চলবে না তাঁর। তবে কিনা, ওই পর্যন্তই। কর্মে নেই কোন। কাজ-কর্ম দিলেও ভরসা নেই। একদিন তো এক কাণ্ডই করে বসলেন।

বড়মামাকে রোগিনীর শিয়রে বসিয়ে উমা গিয়েছিল চান করতে। উমা এখন আর বড়দা বলে না বড়মামাকে। কল্যাণী বলে ডাকটা বদলিয়েছে। বড়মামাকে বলে গেল উমা, মামীমার গলা শুকিয়ে গেলে মিছরি দিয়ে একটু লেবুর রস যেন খাওয়ান।

নিষ্কর্মা মানুষ, কাজ পেয়ে ভারি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। দু'চার মিনিট পরপরই কল্যাণীকে সুধোতে লাগলেন, কি গো, গলা শুকলো নাকি?

কল্যাণী যতো বলে, না, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, বেশ আছি আমি, বিভূতি-ভূষণ ততো অস্থির হয়ে ওঠেন। রোগিনীর বদলে গলা শুকিয়ে উঠলো বিভূতি-ভূষণেরই। অবস্থা দেখে কল্যাণীকে বলতে হল অগত্যা, দাও বাপু একটু লেবুর রস।

ব্যস, আর যায় কোথায়! আস্তো একটা লেবু দু'টুকরো করে কল্যাণীকে বললেন, হাঁ করো।

কল্যাণী হাঁ করতেই জিভের উপর একটুকরো মিছরি ছেড়ে দিয়ে পরিগ্রাহী লেবু নিঙরোতে শুরু করলেন লোকটি। অম্ল-মধুর, তিক্ত-কষায় বিচিত্র স্বাদে মুখ বিকৃত করে ফেলল কল্যাণী।

এই দ্যাখো, যতো চোরের ঝাড, পয়সা নিলে বেশি, অথচ কমলাটা বাজে দিয়েছে। দাঁড়াও।

বলে আর একটা মিছরির চাকা ওর জিভের 'পরে ছাড়লেন।

কল্যাণীর আর হাঁ করবার ইচ্ছে ছিল না। তার গাল বেয়ে, গলার ভিতর নাহলেও বাইরেটা পুরো ভিজে গিয়েছে। কিন্তু কে তার কথা শোনে! পিসিমা বলতেন, রোগীর ইচ্ছেয় তো আর তিগিচ্ছে না। কল্যাণী তো কাহিল।

এদিকে ছোট ভাই ডাক্তার নুটবিহারী যতবার ঘাটশিলা থেকে অবস্থা জানতে চাইছেন, বলছেন, দরকার হলেই সস্ত্রীক চলে আসবেন, জানান, ততোবারই বিভূতি-ভূষণ আসতে বারণ করছেন। প্র্যাকটিস বন্ধ করে এলে রোজগার নষ্ট হবে। আমাদের জন্য কোন ভাবনা নেই।

উমা দ্রুত ঘাট থেকে ফিরে এসে কাণ্ড দেখে অবাক। বড়মামাও অপ্রস্তুত।

এ সময় যা ভয়, তাই ঘটল। কল্যাণী তখন সংজ্ঞাহীন। এই অবস্থাতেই ওর একটি কন্যাসন্তান জন্মাল ভাদ্রের চার তারিখ। মাত্র তিনদিনের বেশি রইলো না সে ও'দের ঘরে। ভাদ্রের সাত তারিখে তার মৃত্যু। এটা ইংরাজি আগস্ট, উনিশ শ' বিয়াল্লিশ। পাড়াপড়শীরা সান্ত্বনা দিলেন। এজন্য দুঃখ করতে না বললেন। বাইরে তা শুনলেও বুকের গোপন কান্না লুকোবেন কি করে ও'রা একে অপরের কাছে! জীবনের প্রথম সন্তান—প্রথম স্বপ্ন ছিল যে ওই শিশু। তাকে ইছামতীর তীরে একটি মনোরম লতা-ঝোপের তলায় সমাধিস্থ করে এলেন নিজের হাতেই বিভূতিভূষণ।

ঘরের হাওয়া ভারি হয়ে উঠছে। যেন দম আটকে যাচ্ছে। নিজের ভাগ্য তো এমনিই! বিভূতিভূষণের কেবল আঘাতের পর আঘাত। ভাবলেন, কল্যাণীকে এ সময় ওর মা-বাবার কাছে রাখলে কিছুটা যদি শান্তি পায়। বললেন, চলো, কোলাঘাট যাই।

একটা সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়ে ভাদ্রের পনের তারিখে কল্যাণীকে নিয়ে কোলাঘাট এলেন। পূজার দিনগুলি ওখানেই কাটলো। ইতিমধ্যে ষোড়শীবাবুর বদলির হুকুম

এলো ঝাড়গ্রামে। কল্যাণী-উমাকে নিয়ে ও'দের সঙ্গেই ঝাড়গ্রাম গেলেন বিভূতি-ভূষণ। ওদের রেখে কলকাতায় চলে এলেন নিজে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন। বইপাড়ায় ঘুরলেন। ইতিমধ্যে তাঁর 'অনুবর্তন' বেরিয়ে গিয়েছে জুলাই মাসে। তার আগে বেরোয় শিশু উপন্যাস 'মিসমিদের কবচ' এপ্রিলে। সম্প্রতি বেরোল অপরাজিত রচনাকালের দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর'। প্রকাশকদের কাছ থেকে কিছু পাওনা আদায় করে কল্যাণী-উমাকে নিয়ে ঝাড়গ্রাম থেকে একেবারে ঘাটশিলা।

স্কুল খুলেছে খুলুক। শরীর মনটা তো আগে সারুক কল্যাণীর। ওকে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন ঘাটশিলার চারদিক। দেখতে দেখতে বছরটা শেষ হয়ে গেল।

ইংরাজি নববর্ষের এক উৎসবে যোগ দিতে গেলেন চাইবাসা। সেখানে ভাগ্যক্রমে দু'জন ফরেস্ট অফিসার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সিনহা এবং শ্রীহরদয়াল সিনহার সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় আগেই হয়েছিল ঘাটশিলায়। এখন তিনি বিহার সরকারের কনজারভেটর অব ফরেসট হলেও, তখন ছিলেন ডিভিশনাল ফরেসট অফিসার। বললেন, আপনি বন ভালবাসেন, বামিয়াবুরু, চিটিমিটি, জাতে—এসব দেখেছেন?

বিচিত্র নাম! কোথায় সে-সব? বিভূতিভূষণ উৎসুক।

যোগীন্দ্র সিনহা বললেন, সারাণ্ডায়।

সারাণ্ডা! প্রায় চমকে উঠলেন। সেই প্রায় দশ বছর আগে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে করনেল ডালটনের লেখা বইয়ের পাতায় যার বর্ণনা পড়েছিলেন, ভারতের সেই বিখ্যাত অরণ্য সারাণ্ডা। সুযোগ আছে দেখবার?

নিশ্চয়। চলুন আমার সঙ্গে।

বিভূতিভূষণ তৈরী। আর দেরি নয়। কল্যাণীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—পরের দিনই, জানুয়ারির তিন তারিখ, উনিশ শ' তেতাল্লিশ। একেই তিনি বলেছেন 'আমার আসল বনভ্রমণ শুরু'।

এ তাঁর বারাকপুরের বাঁশবন, সোঁদালি ঝাড় বা ঘেঁটুর জটলা নয়—'শ্বাপদ সঙ্কুল, ব্যাঘ্র-গজ-অধ্যুষিত, ধনেশপাখী-ময়ূর-নিনাদিত, সপ্তশৈলযুক্ত, চারশত বর্গ মাইলব্যাপী অরণ্য-নিবিড় ভীমকান্ত সারাণ্ডা। রূপ দেখে দু'জনেই বিহ্বল। অসম্ভব এর বর্ণনা দেওয়া; তবে, বিভূতিভূষণের মনে হয়, এর গম্ভীর মহিমার বর্ণনা দিতে পারেন কেবল তিনি—উত্তররামচরিতের রচয়িতা মহাকবি ভবভূতি।

শাল, ধ, আসান, লুদাস, অর্জুন, আম্দি, পঞ্জন, করন্দ, কুঞ্জরি, কর্কট, বাঁশ, বোগান, বেল, আম, গাব, বেত, পাটডুমুর, গাচাকেন্দু, ধাওড়া, রাজাজহুল, শিববৃক্ষ—কতো ধরনের যে গাছ। একসঙ্গে জড়িয়ে অনেক জাত নেই। যেখানে শাল—শালই। শিববৃক্ষ তো কেবলই শিববৃক্ষের বন। অর্জুন তো অর্জুনই সই। জড়িয়ে থাকে লতাশ্রেণী। কাছাকাছি থাকে নানা ফুলের গাছ। অশ্বগন্ধা, টিহরলতা, স্বর্ণলতা, সর্জনলতা, আলোকলতা, লতাপলাশ, কাংগা। তারই পাশে পড়শী, পিয়াল, মলুয়া, পিটুলিয়া, পিয়াসাল, গোলগোলি, দেবকাঞ্চন, বন্যকাঞ্চন, কামিনী, বকুল, নাগকেশর। আছে দারুচিনি, কন্দমূলও। সব মিলিয়ে এমন একটা মিশ্র সৌরভ, সারা পথ বাতাসে যেন গাজিপুরের দামী আতরের গন্ধে ভুর ভুর করে। তবে কথা হল এত গাছপালার নাম পেলাম কোথায়? খুঁজলেই জানা যায়। আর সেটা খুঁজে জানাটাই বিভূতি ভূষণের নেশা। কোথাও তিনি 'নাম-নাজানা পাখি, অচেনা ফুলের গন্ধ, কত বিচিত্র বৃক্ষরাজি' এমনি কথায় নেই। সব খুঁটিয়ে জানো, তবে হল। নেহাৎ নাম না পেলে

বানিয়ে নামকরণ করা। যেমন—নাম-নাজানা ধূসর বলকল, বলিষ্ঠ ঋজু বৃক্ষশ্রেণীর নাম দিলেন—শিববৃক্ষ। বিভূতি-কল্যাণী দু'জনেই যেন নেশাগ্রস্ত।

আবার সে নেশা ছুটে যায় অকস্মাৎ চমকে-দেওয়া ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাঁকোর হাঁকোর আওয়াজে। কল্যাণী কেঁপে ওঠে; বাঘ! কোথায় বাঘ?

পাহাড়ী ঝরনার ঢল মাঝে মাঝে জলাশয় সৃষ্টি করেছে সে অরণ্যে। সঙ্গী যোগীন্দ্রনাথ টর্চ মেরে দেখালেন, বেশি দূরে নয়, ওই কাদায় বাঘ, হাতী, বাইসন, সম্বর, বুনোশুয়োর—কত জন্তুর যে বিচিত্র পায়ের ছাপ। জায়গাটা চিটকেল সোরার কাছাকাছি। সে বনান্ধকারে দিনের বেলাতেই স্পষ্ট কিছু দেখতে হলে টর্চ চাই। কল্যাণী অতগুলো জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে ঘাবড়ে যায়, আর এগোবে কি?

নিশ্চয়।—বিভূতিভূষণের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছে। 'জানো, প্রকৃতিদেবী তার সৌন্দর্য মানবচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চায় নানা ভয়-বাধার বেষ্টনী দিয়ে। তাকে জয় করতে হয় সাহস, সাধনা আর প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসায়, তবেই উত্তোলিত হয় সে রহস্যালোকের যবনিকা, যেমন হতে শুরু করেছে আমাদের সামনে।'

যোগীন্দ্র সিনহাও বাঙলা বোঝেন ভালো। ও'র কথা শুনে অবাক হন। এমন বনভ্রমণকারী এর আগে তিনি পাননি সারাণ্ডায়। বললেন, সত্যিই, আপনাকে নিয়ে বনভ্রমণের এ অভিজ্ঞতা আমারও স্মরণীয় হয়ে থাকবে মিঃ ব্যানারজি।

বিভূতিভূষণ বলেন, আমিও কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম আপনার কাছে মিঃ সিনহা। 'এ জিনিস যে না দেখলে, তার পক্ষে 'যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু' আওড়ানো বৃথা। ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক আর না হোক, আমি স্বর্গে যাই না-যাই—এসব ভাবনা আমার নেই।'

কথা বলতে বলতে আরও নিবিড় অরণ্যে ঢুকে পড়েন ও'রা। হঠাৎ যেন ঘাসের মাঠ! টর্চের আলোয় একটা সেতু ভেসে উঠল ওই বনের মধ্যে।

ও জিনিসটা কী এখানে? একসঙ্গে দু'জনের প্রশ্ন।

মিঃ সিনহা বললেন, ওটা বাঘের পুল।

বাঘের পুল? মানুষে কেন পুল বানাতে গেল বাঘের জন্য?

ওখানে বন্য শণের মাঠ দেখছেন না। ঘাসের মধ্য দিয়ে চলাফেরা বাঘের পছন্দ নয়। গায়ে চোরকাঁটা বিঁধে কাবু করে দেয়।

তাহলে পুল পেয়ে এইটেকেই ওরা চলাচলের সদর সড়ক করেছে নিশ্চয়!

ওই দেখুন। মিঃ সিনহা পুলের মুখে টর্চ ফেলতেই চকচক করে উঠল বাঘের পায়ের ছাপ। বিলকুল তাজা—প্রকাণ্ড পাঞ্জা!

সেই পাঞ্জার ছাপের উপর দাঁড়িয়ে আনন্দে শিশুর মত নৃত্য করতে থাকলেন বিভূতিভূষণ—এই যে বাঘের চৌরঙ্গী।

হঠাৎ পাশ থেকে গম্ভীর ব্যাঘ্রগর্জন। মুহূর্তে থেমে গেলেন। পরমুহূর্তেই আবার নৃত্য-গান একসঙ্গে—এসো ভাই, সবাই আমরা একসঙ্গে চলি।

যোগীন্দ্র সিনহা জীবনে ভুলতে পারেননি এ অভিজ্ঞতা। আবার ও'দের নিয়ে এগোন। হাতে ঘড়ি নেই বিভূতিভূষণের, বেলা আর আছে কিনা বোঝা দায়। সব সময়েই তো আধা-অন্ধকার। যোগীন্দ্র সিনহা বললেন, এবার ফিরুন, সন্ধ্যা হয়েছে।

বনে আবার দিনরাত পার্থক্য করার দরকার কি? সবই তো এক, চলুন না, শুধু ঘুরি।

না, বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া সবই তো আছে। তাছাড়া রাতের অরণ্য একান্তই

আরণ্যক। মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়।

কী হতে পারে? বিভূতিভূষণের জিজ্ঞাসা।

কী না হতে পারে বুঝি না।—মিঃ সিনহার উত্তর।

কথা থেমে যায়। সামনে ওটা কী?

বনানীর সেই রহস্যগভীর গোপন অন্তরালে ঝিলিক মারছে এক গম্ভীরদর্শন জলপ্রপাত। নিচে একটি ছোট সরোবর, নাম—টোরেবু।

টর্চের আলোয় দেখলেন, মাছ কিলবিল করছে সে সরোবরে।

এতো মাছ! টোরেবু মানে কি মাছের আড্ডা নাকি?

না, মোচড়ানো ঘাড়।

নামের অর্থ শুনে সেই অন্ধকার অরণ্যে শিউরে ওঠে কল্যাণী। চলো মানকু, ফিরে যাই রেসট-হাউসে।

দাঁড়াও বুঝে নিই। এ-রকম নামের কারণ কি মিঃ সিনহা?

তিনি যা বললেন তা শিউরে ওঠা কাহিনীই বটে। এক হো-জাতীয় লোক স্ত্রীকে নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিল এখানে। মাছ ধরে ধরে সে ডাঙার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর, স্ত্রী লুফে লুফে নিচ্ছে। একবার আঁতকে উঠল স্ত্রী, মাছের বদলে তার হাতে এলো স্বামীর সদ্যছিন্ন মুণ্ডটি। সেই থেকে ওই নাম। বন্য অপদেবতার ভয়ে আর কেউ আসে না এখানে মাছ ধরতে।

কলকাতা বসে এ-রকম কাহিনী আষাঢ়ে গল্প মনে হবে। কিন্তু ভীমরূপ সারাণ্ডার বনান্ধকারে চলতে চলতে প্রতি পদে এ-রকম ভয়াল ঘটনার সম্ভাবনাই মনে হবে স্বাভাবিক।

গভীর বন থেকে কুকুর ডাকার মত শব্দ। না, কুকুর নয়, বারকিং ডিয়ার, এক বিচিত্র ধরনের হরিণ। আবার বন চিরে ওঠে সম্বর হরিণের চিৎকার, ময়ূরের কেকা। তার সঙ্গে মিশে যায় পাহাড়ী ঝরনার কলধ্বনি, সুউচ্চ শৈলশিখর থেকে নিচে খাড়া আছড়েপড়া জলের শিলাহত প্রতিধ্বনি। পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে রাঙা-ধুলো-মাখা হাতী। হাতীর উপদ্রব সর্বত্র। কিন্তু বিভূতিভূষণের মনে হয় 'পদে পদে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের ভয় এই অরণ্য-সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়েই তুলেছে'।

রেসট হাউসে ফিরে মিঃ সিনহা ওঁদের বলেন, রাতে কিন্তু জানালা-দরজা কিছু খুলবেন না মিঃ ব্যানারজি। হাতীগুলো বড় বদমায়েস। রাতে বারান্দায় ঘুরঘুর করে! এমনকি দরজায় শুঁড় দিয়ে এমনভাবে নাড়া দেয়, যেন কেউ এসেছে! আর এই ভুল করে কত লোক যে দরজা খুলে প্রাণ দিয়েছে।

বিভূতিভূষণ কিন্তু জানলা বন্ধ করলেন না। কল্যাণীকে বোঝালেন, কেউ এসে পড়লেই জানলা বন্ধ করা যাবে। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে আছি।

কল্যাণী জানে এমন পরিবেশে ওঁকে ফেরানো শক্ত' জ্যোৎস্না উঠেছে। কেবল বলছেন, দ্যাখো মানকু, দ্যাখো, চন্দ্রকরোজ্জ্বল বনভূমির কী অসহ্য সৌন্দর্য!

অনেক রাত পর্যন্ত কল্যাণীও বসে রইল ওঁর পাশে খোলা জানালায়। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত ছিল। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। রাত প্রায় ভোর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে স্বামী তাঁর তখনও বসে আছেন নির্নিমেষনেত্র। অরণ্যের রাত্রিরহস্যে ডুবে আছেন।

এ কী করেছো তুমি? একটু শুলে না সারারাত?—কল্যাণী অনুযোগ করে।

জবাব দেন সম্মোহিত বিভূতিভূষণ, 'বাঙলাদেশে ঘেঁটুফুলের যে সৌন্দর্য দেখেছি তা সুন্দর, লিরিক কবিতার মত মিষ্টি। কিন্তু এই গম্ভীর অরণ্য, উদ্ধত শৈল-

মালা, প্রস্তরমণ্ডিত নদী-নির্ঝর, আলোকময় বিশাল আকাশপট আর ভয়াল বন্য-জন্তুর বিচরণ—এই নিয়ে যে সৌন্দর্য—এ যেন প্রকৃতির এপিক কাব্য রচনা!'

এর পর একটু থেমে বলেন, 'কিন্তু মনে হয় এ গম্ভীর মহাকাব্য সকলের জন্য নয়। তুমি জানো না কল্যাণী, রাত ঠিক দুটো, আর সামলাতে পারলুম না নিজেকে, বাঙলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু তোমায় বলছি, একটু পরেই ফিরে এলুম। সে-দৃশ্য সহ্য করতে পারা যায় না। মনকে স্তব্ধ করে, অভিভূত করে, ভয় এনে দেয়।'

তবু যেন কী এক নেশা তাঁকে টানে, দুর্নিবার আকর্ষণে টানে। উচ্চতম শিখরে দাঁড়িয়ে গোটা বনের চেহারা দেখতে হবে। সাড়ে তিন শ' ফুট উঁচু শংশাদ বুরু-সারাণ্ডার উচ্চতম শিখর। হামাগুড়ি দিয়ে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, ক্ষত-বিক্ষত পায়ে সেখানে উঠলেন। নিচে, চারদিকে কী অবর্ণনীয় শোভা—'চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণীসরসা'। শ্যামমেখলা ধরণীর সে-রূপে তিনি বিহ্বল হয়ে যান।

একদিকে চোখ পড়তে হঠাৎ চমকে ওঠেন, যেন সবুজ একখানি গালিচা বিছানো, তার উপর কয়েকটি খেলাঘর। একখানা ছবি। মিঃ সিনহা বলেন, সরগুজা ক্ষেতের মধ্যে ও একটা হো-পল্লী। পথে পথে বাঘের চলার ছাপ, বিরাট পাইথনের টাটকা-ছাড়া খোলস। বুনো হাতী দাঁত দিয়ে গাছের বাকল সদ্য তুলেছে তার চিহ্ন, এমন পরিবেশে কয়েকখানা পাতার কুঁড়েঘরে কারা থাকতে পারে? দেখতে গেলেন পরদিন বিকালে।

ছোট্ট গ্রামটির সামনের খোলা জায়গায় মেয়েরা বুনো খেজুরপাতার চাটাই বুনছে, গান করছে, নাচছে। এক মনোহরণ পরিবেশ। অকারণ হাসছে তারা ও'দের দেখে। শুধু অকার। পুলকে। আবার বলছে, জোমপে, জোমপে!—অর্থাৎ ভাত রান্না হয়েছে, খেতে চলো আমাদের সঙ্গে।

বড় বড় মেটে হাঁড়িতে করে সীতাশাল চালের ভাত। ডাল-তরকারি আর কিছু নেই, এমনকি নুনও না।—শুধু ভাত খেতে কষ্ট হয় না? প্রশ্ন শুনে ওদের আর এক প্রস্থ হাসি।

শুধু ভাতে এমন নিটোল স্বাস্থ্য!

মিঃ সিনহা বলেন আরও আশ্চর্য কথা, কখনো-সখনো বনের ধান নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভাতও খেতে পায় না, খায় কন্দমূল সিদ্ধ করে। ওরা বাইরে যায় না কিছুর জন্য। বন্য কার্পাস দিয়ে মোটা কাপড় বুনে পরে, তেল বানিয়ে নেয় করঞ্জা আর মহুয়ার বীজে। ওরা স্বয়ম্ভর। বনের মাঝে মাঝে এমনি পাঁচ-ছ'খানা ঘরের ছোট ছোট পল্লী খুঁজে পাওয়া যায়। এও বনের ছন্দে সুসমঞ্জস।

একদিন দেখেন হাট বসেছে পাহাড়ের নিচে। কয়েকটি হো তরুণী একটি মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ও'দের দিকে চেয়ে হাসছে। কল্যাণী চিনে ফেললে একটি মেয়েকে, ওই তো সেই কুঁইরাগ্রামের বুধনী কুঁই।

কুঁই হল কুমারী মেয়েদের পদবী। চিনতে পারায় বুধনীও খুশি। এগিয়ে এলো, বাবুরা হাট দেখতে এলি?

কল্যাণী বলে, হাঁ, এ-মেয়েগুলি কোত্থেকে?

আমার বন্ধু।

কি কিনবিরে হাটে?

কিছুই না।

তবে এসেছিস কেন?

কী বলবে বুধনী কুই? শুধু হাসল শিশুর মত উচ্ছলিত হাসি।

আসলে কেউ কিছু কিনুক না-কিনুক সেজেগুজে হপ্তার হাটে আসা চাই। এটা একটা আনন্দের পরব। চুলে করঞ্জার তেল, খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা করে বাঁধা, তাতে বন্যফুল গোঁজা। পুরুষদের হাতে তীরধনুক। ওদের মাথায়, চারপাশে মহুয়ার ফুল ঝরে পড়ছে টুপটাপ। সামনে দূরে নীল শৈলমালা।

এই ঐশ্বর্যের জন্যই অত অভাবেও দুঃখবোধ নেই, অতৃপ্তি নেই ওদের। কিন্তু ক্রমপ্রসারমান নগর সভ্যতার কুঠার একদিন হয়ত ওই বন নির্মূল করবে, আঘাত হানবে ওদের আনন্দোচ্ছল নিষ্পাপ জীবনের 'পরে, তখন?—বনবিভাগের রিপোরট আছে, কাননের বেড়া না দিলে মাত্র দু'বছরে নাকি একটা দশ বর্গ মাইলের বনভূমি কাবার হয়ে যায় মানুষের কুঠারাঘাতে! তেমন হলে, কেমন করে ওরা আড়াল দিয়ে লুকিয়ে চলবে ওদের নৃত্য-গীতমুখর জীবনের আনন্দধারা নিয়ে?—ভাবনা-বিভোর বিভূতিভূষণ।

ওঁর এ-রকম তন্ময়তার একটি সুন্দর কাহিনী বলেছেন যোগীন্দ্রনাথ সিনহা। বিহার সরকারের চীফ কনজারভেটর অব ফরেসট—এই মানুষটিকে যে অঞ্জন পরিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ, তা দিয়ে তিনি দেখতে শিখলেন নতুন করে অরণ্যকে। হলেন কবি, কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'বনলক্ষ্মী', 'পাহাড় কী পুকার' বইগুলি এর সাক্ষ্য। আর এই নবজীবনে তাঁকে দীক্ষা দিলেন বিভূতিভূষণ। 'বনলক্ষ্মী' বইয়ের ভূমিকায় তাই তিনি বিভূতিভূষণকে বলেছেন তাঁর 'সাহিত্যজীবনের গুরু'। গুরু প্রণাম সেরে শুরু করেছেন লেখা। আজ তিনি হিন্দী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। এবং আজও তিনি বলেন—আমার গুরু বিভূতিভূষণ। বিহার সরকারের বন-স্মরণিকায় বিভূতিভূষণ সম্পর্কে তিনি লিখছেন—'হি কোচ্‌ড মি অলমোসট ফ্রম দি কিনডার-গারটেন স্টেজ ইনটু রাইটিং সর্ট স্টোরিজ অ্যানড নভেলস অ্যানড টট মি হাউ টু টার্ন টয়েল ইনটু থ্যাংকসগিভিং ডিলাইট বাই সাব্‌লিমিটিং ইট ইনটু লিটারেচার'।

যোগীন্দ্র সিনহা যে কাহিনীটি এখানে বলেছেন, তাতে বিভূতিভূষণেরও অলিখিত একটি কাহিনীর আভাস পাওয়া যাবে। আরও বোঝা যাবে, মনসাপোতার মেলা থেকে ফিরতি পথে দূরে কিছু লোককে আগুন জেলে গুড় জ্বাল দিতে দেখে যে অপূ আকৃষ্ট হয়েছিল আজও সে তেমনি আছে এই লোকটির মধ্যে।

সারান্ডার নিবিড় অরণ্যের মধ্যে যে-সব রেসট হাউসে তাঁরা ছিলেন, তার একটি হল বামিয়াবুরু রেসট হাউস।

কল্যাণী ক্লান্ত। সেদিন তাকে রেসট হাউসে রেখেই বেরিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ আর যোগীন্দ্রনাথ সিনহা। বেরিয়েছিলেন দুপুরে। ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা উৎরে গেল অজান্তেই। মিঃ সিনহা অভিজ্ঞ লোক, এবার ফিরবার তাগিদ দিলেন। কিন্তু দূরে শালবনের ফাঁকে কিসের আগুন দেখা যায়?

একটা হো-পল্লী।—মিঃ সিনহা বললেন।

শুনেই সেদিকে এগিয়ে চললেন বিভূতিভূষণ, অগত্যা যোগীন সিনহাও। এগোতে এগোতে কানে এলো বাঁশির তানের সঙ্গে গানের মিঠে সুর।

ছোট বনঝোপের মধ্যে পাতায় ছাওয়া কুটির। কাঠের কুন্ড জ্বলছে সামনে। আগুনঘিরে বসে আছে আদিবাসী হো ছেলেমেয়ের দল। যুবতীরা চাটাই বুনছে সেই আগুনের আলোয়। কিছুটা দূরে দুই যুবক বাজাচ্ছে বাঁশির। পদটা শুনে নিলেন বিভূতিভূষণ, ওরা বলছে—

আও প্রিয়ে, মাঘী পরব আগয়া
হমলোগ মিলকর নাচে।—

গানের সুরে জবাব দিচ্ছে যুবতীরা—

আতী হুঁ, জরা ঠহরো, চটাই বুনলু।

যুবকদের পাল্টা জবাব—

জলদী আও, কবতক খাড়া রহু?
মুঝে ভৈস চরানে জানা হৈ॥

কী রোমাণ্টিক জীবন-নাট্যধারা এই ভয়াল অরণ্যের গহনে প্রবাহিত!

চলুন। মিঃ সিনহা বিভূতিভূষণকে তুললেন। লোকটি উঠলেন বটে, তবে বেশ বোঝা গেল—উনি তখন আচ্ছন্ন। মুখে বলে চলেছেন, আঃ, এই গান—বাঁশির তান. ওদের এই অকলুষিত আত্মা—কী শান্তি, কী শান্তি!

হাঁটছেন আর বলে চলেছেন. ভ্রান্ত মানুষ ভাবে ঐশ্বর্যে সুখ। দেখে না কী ঐশ্বর্য এই অরণ্যলালিত পর্ণকুটিরে।—

এমনি বলতে বলতে এক সময় চুপ মেরে গেলেন। থেমে গেল কি ভাবনা? না, এবার ভাবনাধারা অন্তর্বাহী। মাথায় চলছে গল্পের বুনট। তা বোঝা গেল একটু পরেই। এবং বোঝা গেল, বিভূতিভূষণ তখন যে ভুবনে, সেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবে কোন ভেদাভেদ নেই।

এই সঙ্গীতময়ী তরুণীদের একজনকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি শহরে নিয়ে আসে?

যদি কেন এ'ব মনে হল, তাই যেন ঘটে গিয়েছে। এক ঠিকাদার এদের একজনকে কলকাতা নিয়ে এসেছে ঠকিয়ে। প্রথম ক'দিন বেশ লাগল যুবতীর এই মহানগরীর চমকদমক। কিন্তু ক'দিন? এক সময তার কানে পৌঁছায় পাহাড় কী পুকার—পাহাড়ের আহ্বান। ওই ডাক শুনে শুনে মন তার পাগল। দেহের বন্ধন ছিন্ন করে তার মন ছুটে যায় সেই পর্ণকুটিরেব আঙিনায়, যেখানে তার সুজন ডাকছে—আও প্রিয়ে মাঘী পরব আ গয়া।

একদিন সে সত্যিই বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথায়. কেমন করে যাবে? কোন্ দিকে তার ঘর সে তো জানে না! তবু সে থামে না. পাহাড় কী পুকারে চলে অজানা অচেনা পথে, বিপথে। চলে চলে শ্রান্ত সে, ক্লান্ত সে. সে দিকদিশেহারা। পথের পাশেই একটা চায়ের দোকান। সেখানে কেউ তাকে যত্ন করে চা খাওয়ালে। একটা কাজও জুটল সেই চায়ের দোকানে। আশ্রয় তো জুটল একটা।

কিন্তু কোন্ আশ্রয়? পাহাড় কোথায়? কাজের ফাঁকে আনমনা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আকাশের দিকে চেয়ে থাকে—কোথায় তার ঘর!

ভাবনার বুনোট এ পর্যন্ত হতেই রেসট হাউসে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। ও'দের দেরি দেখে উদ্‌বিগ্ন মনে কল্যাণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বারান্দায় পা দিয়েই আঁতকে উঠলেন যেন বিভূতিভূষণ. এ কী! কল্যাণী, তুমি! তুমি কী করে এই চায়ের দোকানে এলে?

কল্যাণীর অভিমান হল. আমাকে এতক্ষণ একলা ফেলে রেখে আবার রসিকতা করছো!

কৌতুক দেখছিলেন যোগীন্দ্র সিনহা।

চমক ভাঙলো বিভূতিভূষণের। লজ্জাবোধ 'ল এতটা আবিষ্ট হওয়ার জন্য।

বললেন, চা দেবে না কল্যাণী! দাও, ব্যাপারটা খুলে বলছি।

তারপর চায়ের টেবিলে বসে বললেন ব্যাপারটা। কাহিনীটার বুনোট যেমন শেষ হল না, বাঙলাদেশ পেল না একটা নতুন গল্প।

তবে অরণ্যে বসে আর একটি বই তিনি লিখে যাচ্ছিলেন—দেবযান। সেটি পাঠক পেয়েছে।

সেবার প্রায় দেড় মাস বনবাসের পর ঘাটশিলা ফিরলেন দু'জনে। মনকে ঠিক ফেরাতে পারলেন না। বছর না ঘুরতেই নবেম্বরের আট তারিখ আবার মিঃ সিনহার চিঠি পেয়ে বেরোলেন। ঘুরলেন পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত। এবার একলা। একলা বেরিয়েছেন এর পরেও উনিশ শ' ছেচল্লিশে। কখনো সারাণ্ডা, কখনো কোলহান ফরেসট। দুটিই পাশাপাশি বিশাল অরণ্য। কোথাও সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ, কোথাও হরদয়াল, কোথাও মিঃ গুপ্ত। কতো বিচিত্র সে ভ্রমণ! মহুয়াতলের নৃত্যগীতমুখর হো-পল্লী—নাম বনগ্রাম। আবার মানুষ যেখানে মানুষেরই চামড়া দিয়ে লোহার ঢোল বা নাগরা ছেয়ে বাজায়, উন্মত্ত নৃত্য করে সেই পল্লী ছোটনাগরা। সারাণ্ডা-কোলহানের মধ্যে কত বিচিত্র নামের এলাকা—চিটিমিটি, পেটাপেটি, রুথাউলি, নরজুলী, জাতে, থলকোবাদ। দেখে দেখে আত্মহারা। আত্মবিস্মৃত নন। সারাণ্ডার ডায়েরিতেই হঠাৎ লেখা হয় 'বাঙলাদেশে এখন বনধুঁধুলের হলদে ফুলে ভরে গিয়েছে.' 'কল্যাণী এখন ঘাটশিলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাচ্ছে, এই সন্ধ্যায় কল্যাণীর কথা বড় মনে হচ্ছে'।

আবার লিখছেন, 'গৌরীর কথা মনে পড়ে'। 'অনেক দূরে ইছামতীর পারে একটি তেতলা বাড়ির উপরের ঘরটিতে—সেখানে এখন কেউ থাকে না। যে ছিল অনেককাল আগে সে চলে গিয়েছে। ভগবান তার মঙ্গল করুন।'

স্মরণে আসছে 'একটি আত্মীয়া বধূ বলেছিল, দাদা, তারকেশ্বর কোন দিকে?

কেন?

সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে।

গেলেই হয়—বেশি দূরে তো নয়।

পয়সায় কুলোয় না। উনি যা পান তাতে—।'

'সত্যিই এদেশে কতো প্রাণে কত অতৃপ্তি! কত দুঃখ! আমার মত দরিদ্রকে যিনি এই মহান রূপ দেখালেন জয় হোক জীবনের সে অধিদেবতার'। 'আমি না থাকলেই বা কি? এই অপূর্ব শিল্প যিনি সৃষ্টি করেছেন যুগে যুগে তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দর ভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোক-লোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল ধরে একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সবল, চপল, আনন্দোচ্ছল নৃত্যছন্দে হেসে গেয়ে।'

এই বিশ্বরূপের জগতে চলার ছন্দে ছন্দ মেলাতে বারে বারে তাই তাঁর ছুটে যাওয়া। আবার বুঝি ভয়ও হয় ওই বিরাট শিশুর বিস্ময়কর রূপসৃষ্টির লীলা-খেলার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে—সামান্য মানবশিশুর। দিনলিপিতে লেখা 'তুমি আমাকে ভালোবেসে এখানে এনেচ, তোমার এই বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ কবার সুযোগ দিয়েচ। কিন্তু আমি তোমার এই বিরাট রূপের সামনে দিশেহারা হয়ে যাই দেবতা। আমার সেই তিৎপল্লাফুলের ঝোপই ভালো। বনশিমতলা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভালো। তোমার রূপ দেখে আমি ভয় পাই।'

আরণ্যক প্রকাশের আট বছর পর নতুন সতেরো পাতা সংযোজনের খসড়া।—নোটবুক ৮. ২. '৪৭।

ডাকিনী, হাঁকিনী, লাকিনী, ফেৎকারিণী—এসব তন্ত্রের বুঝিস কিছু? উচ্চতন্ত্রের ক'হাদি সাধনা পর্যন্ত কতো পথ! দিব্যঘোঁ পথ কাকে বলে, জানিস? তন্ত্রমন্ত্র সাধন-ভজন অতো সোজা কথায় বুঝতে চাস? যা, ঘরে যা উঠে।

উঠলেন বটে বিভূতিভূষণ, কিন্তু আন্দাজ করলেন ধমকের তাপটা অনেক কম। এবার দেখা যাক, কতোদিনে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই বারাকপুরেই যখন তাঁর দর্শন মিলেছে, তখন ছাড়ছেন না তিনি কিছুতেই ওই ভৈরবীকে। সারাণ্ডা থেকে ফিরেই দেখেন উনি অধিষ্ঠিতা।

বয়েস ত্রিশের কোঠায়, দেহ নিটোল, ঈষৎ তামাটে বর্ণ। ডান হাতে ত্রিশূল, চিমটে কমণ্ডলু বাঁ হাতে, ঘামে লেপটানো কপালে তাজা রক্তের মত সিঁদুরের ত্রিপুণ্ড্রক—ঝমঝমে দুপুরে গোপালনগর হাটের পথ থেকে মাঠে নেমে এই অদ্ভুতদর্শনা নারী যেদিন খড়মের আওয়াজ তুলে এগোন ছোট্ট গ্রামখানিতে সেদিন দারুণ চাঞ্চল্য। দূরত্ব বজায় রেখে সবাই তা দেখছিল, কাছে যেতে সাহস হয়নি কারও।

তাঁরও ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথমে গেলেন ইছামতীর বাঁওড়েব ধারে। সেখান থেকে সটান চটকাতলার শ্মশানটার কাছে। চারদিক তীক্ষ্ম দৃষ্টি চালালেন, বেশ খুশি-খুশি ভাব করলেন। দক্ষিণ দিকের বনপ্রান্তে ঝুড়িনামানো বিশাল বটগাছটার তলায় ঝোলা-কম্বল নামিয়ে সেই অধিষ্ঠান হল ও'র।

ও'দের বিষয়ে শ্বশুর ষোড়শীকান্তর কাছে বহু কথা শোনা আছে. আছে কৌতূহল অশেষ। স্কুলে যাতায়াতের পথটা বদলে রোজ কিছুক্ষণ করে এখানে দাঁড়িয়ে যান বিভূতিভূষণ। ধরনধারণ লক্ষ্য করেন ভৈরবীর। অল্প দিনেই নানা কথা ছড়িয়ে পড়েছে। গাঁয়ের চাষীরা আসে জলপড়া, ধুলোপড়া নিতে। তারাই ও'র চাল-কলা-দুধ জোগায়। খোরাক চলে তাতেই। সব মানত নাকি ফলে তাদের। একেবারে খাঁটি ভৈরবী।

প্রথম দিকে দু'চারজন তাগড়া গে'জেল জুটবার চেষ্টা করেছিল বিশেষ বিশেষ সংযোগ। তেমনি 'হ্রী' দিয়ে তারা ও দুর্গাবীজ, ভদ্রকালীবীজ হল 'কিলি-কিলি' ইত্যাদি বিদঘুটে মন্ত্র কিড়মিড় করে।

কিন্তু আপাত-বিদঘুটে ওই শব্দগুলি তান্ত্রিক বা অভিচারসিদ্ধদের কাছে অর্থহীন নয়। যেমন এই 'ক্রী" হচ্ছে কালীবীজ। এর 'ক' হল সর্গাদ্য, পরমেশ্বর-স্বরূপ, 'র'তে বহ্নি, রতি বোঝাতে 'ঈ' এবং তাতে বিন্দু (ँ) অর্থাৎ মহাশক্তিবীজ সংযোগ। তেমনি 'হ্রী" দিয়ে তারা ও দুর্গাবীজ, ভদ্রকালীবীজ হল 'কিলি-কিলি' ইত্যাদি। এসব গুহ্যমন্ত্র বলেই দুর্বোধ্য। তাই ভয়।

কারো ধারণা, ওসব ছিটেমন্তব, লাগলেই রক্ত উঠে হয়ে গেল। কেউ বলে, গভীর রাতে কান পাতলে শোনা যায় ভৈরবী পাড়ায় পাড়ায় নিশি ডেকে ফিরছে। কারও খবর, রাতে যান উনি চটকাতলার শ্মশানে—সে-সব অনেক ব্যাপার। কী ব্যাপার তা জেনে কাজ নেই!

কিন্তু বিভূতিভূষণের কাজ আছে। তিনি জানতে চান। স্কুল ফেরত যাওয়া চাই-ই ওখানে। কথাটা জানতে পেরে কল্যাণীরও ভয় হচ্ছে। শেষে একটা ক্ষতি করে দেবে না তো! নিষেধ করেছে সে ওখানে যেতে। কিন্তু নেশাগ্রস্তকে কে ফেরায়? ফেরাতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত ভৈরবীও।

ভৈরবী তাঁর জীবনরহস্য উদ্ঘাটন করেন। বাবার সঙ্গে ছিলেন নাকি কামাখ্যায়, এক জঙ্গলে। মার কথা জানেন না। তান্ত্রিক বাবা, সাত বছরেই মেয়েকে দীক্ষা দেন। দেহ রাখেন ও'র সতেরতে। ওই কাঁচা বয়সটা বদমাশদের হাত থেকে রক্ষা করেছে কে? ওই খড়্গধারিনী। আঙুল দিয়ে দেখান, অদূরে বটের শিকড়ে হেলান দেওয়া একখানি কালীর ছবি। ওই মহাশক্তির ভয়ে ঘেঁষতেই সাহস হত না কারো। আর ঘেঁষলে রক্ষা ছিল না। একবার কারা ও'কে জোর করে মুখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, বনপথেই মায়ের সাপ এসে বিষকামড় দিয়ে শেষ করলে তিনটেকেই। একটা জংলী তো ও'কে ছুঁতে না-ছুঁতে মুখে রক্ত উঠে মরে গেল। সে কতো গা-কাঁটা-দেওয়া কাহিনী। অনেক পথ ঘুরে এই বাঙলামুলুকে আসা। বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, অট্টহাস, দক্ষিণেশ্বর ঘুরে ঘুরে কাটোয়ার ঘাটে শেষ দু'বছর কাটান। তার পরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে আসা। না, আর তিনি যাবেন না কোথাও। এই বটতলাই তাঁর মা-বাবার থান। ওই চটকাতলাই শব-সাধনার যোগ্য জেনেছেন তিনি।

ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে শবের উপর বসে জপ-জপান্ত—জ্যান্ত হয়ে উঠবে শব, তাকে চড়ুচাল, পঞ্চশস্য খাওয়ানো—ভূত-প্রেত খেতে আসবে, ছলনা করবে। ভয় না পেয়ে ক্রিয়াকর্ম সারতে পারলে আসবেন মহাডামরি। মা-ও আসতে পারেন—সশরীরে —তাহলেই হল। কী হল? সিদ্ধিলাভ।

কল্যাণী ও'কে মন্দ বলে, ছাড়তে বলে পাগলীর সংস্রব। ক'দিন যাওয়া বন্ধ রাখেন। আবার একদিন স্কুল ফেরত ভৈরবীর সঙ্গে চোখাচোখি। তিনি ডাকেন, আয়। ও'কে বলেন, তোকে আমি সব শিখিয়ে দেবো—শব সাধনা পর্যন্ত। তবে কথা দে, সিদ্ধি হলে এইখানে মায়ের মন্দির করে দিবি। পোড়ামাটি না হোক, টিন দিয়েই দে। কি রে, দিবি?

দেবো।

শবসাধনায় বিভূতি বসেছিলেন কিনা, হল কিনা সিদ্ধিলাভ—সে-সব কে বলবে? তবে সেই বটতলায় শিব ও কালীর জন্য ইটের দেয়াল, টিনের চালার মন্দির করে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। ভৈরবী সেখানে পুজো কবেন নিজেই। স্বীকার করেন 'বিভূতি-ছেলের' ওই দানের কথা। ওখানে গেলে শুনতে পাওয়া যায় ওই ভৈরবীর মুখে 'বিভূতিছেলের' অনেক কথা। অনেক পরিশ্রম, সাধ্য-সাধনায় অবশ্য শোনা যায় তা: অনেক পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে মরজি শরিফ করিয়ে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা দায়, তাড়া খেয়ে সরে আসতে হবে।

বিভূতিভূষণকে সরে আসতে হয় অন্য কারণে। কল্যাণীর শরীব ভালো না। অসময়ে কিছু ঘটে যেতে পারে, ভয় হচ্ছে তার। আনমনা স্বামীকে বাধ্য হয়ে কথাটা জানালো সে।

জানাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গ্রামে নেই ভালো ডাক্তার, নেই ভালো নার্স। বন্ধুদা—ক্যাপটেন সুরেন চ্যাটারজিও বনগাঁ শহরে! তিনি বললেন, বনগাঁ এনে রাখো স্ত্রীকে। তাই করলেন। পাঁচ বছর পরে আবার সেই জাহ্নবীদের জন্য ভাড়া করা বাসার ঠিক পিছনেই আদিত্য চাটুজ্যেব বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস শুরু করলেন সস্ত্রীক। সেখান থেকে গোপালনগরে হরিপদ ইনসটিটিউশনে হাজিরা। কল্যাণীকে দেখাশোনার জন্য একজন শিক্ষিতা ধাত্রী রেখে দিলেন। ক্যাপটেন চ্যাটারজি তো আছেনই। এবার আগে থেকেই সতর্ক হলেন বিভূতিভূষণ।

কিন্তু ললাটলিখন খণ্ডানো গেল না। পূর্ণ গর্ভের আগেই মাতৃনাড়ী কণ্ঠে

জড়িয়ে মৃতা কন্যা এলো দুঃখের রূপ ধরে। আঘাতের সঙ্গে আর এক আশঙ্কা— প্রসূতিকে নিয়েই যমে-মানুষে টানাটানি। অসহায়ের মত একি সহ্য করা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? 'যা হয়—করো' বলে বন্ধুদা ক্যাপটেন চ্যাটারজিকে কল্যাণীর সামনে রেখে উন্মাদের মত উধাও হয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ।

পরদিন একটা গাছতলায় মন্মথদা যখন ওঁকে আবিষ্কার করেন, কাঁদতে কাঁদতে ওঁর প্রথম প্রশ্ন, কল্যাণী?

সুস্থ হয়ে উঠেছে, ঘরে চলো—বলে ওঁকে ধরে আনলেন মন্মথ চ্যাটারজি—ওঁর লিচুতলা ক্লাবের মন্মথদা।

মন ভালো নেই। কখনও খয়রামারির মাঠে বসে বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা পড়েন কল্যাণীকে নিয়ে। কখনও ইছামতীর প্রান্তে ঘেঁটুফুলের ঝাড়ের পাশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পাঠ করেন। আবার হয়ত বেড়াতে বেড়াতে পেঁৗছে যান সেই কিন্নরকণ্ঠীদের পল্লী উলসিতে। বাবা আসতেন এ-গ্রামে। এ-গাঁয়ের মধু কানের গান ছিল বাবার সবচাইতে প্রিয়। মধু কান মারা গিয়েছে বার শ' চুয়াত্তরে, সে প্রায় বিস্মৃত অতীত। ভিটে জঙ্গলে ভরা। পল্লীটিও বনপল্লী হয়ে আছে। বউ-কথা-কও পাপিয়ার ডাকে ভরা সে বনকুঞ্জ। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জল নিয়ে ফিরছিলেন। তাঁকে ডাকেন, আলাপ জমান, মধু কানের গান জানেন?

জানি। মহিলা তাঁর বাড়ি ডেকে নিয়ে যান, গান শোনান মধু কানের। দু'খানা খাতা দেখান মধু কানের গানের। হাতের লেখা অপরের। শেষ জীবনে নিজের লেখার ক্ষমতা ছিল না মধু কানের। মুখে বলতেন—লিখতেন মুহুরি। উঠে আসবার আগে প্রণাম করেন খাতায়।

যান বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের মঠে। হরিদাসের প্রথম জীবনের স্থান, চার-পাশে ঘন বন এক প্রশান্তির ছায়া ছড়ায়। মঠের সোপানে বসে হরিদাসের কাহিনী পাঠ করতে করতে সন্ধ্যা নামে। মন্দিরের আরতির ঘণ্টা। ওপাশে হীরানটীর মূর্তির সামনেও আরতি হচ্ছে। কার কৃপায় পতিতাও আজ দেবীর আসন পেল? ভাবতে ভাবতে অন্যলোকে চলে যায় মন। সংসারের আঘাত থেকে এমনি করেই নিজেকে ভুলিয়ে রাখা, উত্তরণ অন্য লোকে। পথের মাঝে ভেঙে পড়লে চলবে না পথের চারণকে।

ইতিমধ্যে জন বারোজের লেখা টমাস বাটার আত্মজীবনী অনুবাদ করে বার করেছেন। বইটির ভূমিকা লিখে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। ' রিয়েছে উনিশ শ' আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশের দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর'—উনিশ শ' েতাল্লিশের মারচে। এ বই উৎসর্গ করা সজনীকান্ত দাসকে। লেখা হয়েছে গল্পগ্রন্থ—নবাগত, তালনবমী, দিনলিপি 'ঊর্মিমুখর'। পরিমল গোস্বামী ও সুধীর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় যে 'নতুনপত্র' বেরোয় তাতে প্রকাশিত হোল বিভূতিভূষণের অরণ্য ভ্রমণ-কাহিনী 'বহরাগড়া'। এও এক বিশিষ্ট রচনা, অরণ্যের কথা, কিন্তু অরণ্য অপেক্ষা আরণ্যমানুষ আর সেই সমাজের কথাই বেশি। বোঝা গেল, কেবল লতাপাতা পশুপাখি দেখেই ভুলে থাকতেন না তিনি।

তা যে থাকতেন না তার আরও প্রমাণ ডায়েরিতে। সারাণ্ডার নিবিড় অরণ্যছায়ায় বসে তিনি পড়েছেন রামকৃষ্ণ জীবনী, বিবেকানন্দের রচনা, অমিয় নিমাই চরিত। আর—লিখেছেন পাতার পর পাতা দেবযান। এখনও চলছে স্বর্গলোকে আত্মার উত্তরণের দেবযান রচনা।

কিন্তু বারে বারে আঘাত পাচ্ছেন মানুষটি! গজেন মিত্র এসে বললেন, চলুন বড়দা, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক। তিনি জানেন, পথই সব দুঃখ ভোলায় তাঁর বড়দা বিভূতিভূষণের। আর এমনিতেই যিনি পা বাড়িয়ে আছেন তাঁকে ও-রকম প্রস্তাব দিলে তো কথাই নেই।

মেয়েদের শরীরের অবস্থা সব সময় কি বেরোনোর মত থাকে? সে-কথা ওই মানুষটিও যেমন বোঝেন না, বলেও দুঃখ দিতে চায় না কল্যাণী। সে জানে, তাকে নিয়ে ভ্রমণে স্বামীর কত আনন্দ। আবার গজেনবাবুদের আনন্দ বড়দা-বউদিকে নিয়ে ভ্রমণে, যদি না তা বনবাদাড় হয়। মাঝে মাঝেই তাই একসঙ্গে বেরোন। তাব অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। বিচিত্র অভিজ্ঞতা কল্যাণীরও।

এক বছর আগের কথা। গাজেনবাবুদের সঙ্গে কী একটা প্ল্যান কষে এলেন: কল্যাণীকে বললেন, চলো ঘুরে আসি।

কল্যাণীর শরীর তখন ভালো নয়। ভয়ে ভয়ে বলল, বেশি দূরপাল্লায় নয় তো?

না না, কাছেই যাবো, সালানপুর। আসানসোলের পাশে। কয়লার ব্যাপারীরা জানলেও, জায়গার নামটা শোনা নেই কল্যাণীর। আসানসোলের পাশেই এমন কী একটা বেড়ানোর মত জায়গা থাকতে পারে! স্বামীর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো, ঠাট্টা করছো?

ঠাট্টা? হলেই হল? গজেন-সুমথরাও যাচ্ছে না বাড়ির মেয়েদের নিয়ে? চলো না দেখবে।

হাওড়া স্টেশনে এসে কিন্তু গজেন-সুমথদের দেখা নেই। এসেছেন সুমথ ঘোষের ভাই প্রমথ। কী-সব কথা হচ্ছিল তাঁর বিভূতিভূষণের সঙ্গে ফিসফিস করে। কল্যাণী ভাবলো, কোন একটা গোলমাল হয়েছে বোধহয়। কাছে এগোতেই হাঁ-হাঁ করে ওকে দূরে সরিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ। মানকুর কাছ থেকে এ-রকম ব্যবহার পেলে দুঃখ হয় বইকি! চুপ করে রইল কল্যাণী।

ট্রেনে উঠেই দেখা গেল কল্যাণীকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিভূতিভূষণ, অসুস্থ শরীর তোমার। মিছেমিছি কেন কষ্ট করছো, সময়মত আমি ডেকে দেবো, ইত্যাদি।

কল্যাণীর আগেই অভিমান হয়েছিল। কথা না বাড়িয়ে সে শুয়ে ও'কে স্বস্তি দিল। উদ্বেগটা বাড়লো ভিতরে। ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঝিমিয়ে ধড়ফড় করে উঠে পড়ল, এতক্ষণে আসানসোল বুঝি ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু কোথায কি? গাড়ি ছুটেছে তীব্র গতি। জানালা দিযে নির্বিকাব বাইরের অন্ধকার দেখছেন লোকটা।

শুনছো, গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবে না, আসানসোল তো এসে গেল। কল্যাণী আর চুপ করে থাকতে পারে না।

আঃ, তুমি আবার উঠলে কেন? শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো,—বলেই দ্রুত হাত বাড়িয়ে জানলার কাচ নামিয়ে দিলেন।—ধুলোবালি আসবে।

ব্যাস, এবার আর বাইরের কোন স্টেশনেব নামও পড়া যাবে না পরিষ্কার। রকম-সকম দেখে কল্যাণীর খটকা লাগে, আসানসোল কি এখনও আসেনি? কোথায় চলেছি আমরা, সত্যি করে বল তো?

কোথায় আবার—সালানপুর, উত্তরদাতার নির্বিকল্প ভাব।

কই, টিকেট দেখি! ব্যাপারটা বুঝতে চায় কল্যাণী।

কিন্তু, না, এ-পকেট, সে-পকেট, নোটবুক, কোথাও টিকেট পাওয়া গেল না।

বললেন, বাকসে রয়েছে তাহলে। এখন আর খুলে কী কাজ। তুমি ঘুমোও।

এ-রকম কাণ্ড-মাণ্ড দেখে ঘুম! গুম মেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে রইল কল্যাণী। সারা পথ আর কথাই বললে না।

যখন ভোর-ভোর, বিপুল শোরগোলে চমকে উঠল, কী ঘটল? গোটা গাড়িতেই যে গোলমেলে কাণ্ড শুরু হল!

বিমূঢ় কল্যাণীকে সাদরে জানলায় এনে বাইরে আঙুল দেখালেন বিভূতিভূষণ, নমস্কার করো।

ট্রেন তখন মন্থরগতিতে একটা সেতু অতিক্রম করছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল একটি মন্দিরচূড়া, ধ্বজদণ্ডে তার প্রত্যূষ বায়ুতে আন্দোলিত পতাকা। সবাই গাড়ি থেকে নমস্কার করছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে, জয় বাবা বিশ্বনাথ। সে কী, কাশীধাম! একগাল হেসে টিকেট দু'খানা ওর হাতে দিলেন বিভূতিভূষণ, 'হাওড়া টু বেনারস'!

প্লাটফরমে গজেনবাবু-সুমথবাবুরা সস্ত্রীক হাজির। ও'দের সম্বর্ধনা জানাতে সঙ্গে বেশ কিছু প্রবাসী বাঙালীও এসেছেন।

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে বুঝল কল্যাণী, কেবল কাশী নয়, এবারের ভ্রমণ-তালিকায় কাশী থেকে সারনাথ, আগ্রা, দিল্লি পর্যন্ত রয়েছে। অভয় দিলেন বিভূতি-ভূষণ, কিছু ভেবো না, সব জায়গায় সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তার নমুনা বুঝতে অবশ্য দেরি হল না বেশি, তবে চরম হল দিল্লিতে।

সঙ্গীরা ঠিক তাল রাখতে পারেন না ও'র সঙ্গে। আগ্রা গিয়ে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত জেগে রইলেন তাজমহলের মর্মর-বেদিকায়। তাজ তাঁর কাছে সুন্দর। তবু তাঁর ভাষায়—যে-কোন অরণ্যের রূপ, এমন কি একটা ঘেঁটুফুলের রূপ আরও সুন্দর।

কিন্তু দিল্লিতে? ভালো সরকারি চাকরি করে সেখানে অপূর্বমণি দত্ত। কতবার বলেছে, দাদা, একবার পায়ের ধুলো দিলেন না! দাদ এবার চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন, যে-কোনও একদিন সদলবলে আসছেন। অপূর্বমণিও জানিয়েছে সে পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করবে। আট-দশজন হলেও কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, সদলে সেখানেই চড়াও হওয়া যাবে।

দিল্লিতে তখন নিষ্প্রদীপ চলছে। সন্ধ্যার পর পৌঁছে ঠিকানা খোঁজা এক ঝকমারি ব্যাপার। তা নম্বরটা যখন ঠিক জানা আছে, খুঁজে বিভূতিভূষণ বার করবেনই। টাঙ্গা নিয়ে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সঙ্গীদের আশ্বাস দিচ্ছেন তিনি। টেগোর রোড। নম্বর—উনচল্লিশ। দেখা গেল সে এক অবাঙালীর বাড়ি। একে একে 'উন' দিয়ে যত নম্বর সব শেষ করে এলেন রোড ছেড়ে লেনে—টেগোর লেন। হাঁ, এখানে এক 'উন' নম্বরে বাঙালি একজন থাকেন।

কিন্তু এই বাড়ি? বড়দার কথা অনুযায়ী নম্বর মিললেও গজেনবাবুদেব সন্দেহ অপূর্ববাবুর মনটা উদার হলেও বাড়িটা তেমন প্রশস্ত নয় যে এতগুলো লোকের ঠাঁই হবে।

কড়া নাড়তে যিনি বেরোলেন, তাঁকে দেখে তো ঘাবড়েই গেলেন ও'রা। বাড়িটির চাইতেও বেশি বেচারা চেহারা লোকটির। মনে হল না ও'দের দেখে খুশি হয়েছেন একটুও। সুমথবাবু চিমটি কাটলেন গজেন মিত্রের গায়ে।

বিভূতিভূষণ এগিয়ে এলেন। অপূর্ববাবু অপূর্বমণি দত্ত? লোকটি অবাক। অপূর্ব? দত্ত? আমি মিঃ মুখারজি। আপনারা ।ঠকানা ভুল করেননি তো?

সন্দেহটা গজেনবাবুদেরও সেই রকম। বড়দা, বাড়ির নমবরটা ঠিক—।

না হে, না, কি যে বল, আমার ভুল হবে? একদম ঠিক।

তা তো হল, মুখুজ্যে যে কিছুতেই 'দত্ত' হতে চাইছেন না।

সুমথ আবার চিমটি কাটলেন গজেনকে। মেয়েরা ঘাবড়ে সারা এই ব্ল্যাকআউটের বেঘোরে। একটা টোপ ফেলে দেখলেন সুমথনাথ, তা মশায়ের নিবাস ছিল কোথায়?

শেওড়াফুলি।

বেশ বেশ, আমাদের অমুকের তো শেওড়াফুলিতেই বিয়ে হয়। সুমথ কথাকে সাত কাহণ করে সম্পর্ক পাতাতে সচেষ্ট।

কিন্তু লোকটি রাজধানীর জল-পানিতে ধাতস্থ। সুমথনাথের মতলব বুঝতে দেরি হল না। কথা বাড়ালেই আসন বাড়িয়ে দিতে হয়। শেষে বাঙালী যখন, আত্মীয়তা খুঁজে আশ্রয় দাবি। আর আশ্রয় দিলে আহারের প্রশ্ন। কনট্রোলের বাজার। তাছাড়া অতগুলো মেয়েপুরুষের জায়গা কোথায় তাঁর বাড়িতে!

অকূল সমুদ্রে বিভূতিভূষণ অ্যানড পারটি। ব্ল্যাকআউটের রাত্রে শেষটা মিলিটারির হাতে পড়তে হয় বুঝি! গজেন মিত্র বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। বিভূতিভূষণের নামটা একবার শুনিয়ে দিলেন কৌশলে। যদি কাজ হয়।

হল না। পাঁচালী বলতে তিনি জানতেন লক্ষ্মীর পাঁচালী। তাও মা-ঠাকুমার কালের কথা। সাহিত্য-ফাহিত্যের তেমন ধার ধারেন না তিনি অফিস ম্যানুয়েল ছাড়া।

তবু প্রবাসে বিপন্ন বাঙালী। শেষ পর্যন্ত দুয়ার আগলে থাকতে পারলেন না ভদ্রলোক। খাওয়ার প্রশ্ন আগন্তুকরাই মুলতবি রাখলেন। ট্রেনের রেস্তরাঁ কারে গলা-গলা খেয়ে নিয়েছেন, আর খাওয়া এমনিতেই কারো সম্ভব নয—ইত্যাদি ইত্যাদি অযাচিত কথা বলে আশ্বস্ত করে নিলেন গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীকে। কিন্তু ফাঁকা উদরকে কাঁহাতক ফাঁকি দেবেন বিভূতিভূষণ। গৃহকর্তাকে ডাকতেই হল অগত্যা। একটু চা হবে?

লোকটি বিব্রত। এই যুদ্ধের বাজারে চা পেলেও চিনি কোথায! 'ব'-চা হলেই চলবে। সমস্বরে জানালেন ও'রা।

আর তাতেই ক্রিয়া হল। চায়ের গরম লিকর পানের পর অকস্মাৎ স্মরণশক্তি চাঙ্গা হয়ে উঠল বিভূতিভূষণের—উনচল্লিশ নয়, একশ' উনচল্লিশ।

অর্থাৎ চল্লিশের এক কম ভাবতে ভাবতে, আগেই এক-টা কমিয়ে ফেলেছেন। কথাটা বলে, সেই শেষ রাতে বুভুক্ষু ক'টি নির্ভরশীল নরনারীর দিকে অপ্রতিভের মত তিনি তাকিয়ে থাকলেন।

এমনি অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ও'র সঙ্গই ভালো লাগে পথে। এবারও তাই অনুরোধ করছেন গজেনবাবু, চলুন বড়দা। মনের এ অবস্থায় বিভূতিভূষণও কোথাও ঘুরে আসতে চান মৃতবৎসা কল্যাণীকে নিয়ে। গজেনবাবু সুমথবাবুরা আগেই বেরোলেন। কল্যাণী আর উমাকে নিয়ে বিভূতিভূষণ যাত্রা করলেন ক'দিন পরে, ছয় মে। এবার পুরী।

সম্মুখে অনন্তবিস্তারী সাগর-গগনের মিলনতরঙ্গ, কী বিরাটত্বের আভাস ওই নীল-শ্যাম রূপের।

জগন্নাথ মন্দির, সেও বিরাটেরই প্রতিচ্ছবি। অভ্যন্তরে ভক্তজনপূজিত নীলমাধব যেন নীল-শ্যাম অসীমের মূর্ত মহাদেবতা।

পুরীর সর্বত্র এত দেখবার যে কল্যাণীর অবস্থা হল 'কাকে ফেলে কাকে দেখি,

কেহ নহে উন'। পুরুষোত্তমমঠ, শঙ্করমঠ, সিদ্ধবকুল, হরিদাসের সমাধি, চক্রতীর্থ—চক্রাকারে ঘোরা। সমুদ্রে স্নান। ঝিনুক কুড়নো। আরো কত।

বিভূতিভূষণের আগমনবার্তা রটে যায় পুরীতে। স্থানীয় বাঙালীরা দুর্গা-বাড়িতে সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন ও'র। কথা হল, সেখানে দেবযানের পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ হবে কিছুটা। পুরোহিত থাকবেন ডঃ অমিয় চক্রবর্তী। কিন্তু যথাকালে মান্য অতিথি আসবেন তো সমুদ্রতীর ছেড়ে সভায়?

গজেনবাবু দায়িত্ব নিলেন, নিয়ে আসবেন ঠিক। বিভূতিভূষণ বললেন, দায়িত্ব নেওয়ার কি আছে, তাঁর নিজের কি একটা দায়িত্ববোধ নেই!

যথাসময়ে দেখা গেল, যা সন্দেহ করা গিয়েছিল ঠিক তাই। বড়দা, কল্যাণী-উমাকে নিয়ে নিখোঁজ। গজেনবাবুর সঙ্গে সুমথবাবুরাও ক'জনে খুঁজতে লাগলেন সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে।

এদিকে বিভূতিভূষণ তখন পুরুষোত্তম মঠের পিছনে সুন্দর একটি জায়গা বেছে বসে আছেন। ডাইনে ঝাউবন, পাশে টোটাগোপীনাথের মন্দির, বাগানে অজস্র কাঁঠাল গাছ। সামনে বিস্তৃত বালুরাশির পাড়ে আছড়ে পড়ছে সফেন ঊর্মিমালা। কল্যাণী কয়েকবার তাগিদ দিলে, ও'রা বসে থাকবেন, সভায় যাবে না? বিভূতিভূষণ উত্তর দিলেন, এই বিশ্বরূপের মন্দির ছেড়ে কোথায় যাবো?

শেষ অবধি যেতে হল। গজেনবাবুরা ও'কে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে ধরে নিয়ে গেলেন সভায়।

খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, ভুবনেশ্বর, কোনারক সব ঘুরে ঘুরে দেখে এলেন। কোনারক গিয়ে সে আর এক কাণ্ড। পিষ্ঠ থেকে পতাকা পর্যন্ত প্রায় দু'শ' ফুট উঁচু সেই সূর্যমন্দির। শিখরে বৈজয়ন্তী, পদ্মকুম্ভে বিধৃত। ওই পর্যন্ত উঠবেনই বিভূতি-ভূষণ। কল্যাণীকেও ডাকছেন, ওঠো। কিন্তু তার বুক কাঁপে বেশি উপরে উঠতে। বুক কাঁপছে তার আরও বেশি, স্বামীর কাণ্ড দেখে। সেই শীর্ষবিন্দুতে উঠে আবেগাচ্ছন্ন মানুষটি আবক্ষ জড়িয়ে আছেন পদ্মকুম্ভ! যতদূর সাধ্য উঠে ডাকাডাকি করছে কল্যাণী, কিন্তু কার কানে তা যাবে! গজেনবাবুরাও সঙ্গে নেই এদিন। সে এক মহা বিপত্তি!

এদিকে ঠিক ছিল কিছু সহযাত্রী মিলে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া হবে। তা হল নিচে, রান্না-খাওয়া সবই। ও'রা দু'জন কেবল রইলেন অভুক্ত। পুরীমুখী হর্নে কোন-ক্রমে ছুটে এসে গাড়ি ধরা।

ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি—থেমে থেমে, দেখে দেখে ফেরা। কিন্তু সবাই দেখুক মন্দির, তার গর্ভগৃহের বিগ্রহ, বিভূতিভূষণের দেখা কি তাতে মেটে? তাঁর দেবতা দেখা দেন মুক্তরূপা প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশে। তাঁর দিনলিপি তৃণাঙ্কুরে একটি স্বীকৃতি—'আজ ও-বেলা যখন শালগ্রাম পূজা করছিলুম, তখনই আমার মনে হল, ওই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভাগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজব সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙার বাঁওড়ের ধারে, মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্তবেলায় পাখিদের কাকলীর মধ্যে।' সুতরাং মন্দির দেখছেন, তবু দৃষ্টি বেশি চারদিকের প্রকৃতির দিকে। ওগুলি কী গাছ? গিলে। সেই গিলে, যা নবজাতকের কোমরে গলায় পরিয়ে দেন মা, যমকে ঠেকাতে? ছোটবেলা থেকে এত চেনা ওই ফলটি—আজ তার গাছই দেখলেন, গাছে গাছে ঝুলছে গিলের ছড়া! আবার ওই কিসের বন? নাকসভমিকা! সেকি, নাকসভমিকার বনও দেখল দুটি চোখ তাঁর।

দেখলেন আরো কত, আধি, কোল, মহীগাছ, চেনাজানা হল নতুন কত গাছের সঙ্গে। এজন্যই বুঝি পথ তাঁকে টানে, টানে প্রকৃতি।

টানে মানুষও। রামকৃষ্ণ লাইব্রেরিতে যেতে হয় দেবযান পড়তে। খুরদা রোডে যোগ দিতে হয় কালিদাস উৎসবে। পয়লা আষাঢ়ের এই স্মরণোৎসব তাঁর চিরদিনের। বারাকপুরের গ্রামে বর্ষাবন্দী হয়ে যখন বেরোতে পারেননি, তখন আর কাউকে না পেয়েছেন, খুকুকেই ডেকেছেন, 'আজ পয়লা আষাঢ়, খুকু এসো, আমরা কালিদাসকে স্মরণ করি'।

এদিন খুরদা রোডে বিকালের অনুষ্ঠানে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এক বাড়িতে ওঁদের আপ্যায়ন করা হল। অনেক রাত পর্যন্ত উঠোনের জ্যোৎস্নায় বসে চলল অলৌকিক প্রসঙ্গ। বিভূতিভূষণকে পেলে ইদানীং ওই প্রসঙ্গে অনেকেরই কৌতূহল বাড়ে। আর তাঁরও উৎসাহ বেড়ে যায়, এটা তাঁর দেবযান রচনাকালের একটা বৈশিষ্ট্য।

পরদিন বাড়ি ফেরার পালা। যাত্রার আগে পুরুষোত্তম-নীলমাধবের মন্দিরে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে এলেন কল্যাণী-বিভূতিভূষণ।

প্রায় আড়াই শ' বছর আগে চৌষট্টি বছর বয়স্ক রুদ্রদেব বাচস্পতি নাকি পায়ে হেঁটে ত্রিবেণী থেকে পুরীধামে এসেছিলেন, জগন্নাথদেবের কাছে পুত্রকামনা জানাতে। দু'বছর পরে পুত্র পেলেন রুদ্রদেব, নাম রাখলেন জগন্নাথ—সে-ই পরবর্তী-কালের বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

মৃতবৎসা কল্যাণী, আর পাশে দাঁড়িয়ে তার স্বামী আজ কী প্রার্থনা জানালেন?

॥ আঠার ॥

আরে শুনেছেন, লোকটা নাকি মরে গিয়েছে, একেবারে স্বর্গে।

মানে?

মানে উনি মর্তের জীবনাবর্ত শেষ করে দেবযানে উঠে গিয়েছেন জনঃ, মহঃ, তপঃ স্তর ছাড়িয়ে, ভুবর্লোক ভেদ করে, এখন অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতি ব্রহ্মচক্রে।

'এই তো বৃহত্তর জীবন, মৃত্যুর পরে যা সে লাভ করছে।..এই অনন্ত জীবন-প্রবাহে সে যুগ-যুগান্তর ধরে ভাবের ও প্রেমের স্রোতে বয়ে আসচে।..কত বিস্মৃত মরুদ্বীপে, কত শ্যামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কত ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরের কুটিরে, কত পাহাড়ের নিচেকার আদিমকালের গুহায়. কত রাজার রাজপ্রাসাদে...কত দশার্ণ গ্রামে ব্যাধরূপে, কত শারদ্বীপে ক্রৌঞ্চমিথুনরূপে, কত কুরুক্ষেত্রে বেদগায়ক ব্রাহ্মণরূপে...।

'বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্য দিয়ে তার মনে হল—বহু কদম্বদ্রুম যেন কোথায় মুকুলিত, লতানিকর বিকশিত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গিরিগ্রামে বহু বিহগকণ্ঠের কাকলী, প্রেম—স্নেহ—সুগভীর স্নেহের নিঃস্বার্থ আত্মবলি—আরও কত কি—কত কি—

'সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েছে। সে মুক্ত।...বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহ-নক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যচ্ছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা।'

কোন্ কবিমনীষীর লেখনীনিঃসৃত ওই কথাগুলি, বিচক্ষণ বাঙলা-সাহিত্য পাঠকের তা বুঝতে সময় লাগে না। উদ্ধৃতিগুলি তাঁর 'দেবযান'-এর। এবং ওই দেবযান

নিয়েই তখন দেশে আলোড়ন, ভালো-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা-ব্যঙ্গ-বিস্ময়। তার মধ্যে লেখক সম্পর্কেও 'স্বর্গপ্রাপ্তি' জাতীয় রস-রচনা বাদ যায়নি।

দেবযানের প্রকাশকাল, তিন অকটোবর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ। বইটির সংকল্প নিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ পনের মারচ, উনিশ শ' আঠাশ। লবটুলিয়ার বনছায়ায় লেখা শুরু উনিশ শ' বত্রিশে। মাঝে রেখে দেন, আবার ধরেন উনিশ শ' চল্লিশে। দীর্ঘ ষোল বছরের মনন, চিন্তন, অভিজ্ঞানের আলো দিয়ে দেবযানে অমৃতলোক-অভিসার করেছেন বিভূতিভূষণ। মাটির পৃথিবীতে সেই লোকটিকেই যখন জলজ্যান্ত সামনে পাওয়া গেল, ঘেরাও হলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা—"আমার অবিশ্বাসী মন নিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, শেষটায় সাহিত্যে এইসব গাঁজাখুরি ঢোকাতে লাগলেন! তাতে তিনি এই অলৌকিক রহস্যে পূর্ণ বিশ্বাসের জোরের সঙ্গে আমায় বললেন, 'গাঁজাখুরি নয়, সব সত্যি। আমার এ অভিজ্ঞতার ফল'। "

বিভূতি-জীবনের রহস্য-যবনিকা ঈষৎ উত্তোলন করলে ওই অভিজ্ঞতার পশ্চাৎপট দেখতে পাবো।

'জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল। নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন। গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্নে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানের বুকে দেখেছি পত্রশয্যায় তিনি ঘুমিয়ে আছেন। অবিশ্যি আমি দূর থেকে দেখেচি, কাছে যাইনি।

'নারীর মত সুকুমার, কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা। দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত, দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাইনে ওর।'

কথাগুলি 'দেবযান'-এর নয়; দিনলিপির। ইছামতীতীরে প্রকৃতির রূপ-রহস্যে সম্মোহিত কোন-এক অপরাহ্নের অভিজ্ঞতা এখানে লিপিবদ্ধ। এমনি অপার্থিব অনুভূতি বার বার ঘটেছে তাঁর জীবনে—অরণ্যে, পর্বতে, নির্জনে। তাই তিনি বনে-পাহাড়ে ভ্রমণ করে হঠাৎ কখনও তরুছায়ায় বা শিলাসনে ধ্যানমগ্ন হতেন। দিনলিপির পাতায় পাতায় তার চিহ্ন বর্তমান।

শৈশব থেকেই তিনি অনুভব করেছেন প্রকৃতির এক আত্মিক রূপ। তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে রূপের আড়াল থেকে রূপস্রষ্টা স্বয়ং। 'ফ্রম নেচার টু নেচারস গড'।

গৌরী ও মনির মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী দর্শন, থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে জড়িত হওয়া, প্লানচেট, চক্রাধিবেশনে আত্মা আবাহন এবং বিভিন্ন তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়ন অমর্ত্যলোক সম্পর্কে স্পষ্টতর করে তোলে তাঁর ধারণাকে। অতিলৌকিক জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস তাঁর সমগ্রজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, প্রথম গল্প উপেক্ষিতা থেকে শেষ উপন্যাস ইছামতী পর্যন্ত তার ছাপ সুস্পষ্ট। মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া-পাত ঘটার যে কথা দৃষ্টিপ্রদীপে বলেছেন, সে অভিজ্ঞতাও স্বীয় জীবন থেকে সংগৃহীত। এমন কি নিজ জীবনের চরম ভবিষ্যৎ ঘটনাও চোখের সামনে ছায়াছবির মত অভিনীত হতে দেখেছেন, শিউরে উঠেছেন দেখে, এবং বাস্তবে ঘটেওছে তা—। সে ভয়াবহ কাহিনী না বলতে পারলেই ভালো হতো। তবু ঘটনাসূত্রে তাও বলতে হবে। এখনু নয়, শেষে।

আহ্বান, হাসি, পেয়ালা, পৈতৃক ভিটা, কালী কবিরাজের গল্প ইত্যাদি অতি-প্রাকৃত বিষয়বস্তুর উপর লেখা তাঁর যে-সব কাহিনী সে-সবের অধিকাংশই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। সন্দেহ নেই, অনেকের কাছে এগুলি নেহাৎ গল্প। 'রঙ্কিনী

দেবীর খড়্গ' গল্পের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'জীবনে অনেক জিনিস ঘটে যাহার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়ত খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যায়।'

নেহাৎ ভয়াল ভৌতিক ঘটনার চমক দেওয়ার জন্য এসব গল্প লেখা নয়। রবীন্দ্রনাথও ক্ষুধিত পাষাণ, মাস্টারমশায় বা মণিহার গল্পে নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে কমবেশি কাজে লাগিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কথা যখন উঠল, স্মরণ করা যায়, তাঁকেও প্লানচেটে বসতে দেখা গিয়েছে। চক্রাধিবেশনে মহর্ষিদেব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, শরৎচন্দ্র প্রমুখের আত্মা এনেছেন।

রহস্যালোক সম্পর্কে এ নেহাৎ কবিমনের কৌতূহল কিনা জানি না। তবে মৈত্রেয়ী দেবীর 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ'-এ দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে মৃত্যুপারের জীবন নিয়ে কবি বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ অলিভার লজের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে অলিভার লজের আত্মাও এনেছেন।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে বার বার উল্লিখিত হয়েছে এই অলিভার লজের কথা। অবশ্য আরও অনেক নাম, অনেক বইয়ের কথা তাঁর ডায়েরি বা বিভিন্ন রচনায় আছে। একটু খোঁজ নিলে এ ব্যাপারে আরও কিছু জানা যায়।

বনগাঁ থেকে সাটেল ট্রেনে ছোট্ট স্টেশন মাঝেরগ্রাম। গরীবপুর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মাইল দুই পথ। একান্তই গ্রাম, বিকেলের গাড়ি একবার ফসকে গেলে বনরাজি-আবৃত সেই গ্রাম থেকে বেরোনোর আর যানবাহন নেই। গাঁয়ের প্রবেশপথে অতি বিশাল এক বটবৃক্ষ, ছোট গ্রামটিকে যেন সে ঢেকে রেখেছে নানা অলৌকিক কাহিনী-মাখা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। সেই ছায়ায় ঢাকা গ্রামের একটি ঘরে এক-আলমারি মূল্যবান বই। মূল্যবান বিশেষত এই জন্যে, অনেক বইয়ের অনেক পাতার প্রান্তে বিভূতিভূষণের হাতে লেখা নোট দেখতে পাওয়া যাবে।

বইগুলির বর্তমান মালিক শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর পিতামহ বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় একদা বনগাঁর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। পুত্র অপূর্ব যৌবনেই মারা যায়। ভদ্রলোক এর পর পরলোক চর্চায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। নানা বই এনে পড়তেন, আলোচনা করতেন, বসতেন প্লানচেটে, চক্রাধিবেশনে। বিভূতিভূষণও বনগাঁ বাসকালে ভিড়ে গেলেন চক্রে। বীরেশ্বর নিজেও কবি। তাঁর রচিত 'ইছামতী' নামে এক কবিতাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে সেই আলমারিতে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধু ছিলেন বীরেশ্বরের। তিনি নিয়মিত তাঁর কাছে আসতেন। কবি বলে ডাকতেন তিনি বীরেশ্বরকে। করুণানিধানের অনেক চিঠি পাওয়া যাবে এখানে।

বীরেশ্বরের মৃত্যুর পরে আর বসেনি আসর সেখানে। নাতি অরুণকুমার শহর ছেড়ে বাস করতে লাগলেন এই গরীবপুরে। ঘটনাচক্রে তাঁর বাড়ির পাশেই হল শিবরানীর শ্বশুরবাড়ি। শিবরানী মানে সেই খিনু, যাদের ঘরে আশ্রয় পেয়ে বনগাঁ স্কুলের শেষ দু'বছর পাঠ চালিয়েছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু সম্পর্কটা তো আর দু'বছরে চুকিয়ে দেননি। পথের পাঁচালীর লীলা চরিত্রের মধ্যে ধরে রেখেছেন খিনুকে।

গরীবপুরে বিভূতিভূষণ প্রায়ই যেতেন। আকর্ষণটা যেমন খিনুর জন্য, তেমনি খিনুর পাশের বাড়ির বইগুলির প্রতিও। অরুণবাবুর কথা, আসতেন বটে ওই বাড়ি, কিন্তু কাটাতেন এখানেই সারাদিন। প্রায় হাজারখানেক ইংরাজি বই, বিশ্বের নানা দেশের, নানা প্রসঙ্গের বিখ্যাত সব গ্রন্থ। এই নিয়ে ডুবে থাকতেন। তবে দেবযান রচনাকালে বিশেষভাবে যে গ্রন্থগুলি ঘাঁটতেন বলে তাঁর মার্জিন-নোট দেখে মনে হয়, তা হল ই. ডব্লু. স্টীড-এর 'আফটার ডেথ (লেটার ফ্রম জুলিয়া)', উইলিয়াম স্ট্যানটন মোজেস-এর 'স্পিরিট টিচিঙস্', সিমন ন্যু ক্যুম্ব-এর 'রেমিনিসেনস অব অ্যান অ্যাসট্রোনমার' প্রভৃতি ক'খানা বই। এছাড়াও ই. ডব্লু. অ্যানড এম এইচ. ওয়'লিস-এর 'গাইড টু মিডিয়ামশিপ' বা জে. এম. ব্রমওয়েল-এর 'হিপনটিজম' জাতীয় বই-গুলিতেই নানা চিহ্নে বিভূতিভূষণের পাঠের স্বাক্ষর আছে। তবে দেবযান রচনায় প্রথম বই তিনখানির কিছু প্রতিফলন ঘটেছে হয়ত। এর মধ্যেও আবার প্রথমখানির ছাপ স্পষ্ট মনে হবে।

আফটার ডেথ বইটির অধ্যায়গুলি হচ্ছে, লাইফ ইন আদার সাইড, দ্য ইউজ অ্যানড অ্যাবিউজ অব স্পিরিট কম্যুনিকেশন, এবং দ্য ওপেন ডোর টু ওপেন সিক্রেট। বইটির সূচনাতেই দেখি, আফটার ডেথ—ক্রশিং দ্য বার, জুলিয়া তার বন্ধুকে চিঠি দিচ্ছে মিডিয়মে এই বলে, 'হোয়েন আই লেফ্‌ট ইউ ডারলিং, ইউ থট আই ওয়াজ গন্ ফ্রম ইউ ফরএভার, অর অ্যাট্‌লিসট টিল ইউ অল্‌সো পাস্‌ড ওভার; বাট আই ওয়াজ নেভার সো নিয়ার টু ইউ অ্যাজ আফ্‌টার আই হ্যাড, হোয়াট ইউ কল্‌ড ডায়েড।

'আই ফাউন্ড মাইসেল্‌ফ ফ্রী ফ্রম মাই বডি। ইট ওয়াজ সাচ্ এ স্ট্রেন্‌জ ফিলিং।'

জুলিয়া বলছে, যে-খাটে তার মৃতদেহ শয়ান আছে, সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পাশেই।

বিদেহী আত্মার গতিবিধি সম্পর্কে তার কথা—'নর্ ডু উই টেক্ অ্যাকাউনট অব ডিসট্যান্স, হোয়েন ইউ হ্যাভ ওনলি টু থিংক টু বি এনিহোয়ার। দ্য স্টারস অ্যানড দ্য ওয়ারল্‌ডস অব হুইচ ইউ সি গ্লিমিং টুইংক্লিঙ অ্যাট নাইট, আর টু আজ অল অ্যাজ ফ্যামিলিয়ার অ্যাজ দ্য ভিলেজ হোম টু ভিলেজার। উই ক্যান্ গো হোয়ার উই প্লিজ, অ্যানড উই ডু প্লিজ ভেরি অফ্‌ন্।'

দেবযানে দেখি, যতীন মৃত্যুর পরেও প্রথমে বুঝতে পারছে না, সে মৃত। 'খাটের দিকে একবার চাইতেই বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িযে রইল। খাটের উপর তার মত একটা দেহ নির্জীব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ-মুখ—সবই তা।

'তার কিশোর বয়সের ভালবাসার পুষ্প, আগেই পৃথিবী ছেড়ে এসেছে স্বর্গে; তারই জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। সে এসে বলে, যতুদা মনে ভাবো উড়ে যাচ্ছি।

'যতীন মনে মনে তাই ভাবলে, অমনি দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে।

'দু'জনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চললো। ডাইনে বাঁয়ে অগণিত তারালোক, মৃদু জ্যোৎস্নায় ভাসানো জীবনপুলক, ওদের মুক্ত দেহে এনেচে শিহরন, প্রাণে মুক্তির আনন্দ—দূর...দূর...বহুদূর তারা চললো—।'

দেবযানের কাহিনী গঠনে 'আফটার ডেথ'-এর প্রভাব কতটা তা স্পষ্ট। এমনি আরও ছায়া পড়েছে স্ট্যানটন মোজেস, মারি করেলি, সিমন ন্যু ক্যুম্ব বা মাইকেল স্কটের রচনাবলীর। এটা কাঠামোব স্থূলে দিক। এর প্রাণবায়ু—উপনিষদ। পরলোক চিত্রণে হেনরি বারগস' এবং ঋষি অরবিন্দর রচনার প্রভাব আছে। প্রাক্-বাক্‌এ

দেখি শ্রীঅরবিন্দর লাইফ ডিভাইন থেকে উদ্ধৃতি—'বিয়নড দিজ সাট্‌ল্‌ ফিজিক্যাল প্লেন্‌স অব এক্সপেরিয়েন্স অ্যানড লাইফ্‌-ওয়ার্‌ল্‌ডস, দেয়ার আর অলসো মেন্টাল প্লেন্‌স টু হুইচ্‌ দ্য সোল সিম্‌স টু হ্যাভ অ্যান ইণ্টারন্যাটাল অ্যাকসেস...বাট ইট ইজ নট্‌ লাইক্‌লি টু লিভ কনসাস্‌লি দেয়ার, ইফ্‌ দেয়ার হ্যাজ নট্‌ বিন্‌ এ সাফিসিয়েণ্ট মেণ্টাল অর সোল-ডেভেলপ্‌মেণ্ট ইন দিস লাইফ্‌...।'

এই কথাগুলি তো দেবযানের কাহিনীগঠনের মূল ভিত্তি। কিন্তু উপন্যাস হলেও মাত্র কাহিনী-কাঠামোতেই দেবযান শেষ নয়। কেবল কল্পনা আর কাব্যময়তাই নয় এর বৈশিষ্ট্য। দেবযান রচনাকালে বেদান্ত ছিল তাঁর প্রধান অধ্যয়ন। ছবির মত করে তিনি রঙে বর্ণে বিন্যাস করেছেন তার কঠিন তত্ত্বকে এই দেবযানে। দেবযানের লেখক যেন বেদগায়ক।

মূর্তিমান ভগবানকে তিনি হাজির করেননি তাঁর এ গ্রন্থে। তাঁর ভগবান—'মহা-ব্যোমের, মহাশূন্যে অনাদি, অনন্ত। স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নির্বিকার, নির্বিকল্প, সে শুধু আছে পাপহীন, পুণ্যহীন, মঙ্গলহীন, অমঙ্গলহীন, সুখহীন, দুঃখহীন, সর্ব-প্রকার উপাধিহীন।'

নায়ক যতীন প্রশ্ন করে করুণাদেবীকে—তিনি কি দেখেছেন ভগবানকে? করুণা-দেবী বলেন, না, অনুভব করেছি, বাষ্পকণায়, জ্যোতিঃকণায়, তৃণে, ধূলিতে। তাকে বুদ্ধি দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে অনুভব করা যায়।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড চষে বেড়ানো পথিক দেবতার কাছেও নায়কের ওই জিজ্ঞাসা, ভগবান দেখতে কেমন দেখেছেন? পথিক দেবতার উত্তর—'আমি তাঁর রূপ দেখেছি তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে।...আমি ভবঘুরে, তাঁকে দেখে বেড়াতে চাই তাঁর সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে। ভ্রাম্যমান আত্মা হয়েই আমার আনন্দ।..এই ভ্রমণই আমার উপাসনা।'

এই পথিকদেবতার কথাই পথিক বিভূতিভূষণের আদর্শ। ভ্রমণকালে তাঁর ডায়েরির পাতায়ও বারে বারে লেখা পড়ে—'নিত্য নূতন তোমার সৃষ্টির লীলা দেখে বেড়াব, এই তো চাই।' পথের পাঁচালীতে পথের দেবতা কিশোর অপুকে ডাক দিয়ে বলে—তোমার পথ শুধুই সামনে, দেশ-দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় এড়িয়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...। 'অপরাজিত'তে তাঁর মনে হয়—'সে জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা—দূর হইতে সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি,—এই বিপুল নীলাকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যানড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শতসহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ।' তাঁর 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর নায়কের কথা—'আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম করে আবার আনন্দভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।' মূল কথা—চরৈবেতি। চলার গান, পথের কবির।

অপু, জিতু, যতীন, যে নামেই ডাকো, আড়ালের আসল মানুষ বিভূতিভূষণ ধরা পড়বেনই। বনগাঁর স্কুল বোর্ডিং-এর কিশোর আবাসিক বিভূতিভূষণের অপুও স্কুল বোর্ডিং-এ থাকে, ছুটির দিন, ঘেঁটু, বৈঁচি, তিৎপল্লার ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফেরে। দেবযানে পরলোকে গিয়েও 'পুষ্পকে নিয়ে যতীন নেমে এলো কোলা-বলরামপুর—তিৎপল্লার হলুদ ফুল, বনশিমতলায় বেগুনি ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করেছে—মন খারাপ হয়ে গেল। এর সঙ্গে জীবনের কত স্মৃতি জড়ানো! ছেলে-বেলায় এমনি শরতে পুজার ছুটিতে স্কুল বোর্ডিং থেকে বাড়ি আসতুম।'

সকল তত্ত্ব সত্ত্বেও, দেবযানের পুষ্প-যতীন পরলোকে বসেও কল্পনায় রচনা করে নেয় বিভূতিভূষণের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত সেই শাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটটি। স্বর্গে, যেখানে ফোটে আলোর ফুল, তা দেখে মন কাঁদে, তিৎপল্লা, বনশিম ফুলের জন্য। যতীনের ইচ্ছে হয়, আবার সেই মাটির ঘরে গরীব মায়ের কোলটি আলো করে জন্মাতে।

বইখানির প্রথম পরিকল্পিত নাম 'দেবতার ব্যথা'। পৃথিবীর পাপী, দুঃখী, অজ্ঞ মানুষের জন্য দেবতার ব্যথাই বর্ণিত দেবযানে। জ্যোতির্বাতায়ন দিয়ে তাঁরা দেখেন পৃথিবীকে, ধুলোয় নামেন মানুষের দুঃখ মোচন করতে, তাদের মুক্ত করতে। যতীনের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমে পুষ্প হয় স্বর্গের অধিকারিণী। তার প্রেমাস্পদ যতীনকেও সে উচ্চতর আত্মিক লোকে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মানবিক প্রেমের জয়গানে ভরে যায় দেবযান। প্রেমিক পুরুষ ভগবানকেও প্রেমেই পাওয়া যায়। দেবযানের নায়ক অভিচার সিদ্ধ গুনিকের মত নিশি ডেকে, প্রেত নামিয়ে ফেরেন না, মঠে-মন্দিরে মুক্তি খোজেন না, তাঁর মুক্তি অন্তহীন চলার ছন্দে, তাঁর মুক্ত আত্মা হতে চায় বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর।—আত্মার তত্ত্ব অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নে আয়ত্ত করে তিনি দেখিয়েছেন পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন যাত্রা এই 'দেবযান'-এ।

যে-কোন রচনা নিয়ে নিন্দা-প্রশংসায় যে লেখক নির্বিকার, বীতমন্যু, তিনিই দেখি উত্তেজিত হয়ে পড়েন দেবযানের সমালোচনায়। না, এর কল্পনার প্রসারতায়, আশ্চর্য কাব্যময়তায় প্রশ্ন তোলেনি কেউ। প্রশ্ন—বিষয়বস্তু নিয়ে, প্রতিপাদ্য নিয়ে। আর সে প্রশ্ন মুখোমুখি হলে আর নিস্তার নেই। কাব্য নয়, কল্পনা নয়, ওই তত্ত্বটিই প্রমাণের জন্য তাঁর চ্যালেঞ্জ। সে-বিভূতিভূষণ তার্কিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক।

প্রমথনাথ বিশীর ছোট ভাই মারা গেল অকালে। ব্যথাতুর গোটা পরিবার। কোন সন্ন্যাসীর কাছে না গিয়ে তাঁরা গিয়েছেন বিভূতিভূষণের কাছে সান্ত্বনা পেতে, অকালে ঝরে পড়া জীবনটির কী হল জানতে। প্রমথবাবুর স্ত্রী সুরুচি দেবী বলেছেন, 'তিনি (বিভূতিভূষণ) সেই সময় শ্লেটে দাগ টেনে আত্মার গতির চিত্র এঁকে এঁকে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আত্মার জন্য শোক করলে আত্মার কেমন কষ্ট হয় তা বুঝিয়েছেন। নানাবিধ কথা আর তাঁর উপদেশে সদ্যশোকতপ্ত আমাদের মনের উপর সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়েছিল।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্লানচেট ও পরলোকচর্চা শুরু করেন তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে। ওই সময় তাঁর শোককাতর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়াব জন্য বিভূতিভূষণেব সাহায্য চান অচিন্ত্যকুমার। পরলোক সম্পর্কেও তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল। দেবযান-লেখকের কাছে চান জানতে। ঘাটশিলা থেকে লিখে জানালেন বিভূতিভূষণ—

'প্রীতিভাজনেষু, অচিন্ত্যবাবু, আপনার পত্রে সব জানলাম। প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহু স্তর বিদ্যমান, বিশেষে বহুলোক. বহু স্তর. বহু গ্রহ, মৃত্যুর পব যেখানে জীবনের গতি হয়। এই সব 'সুপারমানডেইন ওয়ারল্‌ডস' আছে এবং ঋষিরা প্রাচীন যুগে তাদের অস্তিত্ব জেনে-ছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।

'এগুলির আকর্ষণ অতি তীব্র—পৃথিবীর জীবনের পরে যখন এই সব লোকে গতি হয় তখন পৃথিবীর আনন্দ এদের আনন্দের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সেই আসক্তি বা কামনাই পুনর্জন্মের বীজ বপন করে।

'প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে এই সব বিভিন্ন লোকালোকের আসক্তি ও মায়া

কাটিয়ে সর্বলোকাতীত বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা। ভগবানকে পাওয়া এরই নাম। ধর্মজীবনের আরম্ভ তখনই হবে যখন আমাদের মন নিরাসক্ত হবে জাগতিক রসাকাঙ্ক্ষায়। তাঁকে জানলেই সব জানা হোল। নতুবা প্রেতলোকের আবিষ্কারের আর নতুন একটা দ্বীপ আবিষ্কারের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুটোর কোনটাই আধ্যাত্মিক ঘটনা নয়।'

দীর্ঘ পত্রে তিনি জপ-ধ্যান ইত্যাদির পরামর্শ দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমারকে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রেতলোক সন্ধান করে রোমাঞ্চ অনুভূতি বা তার কাল্পনিক অবতারণার দ্বারা লেখায় চটক সৃষ্টি করা তাঁর লক্ষ্য নয়। দেবযানে যে অতিজাগতিক লোকের নানা স্তরের কথা, তার ভিত্তি বেদ। তিনি তাতে বিশ্বাসী।

ব্যঙ্গ-কৌতুক যে যাই করুন, ক্রমে সবাই ও'র মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে শুরু করেন ও'র বিশ্বাসের সত্যতাকে। দেবযানের লেখক সম্পর্কে সুশান্ত শা'র লেখক ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের 'মনে পড়ে, রাকা মাইনসের গভীর পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা বাড়িটার বারান্দায় বসে কত দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই নিয়ে আলোচনা করেছি! কত গভীর রাতে আমাদের কারো চোখে ঘুম নেই, দু'জনে বসে আছি বারান্দায়, চারিদিকে সেই নির্জন বনভূমি উদ্ভাসিত করে জেগে উঠেছে চাঁদের আলোয় একটা যেন অবাস্তব মায়া রাজ্য। মনে পড়ে, অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর, প্রায়ই দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতাম বাইরের দিকে চেয়ে যদি কোনও অশরীরী মৃত্যুঞ্জয় আত্মাকে দেখা যায়! তখন বলিনি, আজ বলি, আমি সেই সময় অনেকবার চুপি চুপি তোমার চোখের দিকে চেয়ে দেখেছি। লক্ষ্য করেছি দৃষ্টিপ্রদীপ উঠত জ্বলে তোমার চোখে।'

সজনীকান্ত দাস তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেছেন, 'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আচারে ব্যবহারে কালাপাহাড় বলে অখ্যাতিও আছে।' পরলোকচর্চার জন্য বিভূতিভূষণকে যে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করতেন, ওই কথা উল্লেখ করে আত্মস্মৃতিতেই সজনীকান্ত স্বীকার করলেন—'পথভ্রষ্ট (?) বৈজ্ঞানিকদের আলোচনায়ও দেখিয়াছি এবং বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি। বিভূতিকে বাহির হইতে কখনও আমল দিই নাই, ঠাট্টা করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গু ধারার মত মৃত্যু পরপারের এই টুকরা রহস্যটি আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করিয়াছে, আর বিভূতিকে স্বীকার করিয়াছি।'

এই 'টুকরো রহস্য' বলতে সজনীকান্ত যে ঘটনার কথা বলেছেন তাঁর আত্মস্মৃতিতে তা সংক্ষেপে এই—মালদা ইংলিশবাজারের কালীতলাপল্লীর বাড়িতে বসে তাঁর মেজদা মারা যান। মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে তাঁর বাবা রুগ্নপুত্রের শিয়রে শেষ প্রহর জাগছিলেন। এমন সময় দেখলেন, অস্বাভাবিক লাল আলোতে ঘর ভরে গেল। আর মুমূর্ষু মেজদা হঠাৎ শয্যা হতে উঠে বসে কাকে যেন বললে, এই যে আমি যাচ্ছি!

এ জাতীয় অভিজ্ঞতা সজনীকান্তর পিতৃদেবের আগেও হয়েছিল। তিনি বুঝলেন তাঁর অজু চলে যাচ্ছে।

পরদিন দুপুরেই সে ওই অদৃশ্য অভ্যাগতের আহ্বানে চলে গেল।

চলে তো গেল, কিন্তু পরদিন ঠিক দুপুরে কী দেখলেন তাঁরা সবাই?

সজনীকান্ত লিখছেন, 'হঠাৎ বাবা কী দেখিয়া মাকে ডাকিলেন—আমরাও তাকাইলাম, আমরা সকলেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একখানি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণ শীর্ণ মেজদাদা আসিয়া

বসিয়াছেন। মা,—'বাবা আমার' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, পরক্ষণেই দেখি সে অন্তর্ধান হইয়াছে।'

সজনীবাবু মত পাল্টালেন। এমনি অনেককেই মত বদলাতে হয়েছে ঘটনাঘাতে। এক চরম সংঘটনের পরে সুনীতিকুমারকেও ফিরে বলতে হল 'বিভূতিবাবুকে আমরা প্রকৃতিপূজারী, বন-পাগলা কবি, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দ্রষ্টা আর সাহিত্যে তার স্রষ্টা বলেই জানতুম, শ্রদ্ধা করতুম—কিন্তু তিনি যে এইভাবে নিজে জীবনের এক 'ফিলসফি', নিজের বিশেষ দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে নিয়ে তারই আধারে স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী হয়েছিলেন, তার খবর আমার জানা ছিল না।' সে চরম ঘটনার কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

সেই সাতসকালে রেল চেপে শহরে এসেছেন। ম্যাট্রিকের খাতার বানডিল হাতে হেড একজামিনারের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে আছেন আরো দশ জন শিক্ষকের সঙ্গে। কখন ভিতরে ডাক পড়বে ঠিক নেই। হয়ত দুপুর গড়িয়ে যাবে। তারপর হোটেলে খেয়ে বারাকপুর ফেরা। অতএব তাড়া আছে, তবে ক্ষোভ নেই কোন। নানা জায়গা থেকে আসা স্কুল-শিক্ষকদের জমিয়ে নিয়েছেন।—এ দৃশ্য দেখে দুঃখ করেছিলেন সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীগোপাল হালদার। তাঁর ক্ষোভ হেড একজামিনারের আচরণে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানলে হয়ত হত না ক্ষোভ। হায়, কার জন্যে ক্ষোভ করা?

উত্তর দিয়েছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছেই এক সময় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাঙলা পরীক্ষক হিসাবে খাতা জমা দিতে আসতেন বিভূতিভূষণ। সাধারণ পরীক্ষক থেকে পরে তিনি ওঁকে স্ক্রুটিনাইজার বা নিরীক্ষক করে নেন। নিয়মিতভাবে সুনীতিকুমারের বাড়িতে গিয়ে স্তূপীকৃত কাগজ স্ক্রুটিনাইজ করতেন। আর ফাঁকে ফাঁকে গল্পে পরিহাসে মাতিয়ে তুলতেন আসর। সুনীতিবাবু যে নানাভাবে ওঁর যত্ন-আপ্যায়ন করতেন, এবং মাঝে মাঝে বেশি ভোজনে অসুখ পর্যন্ত বাধিয়ে ফেলতেন লোকটি তা বিভূতিভূষণের দিনলিপি থেকে জানা যায়। কিন্তু অনেক সময় নিজেই বাইরের ঘরে এমন জমিয়ে বসতেন, কোন খবরই দিতেন না সুনীতিবাবুকে, তিনিও টের পেতেন না, এতেই বিভ্রাট। সুনীতিকুমারের কথা—'বিভূতিবাবুর অনুরাগী ভক্ত মেয়ে আর পুরুষ, স্কুলের ছেলে আর কলেজের অধ্যাপক জুটত প্রচুর। তিনি নিজেকে কারো কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না, প্রাণ খুলে গা ঢেলে সকলের সঙ্গে মিশতেন। এতে করে মাঝে মাঝে নিজেকে খেলো করে ফেলতেন—কিন্তু বন্ধুদের অনুযোগে কোন ফল হত না, ভারিক্কে হবার কলা তাঁর কৌশলের বাইরে ছিল।

'সদানন্দ প্রকৃতিগত প্রাণ আত্মভোলা এই মানুষটিকে ভাল না বেসে কেউ পারত না। ইনি কারো তাচ্ছিল্য, অবহেলা গায়ে মাখতেন না, এক সহজ চিত্তপ্রসন্নতা এঁকে যেন অভেদ্য বর্মে আবৃত করে রেখেছিল। ক্রমে বুঝেছি, এই চিত্তপ্রসন্নতার আড়ালে তাঁর চরিত্রে এমন একটা বড় জিনিস ছিল যার হদিস আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।' ঠিক এই হদিসের অভাবেই ওঁকে নিয়ে কৌতুক করতে আটকাতো না অনেকের।

পরিমল গোস্বামীর কথা—'তাঁর সঙ্গ ভাল লাগত না, এমন কাউকে আমি জানি না। কি এক আশ্চর্য মাধুর্য ছিল তাঁর চরিত্রে। তিনি কখনো সাহিত্যের জগতে গুরু সাজতে চেষ্টা করেননি, কাউকে উপদেশ দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাননি,

হীন ভাবও তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি, তিনি নিরহংকার ছিলেন, সবাই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেত। তাই তাঁকে সবার ভাল লাগত। এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিজের প্রতি উদাসীন ছিলেন।'

সকালের দিকে বেশ আড্ডা জমেছে বইপাড়ায় মিত্র-ঘোষের প্রকাশালয়ে। তারাশংকর, গজেন মিত্র, সুমথ ঘোষ প্রমুখ হাজির। এমন সময় ছেঁড়া শিলপারে চটাস চটাস আওয়াজ তুলে লোকটি প্রবেশ করলেন। ছেঁড়া ছাতা, ময়লা পোশাক, হাতে পরিচয়ের বিশেষ প্রতীক একখানি তাজা কণ্ঠি।

আরে, এই যে ঘেঁটু সোঁদালির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! গোটা আসর নড়েচড়ে উঠল। লোকটি কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে একটি আসন টেনে বসলেন।

চুপ করে যে! ব্যাপার কি? মনে হল, কী যেন ভাবছেন। একটু পরেই দেখা গেল কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন, টাকা দাও আমার।

অতগুলো মানুষের মধ্যে এ-রকম গৌরচন্দ্রিকাহীন অর্থ দাবি! সবাই হতবাক প্রথমে মুখ খুললেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পোশাকের এ কী ছিরি করেছো তুমি?

লোকটি বিব্রত। সাফাই গাইলেন, গেঁয়ো মানুষ, ওতে আমাদের কি।

কিছু নয়? তারাশংকর ক্ষুব্ধ। সামাজিক মর্যাদা এখন যথেষ্ট তোমার। সুনামেব উপযোগী শোভনতা রক্ষা করবার মত অর্থাগমও হচ্ছে। আর তা যদি নাই করলে, অর্থের দরকার কি?

কী বলতে যাচ্ছিলেন লোকটি। বাধা দিলেন গজেন মিত্র, জানেন, স্ত্রীকে পর্যন্ত ভালো একখানা গয়না দেননি বড়দা।

'হা-হা' রবে ঠেকাতে চাইলেন গজেনকে। কিন্তু চুপসে গেলেন তারাশংকরের ধমকে, কথা শোন।

বেশ, শুনছি।—শিশুর মত শান্ত। শুধু হাত বাড়ালেন, একটা বিড়ি দাও তবে। বিড়ি তারাশংকর খান না, খান দামি সিগারেট, এটা প্রার্থীরও জানা।

ও'কে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে তারাশংকব বললেন, দেখুন তো গজেনবাবু, কত টাকা ওর হবে আপনার এখানে?

সুমথ ঘোষ হিসাব দাঁড় করালেন, তা হাজারের উপরে।

এখন ও'র স্ত্রীর কী গয়না চাই, কোনটা পছন্দ, জানা দরকার যে।

তা বৈষয়িক গজেনবাবু আগেই সেরে রেখেছেন। হাতের মাপ পর্যন্ত। বললেন, অনুমতি করলে এক্ষুনি আনতে পারি।

এতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন আগন্তুক,—না না, আমি জানি, গজেন সব সোনার গয়নার কথা বলছে। সে হয় না।

নিশ্চয় হয় এবং আজই হবে।—তারাশংকর দৃঢ়তর।

অসহায়ের মত লোকটি চারদিক চোখ হাতড়ে নিলেন।—না, কেউ বন্ধু নেই এখানে।

তা যে সত্যিই নেই, মুহূর্তে সে সম্বন্ধে সব সন্দেহ দূর হল। ভাবলেন এখান থেকে যত দ্রুত কেটে পড়া যায়, ততো ভালো। কিন্তু উঠতে গিয়েই হাতেনাতে, না পায়ে, প্রমাণ পেলেন। শিলপার নিখোঁজ।

তারাশংকর রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, ওখানেই অন্ত্যেষ্টি হয়েছে শিলপারের। ছাতা?

ছাতার ছেঁড়া কাপড়টা ততক্ষণে ফর্দাফাঁই।

নতুন ছাতা, জুতো, রেডিমেড জামা—সব কেনা হল। লোকটি আপনমনে বিড়বিড় করতে থাকলেন, ফোতো, যতোসব ফোতোদের কাণ্ড! চ্যান করুকগে, যাক।

বোঝা গেল, যাত্রা শুভ হয়নি। দুর্গা দুর্গা বলে এখন বারাকপুর ফিরতে পারলেই স্বস্তি। কিন্তু তারাশঙ্কর ছাড়লেন না। ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্ন করে খাওয়ালেন। সন্ধ্যায় দুজনে আবার মিত্র-ঘোষে। সেখানে গজেনবাবু গয়নাগুলি হাতে দিতেই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশিতে মাথা দোলাতে থাকলেন, ভালোই হল, খুব ভালো করেছ গজেন। ইন ফ্যাক্ট, কল্যাণীকে বড্ড উপেক্ষা করা হয়েছে অ্যাদ্দিন। কিছুই চাইবে না তো! আমার কি ছাই এসব মনে থাকে। বেশ হয়েছে।

বাদবাকি টাকাটা ও'র হাতে দিতেই ফিরিয়ে দিলেন, এসব নিয়ে করব কি বল দেখি? তোমার কাছেই থাক।—বলেই কণ্ঠ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে পড়লেন। হ্যারিসন রোডের বাঁকে অদৃশ্য হতে হতে বললেন, চললুম, তাহলে ওই কথাই রইলো।

কথা কিছুই রইলো না। ওটা বিভূতিভূষণের নিষ্ক্রমণকালের অভ্যস্ত একটি বাক্‌বিভূতি।

ও'র পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গজেন মিত্র তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে তিনি আপনমনেই বললেন, মানুষের মধ্যে যাঁকে খুঁজে বেড়াই, তাঁকেই বুঝি দেখতে পেলাম আজ ও'র মধ্যে!

সেবার গজেন মিত্ররা ক'জন একটা জরুরি কাজে বারাকপুর হাজির। গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল বড়দার কাছে।

ও'দের দেখে মহা খুশি বিভূতিভূষণ। আগে চলো, ইছামতীতে চান করা যাক, তারপরে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে সব ঘুরে দেখতে।

কিন্তু ও'দের দরকার সেই দলিলটি দেখা! গুরুত্বটা উল্লেখ করতে ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক, বলো কী, খুব জরুরি?

গজেনবাবু ও'র মৌখিক চেহারা দেখে উদ্‌বিগ্ন হলেন, আছে তো বড়দা?

তা নিশ্চয় আছে, দিয়েছো যখন। তবে একটু খুঁজে দেখতে হবে আর কি!

খোঁজা শুরু হল, তন্নতন্ন তল্লাসি। সর্বশেষ পৌঁছানো গেল কেরোসিন কাঠের একটা ভাঙা আলমারিতে। কেরোসিনত্ব তার অনেককাল আগেই উবে গিয়েছে। এখন রাশীকৃত কাগজপত্রের ভাঁজে ভাঁজে উইপোকাদের পাঁচশালা পরিকল্পনার নির্মাণকার্য চলেছে পুরোদমে। দেখেশুনে বিষণ্ণ গজেনবাবু সুমথ ঘোষের দিকে তাকাচ্ছেন। ফ্যাসাদে পড়েছেন বিভূতিভূষণ,—খুবই জরুরি বলছ?

আর বলে কী হবে!—গজেনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। কেঁচো খুঁড়তে সাপ! একটা উইয়ের স্কাইস্ক্র্যাপার হাতে নিয়ে দেখলেন, অনেক টাকা ব্যয়ে তা নির্মিত। একগোছা নোটে মাটি! হায় হায়, কত ছিল এখানে বড়দা?

তাই তো! কত টাকা হে? বিভূতিভূষণেরও মাথায় হাত।

সুমথবাবু ততক্ষণে আর একটা লম্বা খাতা টেনে বার করেছেন। চক্ষুস্থির কাণ্ড! বেশ কয়েকখানা চেক তার মধ্যে, এক বছর, দু'বছর, কোনটা বা তারও আগেকার।

সব মিলিয়ে প্রায় হাজার দুই টাকার।

বিভূতিভূষণ উৎফুল্ল হলেন, ঠিক আছে, এতে তেমন দাঁত বসানো হয়নি ওদের।

দরকারও হয়নি আর।—গজেনবাবুর মুখে সকরুণ হাসি।—ওর সব ক'টিরই মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বড়দা!

তাই নাকি? দ্যাখোতো হাঙ্গামা!

কেবল হাঙ্গামা, এতটা সর্বনাশের গুরুত্ব কে বোঝাবে এমন শিশুকে! সবাই নির্বাক। ও'দের দিকে খানিকক্ষণ ভ্যাবাচাকা তাকিয়ে থেকে গা ঝাড়া দিযে উঠলেন লোকটি—চ্যান করুক গে, যাক।

হাঁ, 'কৃপণ' বিভূতিভূষণের হৃদয়ে অতগুলি টাকার ক্ষতিও কোন ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। ও'দের নিয়ে হৈ হৈ করে কাটালেন সারাদিন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সুহৃদের উক্তি,—'ছিল শিশুর মত ও'র সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। খেলাঘরে পুতুলটি থেকে সামান্য সুতোগাছিও সযত্নে যখন সাজাবেন, তার প্রতি তখন প্রাণাধিক টান। আবার পরমুহূর্তেই ওগুলি সব ফেলে দিয়ে নতুন খেলায মাততে তাঁর আপত্তি নেই।'

কোথাও বেরোতে হলে হাত পাতবেন, কিছু পয়সা দেবে কল্যাণী!

কল্যাণী দেয়। দেবে কোত্থেকে? অত বড় লেখক যিনি, ক'টাকা আনেন তিনি ঘরে? প্রকাশকদের কাছে কত পড়ে আছে তার হিসেবই বা কে রাখছে? অথচ এক-একবার বাইরে যাবেন, ফিরে এসেই হাত ফক্কিকার। লেখা, পড়া, আড্ডা, ঘোরা, বন্ধু-বান্ধব ডেকে এনে আপ্যায়ন—এইসব নিযে মেতে আছেন। দুটো পয়সার দরকার হলেই শিশুর মত হাত পাতবেন—দেবে কল্যাণী? কত অসহায়!

অসহায় বোধ করে কল্যাণীও মাঝে মাঝে। বলতে বাধ্য হয়, তার হাতও শূন্য। জিজ্ঞেস করে, প্রকাশকদের কাছে পাওনা নেই কিছু?

তাই তো! পাওনা কি নেই কিছু? দেয় না কেন ওরা?—হঠাৎ মাথা গরম হযে যায় ওদের ব্যবহারের কথা ভাবতে।—দেখেছ কাণ্ড, না চাইলে কোন বান্দা ট্যাঁক ঢিলে করছে না! কণ্ঠ হাতে কলকাতার বইপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

পথে যে প্রকাশককে আগে পাওয়া গেল, তাকেই পাকড়াও। ঋজু জিজ্ঞাসা, কত টাকা আছে হিসাব করে দিন।

প্রকাশকরা অবাক হন, অসুবিধায়ও পড়েন কখনো-সখনো। টাকা তো ও'র অনেকই পাওনা। কিন্তু চান না বলেই দেন না। হঠাৎ চাইলে মুশকিল।—এখন কত হলে চলে বলুন তো?

চলে মানে কি? সবটাই চাই।

উপায়ান্তর না পেয়ে সব টাকাটাই দিতে হয় জোগাড় করে।

হাতে নোটগুলি নিয়ে নাড়েন চাড়েন, কত টাকা! চোখ চকচক করে। কোঁচার প্রান্তে শক্ত গেরো দিয়ে বাঁধেন।

প্রকাশকরা ব্যবসায়ী। ও'র টাকা সামলানোর ধরন দেখে বারণ করেন ওভাবে নেবেন না, টাকাটা পথেই মারা যাবে।

ওদের কোন কথা আর কানে তোলা নয়, পা' বাড়ান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটিকে আবার ফিরে আসতে দেখা যায়।

কী ব্যাপার?

অত টাকা একসঙ্গে কী হবে আমার। অল্প কিছু দিয়ে বাকিটা রেখেদিন।

এখানে উল্লেখ্য, জীবনে তিনি কোনকালে মনিব্যাগ বলে কোন বস্তু ব্যবহার করেননি।

বিভূতি-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রকাশক গজেন মিত্র। সম্পর্কটার সূত্র ছিল ব্যবসায়িক। কিন্তু সবার উপরে এক আশ্চর্য হৃদ্যতা জন্মে গেল অজ্ঞাতে। গজেন-বাবুর কথা, অর্থে আসক্তি ও'র অভিনয়। কয়েকটি টুকরো ঘটনা বলেছেন তিনি।

'বিভূতিভূষণের কোন একটি বই কোন একজন প্রকাশক প্রকাশ করেছেন। একদিন আমাদের সামনে আর এক প্রকাশক এসে সেই বইটিরই পরবর্তী সংস্করণের জন্য প্রথম প্রকাশক পূর্ব সংস্করণের জন্য যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে দেড় হাজার টাকা বেশি দিতে চাইলেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ রাজি হলেন না। বললেন, থাকগে। লোকটা বড্ড কান্নাকাটি করবে। বড্ড আঘাত পাবে। সেখানে আরও দু'তিনজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা আজও জীবিত। আমার এ উক্তির সমর্থন তাঁরা করতে পারবেন।'

শুধু তাই নয়। 'একবার যুদ্ধের সময়, ছোট গল্পের বিষম দাম উঠেছে। পুজোর বাজার, আমরা এক শ' টাকা, আশি টাকা নিয়েছি, পঞ্চাশের কমে তো কাউকেই দিইনি। কোন কোন লেখক শতাধিক টাকাও পেয়েছেন একটি ছোট গল্পের জন্য। এমন সময় সংবাদ পেলাম যে, কোন কোন কাগজে উনি চল্লিশ টাকাতেও গল্প দিয়েছেন। খুব বকাবকি করলাম, এমন করে বাজার খারাপ করলে চলে কি করে? আপনার গল্পই যদি অত কম টাকাতে পায় তো আমাদের বেশি টাকা দেবে কেন? উনি মুখ কাঁচুমাচু করে একটি বিশেষ কাগজের সম্পাদকের কথা উল্লেখ করে বললেন, বুঝতে পারছেন না, ও লোকটা বড় গরীব, ও বেশি দেবে কি করে?

আমি রাগ করে বললাম, 'বটে, ওই লোকটিই প্রবোধবাবুকে আশি টাকা দিয়ে লেখা নিয়েছে তা জানেন? আসলে গোঁ ধরে বসে থাকলেই দিতে বাধ্য হত। প্রবোধ-বাবু জানেন কেমন করে নিতে হয়।

'উনি বললেন, আহা-হা, বুঝতে পারছেন না। প্রবোধ যে ছাপোষা মানুষ, তার উপর শহরে থাকে। ওর যে বেশি টাকার দরকার। ওর না নিলে চলবে কেন?

এ মানুষকে কি বলা যায়?'—প্রশ্ন গজেনবাবুর।

তিনি বলছেন, 'কখনও কখনও বড়দা আমাদের কথায় তেতে উঠে বলতেন, না আমি আর কাউকে কম টাকায় লেখা দেব না। ও ছাপা না হয় পড়ে থাক। অথচ ঠিক তার পরমুহূর্তেই হয়ত কোন সম্পাদকের জন্য উমেদারি শুরু করতেন।

এ বছরও পুজোর সময় লেখাগুলি দিয়ে বললেন, (আমার কাছেই লেখা থাকত ইদানীং—কারণ উনি থাকতেন বিদেশে, ও'কে সবাই ধরতে পারত না) না মশাই, পঞ্চাশের কমে কাউকে দেবার দরকার নেই, মিনিমাম পঞ্চাশ। এর কম দিলে আমি আপনার কাছ থেকে আদায় করব।

বেশ কথা। বসে কিছুক্ষণ গল্প করে কাপ দুই চা খাবার পরই উমেদারি শুরু করলেন, দেখুন একটা কথা কিন্তু, অমুক আপনাদের এতকালের বন্ধু (বন্ধু আমাদের চক্ষুলজ্জাটা তাঁর!) তার কাছ থেকে কি আর জোর করে আদায় করতে পারবেন। মরুক গে, ওকে লেখা দিয়ে দেবেন, যা দেয় দেবে।

আর একটি বিড়ি শেষ করে আর একজনের কথা পাড়লেন, দেখুন অমুক বড্ড

কাকুতিমিনতি করে চিঠি লিখেছিল কিন্তু আমাকে, বাজার নাকি বড্ড খারাপ, ওর নিজেরই সংসার অচল হয়ে উঠেছে, কিছু কমে লেখা না পেলে কাগজ বার করতেই পারবে না। কী করবেন? দেবেন নাকি ওকে একটা লেখা?

যেন লেখাটা আমার—উনি কেউ নন।'—গজেন মিত্রর মন্তব্য।

এমনি অনেক টুকরো কথা গজেনবাবুর ঝাঁপিতে।

রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য টাকা তোলা হচ্ছে। বারাকপুর থেকে শহরে আসতেই বিভূতিভূষণকে ছেঁকে ধরলেন সাহিত্যিকরা, মোটা চাঁদা দিতে হবে।

চাঁদা? ও কাজে আমি নেই। চাঁদা কি হবে মশায়, আমাকে কে দেয় তারই ঠিক নেই।

ও'রা বললেন, তা হবে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির ব্যাপার, সাহিত্যিক হয়ে—

না না। ওসব চলবে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে আমরা দেব কেন? উল্টে সেই ভাণ্ডার থেকে আমাদেরই কিছু দেওয়া উচিত। বাঙালী সাহিত্যিকদের চেয়ে দুস্থ কে আছে? তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা! রবীন্দ্রনাথ নিজে শুনলে দুঃখিত হতেন।

অনেক পীড়াপীড়ির পর পাঁচ টাকায় রাজি হলেন। অবশ্য দিলেন পঞ্চাশ টাকা।

আবার প্রবোধ সান্যাল যেদিন বললেন, করুণাদার সম্বর্ধনায় তোমায় মোটা চাঁদা দিতে হবে, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, এটা খুব ভালো প্রস্তাব, করুণাদার জন্য সত্যিই কিছু করা দরকার।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে সম্বর্ধনায়ও পঞ্চাশ টাকা দিলেন যেচে। আর খুশিতে ঘাড় নাড়তে লাগলেন, খুব ভাল কাজ, বাঃ...নিশ্চয় এটা দরকার।

'কৃপণ'-এর মতো আর একটি মিথ্যে পরিচয় তাঁর 'পেটুক'।

শহরের অগ্নিমান্দ্যভোগী অনেক বন্ধুই সুস্থশরীর বিভূতিভূষণের সহজ স্বচ্ছন্দ ভোজন দেখেছেন। চিরদিন গরিবের ছেলে, মায়ের দেওয়া খুদভাজাকেও পরমান্ন মেনে সযত্নে খেতে অভ্যস্ত। আর এক অভ্যস্ততা মেস-জীবনের বাঁধা ঘ্যাঁটে। তাও কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়ে হিসাবি-হাতায় পাতে পড়ত। হাড়ে লাগত কিছু পাতে ঠেলে রাখতে। একটু ভালো জিনিস হলে তো কথাই নেই, গোগ্রাসে খাবেন। তাই বলে তেল-মুড়িতেও কম আনন্দ নয়। এতেই ওই অপবাদ। বেশ তো। ওই একটা মজা পাওয়া গেল। বিভূতিভূষণও দিগুণ উৎসাহে ওই ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা খোঁজ নিয়েছেন, তাঁরা জানতেন, ভোজনরসিক ওই লোকটি কতদিন ভোজন না করেই রসিকতা করে কাটিয়েছেন হাসিমুখে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ি চলেছেন সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পথে মিরজাপুর পারকের কাছে বিভূতিভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সাহিত্যরত্ন মশায় রসিক মানুষ। ও'র 'পেটুক' নামটি বন্ধুসূত্রে তাঁর কানেও পেঁাছেছিল। বললেন, কোথায় ছিলে ভাই? ও, কি প্রচুর খাওয়াটাই না খাওয়া গেল!

শোনামাত্র বিভূতিভূষণ এমনভাবে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন যে, ব্যাপার দেখে দু'একজন করে লোক জমতে আরম্ভ করল। তিনি তাড়াতাড়ি বিভূতিভূষণকে নিয়ে সরে পড়লেন।

এই কাহিনীটি বলে এক প্রবন্ধে সাহিত্যরত্নমশায় মন্তব্য করেছেন 'শুনিয়াছিলাম

বিভূতিভূষণ ভোজনবিলাসী। কিন্তু কলকাতা শহরে দুইএকবার একসঙ্গে নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিয়াছি, তিনি বচনে যেরূপ আড়ম্বরের সৃষ্টি করিতেন, উদর তাহার ততখানি সমর্থন করিত না।'

সজনীকান্তর অভিজ্ঞতা আরও করুণ।

এক সকালে ঢাকুরিয়ায় সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর বাড়ি হাজির বিভূতি-ভূষণ। পরিচয়টা অল্পদিনের। গৌরীশঙ্কর ওঁর বাড়ি গিয়েছিলেন গজেনবাবুর সঙ্গে, নিজের নতুন প্রকাশনালয়ের জন্য বই যদি পাওয়া যায়। গজেনবাবুর দায়িত্ব ছিল ওঁর হয়ে সুপারিশ করা। কিন্তু দরকার হল না। শুনেই বিভূতিভূষণ বললেন, তুমি তরুণ, ব্যবসায়ে নেমেছ, বই তুমি নিশ্চয় পাবে। তারপরে দরদস্তুর না করে, এবং গৌরীশঙ্করের ভাষায় 'অনেক কম টাকায়' অনুবর্তনের পাণ্ডুলিপি দিয়ে দিলেন ওঁকে। পরিচয়ের সূত্রটা এই, কিন্তু সেই সুতোই কতো পাকে প্রাণে ধরে রেখেছেন গৌরীশঙ্কর।

যাক যে কথা হচ্ছিল। বড়দাকে পেযে ওঁর ভারি খুশি। গল্পে গল্পে বেশ বেলা হল। এবং উনি উঠে পড়লেন।

উঠছেন কোথায়? গৌরীশঙ্কর হাত টেনে ধরলেন, রান্না হয়ে গেছে, চান করবেন চলুন।

সর্বনাশ, বলো কী? সজনীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রযেছে যে। ওরা বসে থাকবে, সে হয় না।

গৌরীশঙ্কর আর তাঁর স্ত্রী স্বরূপা দু'জনে মিলে কতো সাধ্যসাধনা। কিন্তু সজনীকান্তর স্ত্রী নাকি ওঁর জন্যে কি কি বিশেষ খাবার তৈরি করেছেন। সুতরাং...।

পরিচিত সবাই জানেন, সামাজিকতার কোন তোয়াক্কা করেন না বড়দা। খিদের সময় কোথাও পাত পড়লেই হল। আজ এ-রকম যখন বলছেন, কী করা যাবে! ক'খানা লুচি আর চা ছাড়া কিছুই খাওয়ানো গেল না। কণ্ঠি হাতে বিভূতিভূষণ উঠলেন।

গজেন মিত্রর দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

কে?

বিভূতিভূষণ স্বয়ং। কী আনন্দ। কিন্তু পরক্ষণেই অন্য চিন্তা। কত বেলা হয়েছে, কখন বারাকপুর থেকে বেরিয়েছেন বড়দা, এত দেরি হল যে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন পর পর। যাক, উত্তর পরে শুনব। আগে চান করুন তো, খাওয়াদাওয়া হোক, পরে কথা।

বিভূতিভূষণ জানালেন, সজনীকান্ত দাসের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছেন তিনি।

তবু একটু জলখাবার। অনুরোধে করজোড় হলেন গজেনবাবু।

উপায় নেই। বিভূতিভূষণ গলার কাছে হাতখানা তুলে দেখালেন, এই গলা-গলা খাইয়ে দিয়েছে সজনীর বউ। উপায় নেই ভায়া।

তাতে কি বড়দা, বলে কিনা আপনার মত খাইয়ে লোককে কাবু করবেন সজনী-বাবুর স্ত্রী।—গজেন ওঁকে কৌশলে কায়দা করতে চান।

হেঁ হেঁ, বলছ ভায়া ঠিকই। তবে দাও, এক কাপ চা তো দাও।

চা খেতে খেতে গল্প জমাট। বেলা পড়ো-পড়ো। কোথায় একটা কাজের তাগিদে উঠতে হল বিভূতিভূষণকে। ওঁকে একবার পেলে ছাড়া, সেকি সহজ! দরজায় দাঁড়িয়েও কথা ফুরোয় না গজেনবাবুর। এমন সময় দুয়ারে এক মূর্তিমান আবির্ভাব! —স্বয়ং সজনীকান্ত দাস।

বিভূতিভূষণকে দেখেই রোমশ ভুরু কুঁচকে ফেললেন তিনি, কে, বিভূতি না?

বিভূতিভূষণ ফ্যাকাশে।

কড়া গলায় জানতে চান সজনীকান্ত, কোথায় খাওয়া হল আজ?

বিভূতিভূষণ নির্বাক। গজেনবাবু বিমূঢ়।

সজনীবাবু গজেন মিত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিই ব্রাহ্মণ ভোজন করালে বুঝি?

এ কী কৌতুক! গজেনবাবু সজনীকান্তকে টেনে এনে চেয়ারে বসালেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সজনীবাবু বলছেন কী! বড়দা যে তাঁর বাড়ি থেকেই খেয়ে এসেছেন, বললেন!

সেই কথাই হয়েছিল। কিন্তু আমাকে বললে, গৌরীর বাড়ি নিমন্ত্রণ। ছেলেমানুষ, দুঃখ পাবে না-গেলে, ইত্যাদি। বিকালে ওকে নিয়ে বেড়াতে যাবো ভেবে গৌরীর বাড়ি এসে শুনলাম, আমার ওখানে গিয়েছে। বাড়িতে টেলিফোন করলাম। না, যায়নি সেখানে। ভাবলাম, তোমার এখানটা খবর নিয়ে যাই। আর—। সজনীবাবু রাগে দুঃখে কাঁপছেন।

তার মানে গোটা দিন অনাহারে কাটল! কী রহস্য যে এই মানুষটির মধ্যে লুকোনো তা কি কেউ কোনদিন বুঝবে?

হাতের কঞ্চিখানা দেয়ালে কাত করে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন বিভূতি-ভূষণ। ঘরের ভাব থমথমে। এক গাল হেসে তিনি বললেন, আচ্ছা, এ-রকম আর হবে না কখনও, কথা দিচ্ছি।

ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানত উপবাসী রাখবার পাপ খণ্ডাতে গজেনবাবু ততক্ষণে ভিতরে ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষ, কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হবে। সাহিত্যশাখার সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বিভূতিভূষণ।

ঠিক ছিল, এখানকার সবাই জড়ো হবেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেখানে আহারাদি সেরে একসঙ্গে যাত্রা। সকাল থেকেই আসর জমতে লাগল, কিন্তু আসল লোকটি কই? এলেন, ঠিক দুপুর মাথায় করে। তারাশঙ্কর তাগিদ দিলেন, আর দেরি নয়, চট করে চান করে নাও।

কলের জলে চান করতে রাজি নন বিভূতিভূষণ। বললেন, এই তো দু'পা গেলেই গঙ্গা। ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু গেলেন তো আর ফেরার নাম নেই। উদ্‌বিগ্ন তারাশঙ্কর বেরিয়ে পড়লেন। দেখেন, গঙ্গায় কোমর জলে দাঁড়িয়ে মানুষটি আঁজলা ভরে জল ঢালছেন আর ঢালছেন। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এক সময় মুখ ফেরাতেই তারাশঙ্কর দেখলেন ও'র চোখে জল। ব্যাপার কি?

অপ্রস্তুত বিভূতিভূষণ। একটু পরে বললেন, পিতৃতর্পণ করছিলেম। আজ বারাকপুর থেকে বেরোবার পরেই বাবার কথা মনে হচ্ছে বড়। তিনিও সাহিত্যসেবী ছিলেন, কিন্তু সাধ পূর্ণ করে যেতে পারেননি। আজ তোমরা আমাকে সম্মানিত করছ। বাবা যদি বেঁচে থাকতেন আজ!

গাড়িতে সে আর এক অভিজ্ঞতা। তারাশঙ্করের ভাষাতেই বলি,—

'একই কামরায় দু'জনে যাচ্ছি। বিভূতিভূষণের সঙ্গে একান্ত পরিচয় এই প্রথম। তার আগে পর্যন্ত আমার সন্দেহ ছিল—বিভূতির জীবনের অনাড়ম্বরতায়, উদাসীনতায় একটি গোপন কৃত্রিমতা আছে। ট্রেনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিভূতি তাঁর উচ্ছিষ্ট হাত দু'খানি স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—দে না ভাই হাত দুটো ধুয়ে। বড্ড খেয়েছি। উঠতে কষ্ট হচ্ছে।

'আমি তাঁর মুখের দিকে চাইলাম তারপর ধুয়ে দিলাম তাঁর হাত। মনে মনে বললাম, মানুষের মধ্যে যাঁকে খুঁজি তিনিই যদি বলে থাকেন এ-কথা তবে এর পর তাকে স্বরূপেই দেখা দিতে হবে। তারপর তিনি হঠাৎ জানলা খুলে দিলেন। শেষ ডিসেমবরের শীত, দিল্লি একসপ্রেস হু হু করে চলছে তখন মানভূম পার হয়ে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে কামরাখানা ভরে গেল। বললাম, করছ কি? বিভূতি বললেন. জ্যোৎস্না হয়েছে দেখ্—আয় ব'স্। আমি প্রশ্ন করলাম, সেজেগুজে কনে পছন্দ করে মানুষ অধিকাংশ সময়েই ঠকে বিভূতি। হঠাৎ দেখা পাওয়া যায় যার—তাঁকে এমন করে দেখা যে বিড়ম্বনা। এই ভাবে কি জ্যোৎস্না দেখে ঠিক লগ্নের-দেখা দেখা যায়?

'বিভূতিভূষণ বললেন, ঠিক বলেছিস। তা যায় না। কিন্তু কি জানিস, মানুষ ইষ্টদেবতার ধ্যান করে, নিত্যই করে; করতে করতে গোটা জীবনটায় ক'টা মুহূর্তের জন্য দেবতাকে পায়। হঠাৎ আসে। তাই, বাইরে যখন আয়োজন রয়েছে, তখন বসলায আসনে। জানালা বন্ধ করে থাকব—কিন্তু সে লগ্ন যদি আজই আসে? তবে? তুইও আয় না।

'আমি শুলাম। তাকিয়ে থাকলাম তাঁর দিকে।'

কানপুর থেকে ফিরে এসে গজেনবাবুদের বললেন তারাশঙ্কর, 'ওহে, কানপুর গিয়ে আমার সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে কি জানো? বিভূতিকে পেয়েছি আমি। এতদিন ওকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি ওকে। এবার এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ওকে বিশেষ করে আবিষ্কার করলাম যেন। ওর সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি।'

ওই কথাটি জানিয়ে গজেন মিত্র লিখেছেন, 'ও'র সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। চিনতে পারা কঠিন ছিল।...সবাই জানত ও'কে আধ-পাগলা কৃপণ স্বভাবের বড়গোছের সাহিত্যিক একজন; খুব অন্তরঙ্গ সাহচর্য পাবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, সেই শুধু কোন এক সময় চমকে উঠে আবিষ্কার করেছে তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব, বিরাট মানুষের বিরাট স্বরূপ। সখা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখার মতই বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে।'

॥ উনিশ ॥

উনিশ শ' ছেচল্লিশের আগস্ট। দেশের হাওয়ায় তখন উড়ে উড়ে ফিরছে আশা আর নিরাশার খবর। দীর্ঘকালের সাম্রাজ্যশাসনের দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হয়ে পড়ছে ইংরেজের! বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিরাট কোন পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দেশ। সেই সঙ্গে ঈশান কোণে দেখা দিল ঝড়ের সংকেত।

চঞ্চল হয়ে উঠল ঘৃণ্য স্বার্থের কুটিলচক্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতার দাবানলে ভস্মীভূত হতে থাকল মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক, জীবনমূল্যে অর্জিত আদর্শ, স্বপ্ন আর

ভবিষ্যৎ।

বিভূতিভূষণের চেতনায় ও সৃষ্টিতে তার প্রতিভাস ধরা পড়ে। মানুষকে বর্জন করে তো তাঁর সাহিত্য নয়। তিনি চেয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে এক অখণ্ড সত্তায় তাকে ধরতে। জীবনসংযোগহীন সাহিত্য তাঁর সাধনা নয়। সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে তাঁর কথা—

'যে-সাহিত্য টবের ফুল, দেশের সত্যিকারের মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রসসঞ্চয় করচে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী পেল না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের বরে বঞ্চিত, নয়তো সংসারবিরাগী ঊর্ধ্ববাহু মৌনী যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনান্তে বাইরে অবস্থিত।'

পঞ্চাশের মন্বন্তরকালে বারোয়ারি গল্পে তাঁর লেখায় সেই যুগমহানিশার উদ্‌বেগ, ক্ষোভ এবং সবার উপরে এক মহৎ আশার বাণী ফুটে ওঠে। গল্প পঞ্চাশৎ এর 'গল্প নয়'-এ কুশ্রী-কদাকার, মাতৃহীন, দরিদ্র, রুগ্ন শিশুর প্রতি রেলের কামরাভরা ঘৃণার মধ্যে আর একটি দরিদ্র অনাত্মীয় গ্রাম্য বধূর স্নেহনির্ঝরের চিত্র এঁকে তাকে বলতে শোনা যায়—'মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থ-পরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূমমলিন, যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থের আদর—সেখানে এই ময়লা-শাড়ি-পরনে দরিদ্র পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।'

এমনি শাশ্বত বাণী তাঁর 'ভিড়' গল্পে। একটা নির্দয় পরিবেশ। লুঙিপরা একটি মানুষের প্রতি সব 'নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্রস্বার্থবোধ...যাতে মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল; তা সব ধুয়ে মুছে গেল তার পুত্রশোকাতুব কান্নায়। মানুষের লজ্জা হল যেন মানবতার অপমানে। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।'

'আমার ছাত্র'তে হরিজন গণেশ মুচি, লেখকের গণেশদাদা তাঁর আদর্শ চরিত্র। তার চরিত্রবর্ণনে লেখক সেই চিরন্তন সত্যেরই জয়ধ্বনি দিয়েছেন, 'মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্ছে সভ্যতার নামে, শত বৎসরের শিক্ষা, সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে তৃণের মত উড়ে গেল; উদগ্রলোভ, হিংসা ও লালসার এই যে নগ্নমূর্তি দেখা গেল চোখে—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মনুষ্যসমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান।' 'গল্প নয়' এবং 'আমার ছাত্র'তে একই কথা লেখকের।

উপলখণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'আহ্বান'। প্রায়-ভিখারিণী সেই মুসলমান নারী জামির করাতির বউ—হিন্দু যুবক লেখকের মাতৃপ্রতিমা। মৃত্যুকালে তারই আত্মার অলখ্য আহ্বান পৌঁছয় লেখকের কাছে। তিনিও ছুটে এসে ওর কবরে মাটি দিয়ে সন্তানের কর্তব্য পালন করেন। এমনি ধ্রুবতারার মত কতকগুলি চরিত্র আর কাহিনীকে তিনি তুলে ধরেছেন কলুষ-ক্লিন্ন এই শতাব্দীর ঊর্ধ্বগগনে। সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র ছোবলের মধ্যেও তিনি আস্থা হারাননি সত্য-সুন্দরের শাশ্বত বাণীতে। প্রেমবাণী নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর পরিব্রাজনকে আরতি করেছেন রচনায়। তাঁর কথা শুনতে লেক ময়দানে দুপুর থেকে ঠায় বসে আছেন রবাহূত বিভূতিভূষণ। নোয়াখালি থেকে ফিরেছেন গান্ধী-সহচর অধ্যাপক নির্মল বসু। হাজির সেখানে, জানতে সব কথা।

ক্লেদ-পঙ্কের মধ্যে হৃদয়পদ্ম পাপড়ি মেলে সূর্য-প্রত্যাশায়।

তাই বলে ঘোষণা করেননি, এবার কলম রইলো, পথে নামো, ঝাণ্ডা উঁচাও. শ্লোগান দাও। কলমই তাঁর পতাকা। পথ তাঁর সাহিত্য।

এ সময়ে খুলনা মডেল হাইস্কুলের জনৈক কৌতূহলী ছাত্রের এক চিঠি এলো তাঁর কাছে। তিনি জবাবে লিখলেন, 'দেশমাতৃকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবা হল সাহিত্য-সেবা। যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা অলস দিবস যাপন করেন না। এই সত্যটাই আমাদের আজ প্রত্যেকের জানা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আজও কবিতাকে বলি ফাঁকা ভাবুকতা, কথাসহিত্যকে বলি 'নাটক নভেল', লেখককে বলি চাকুরীহীন, বেকার, অকর্মণ্য লোক।...'

সাহিত্যিকরা যে 'অলস জীবন যাপন করেন না' তার নজির তিনি ওই সময়েও দিয়েছেন তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারে। দেবযানের ন্যায় অসাধারণ কীর্তির বছরেই বের হল তাঁর 'নবাগত' আর 'তালনবমী'—দু'খানা গল্পগ্রন্থ। 'ভিড়', 'চাউল' প্রভৃতি যুগসমস্যার অনেক গল্পই রয়েছে এতে। মন্বন্তর নিয়ে লেখা 'অশনি সংকেত'।

অন্য ধরনের লেখাও আছে। এই 'নবাগত'তেই বিভূতিভূষণ তাঁর লেখক হওয়ার চমকপ্রদ কাহিনী প্রকাশ করেন।

তাল নবমীর মধ্যে 'মেডেল' আর 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' নামে গল্প দুটির একটু ইতিহাস আছে। ঘাটশিলায় একটি মন্দির আছে রঙ্কিণী দেবীর। কেউ বলে রাক্ষসী, কেউবা বলে রণরঙ্গিনীই দেবীর আসল নাম। দেবী এসেছেন নাকি পঞ্চকোটের জঙ্গল থেকে। প্রথম এখানকার মহুলিয়া হাটের কাছে মহুলিয়া বা মহুয়া গ্রামে রাখা হয়েছিল। সেখানে দেবীর ভোগে গাঁ উজার হতে শুরু করলে দেবী আসেন এখানে। রোজ নাকি নরবলি দিয়ে তুষ্ট করা হত। সে অনেক দিন আগেকার কথা। তারপরও নরবলি হয়েছে—মাঝে মাঝে বেঁধা পরব উপলক্ষে। অনেক কথা-কিংবদন্তী তাঁকে নিয়ে। এ মন্দিরটির কাছে মাঝে মাঝেই গিয়ে বসতেন বিভূতিভূষণ। একে ভিত্তি করেই 'রঙ্কিণীদেবীর খড়্গ' লেখা।

আর 'মেডেল' গল্পের 'মেডেল'টি তিনি পান খেলাত স্কুলের এক ছাত্রর কাছে। মাসটারমশায়ের কাছে ছাত্রটি তাদের বাড়ির আধি-ভৌতিক মেডেলের গল্প করতেই মাসটার চলে গেলেন ওদের বাড়ি। নিয়ে এলেন মেডেলটি নিজের বাড়িতে দেখাতে। তবে স্ত্রী কল্যাণী তা রাখতে দেয়নি ঘরে। ধাতব 'মেডেলটি' দিলেন ছাত্রকে। গল্পের 'মেডেল' দিলেন সবাইকে।

এর ক'মাস পরেই আত্মপ্রকাশ করল লেখকের দিনলিপি 'ঊর্মিমুখর'। সালটা ঘুরল বটে, কিন্তু সময়ের হিসাবে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ছাড়লেন দু'খানা গল্পগ্রন্থ —'উপলখণ্ড' আর 'বিধু মাসটার'। 'কেদার রাজা' উপন্যাসও ওই বছরের বই। বইটি উৎসর্গ করা নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তর অকালপ্রয়াত পুত্র 'আলোকরঞ্জনের স্মৃতি তর্পণে'। দিনলিপি তৃণাঙ্কুর-এ এর কাঠামোটাব কথা আছে।—'শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যা মন্দির দেখতে দেখতে অদ্ভুতভাবে মনে জাগছিল—চারিধারে ঘন সবুজ বেতঝোপ, পুরনো মজা দীঘি, মহলের পর মহল নির্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল।...একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেছে। এই ভাঙাপুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য জীবনের দুঃখ কষ্ট...'ব্যাকগ্রাউন্ড'।' এই 'কেদার রাজা'ও 'মাতৃভূমি'তে দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা অর্থাৎ তের শ' সাতচল্লিশের অগ্রহায়ণ থেকে বেরোয়। বিধু মাসটারের মধ্যে আছে, বড় শ্যালিকা

মায়া দেবীর ট্রেনের মধ্যে বাকস বদলের কাহিনী 'বাকস বদল'। আর নিজের শিক্ষক-জীবনের একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে বিধু মাসটার শিরোনামের গল্পে। ভ্রমণ কাহিনী 'বনেপাহাড়ে'-ও এই সময়ের বই। বের হল গল্পের বই 'ক্ষণভঙ্গুর'। 'সিঁদুচরণ' গল্পটি এর অন্যতম। কেষ্টনগর-মালিপোতার বিখ্যাত ভ্রমণকারী এই সিঁদুচরণ। ঘর থেকে সে বেরিয়েছিল 'পিরথিমিডা' একবার ঘুরে দেখবার বাসনায়। অনেক চলার পর ক্লান্ত সিঁদুচরণ একটা রেলস্টেশন দেখতে পেল। এটা কোথাকার ইসটিশান? লোক বললে—রানাঘাট।

রানাঘাট! নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেন বিখ্যাত ভ্রমণকারী—নাঃ পিরথিমিডার আর ঘুরাতামা পেইলেম না।

কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি বাহাদুরপুর পর্যন্ত তিনি পেঁাছেছিলেন।

তাঁকে ব্যঙ্গ করেননি পথের কবি বিভূতিভূষণ। তাঁর কথা—পথের দেবতাব প্রসাদ এই সিঁদুচরণও পেয়েছেন। ওই বইয়েব আর এক ভ্রমণকারী গোপীকৃষ্ণকে দেখি লাঙলপোতা পর্যন্ত পেঁাছতে।

এর পরের বছর শিশুরা উপহার পেল 'হীরা মানিক জ্বলে' উপন্যাস। বড়দেব জন্য বেরুল উপন্যাস 'অথৈজল'। বইটি লেখকের 'বন্ধুদা' সুরেন চ্যাটারজিকে উপহৃত। একই বছরে পাওয়া গেল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার-দেওয়া গল্প-গ্রন্থ 'অসাধারণ'।

'অলস জীবন যাপন' তিনি করেননি। ওই সময়েই চলছিল আবার 'ইছামতী' রচনা এবং ধারাবাহিক প্রকাশ।

বছরটা ঘুরে গেল। দেশের মধ্যে যে আগুনটা জ্বলছিল. বাইরে থেকে তা শান্ত হলেও আর একটা খবর ছিল। দেশ নাকি স্বাধীন হচ্ছে। এটা খারাপ খবর নয়। যেটা খারাপ, তা হল রাজনীতির পাশাখেলায দেশ নাকি দু'টুকরো হচ্ছে। আর ও'র বনগাঁ যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে. পররাজ্য হয়ে।

বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছোটাছুটি করছেন. সীমান্ত ছাড়িযে ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নিরাপদ জায়গার জন্য। সীমান্ত অঞ্চল বনগ্রাম বিপজ্জনক বোধ হল। অন্য কোথাও জায়গা দেখা দরকার. কিন্তু বিভূতিভূষণের গরজ কই? স্ত্রী তাগিদ দেয়. বারাকপুর পাকিস্তানে পড়লে থাকবে কোথায়?

হবে হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আশ্বাস দেন বিভূতিভূষণ।

এদিকে জামাতাবাবাজীর মতিগতি দেখে শ্বশুর ষোড়শীকান্তর খটকা লাগে। একদিন শেষে ধরলেন—বলা তো যায় না হে. একটা সুবিধামত জায়গা কিনে রাখা ভাল। জমির খোঁজও আছে। চলো না দেখেই আসা যাক।

উপরোধে পড়ে যেতেই হয়। নানা জায়গা ঘুরলেন. দেখলেন, ব্যাপারটা বেশ লাগল। কিন্তু কেনাকাটায় উচ্চবাচ্য কই? তাহলে কেবল পযসা আর সময় নষ্টে লাভ কী হল? একটা চমৎকার গল্পের জমিন পেলেন বিভূতিভূষণ। বাঙালী পাঠক পেল 'আচার্য কৃপালনী কলোনী'র মত একটি গল্প। বন্ধুবর 'বনফুল'কে উপহৃত ওই নামের গল্পগ্রন্থটি বের হয় উনিশ শ' আটচল্লিশের আশ্বিনে।

তা হোক। তবু গল্পেই তো আসল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। শ্বশুর ষোড়শী-কান্ত একদিন সরাসরিই জানতে চাইলেন, জমি তো অনেক দেখা হল বিভূতি, কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা তো বুঝতে পারছি না। এখনও কম দামে কিছু জায়গা হতে পারে। এর পর সব হাতছাড়া হলে কিন্তু পস্তাতে হবে।

বিভূতিভূষণ দেখলেন, কথাটা খোলসা করে দেওয়াই ভালো। বললেন, মাফ করবেন আমাকে। বৃথা আপনাদের ভুগিয়েছি। ইন ফ্যাকট, জমি দেখবার কোন দরকার নেই আর।

দরকার নেই? বলো কি? বনগাঁ যদি পাকিস্তানেই পড়ে? ষোড়শীবাবুর স্পষ্ট প্রশ্ন। বিভূতিভূষণ স্পষ্টতর, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান বুঝি না, গ্রাম, মানে আমার বারাকপুর আমি ছাড়ব না।

সে কি? পাকিস্তান হলে কি আর হিন্দুরা কেউ থাকবে সেখানে? না, থাকতে পারবে? শ্বশুর বিস্মিত।

হিন্দু-মুসলমান জানি না, কিছু মানুষ নিশ্চয়ই থাকবে। সজনেগাছ, বকুলগাছ, চালতেগাছ, নীলকুঠি, বিলবিলে, ইছামতী—এরাও কেউ জাত বদলে ফেলবে না বা পালিয়ে যাবে না কোথাও।

এ-লোকের সঙ্গে কী তর্ক করবেন প্রবীণ ষোড়শীকান্ত, কী বোঝাবেন একে? বিরক্ত হয়ে নিজ কাজে চলে গেলেন তিনি। দুঃখ হচ্ছিল মেয়েটার কথা ভেবে। ওর হাতেই তো দিয়েছেন তাকে।

দুঃখ হল সব শুনে কল্যাণীরও। তবু স্বামীর ইচ্ছের বাইরে কিছু ভাববে না সে। স্বামীর আপাত-অদ্ভুত প্রতি কথা ও কাজকে সে বুঝতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারেও। বাবার কাছে সব শুনে সে ও'র সামনে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শোন কল্যাণী।—বিভূতিভূষণ ওর হাতখানা মুঠির মধ্যে নিয়ে বললেন, ওরা যা বলছে, তাই যদি ঘটে, রবীন্দ্র-স্মৃতিতীর্থ শিলাইদহ-সাজাদপুর, মধুসূদনের সাগরদাঁড়ী, মধু কানের উলসী, দীনবন্ধুর চৌবেড়ে, হরিদাসের বেনাপোল—এসবও তো যাবে পাকিস্তানে। আমাদের বারাকপুরও যদি সেই দলে যায়, তাই বলে কি বর্জন করব আমরা তাকে? কত ঋণে ঋণী আমি ওই গ্রামের কাছে, কেউ জানে না, কেউ জানে না কতো ভাল আমি বাসি ওকে। তুমি দুঃখ পেও না কল্যাণী। বারাকপুর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

পনের আগসট স্বাধীন হল দেশ। কিছুটা আনন্দ-উল্লাস হলেও তার পূর্ণ উপলব্ধি অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

দু'দিন পর, সতের আগসট হঠাৎ শোরগোল পড়ে গেল চারদিক, র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রোয়েদাদ বেরিয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকা বিকালে টেলিগ্রাম বার করেছে তার পূর্ণ বয়ান দিয়ে।

রাজনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সমকালীন তাবৎ হৈ চৈ-এর গতিস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে খোকা, অর্থাৎ কল্যাণীর সেই ভাই, মেজদি-মেজদার অনুরক্ত সাকরেদ চণ্ডীদাস। কলকাতার রাস্তায় টেলিগ্রামটা হাতে নিয়েই আগে বনগাঁর অবস্থাটা দেখে নিলে। বাপ্‌স্‌, যশোর জেলার বেশ খানিকটা অংশে দাঁত বসিয়ে দিলেও পাকিস্তানের কামড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছে বনগাঁ মহকুমা! সুতরাং মেজদি-মেজদার বারাকপুরও।

ওরাও থাকে ব্যারাকপুরে, বারাকপুর নয়। এ ব্যারাকপুর, লাটসাহেবের ব্যারাকপুর, চব্বিশ পরগনার মহকুমা শহর। দুটোই প্রায় এক রকম নাম, তবে বানানের হেরফেরে যা বোঝা যাবে। এটা বিভূতিভূষণের নিজস্ব বানান। নিজের গ্রাম থেকে শ্বশুরের বাসায় যেদিন এসেছেন, তাঁর ডায়েরির পাতার উপরে সেদিন হেডিং দিয়েছেন : বারাকপুর—ব্যারাকপুর। সেই বানানই ব্যবহার করা হয়েছে এখানে।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশের দিনও বিভূতিভূষণ তাঁর শ্বশুরবাড়ি, ব্যারাকপুর ভূতনাথ কুটিরে। ছিল সেখানে কল্যাণীও, এবং বিশেষ কারণেই, তবে তা পরে বলা যাবে। আনন্দবাজার পত্রিকাটি বগলদাবা করে চণ্ডীদাস ছুটলেন ব্যারাকপুর ভূতনাথ কুটিরের উদ্দেশে। উদ্দেশ্য, মেজদাকে আগে জানানো চাই খবরটা।

কী খবর? ওকে দেখেই বিভূতিভূষণ উৎসুক। এটা কোন বিশেষ খবরের পূর্বাভাসে উৎসুক হয়ে নয়। কলকাতার বাজারটা তখন গুজবে ভরা, একটু হাতড়ালেই প্রচুর খবর জোগাড় করে ফেরা যায়। এবং খোকা, অর্থাৎ চণ্ডীদাস রোজই কিছু খবর রোজগার করে আসবে। আর তাই নিয়ে ভূতনাথ কুটির সরগরম হবে, এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু আজকে খোকার মেজাজ অন্য রকম। মুখে বলবার অবস্থা নয়, টেলিগ্রামটা ছুঁড়ে দিল মেজদার কোলে। বিভূতিভূষণ চোখ লাগানোর আগেই চেঁচিয়ে সে তুরুপ ছেড়ে দিলে—বনগাঁ, বারাকপুর—নো পাকিস্তান।

বিভূতিভূষণ হতভম্ব। এও সম্ভব? মনের ভাবটা উল্লাসে ফেটে বেরোল—আনন্দে গলা ফাটিয়ে দিলেন—বারাকপুর, আমার বারাকপুর। আর সেই সঙ্গে কী নৃত্য তাঁর! হাতের কাছের কাগজগুলি সব বলের মত মুড়ে উপরে ছুঁড়ছেন আর গানের সুরে চেঁচাচ্ছেন—বারাকপুর! বারাকপুর! আমার বারাকপুর!

কাণ্ড দেখে ঘরের সবাই হেসে সারা। কল্যাণী এবার সাহস পেয়ে সুধালো,—এখন বল তো পাকিস্তান হলে কেমন হত?

ওঃ সেই কথা? জুতসই একটা জবাব হাতড়ে না পেয়ে গান ধরলেন বিভূতিভূষণ—বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।

এ কোন নিষ্ঠুর খেলা তাকে নিয়ে বিধাতার? একটি আশার মুকুল যতবার মঞ্জরিত হতে চায়, বার বার তা শুকিয়ে যাবে? কেন, কেন? পুঁটিদির কথা ভোলেনি কল্যাণী। বারে বারে মনের 'পরে ছায়া ফেলে একটা কালো মেঘ। এই তৃতীয় বার। এবার মেয়েকে ব্যারাকপুরে নিজের কাছে আগলে রাখছেন মা সাধনা দেবী। স্নেহের মূল্য দিয়ে যতটা লড়াই করা যায়।

বিভূতিভূষণেরও কষ্ট হয় কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে। তিনি ভাবেন মাতৃত্বে পূর্ণাভিষিক্ত হতে কল্যাণীর নারীসত্তা আজ কতো উন্মুখ। বারে বারে কী সংগ্রাম! গভীর এক প্রত্যয়ে একদিন ও'র হাতে সিঁদুর পরেছিল কল্যাণী। আস্থা হারায়নি আজও। ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিজয়িনী হবে এই শপথ। বিভূতিভূষণের মুখে বেদনার সকরুণ হাসি।

পুজোর ছুটির বাঁশি বাজল। আকাশের নীল খামের চিঠিতে দূরের নিমন্ত্রণ। তা ফিরিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ। এবার কোথাও না। অন্তঃসত্ত্বা কল্যাণী ব্যারাকপুরে ভূতনাথ কুটিরে আছে মায়ের কাছে। কে জানে কেমন আছে। খবর সব বন্ধ ক'দিন ধরে। না, কোন উত্তর আসছে না ব্যারাকপুর থেকে বারাকপুরে।

খবর কি সত্যিই চাইছিলেন বিভূতিভূষণ? নিজেই তা জানেন না তিনি। আগের দু'বছরের ঘটনা ধীরে ধীরে একটা ভয়ের কালো ডানা বিস্তার করেছিল তাঁর মনে। তার উপর এই হঠাৎ ওতরফে চুপ করে যাওয়া! কেন? কোন খবর লুকোতে চায় ওরা? অসহ্য!

স্কুলের ক্যালেনডারে বিশ অকটোবর থেকে পুজোর ছুটি শুরু। তবে সেদিন

সোমবার। অতএব, আসলে ছুটি শুরু আঠারো তারিখ, শনিবার দুপুর থেকেই। কী করবেন বিভূতিভূষণ, শনিবারই বিকালে ছুটবেন ব্যারাকপুরে? কিন্তু কী শুনতে হবে গিয়ে? পা চলল না, রবিবারও না। অসহ্য দেড়টা দিন। সোমবার শেষটায় ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন।

বনগাঁ থেকে দমদম এসে ব্যারাকপুরের গাড়ি। ও'দের গায়ের লোক বলে দমদম-ব্যারাকপুর। আর নিজেদের গ্রাম—চালকি-বারাকপুর। মাঝে মাঝে এমনি উল্লেখ আছে বিভূতিভূষণের দিনলিপিতেও। ওই বিশ অকটোবরের ডায়েরির পাতার হেডিং—'বারাকপুর—ব্যারাকপুর'। আশা-আশঙ্কায় দোলাতে দোলাতে ট্রেন যখন ব্যারাকপুর স্টেশনে ও'কে নামিয়ে দিল তখন সন্ধ্যা। সিকি মাইলও হাঁটতে হবে না স্টেশন থেকে। সেটুকুনোই বা হাঁটার শক্তি কোথায়! কেন চিঠির উত্তর নেই? কোন্ কথা ওরা গোপন করে রেখেছে তাঁর কাছ থেকে?

'ভূতনাথ কুটির'-এর দরজায় পেঁাছেই এক অপরিচিত কণ্ঠের কান্নায় চমকে উঠলেন।—কে? কে কাঁদছে?

কণ্ঠটি যত অপরিচিতই হোক, কান্নাটি শাশ্বত সঙ্গীতের মত সর্বজনপরিচিত। এ কী রোমাঞ্চ তাঁর সর্ব অঙ্গ ঘিরে! এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব আশ্চর্য অনুভূতি। তবে কি তাঁর কল্যাণী আজ বিজয়িনী, জননী! আনন্দবিহ্বল বিভূতিভূষণ ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলেন, মাতৃপ্রতিমা কল্যাণী কোলে ধরে আছেন মহানন্দের উত্তরপুরুষকে।

আগন্তুক ওই জাতকটি কিন্তু তখনও যৎপরোনাস্তি চিৎকার পেড়ে পিতৃসমীপে তার আবির্ভাববার্তা পৌরুষের সঙ্গে ঘোষণা করে চলেছে। কল্যাণী হেসে ফেললেন। সবার কাছে এবার থেকে কল্যাণীর জননীর মর্যাদা।

এইবার বিভূতিভূষণের অভিমানের পালা। কেউ একটা খবর দিলে না তাঁকে?

না, তিন দিন না যেতে তাঁরা কেউ ও'কে খবর দিতে ভরসা পাননি। যদি আগের আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে? কল্যাণীও সাহস করেননি তাই।

সব বুঝিয়েসুজিয়ে বলার পর ক্রমে অভিমান কেটে গেল বিভূতিভূষণের। মহানন্দপুত্র পকেট থেকে নোটবই বার করে টুকলেন নবজাতকের জন্মলগ্ন।—বাঙলা আঠাশ আশ্বিন, বুধবার, প্রতিপদ তিথি, তের শ' পঞ্চান্ন সাল। ইংরাজি পনের অকটোবর, উনিশ শ' সাতচল্লিশ।

ষষ্ঠ রাত্রে কল্যাণীকে ঘুম পাড়িয়ে নবজাতকের ললাটে বিধাতাপুরুষ কী লিখে গেলেন কে জানে! একুশ দিন উত্তীর্ণ না হতেই, ঠিক উনিশ দিনের মাথায় কচি ছেলেটার কী যে হল! সকাল থেকে আর চোখ মেলে না, নড়ে না, চড়ে না। মেয়েদের টোটকা-টাটকি নিষ্ফল। সূর্য পশ্চিমে চলছে, নিস্তেজ হয়ে পড়ছে শিশুও। বাড়িময় হুলস্থূল।

সন্ধ্যার দিকে বিভূতিভূষণ চণ্ডীদাসকে নিয়ে ডাক্তারের সন্ধানে ছুটলেন। অনেকেই পরামর্শ দিলেন, দূরে যাওয়ার দরকার কি, এই ব্যারাকপুরেই শিশুচিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বড় এক হোমিওপ্যাথ রয়েছেন।

সন্ধ্যা উৎরে গেল। ভূতনাথ কুটিরে শিশুপুত্র-কোলে কল্যাণী একটা কিছু দৈব ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অন্যেরা পথ চেয়ে, কতক্ষণে ডাক্তার পেঁাছবে!

কিন্তু ওই হোমিওপ্যাথ আবার একজন রাজনীতিক, সমাজনেতাও বটেন, নানা

কাজের লোক। প্রথমে সাড়াই দিলেন না। শেষটায় অনেক ডাকাডাকিতে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। জানালেন, রাতে তিনি রোগী দেখেন না, কালকে যা হয় দেখবেন।

পিতা কাতরকণ্ঠে শিশুর অবস্থাটা জানালেন। নিদেন একটা পরামর্শও যদি পাওয়া যায়।

কথা বলা মানেই তো কনসালটেশন! তারও তো একটা ফি আছে। বেয়ারিং বাক্য ব্যয় না করে উনি ভিতরে গিয়ে জানলা সেঁটে দিলেন।

যে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা বার বার এমন করে বিদ্রূপ করে চলেছেন, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া যেমন মূঢ়তা, তেমনি ওই জননেতা চিকিৎসকটি সম্বন্ধেও কিছু বলা অর্থহীন মনে করলেন বিভূতিভূষণ। নীরবে তিনি ঘরমুখো হলেন।

চণ্ডীদাস ততক্ষণে ছুটেছে অন্য ডাক্তারের সন্ধানে। একজন অ্যালোপ্যাথ পাওয়া গেল। শেষ রাতের দিকে চোখ মেললে শিশু। বিপদের যে কুটিল কালো ছায়াটা কাঁপছিল ভূতনাথ কুটিরের উপর, এতক্ষণে সরে গেল সেটা।

নিতান্ত শিশু হলে কী হবে, ওই বয়েসেই দস্তুরমত এক ভারিক্কি নামের মালিক হয়ে বসেছে বাবলু। ওটা মা-বাবার আদরের ডাক। মাতামহ তারা-ভক্ত তান্ত্রিক ষোড়শীকান্ত নাম দিয়েছেন তারাদাস, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মেজাজখানাকেও উচ্চগ্রামে বেঁধে রেখেছেন। কিছু হওয়ার জো নেই তার পছন্দের বাইরে, হলেই চেঁচিয়ে ভণ্ডুল করবে সব। আর করবেই বা না কেন? স্বয়ং পিতৃদেব তার পৃষ্ঠপোষক।

ঝক্কিও কম পোহাতে হয় না এজন্য আজকাল। লেখার সময়ে হাত পড়ে বাবলুর। কল্যাণীর আছে ঘরকন্না। আর যে দেখবে, সেই উমাকেও পরের ঘরে পাঠাতে হচ্ছে। উমার বিয়ে এই বৈশাখের ষোল তারিখ। সনটা ইংরাজির উনিশ শ' আটচল্লিশ। সম্বন্ধ বিভূতিভূষণই করেছেন। তারও একটা ইতিহাস আছে।

কয়েক বছর আগেকার কথা। ঘাটশিলায় দ্বিজু মল্লিকের বাড়ি সাহিত্যবাসর বসেছে। সনটা বোধহয় উনিশ শ' তেতাল্লিশ। আসরে সেদিনের বিশেষ আকর্ষণ, কলকাতা থেকে আগত এক তরুণ সাহিত্যিকের উপস্থিতি। সরকারের মেটালারজিক্যাল বিভাগের কর্মী হিসাবে তাঁর ঘাটশিলায় আগমন। আর লেখক হিসাবে দ্বিজু মল্লিকের আসরে। তরুণ লেখক সেখানে গল্প পাঠ করবেন, স্থানীয় বিশিষ্টরাও উপস্থিত থাকবেন শুনতে।

তা থাকুন, শুনুন। উদীয়মান লেখকটি আধুনিক কায়দায় মকসকরা ক্লাইম্যাকস খেলিয়ে একটা ট্র্যাজিক গল্প হাতে নিয়ে হাজির। উদ্যোক্তারা তাঁকে সাদরে সামনে নিয়ে গেলেন। প্রথমে স্থানীয়দের স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ চলতে লাগল। বিশিষ্ট অতিথির আকর্ষণ শেষের জন্য জমা। তিনি বসে বসে শুনছেন, সভার চেহারা দেখছেন। হঠাৎ সভা নড়েচড়ে উঠল। ফ্রকপরা একটি খালি পা মেয়ের হাত ধরে এক বয়স্ক ব্যক্তি ঢুকলেন। উদ্যোক্তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে সামনে এনে বসাতে। কিন্তু কিছুতেই তিনি এলেন না সামনে। ওই কিশোরীটিকে নিয়ে বসলেন পিছন দিকের এক কোণে।

কে লোকটি? স্থানীয় বিশিষ্ট কোন ব্যবসায়ী বা সম্পন্ন ব্যক্তি বোধহয়। বাইরের বিশিষ্ট লোকের সামনে বসতে চাইছেন না। বোধহয় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস-এ পেয়েছে। একান্তই সাদাসিধে, গ্রাম্য ধাঁচ। কোনা দিয়ে দেখা যায় মেয়েটি আবার চেয়ারে

বসে পা' দোলাচ্ছে। তরুণ লেখক মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন সেদিকে।

তাঁর ডাক পড়ল। দ্বিজুবাবু পরিচয় করালেন, বাঙলাদেশের তরুণ উদীয়মান লেখক শচীন ব্যানারজি—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সামনে স্বরচিত ছোট গল্প পাঠ করবেন।

গল্পের নাম 'ইশারা'। শচীন্দ্রনাথ দেখলেন, পা-দোলানো কিশোরীটি তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

'ইশারা' শেষ। সবাই 'সাধু' 'সাধু' বললেন। এবার দ্বিজুবাবু যাঁর নাম করলেন, এবং যিনি উঠে এলেন সামনে, তাতে ইশারা গল্পের লেখকের মুখ শুকিয়ে সারা। দ্বিজুবাবু বললেন, আমাদের খুব আনন্দ যে, বিভূতিবাবু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এখানে উপস্থিত। তাঁকে অনুরোধ করি, দু'কথা বলতে। আর ওই কথার পরে সেই পা-দোলানো মেয়েটির পাশ থেকে পিছনের সেই লোকটিই কিনা সামনে এসে হাজির বিভূতিভূষণ হয়ে! শচীনবাবু আর ভাবতে পারছেন না। তিনি কেবল দেখছেন বিভূতিভূষণকে। এই তাঁর প্রথম বিভূতি-সন্দর্শন। এক সভা লোকের সামনে যদি ও'র গল্প তিনি নস্যাৎ করে দেন?

কিন্তু কই, তা তো করলেন না! বরং প্রশংসাই করলেন। এমন ভাব, যেন উনিও এমন গল্প লিখতে পারতেন না। শচীনবাবু অবাক বিস্ময়ে শুনছেন। শুনছেন, আর শিখছেন। বিভূতিভূষণ বলে যাচ্ছেন, ছোট গল্প কী, কী তার বৈশিষ্ট্য, ভাষা, বিষয়-বস্তু, স্টাইল—ষোলো রকম ছোট গল্পের ষোড়শোপচার সে আলোচনা—এক আশ্চর্য মধুর কণ্ঠে ও ভাষাবিন্যাসে বলে গেলেন বিভূতিভূষণ।

পথে এসে বিভূতিভূষণের পায়ের ধুলো নিলেন শচীন্দ্রনাথ। সেই সূত্রপাত। আর মুহূর্তে আপনজন হয়ে যাওয়া। ও'র চাকরির ধরন শুনে বিভূতিভূষণ বললেন, ছেড়ে দাও ওসব কারখানা-মারখানার চাকরি।

ছেড়ে অবশ্য দিয়েছেন সে চাকরি শচীন্দ্রনাথ, তবে তক্ষুনি নয়, বরং চাকরিসূত্রে আরও ক'বার যেতে হয়েছে ওই ঘাটশিলাতে। ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হয়েছে বিভূতিভূষণের সঙ্গে সেই সুযোগে। ওখানকার প্রধান আকর্ষণ ও'র কাছে তখন বিভূতিভূষণ।

একদিন খুঁজতে গিয়ে অবাক, স্থানীয় এক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছেন বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালীর লেখক ফুটবল খেলার সভাপতি! কৌতূহল হল। গিয়ে দেখেন বড্ড খুশিভাবে বলের গতি দেখছেন।

এসব আপনার ভালো লাগে?

শচীন্দ্রনাথের প্রশ্নে তাঁকে কাছে ডেকে বিভূতিভূষণ বললেন, কী জানো ভায়া, প্রথমটায় মোটেই ভালো লাগছিল না, জোর করে ধরে এনেছে সবাই। তারপরে হাফ টাইমে খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাকেও বেশ খেতে দিল। তা খাওয়ার পরে মেজাজটা ভালো হল। আর নতুন দৃষ্টি পেলুম যেন। ওই যে সবাই মিলে একটা বলকে গোলে নিতে কাড়াকাড়ি, আমি দিব্যি দেখছি, পৃথিবী-গোলকটা নিয়ে দুনিয়ার শক্তিজোটের কাড়াকাড়ির মত। এখন মজা পাচ্ছি।

একদিন সন্ধ্যার দিকে শচীনবাবু লোকটিকে ধরলেন রেললাইনের দিকে হন হন করে এগিয়ে যাওয়ার সময়। শচীনকে পেয়েই তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, চলো, লাইনের পাশে যাত্রাগান হচ্ছে, শুনে আসি।

না, প্রধান অতিথি হয়ে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন রবাহূত হয়ে। আসরে পেঁছিতেই স্থানীয় দু'চারজন ও'কে চিনে সামনে বসাতে ব্যস্ত হল। উনি গেলেন না, পিছনে

কোনামেরে বসলেন শচীনকে নিয়ে।

কবি জয়দেব পালা। ওসব পৌরাণিক পালাগানে শচীন ব্যানারজির আগ্রহ নেই, তিনি উঠি-উঠি করছেন। বিভূতিভূষণ বুঝতে পারলেন। বললেন, বসো, শুনবে, জাতীয়সংগীত হবে একটু পরেই। কবি জয়দেব যাত্রায় মাঝখানে জাতীয় সংগীত? শচীনবাবুর খটকা লাগে। গান শুরু হতেই বিভূতিভূষণ চকচকে চোখে ও'র দিকে তাকালেন।

এটাকে জাতীয় সংগীত বলছেন? শচীন্দ্রনাথ অবাক।

নিশ্চয়। বিভূতিভূষণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। শচীন্দ্রনাথকেও বললেন—উঠে দাঁড়াও। শচীন্দ্রনাথকেও উঠতে হল। প্রথমে মুখবন্ধ হল—'মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। তারপরে মালবগৌড় রাগে শুরু জয়দেবকৃত সেই মহাসংগীত—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

এমনি করে মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি দশাবতার বর্ণন ও বন্দন চলল রূপক তালে। গান থামলে বিভূতিভূষণ বলতে থাকলেন—ঈশ্বরের সৃষ্টিরহস্য, জীব-বিবর্তনের ইতিবৃত্ত এই মহাসংগীতে বিধৃত। এই বিশ্বপ্রাণীর জাতীয় সংগীত। জয়দেবই পৃথিবীর প্রথম জাতীয় সংগীত রচয়িতা—বলে, ওই মহাকবির উদ্দেশে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন।

ও'র সান্নিধ্যে নতুন শ্রবণ-দৃষ্টি পান শচীন্দ্রনাথ। ভালো লাগে ও'র সংগে এই ঘনিষ্ঠতার কথা ভাবতে।

ভাবতে ভালো লাগে ওই ফ্রকপরা পা-দোলানো কিশোরীটির কথাও। এখন অবশ্য আর কিশোরী নেই সে, ফ্রকও পরে না, শাড়ি ধরেছে সম্প্রতি। পা দোলায় না, গতি-ভংগীতে যৌবনের মন্থরতা। মামার সংগে বেরোয় কম। ডাহিগড়ার গৌরীকুঞ্জে গেলে দেখা যায়।

তা দেখতে হলে নিজ-নিকুঞ্জে নিয়ে গেলেই হয়। বিভূতিভূষণ দেখলেন, শান্তি-পুরের কুলীন ঘর, করনীয় বটে। লেখেও ভাল। খুশি তিনি ও'র আলাপচারিতে। আর পরিচয়টা যে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে, তিনিও কি জানতেন আগে। এও এক আবিষ্কার। রিপনের সহপাঠী সেই সতীশকে তাঁর বিলক্ষণ মনে আছে। দুই বাঁড়ুজ্যেতে বেশ ভাব ছিল। আর দ্যাখো কাণ্ড, শচীন কিনা সেই সতীশেরই ছেলে! অতএব সম্বন্ধ উত্থাপন, পাকা কথা ও দিনাবধারণের মধ্যে কোন ব্যবধান রইলো না। শুভস্য শীঘ্রম্, বিয়ে যোলো বৈশাখ, বিবাহবাসর ঘাটশিলা। সম্প্রদান আর কে করবে বড়মামা ছাড়া? পঞ্চানন-জাহ্নবীর কথা মনে পড়ে। চোখের জল লুকিয়েই দায়িত্ব পালন করতে হয় বিভূতিভূষণকে। নুটু যা পারে দিক। তিনি তো আছেনই, কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না এ উৎসবে। উমার মনে যেন কোন দুঃখ না থাকে। কলকাতার সাহিত্যিক বন্ধুরাও এলেন বিয়েতে। অধিকাংশ কন্যাপক্ষ হয়ে। তরুণ সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুরা এলেন বরপক্ষ হয়ে। সে এক সাহিত্য সম্মেলনও বটে। বিভূতিভূষণের আনন্দ আর ধরে না।

ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনা কয়েক হাজার টাকা গজেনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন,

যা লাগে, খরচ করো। আমি বাপু ওদিকে লক্ষ্য রাখতে পারবো না।

বিভূতিভূষণের হাতেও খরচা হল। সেটা টের পেলেন তাঁর স্ত্রী। গজেনবাবুর হিসাবটা আলাদা। তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কিন্তু বেহিসাবি নন। বিয়ে চুকে গেলে ফর্দ সমেত হিসাবের কাগজ হাজির করলেন বিভূতিভূষণের কাছে, বড়দা, হিসাবটা একটু দেখে নিন।

নিশ্চয়, ওগুলো ভালো করে দেখতে হবে বইকি! কিন্তু এখন এই গোলমালে কি করে হবে। মাথা ঠাণ্ডা করে সব দেখতে হবে। ওগুলো সাবধানে কোথাও রেখে দাও।

বড়দাকে চেনেন গজেনবাবু। মাথা ঠাণ্ডা হলেও দেখবেন কিনা, সন্দেহ আছে। তবু রাখা উচিত। তিনি ওঁকে দেখিয়েই একটা বিছানার নিচে কাগজগুলি রেখে দিলেন।

কিন্তু, গজেনবাবুর কথা, ছ'মাস পরে একদিন ঘাটশিলা গিয়ে আবিষ্কার করলেন হিসাবের কাগজগুলি ঠিক যেমনটি রাখা ছিল, তেমনটি পড়ে আছে বিছানার নিচে। বোঝা গেল, ও কাগজের ভাঁজ খোলা হয়নি ছ'মাসে। বিভূতিভূষণকে প্রশ্ন করলেন গজেনবাবু, ওগুলো আর দেখেননি বড়দা?

বিভূতিভূষণ কী ভাবলেন, তারপরে হেসে বললেন, ইন ফ্যাকট ওটা আর হয়ে ওঠেনি।

না হোক, বিয়েটা তো হল। তা হল, বাবলুর খবর কি? বিয়ের হৈচৈতে কি সবাই ভুলে গেল তাকে?

রোসো না; অত সহজে তা হতে দেবে বাবলু? বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে আর ছোট বলে কি ইয়ে নেই তার? সেই রাত্রে, বাবা যখন কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছেন কেবল, জোর কান্না জুড়ে দিল বাবলু। চিৎকারে বাড়িমাত।

তা কাঁদবার কারণ কিছু ঘটেছে বইকি। বিয়েবাড়ির পাঁচ কাজে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ওই ব্যক্তিটির দিকে তেমন নজর দেয়নি কেউ। সে যে একলা পড়ে রইল, কেউ ভাবছে সে কথা! তবে রে, তীব্র প্রতিবাদ জুড়ে দিয়েছে তারাদাস ব্যানারজি। কল্যাণী ছুটে এলেন, বৃথা নাজেহাল। অন্যেরা আগেই হাল ছেড়েছে। সবাই বলছে, ধন্যি ছেলে বাপু। কিছুতেই থামাবে না কান্না। কারো কোলে আসবে না। কোনমতে মন্ত্রপাঠ সেরে বাপ ছুটে এলেন, দাও আমার কাছে দাও দেখি।

আর তাজ্জব কাণ্ড, বাপের ছোঁয়া পেয়েই যেন জলপড়া লাগল। দস্যি ছেলে একেবারে চুপ! বিভূতিভূষণ বললেন, ইশ্, সারাদিন কেউ গ্রাহ্যে আনেনি বাঁড়ুজ্যে-মশায়কে, কাঁদবে না? আমি ওকে নিয়ে শুতে চললেম, কেউ যেন ডেকো না আমাকে।

কল্যাণী অবাক। বাড়ি ভরতি লোকজন, তুমি শুয়ে পড়লে চলবে কেন?

খুব চলবে। তোমরা আছো চালিয়ে নিয়ো। আমার বাবলুই যদি কাঁদল তো কিসের উৎসব। সারাদিনের উপবাসী বাপ, মুখে কিছু না দিয়েই সত্যিই গিয়ে শুয়ে পড়লেন ছেলেকে নিয়ে।

ডাকপিওনকেও থমকে দাঁড়াতে হয় বাড়ির সামনে। অ্যাদ্দিন সে চিঠি বিলি করছে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, তাঁর বড় ভাই এলে তো রোজ একগাদা চিঠি। কই এমন নামের কে আছে এখানে?

তা ঠিকানা যখন ঠিক, একবার দেখতে হয়। পিওন এগিয়ে গেল, তারাদাস ব্যানারজি, এ বাড়ি? তারাদাস ব্যানারজি! বাড়ির লোকদেরও চমকে উঠবার কথা। তার পরই হাসির ঢেউ। কোলহান ফরেস্ট থেকে চিঠি এসেছে। বর্ণ পরিচয় দূরের কথা, মুখ দিয়ে যার স্পষ্ট কথা ফোটেনি, তাকে 'বন পরিচয়' করাচ্ছেন বাপ দীর্ঘ চিঠিতে। পুজোর ছুটিতে বনভ্রমণে অতটুকু ছোট শিশুকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হয়নি, ফলে সম্ভব হয়নি কল্যাণীকে নেওয়াও। তাই চিঠি আসছে কল্যাণীর কাছে যেমন, তেমনি, তারাদাস ওরফে বাবলুর কাছেও। বাবলুকে উপেক্ষা করতে পারেন না বাপ।

সে শিশুও বোধহয় বুঝে নিয়েছে নিজ গুরুত্বটা। লেখার জন্য সকাল-বিকাল একটা নিয়ম বেঁধে চলতেন বিভূতিভূষণ। এখন তার উপর স্পষ্টত আধিপত্য সাব্যস্ত করে নিল বাবলু। লিখতে বসলে গুটি গুটি হামা দিয়ে হাজির। প্রথমে ধুতির প্রান্ত ধরে টানবে, তারপর পিঠ বেয়ে উঠে গেঞ্জির মধ্যে হাত গলিয়ে দেবে। এই গেঞ্জিটা বিভূতিভূষণের সব সময় গায়ে চাই। অথচ ছেলের জন্য একটি গেঞ্জিও আজকাল দীর্ঘায়ু হতে পারে না। না হোক। বাবলু দীর্ঘায়ু হলেই চলবে। বাপ নির্বিকারে লিখে চলেন।

তারাদাস ব্যানারজির সেটাও পছন্দ নয়। কিছুতেই যখন কাজ ভণ্ডুল করা যাচ্ছে না তখন সে আক্রমণ চালাবে আসল জিনিসের উপর, কাগজ ধরেই টান। উমা একদিন ছোট ছিল, কাগজ তো সামলাতে হয়নি। একটু বড় হয়ে সেই বরং সামলেছে বড়মামার কাগজ। কাছে বসে সুতো দিয়ে গেঁথে দিয়েছে ওঁর লেখা কাগজগুলি। আর এই তারাদাসের কাণ্ড দ্যাখো। ওকেই সামলাতে অগত্যা একখানি সাদা কাগজ আগিয়ে দিতে হয়।

এবার টান কলমে। লেখার সময় সামনে থাকে তিনটে কলম, সবুজ, কালো আর কালোর 'পরে সাদা ডোরাকাটা—তিনটেই পারকার। লেখায় খুঁত খুঁত নেই' যা লিখবেন একবারেই ফাইন্যাল। খুঁত খুঁত, কলমে। বদলে বদলে নেন। ওরই একটা বাবলুর হাতে দিতে হয়। বাবলুর হয় না তাতে। ঠিক যেটিতে বাবা লিখবেন যখন, সেইটেই তার চাই।

মা এসে ছেলেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। ধুরন্ধর পুত্র অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে বাপের দিকে চেয়ে এমন ভঙ্গী করবে যে ওর মন পেতে তখন সর্বকর্ম ইস্তফা। পথে ঘুরতে বেরোতে হয় ওকে নিয়ে। তারপর বারাকপুরের বনপথ দিয়ে, ইছামতীর পাড় ধরে হাঁটো, আগড়ম-বাগড়ম বক বক করা। বারাকপুর ঘাটশিলায় এক ইতিবৃত্ত।

ঘাটশিলায় চললেও, বারাকপুরে স্কুলের তাগিদ আছে। স্কুলের সময় প্রথমে তো কান্নায় সব আচ্ছন্ন করে ফেলবে ছেলে। ছেলের চোখের জলে বাপের পথও ঝাপসা হয়ে যায়। লেট, স্কুল কামাই।

সহশিক্ষকরা এ-নিয়ে আলোচনা করেন। বনভ্রমণে বেরুলে আর পাত্তা নেই। বারাকপুরে থাকলেও এই কাণ্ড। খাটুনি অন্য শিক্ষকদের 'পরে চাপে বেশি। কথাটা স্কুলের সভাপতি—এস. ডি. ও-র কানেও পোঁছয়। কিন্তু তিনি সাহিত্যানুরাগী, ভক্ত তিনি বিভূতিভূষণেরও। সুতরাং ওঁকে চাপ দেওয়ার কোন প্রশ্নই নয়। ঠিক হল, যেদিন সম্ভব, বিভূতিভূষণ আসবেন, মাইনে পাবেন দিন গুনে। তাহলে রুটিন হবে কী করে? তারও ব্যবস্থা হল, ডামি, বিকল্প শিক্ষক রাখা। গাঁয়ের ছেলে স্বরজিৎ সরকারকে এজন্য নিয়োগপত্র দিলেন স্কুল কমিটি। তবু বিভূতিভূষণকে ছাড়লেন না।

কেই বা ছাড়ে তাঁকে। স্কুল থেকে পা বাড়াতেই হাট। আফজল পটল বেচছে গোপালনগর হাটে। গগন পালের স্কুলের সহপাঠী আফজল। বিভূতিকে ডেকে পটল বেচতে বেচতেই গল্প জুড়ে দেবে—মনে আছে সেই তুঁততলার ইসকুল? হাঁড়িবেচো মাসটার? ছাত্রকুলের মুখে ওই নামেই অলংকৃত গগন পাল। সে বিভূতি নেই আজ। আজ লজ্জা হয় ওকথায়। তবু সহপাঠীদের সংগে বসে পুরানো স্মৃতি রোমন্থন ভালো লাগে। 'ভূত' নামে একটা গল্পও লিখেছেন এই হাঁড়িবেচো মাসটারকে নিয়ে। সহপাঠী গোর কল্লু মুদির দোকান চালায়। সেখানে বসলে তো ওঠা দায়। গাঁয়ের কত চাষী, ঘরামির দল সেখানে ঘরসংসার, সুখদুঃখের কথা বলবে। কত বাকীর খন্দের, কত লাভ-লোকসানের কথা। যদি বা ওঠা, আটকে যেতে হবে যুগল ময়রার ওখানে। সাজা তামুকের ডাক, পেসাদ করে দিয়ে যান। সারা হাটে ছড়িয়ে আছে সব বাল্যসংগীর দল। নেপাল মাঝির ছেলে জিতেন দফাদার। সব স্বপ্ন খুইয়ে দোকান পাতিয়ে বসেছে গাঁয়ের হাটে। সে বুঝি সসম্ভ্রমে তাকায়—বিভূতি এখন মাস্টের-মশাই। না, কেউ না তিনি ওদের কাছে। জিতেনের মনের ভাব বুঝতে পেরেই এগিয়ে গিয়ে বিড়ি চাইবেন, সেটা ধরিয়ে বসবেন গল্পে। ব্রজেন মাসটার, মনু রায়, যুগল বৈষ্ণব—কত লোক জমবে সেখানে ও'কে পেয়ে সে আসরে। রাত হবেই বাড়ি ফিরতে।

আরও আছে। পল্লীমংগল সমিতি হয়েছে গাঁয়ে। তিনি অন্যতম উদ্যোগী। হপ্তার সভা বসবে চড়কতলায়। সেখানে গণি ও সয়ারামের মোকদ্দমার বিচার করতে হবে তাঁকে। 'কথকঠাকুরের পুত্তুর থাকলি অলোয্যিডা হতি পারবোনি কিছু'—ওদের বিশ্বাস। তাই সেখানে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে শুনতে হয়—কতটা ক্ষেতে কত মুসুরি খেয়েছিল, আর তা খেলে ডাল ওঠে কত, উঠলই বা কত। তার হিসাব।

তা করুন, কিন্তু নিজের সংসারের হিসাব তিনি রাখেন না। কল্যাণীও নেহাৎ না ঠেকলে জড়াতে চান না ও'কে। জড়াবেনই বা কি করে? সেই বাপের ধাঁচ। বৈষয়িক কথার আঁচ পেলেই অন্য কথা পাড়বেন। মাঝে মাঝে অবশ্য ভাবখানা এমন দেখা যাবে, যেন ভারি বৈষয়িক এক ব্যক্তি। কে তাঁকে ঠকাচ্ছে? অত সোজা? বনগাঁয় চালকি আর মরগাঙের পাশে সামান্য কিছু ধানের জমি কিনিয়েছিলেন কল্যাণী। ছোট সংসারের চাল খরচাটা ওথেকেই আসবে। কিন্তু আসচে কই? চালকির বারিক ও'র প্রজা। মনিবকে বলে দেব্‌তা, কিন্তু জোর তাগিদ ছাড়া ধান দেবে না এক কণা। কল্যাণী বলেন, কিছুই তো বারিক দিলে না এবার।

তাই তো! বারিককে বেশ মন্দ কথা বলে আসতে হবে আজ। বলেই বেরোলেন, কড়া মেজাজ নিয়ে।

ও'র তাপ অনেকটাই পথের সবুজ টেনে নেয়। বারিকের বাড়ি যখন পৌঁছলেন, বেলা তখন পড়ন্ত। বারিক তখনও ফেরেনি। তার বউ সসম্ভ্রমে ঘোমটা দিলে মনিবকে দেখে। ছোট একটি কিশোরী মেয়েকে মাধ্যম রেখে বারিকের বউ বসতে বললে, আসন এগিয়ে দিলে, একটু পরেই আসবে নাকি বারিক।

ওদের ওই আপ্যায়ন উপেক্ষা করতে মনে লাগে। তবে বসতে আসন কেন? এই তো উঠোনে সুন্দর একটা গরুরগাড়ির মাচা। বসলেন তার উপর, চমৎকার আসন।

এই গরুরগাড়ি। কী মিষ্টি এর তেলহীন চাকার শব্দ। যেন সবুজ বনের কোন পাখির কিচিরমিচির ডেকে চলা। ধীরে ধীরে পল্লীপথের বাউলের মত গান গেয়ে চলা এই গাড়ির। ক'দিন আগে কলকাতা থেকে বনগাঁ নেমে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখেন অম্বরপুরের একখানা গরুরগাড়ি যাচ্ছে। ব্যাস, উঠে বসলেন। দু'পাশে

চেনাজানারা মন্দ বললে, অচেনারা অবাক হল দেখে, কিন্তু ও'র মনের সে আনন্দের খবর কি পেল কেউ? সেই একবার গাঁয়ের হাটুরেদের সঙ্গে কলকাতা অবধি গিয়েছিলেন গরুরগাড়ি চেপে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে শহরে এনেছিলেন গ্রামবাঙলার বার্তা। সব তাঁর মনে পড়ে। কখন সন্ধ্যা নামে হুঁশ নেই। বারিকের মেয়ে তামাক সেজে কলাপাতায় কলকে জড়িয়ে এসে দাঁড়ায়—দাদাবাবু, নেন। না, বামুনকে মুখের হুঁকো দেবে কি করে ওরা। তামুক টানতে টানতে মনিবের মেজাজ একদম শরিফ। বারিক যখন ফিরল তখন আর গল্প ছাড়া কিছুই হল না। তার সঙ্গে গল্প করে অনেক রাতে ঘরে ফেরেন।

বারিকও খুশি, দেবতুলি্য নোকের পেরজা মুই। নইলি কেরমেই যা হচ্ছি দিনকাল, বাঁচতো কেডা!

এ-রকম লোককে অগত্যা যতটা সম্ভব কম জড়াতে চান কল্যাণী। কিন্তু বাবলু? বাবলু নাছোড়।

'বাবলু'র সঙ্গে একটা 'সু' যোগ করে বাপ ডাকেন 'বাবলুসু'। একটা কাঠের গাড়ি তৈরি করা হয়েছে ওর জন্য। দড়ি ধরে বাবলুসুর গাড়ি টেনে ইছামতীর পাড়ে নিয়ে যাবেন সকাল-সন্ধ্যা। গাছ-ফুল-পাখি দেখাবেন ওকে। একটু একটু বুঝতে শিখেছে এ-সব সে। সন্ধ্যায় আকাশের দিক তাকিয়ে ওর চোখ উজ্জ্বল হয়। বলে, বাবাই, উই যে নক্কতোষ!

আধো-আধো কথা বলে আজকাল সে। নক্ষত্রকে বলে 'নক্কতোষ', বাবাকে 'বাবাই', মাকে 'মা-কল্যাণী'। তাতেই মা-বাবা হাবুডুবু। শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে আধো কথা বলেন বাপ। এ যেন নিজ শৈশবের বিস্মৃত ভুবনে চিরশিশু বিভূতিভূষণের মানস অভিসার।

সকাল-সন্ধ্যা তো আছেই। দুপুরে স্নান করার সময়ও পিতা-পুত্রের একসঙ্গে ইছামতীতে স্নান। মা থাকেন তখন ঘরকন্নায় ব্যস্ত। দু'বছরের ছেলেকে বাপের সঙ্গে ইছামতীতে পাঠান বটে মা, মনে মনে বড় ভয়, বাপ যতই আগলে রাখুন ছেলেকে, ওই ইছামতীর জগতটায় গেলে লোকটি একদম অন্য মানুষ হয়ে যান। খেয়াল থাকে কোন দিকে? ঘরে না ফেরা অবধি নানা ভাবনা। আর ভাবনা কি এমনি। শেষ পর্যন্ত যা ভয় তাই ঘটল!

সাধারণত বাপ প্রথমে ছেলেকে স্নান করিয়ে পাড়ের ঘাসে বা কোন কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর, নয়ত ডাঙায় তোলা জেলে নৌকোয় বসিয়ে রাখেন। তারপরে নিজে সাঁতার কাটবেন অনেকক্ষণ ধরে। একদিন তো এমনি এক ডাঙায় তোলা নৌকোর উপর বসিয়ে রেখেছিলেন ছেলেকে। উঠে দেখেন, সারা গায়ে আলকাতরা মেখে ভূত হয়ে আছে বাবলু। অর্থাৎ নৌকো মেরামতি করে আলকাতরা মাখিয়ে রেখেছিল জেলেরা। বাপের তা লক্ষ্য নেই। পুত্রও নির্বিবাদে সারা গায়ে তা মাখিয়ে বিচিত্তির!

বাবলুকে ঘরে স্নান করালে হয় না? ভয়ে ভয়ে কল্যাণী বলেন।

সেদিন দু'জনে একসঙ্গেই তেল মেখে বেরিয়েছিলেন। পথে নেমেই কথাটা ভাবলেন বিভূতিভূষণ। বাবলুকে বললেন, আজ বাবা মা-কল্যাণীর কাছে যাও। সে-ই নাইয়ে দেবে। ছেলেও যেন মজা পেয়ে গিয়েছে ইছামতীতে, সে ফিরবে না।

একরকম জোর করেই তাকে ফিরিয়ে, নিজে গেলেন ইছামতীতে। একবার তাকিয়েও দেখলেন, ঠিক আছে, ঘরের পথই ধরেছে বাবলু।

নিশ্চিন্ত মনে অনেকক্ষণ চান করলেন আজ। অনেক দিন বাদে একা একা এই

স্নান করা, ঘরে ফেরা। কিন্তু ও'কে দেখেই কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, একা যে ' ছেলে কই?

ছেলে! বাড়ি আসেনি?

বেশ, ঠাট্টা করছ? তোমার সঙ্গে নিলে না? কল্যাণী বুঝতে পারেন না ও'র কথা।

সে কী? সত্যি বলছ, বাবলু বাড়ি আসেনি! বিভূতিভূষণের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

কল্যাণী প্রথমটায় ভেবেছিলেন, বাবলুকে কোথাও লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে কৌতুক করা হচ্ছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীর অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন, অনর্থ ঘটেছে।

দু'জনে মিলে প্রথমে বাড়ির আশপাশ, ঝোপঝাড়, বাঁশবন, পাড়া, ক্রমে সারা গ্রাম তোলপাড়। প্রতিবেশীরাও ঘাবড়ে গিয়েছে শুনে। বহু লোক বেরিয়ে পড়ল খুঁজতে। তবে কি ইছামতীতে—! বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। ভাবা যায় না। কিন্তু ওসময়ে তো বাপ নিজেই ছিলেন ইছামতীতে। পাড়ার বউ-ঝি, ছেলেমেয়েরাও অনেকে থাকে ওসময়ে ঘাটে ঘাটে। ওদিক গেলে তারা কি দেখতো না?

জঙ্গলে যদি গিয়ে থাকে? চারদিকে যে সব ঝোপঝাড়, তাতে মাঝে মাঝে বাঘ আসে রাতে। হাঁকড়-হাঁকড় শব্দ করে বাঘ জঙ্গল থেকে। সকালে উঠে দেখা যায়, কারো উঠোনে তার পায়ের টাটকা ছাপ! দিনমানে বড় আসে না এদিকে। তবে কি অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকে? ওৎ পেতে থাকে কোন সুযোগের অপেক্ষায়? ঘরে না এসে বাবলু জঙ্গলের দিকে গেল কিনা, বাপ কি তা দেখেছেন?

না, তা তিনি লক্ষ্য করেননি। সর্বনাশ!

সর্বনাশ মানে, শেষ হয়ে গেলেন দু'জনে। কল্যাণী তো প্রায় উন্মাদ। লোকে ধরে রাখতে পারছে না তাঁকে। বাবলু ছাড়া আর আমি ঘরে যাবো না। বাঁশবনের পথে পাড়ার লোক ও'কে আগলে রাখল। ঘরে ফেরানো অসম্ভব। বিভূতিভূষণই বা কোন্ ঘরে তাঁকে ফিরে আসতে বলবেন!

এদিকে হয়েছে কি, বাপ যেই চলে গেলেন, বাবলু অমনি পথ হারালো। কী জানি কেন, সে পা বাড়ালো বাঁশবনের দিকে। শিশুর মাপে সীমাহীন সে বাঁশবন। যত যায় বন আর বন, মাঝে মাঝে ফুল, লতাঝোপ, নানা পাখির কলরব।

ভাজা খাওয়ার জন্য সোঁদালি ফুল নিতে বেরিয়েছিল শ্যামাচরণদাদার স্ত্রী বীণাপাণি দেবী। বাড়ি ছাড়িয়ে অতটা দূর বাঁশবনে বাবলুকে ঘুরতে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি।—কী রে, কার সঙ্গে এলি?

বাবাই।

কোথায় বাবাই?

নেই।

একলা কোথায় চলেছিস?

মা-কল্যাণী যাই।

মা-কল্যাণী যাই? কোথাও যেয়ে কাজ নেই। যেমন বে-আক্কেলে বাপ-মা! এতটুকু ছেলেকে একলা ছেড়ে দেয়। বীণাপাণি ওকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে রাখলেন। না, এক্ষুনি কিছু বলবেন না, শিক্ষা হোক একটু। বাবলুকে গুড়-মুড়ি-কলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখলেন।

কতক্ষণ? ওদিকে উল্টেপাল্টে যাচ্ছে সব। এদিকে ছেলে কিছু মুখে দেয় না, কেবল বলে—মা-কল্যাণী যাই, মা-কল্যাণী যাই। বাবাই কই?

শেষটায় খবর পাঠালেন, ছেলে নিয়ে যাও।

কল্যাণী বিশ্বাস করেন না। তাঁকে ঘরে ফেরাবার ফন্দি ওসব। ছেলে আগে দেখি, তবে উঠবো।

বীণাপাণি দেবী ওই বাঁশবনের পথে বসে-থাকা কল্যাণীর কোলে বাবলুকে এনে দিলেন। ছেলেকোলে ঘরে ফিরলেন মা, পিছনে বাবা।

সেই বাবলুকে আর উপেক্ষা? নহে, নহে।

উনিশ শ' উনপঞ্চাশের আগস্ট। ঋষি অরবিন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে হাজরা পার্কে সম্মেলন ক'দিন ধরে। একদিনের প্রধান বক্তা বিভূতিভূষণ।

ও'রা তখন ব্যারাকপুরে ভূতনাথ কুটিরে। দুপুর থেকেই শ্যালিকারা ভালো জামাকাপড়ে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মেজদাকে। বিকালে কলকাতা থেকে উদ্যোক্তাদের লোক এলো ও'কে নিতে। প্রস্তুত হযে দরজায় পা বাড়াতেই বাবলু এসে ধরল—বাবাই, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবিনে?

ব্যাস, হয়ে গেল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, শ্রীঅরবিন্দ আমার মাথায় থাকুন। তিনি মহাপুরুষ। তাঁর জন্যে বক্তার অভাব হবে না। কিন্তু আমার বাবলুকে নিয়ে বেড়ানোর আমি ছাড়া কেউ নেই।

ছেলে কাঁধে ব্যারাকপুর রেল লাইনের দিকে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ঋষি অরবিন্দ ও'র কাছে আদর্শপুরুষ। তাঁর রচনা, লাইফ ডিভাইন ও'র প্রাণের বই। প্রায়ই পাঠ করেন। এত সত্ত্বেও, বাবলুর জন্য গেলেন না।

॥ কুড়ি ॥

'তিনি শিশুবেশে এসে আমার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আমি 'মায়াবন্ধন' বলে আঁতকে উঠে ছুটে পালালুম, এ-বুদ্ধি নিয়ে, এ-চোখ দিয়ে কি ভগবান দর্শন হয়? তাঁর হাতে বন্ধনই তো মুক্তি।'

বিভূতিভূষণের এখন ওই কথা। বসিয়েছেন 'ইছামতী'র ভবানী বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে। তাঁর বিশ্বাস 'প্রাচীন শাস্ত্র বেদ, যে বেদ প্রকৃতির গায়ে লেখা আছে। আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্মগ্রন্থ।'—পটভূমি অন্যতর হলেও এই ধর্মগ্রন্থ পাঠই প্রধান 'ইছামতী'তে।

বইটির সংকল্প নিয়েছিলেন, পথের পাঁচালীর কালে, উনিশ শ' আঠাশের পয়লা মারচ। ইছামতীর দুই তীরের পল্লীজীবনধারা নিয়ে নীলকরের আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শতবর্ষের ইতিহাস তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন এই উপন্যাসে। শুরু করতে দেরি হয়ে যায়। উনিশ শ' তেত্রিশ-এর এগার জুনের দিনলিপিতে আছে—'বারাকপুর, বহু পুরাতন গ্রাম বটে। রায়েরা এ গাঁয়ের আদি বাসিন্দা। ওঁদের দৌহিত্র আনন্দ রায় ও দুঃখীরাম রায়েরা। রায়েদের ঘরের দৌহিত্র বাঁড়ুজ্যেরা। সুবর্ণপুরের ভবানী বাঁড়ুজ্যে আনন্দ রায়ের তিন পিসিকে বিবাহ করেন।' এমনি ইতিহাসকে

পটভূমি করে ইছামতীর সূচনা। উনিশ শ' ছেচল্লিশে অভ্যুদয় নামক এক মাসিকপত্রে ধারাবাহিক বের হতে লাগল ইছামতী। দেড় বছর পরে বন্ধ হল পত্রিকা, লেখাও। পরে, পাঠকদের দাবিতে, বন্ধুদের তাগিদে আবার কলম ধরা। বিশ জানুয়ারি, উনিশ শ' পঞ্চাশে প্রকাশিত হল সেই বই। বইটি উপহার দেওয়া হয়েছে, 'কল্যাণী-রমাকে', অর্থাৎ কল্যাণীকে।

এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সংকল্প ও'র ঘনিষ্ঠরা জানতেন। এমনকি 'ইছামতী'র পাণ্ডুলিপির পঞ্চম পৃষ্ঠার উল্টোদিকে ইছামতী দ্বিতীয় খণ্ডের একটি খসড়া তৈরির কথা লেখা আছে। তারিখ—ঘাটশিলা, বিশ নবেম্বর উনিশ শ' উনপঞ্চাশ।

মাঝখানে, বহু বছরের ব্যবধান। কিন্তু লক্ষণীয়, পথের পাঁচালী, আরণ্যক, দেবযান, ইছামতী—প্রধান প্রধান বইগুলির সংকল্প একই সময়ে নিয়েছিলেন লেখক। একে একে ইছামতীও বেরোল। তবে এ আর কতটুকু লেখা হল ইছামতীর ইতিহাস। আরও চাই। আপাতত এক খণ্ড তো বের হোক। এ-বইও অসম্পূর্ণ মনে হবে না।

কেবল, কল্পনায় হয় না এ কাজ। ইতিহাস সংগ্রহ করতে হয়েছে নানাসূত্র থেকে। ইছামতী উপন্যাসের মধ্যে একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ—কোলস-ওয়ারদি গ্রানট-এর 'অ্যাঙলো ইনডিয়ান লাইফ ইন রুরাল বেঙ্গল'। মোল্লাহাটির কুঠিয়াল সাহেবদের অতিথি গ্রানট ছিলেন দক্ষ শিল্পী। অনেক পোরট্রেট, স্কেচ করেছেন এ-অঞ্চলের। ইছামতীর আদর্শ চরিত্র ভবানী বাঁড়ুজ্যে ও তাঁর স্ত্রী তিলু—তিলোত্তমার দুটি ছবি ক্যানভাসে এ'কে নিয়ে গ্রানট সাহেব তাঁর বইয়ে তা ছাপিয়ে ওদের পাঠিয়ে দেন বলা হয়েছে। ছবি দেখে তো আহ্লাদ ওদের ধরে না। কিন্তু গাঁয়ে ঢি ঢি। বইয়ের চুয়ান্ন এবং সাতান্ন পাতায় যথাক্রমে 'এ বেঙ্গলি ওম্যান' এবং 'অ্যান ইনডিয়ান ইয়োগি ইন দ্য উডস' ক্যাপসন দিয়ে ছবি। বইটি কুঠির ঠিকানায় আসে। ভবানী বাঁড়ুজ্যের শ্যালক কুঠির দেওয়ান রাজারাম রায় তা নিয়ে আসেন'—ইত্যাদি।

কিন্তু যেমন উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যাবে না ওই বইখানাকে, তেমনি ওই বইখানায় পাওয়া যাবে না উপন্যাসের কথাগুলি। আসলে বইখানার নাম—রুরাল লাইফ ইন বেঙ্গল—ইলাসট্রেটিভ অব অ্যাঙলো-ইনডিয়ান সাবআরবান লাইফ। লেখক সত্যিই বিখ্যাত শিল্পী কোলসওয়ারদি গ্রানট, তবে বইটিতে লেখকের সে নামও নেই। কেবল বলা হয়েছে—লেটারস ফ্রম অ্যান আরটিসট ইন ইনডিয়া টু হিজ সিসটারস ইন ইংল্যানড। ইছামতীতে উল্লিখিত বইটির প্রকাশ কাল—আঠারো শ' চৌষট্টি। এটিও ঠিক তাই। তবে তিলু ও ভবানীর ছবির কথা, উপন্যাসের কথা—আসল বইয়ে নেই। নেই কোন বঙ্গরমণী বা বনমধ্যে ভারতীয় যোগীর ছবিও। ইছামতীতে উল্লিখিত চুয়ান্ন বা সাতান্ন পৃষ্ঠা কেন, পৌনে তিন শ' পাতার সে-বইয়ে এবং তার মোট এক শ' ছেষট্টি-খানি ছবির সূচীতেও ও-রকম কোন উল্লেখ মিলবে না। ছবি আছে নায়েব রাজনারায়ণ মুখারজির—বইয়ের এক শ' আটত্রিশ পৃষ্ঠায়। তার আগের পৃষ্ঠায় আছে হরিসুন্দর মুখারজি ও রামচন্দ্র রায়—দুই 'গোমস্তা'র। এছাড়া জমাদার রামদয়াল, কুলিসরদার বুধি বিশ্বাস এবং কুঠির হাসপাতালের ডাক্তার দীননাথ ধরের ছবি। তিলু-ভবানীর নেই।

তবে গ্রানট সাহেবের বইখানা যে লেখার চাইতে রেখার, তা বলতেই হবে। ওই তল্লাটের তখনকার দিনের, যেমন নানাশ্রেণীর মানুষ, তেমনি পালকি, টাটা হরেক ধরনের নৌকো, নৌকোমাঝি, চাষী, চাষের লাঙল, নীল চাষ থেকে নীল প্রস্তুতের

প্রত্যেক স্তরের দুর্লভ সব চিত্র। আর আছে ইছামতী, তার তীরবর্তী গ্রাম, পল্লী, পাঠশালা, লতাগুল্ম, শস্যবিচিত্রা—তিল, অড়হর, মাষকলাই, খেসারি, মটর, মশুর, সরষে, হলুদ, তামাক, কাপাস, ধান, পাট, মেস্তার ছবি। ছবি আছে গন্ধরাজ, বেল, মল্লিকা, ভাঁট, জুঁইয়ের। এ অঞ্চলের সবুজ যে মন ভুলিয়েছিল শিল্পী গ্রানটেরও, বইটি তার প্রমাণ।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজচিত্রও আছে। মিঃ সিমন-এর আঠারো শ' পনেরর এক রিপোরট উদ্ধৃত হয়েছে গ্রানটের বইয়ে—'নট এ চাইল্ড ক্যান বি বর্ন্, নট এ হেড রিলিজিয়াসলি শেভ্ড্, নট এ সান ম্যারেড, নট এ ডটার গিভ্ন্ ইন্ ম্যারেজ, নট্ ইভ্ন্ ওয়ান অব দ্য টিরানিক্যাল ফ্র্যাটারনিটি ডাইজ উইদাউট অ্যান ইমিডিয়েট ভিজিটেশন অব ক্যালামিটি আপন দ্য রায়ত্স্।'—সমাজের এ-রকম একটা শোচনীয় চেহারা এঁকেও গ্রানট দেখেছেন ওর মধ্যে যা কিছু কল্যাণ-প্রয়াস তা তাঁর 'হোসট' কুঠিয়াল সাহেবদের। বলা বাহুল্য ইছামতীর লেখক তা মনে করেন না। সেখানে তিনি দেখেছেন, কুঠিয়াল সাহেব থেকে শুরু করে দেশি দেওয়ান, নায়েব, আমিন, গোমস্তাদের অত্যাচার গরিব চাষী, বুনোদের 'পরে। কুঠির নির্দেশে বা কুঠির সাহেবদের তুষ্ট করতে তাদের নুনখোরদের হাতের সড়কি কত সাধারণ মানুষের বুকে সাপের জিভের মত ছোবল কেটেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় ওদের হাতে কত জোয়ানের রক্তে লাল হয়েছে ইছামতীর জল, সেই কাহিনী রয়েছে এই উপন্যাসে। আছে সাধারণের উপর সমাজপতিদের নির্মম আচরণ আর কুৎসিত ষড়যন্ত্রের কথাও।

গৃহী সন্ন্যাসী ভবানী বাঁড়ুজ্যের ন্যায় আদর্শ চরিত্রও রয়েছে। তিনি যেন সত্পথ-নির্দেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। গুরুভাই চৈতন্যভারতীর সঙ্গে ভবানীর সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্ত দর্শনের আলোচনার মধ্যে দেবযানের সুর ধরা পড়ে। ধরা পড়েন ভবানীর আড়াল থেকে বিভূতিভূষণ স্বয়ং। তাঁর দিনলিপির পাতায়ও বারে বারে ওই কথাগুলি লিপিবদ্ধ। ভগবানে বিশ্বাস ও ভালোবাসার মূল্য তিনি এ বইয়ে কতখানি দিয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে খেপী সন্ন্যাসিনীর চরিত্রচিত্রণে।

'খেপী সন্ন্যাসিনীর আশ্রম বাঁওড়ের ধারের প্রাচীন বটবৃক্ষতলে, সাঁইবাবলার বনের আড়ালে।' বারাকপুরের সেই ভৈরবীর আশ্রমের খবর জানবার পর এ চিত্রটিরও 'ভিত্তি খুঁজতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সে থাক। 'ইছামতী'র এই খেপী ঈশ্বর বিশ্বাসে এবং তাঁর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসায় শক্তিমতী হলেও অশিক্ষিতা, গাঁজা-ভাঙ ইত্যাদি খায়। জানে না, সত্যিকার সাধন কী। গৃহী সন্ন্যাসী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ভবানীকে সে ভক্তি করে। ওই কারণেই সমাজপতিদের বারণ উপেক্ষা করে তিনি মাঝে মাঝেই যান খেপী সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে। একদিন খেপী তাঁকে বলে—'আমার দেবতা ওই অশ্বত্থ (বট?) তলাতেই দেখা দ্যান ঠাকুরমশাই।...এই গাছতলার ছায়াতে আমার মত গরীবির কুঁড়েতে তিনি বসে গাঁজা খান আমাদের সঙ্গে।'

অ্যা!—ভবানী আঁতকে উঠেছিলেন কথাটা শুনে, দেবতা গাঁজা খান?

কিন্তু খেপীকে সেদিন ভর্ৎসনা করতে পারলেন না ভবানী বাঁড়ুজ্যে। তাঁর বিশ্বাস, 'জন্মজন্মান্তরের অনন্ত পথহীন পথে অতি নীচ পাপীরও হাত ধরে অসীম ধৈর্যে, অসীম মমতায়, তিনি স্থিরলক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন।'

আর একটি চরিত্র এই বইয়ে—শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ, নির্লোভ দরিদ্র' রামকানাই কবিরাজ। পিতামহ তারিণী কবিরাজের একটা ছাপ তার মধ্যে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের হাতে।

শুধু কি তাই? পিতা মহানন্দ বুঝি এসে হাজির ইছামতীতে। রামকানাই কবিরাজের খাতায় মহানন্দর হাতে লেখা ছড়া—

'ন্যাংটা মেয়ের এত আদর জটে ব্যাটা তো বাড়ালে।
নইলে কি আর এত করে ডেকে মরি জয় কালী বলে॥'

আরও স্পষ্ট হয়ে পড়লেন নিজে তিনি মূল চরিত্র ভবানী বাঁড়ুজ্যের মধ্য দিয়ে। প্রৌঢ় বয়সে প্রাপ্ত একটি মাত্র শিশুপুত্র নিয়ে ভবানীর আচরণের মধ্যে বাবলুকে নিয়ে সরাসরি 'ইছামতী'তে হাজির বিভূতিভূষণ।

ওই সময়কার দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখছেন—'বাবলুকে নিয়ে বিকেলে ইছামতীর ধারে কাটাই। কী ভালো লাগে। কী মমতা, কী ভালোবাসার অনুভূতি এর মধ্যে, কেউ জানবে না তা।'

ভবানী বাঁড়ুজ্যেও তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে ইছামতীর পাড়ে বিকেলে বসে ভাবেন, 'আজ এই যে ক্ষুদ্র বালক ও তার পিতা অপরাহ্ণে নদীর ধারে বসে আছে, কত স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ওদের মধ্যে—সে-কথা কেউ জানবে না।'

ইছামতীর 'ভবানী কত পথে পথে বেড়িয়েচেন। কত পর্বতে সাধু সন্নিসির খোঁজ করেচেন, কত যোগাভ্যাস করেচেন, আজকাল মা-ছেলের গভীর যোগের কাছে তার সকল যোগ ভেসে গিয়েচে।'

আজকাল তাঁর মনে হয় 'এক মহাশিল্পীর বিরাট প্রতিভার অবদান এই শিশু।' 'এই নিষ্পাপ শিশুর হাসি ও অর্থহীন কথা অন্য জগতের সন্ধান নিয়ে আসে তার কাছে।'

ভবানীর মধ্য দিয়ে বাবলুর বাবার মনের কথা বেরোতে লাগল।—'তাঁর বয়েস হয়েছে, এই ছেলেকে নাবালক রেখেই তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মহাপ্রস্থানের পথে। কি জিনিস তিনি দিয়ে যাবেন একে—আজকার অবোধ বালক তার উত্তরজীবনের জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে একদিন পিতৃদত্ত যে সম্পদকে মহামূল্য বলে ভাবতে শিখবে, চিনতে শিখবে, বুঝতে শিখবে?

'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ—এর চেয়ে অন্য কোন বেশি মূল্যবান সম্পদের কথা তার জানা নেই।'

ভবানীর প্রার্থনা—'খোকাকে দয়া করো, তাকে দরিদ্র কর ক্ষতি নেই, তোমাকে যেন সে জানে।'

মূল কাহিনীর মধ্যে প্রায় প্রক্ষিপ্তভাবে একটি শিশুচরিত্র এনে, ভগবানের কাছে এ প্রার্থনা বাবলুর জন্যে বিভূতিভূষণের।

'বাবলু বলে, বাবাই কী ভালোই লিখিস।'

কথাটি উনিশ শ' পঞ্চাশের দশ ফেবরুয়ারির ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। মাত্র ক'দিন আগে ইছামতীর প্রকাশ, জানুয়ারির শেষে। অর্থাৎ, বাবলুর প্রশংসাপত্রই বোধহয় প্রথম প্রাপ্তি বিভূতিভূষণের। ইছামতী রবীন্দ্রপুরস্কার অর্জনও করে পরে। কিন্তু সে কথা এখানে অবান্তর, বিভূতিভূষণের হাতে দেশ তা তুলে দিতে পারেনি। মাঝখানে যা পেয়েছেন—কিছু কিছু সমালোচনা। খেদ নেই লেখকের। ইছামতীর ভবানী বাঁড়ুজ্যের কথা শুনি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ—এর চেয়ে অন্য কোন বেশি মূল্যবান সম্পদের কথা তার জানা

নেই।'

একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বললেন, আপনি ইছামতীতে অনেক অবান্তর চিত্র এ'কেছেন।

তাই নাকি? ও, আচ্ছা! বিভূতিভূষণ মেনে নিলেন কথাটা সহজেই।

উপস্থিত ছিলেন সেখানে কালিদাস রায়। তিনি প্রতিবাদ করলেন। না, অবান্তর নেই কিছু। ওগুলিরও দরকার, গল্পের ভেনটিলেশনের জন্যে।

সমালোচকও বুঝি খানিকটা মেনে নিলেন কথাটা। বিভূতিভূষণ তখন সোৎসাহে বলে উঠলেন, হাঁ হাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই, ওই জন্যই ওগুলি দিতে হয়।

ওই কথার স্মৃতিচারণ করে কবিশেখর বলছেন, 'মোট কথা, কোন যুক্তিই তাঁর মাথায় ছিল না। লেখকের সজ্ঞান চেষ্টা যেন ওতে কিছু নেই। সৃষ্টি অবচেতন স্তরেই হয়েছে...। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন সংগতি নেই। কিন্তু ব্যাপার তা নয়, সংগতির সূত্রটা থাকত অনেক গভীর তলে। যখন তিনি লিখতেন তখন তাঁর আবিষ্ট অবস্থা। পরে অনাবিষ্ট অবস্থায় তার কিছুই মনে থাকত না। তাই যুক্তি দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই তা সমর্থন করতে পারতেন না।

'নিজের লেখার প্রুফ দেখতেন না, কোন কাগজে লেখা ছাপা হলে পড়েও দেখতেন না ঠিক আছে কিনা। কেউ যদি তাঁকে জানাতেন, ছাপায় অনেক ভুল আছে, তিনি বলতেন—ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়। না, তাই বলে কী কী ভুল নিজে দেখতেও চাইবেন না। কবি-বন্ধু কালিদাস রায় এসব অভিজ্ঞতার বিস্তারিত উল্লেখ করে বললেন, 'আমরা হয়ত বলতাম, বিভূতি, এই প্রসংগটা বা ওই চিত্রটা বোধহয় এই উদ্দেশ্যে যোজনা করেছ? কথাটা শুনেই বিভূতি খুশি হয়ে বলত, হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়, ঠিক ধরেছেন। তারপর একদিন নিভৃতে বললে, দাদা, আমি কিছুই ভেবে লিখি না। লেখার সময় মনে যা যা আসে তাই লিখে যাই। আপনারা সব কথার মধ্যে একটা শৃংখলা, সার্থকতা ও যুক্তি পাচ্ছেন দেখে ভারি আনন্দ হয়।—এগুলি ও'র উপরি পাওনা যেন।'

নানা চরিত্রের সাহিত্যিকবর্গ নিয়ে বিভূতিভূষণের সতীর্থ বন্ধুমহলও বিরাট। তাঁদের কাছ থেকে সমালোচনা-সুখ্যাতি নানা কথা তাঁকে শুনতে হত সামনে বসে। বিনা বাধায় বলা যেত বলে বোধহয় ওকাজটায় অনেকেই উৎসাহ পেতেন, নানা গারজিয়ানি দেখিয়ে যেতেন। আর বিভূতিভূষণের মনোভাব হচ্ছে সেই গজেন মিত্রর কথায়—ভালো বললে খুশিতে মাথা দোলাবেন, নিন্দায় বলবেন 'চ্যান করুক গে যাক।'

এই গজেনবাবুই বলেছেন, 'ইছামতী'র প্রশংসা করে কোন এক বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচলক বিরাট এক চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা যেদিন এলো, সেদিন খুব আনন্দ, পড়ে শোনালেন আমাদের কয়েকজনকে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন খোঁজ করলাম, কই বড়দা, সে চিঠিখানা? তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তাই তো, চিঠিটা কোথায় রাখলাম! মনে পড়ছে না তো! সেটা আর পাওয়া গেল না।'

একি সমসাময়িক সাহিত্যিক সমালোচকদের সম্পর্কে বিভূতিভূষণের উপেক্ষা? অবজ্ঞা? না আত্মসমাহিত অবস্থার প্রকাশ? পরিমল গোস্বামী বলেছেন, 'তাঁকে তাঁর পথের পাঁচালী, আরণ্যক বা দৃষ্টিপ্রদীপ নিয়ে চটিয়ে দেবার চেষ্টা করে দেখেছি, তা কিছুমাত্র তাঁর অন্তরে পৌঁছত না। তাঁর শিল্পধর্মে এমন পরিপূর্ণ উপলব্ধি ছিল যে, আমার রহস্যছলে বলাকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। সে জিনিস

না দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না। সে হাসি ছিল তাঁর কৃপামিশ্রিত। কারণ তিনি তাঁর সেই শিল্পের স্তরে ছিলেন তপস্যাব্রতী। সে স্তর তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত। অতএব তাঁকে আঘাত করলে সে আঘাত সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসত। তিনি হয়তো মনে মনে বলতেন, প্রভু, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কি করছে।

অন্তত নিন্দা-প্রশংসা যে-সাহিত্যিকরা করতেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা যে তাঁর ছিল তা বোঝা যাবে তাঁর একখানি চিঠি দেখলে। স্ত্রী কল্যাণী দেবীর কাছে মিরজাপুরের মেস থেকে লেখা ওই চিঠিতে দেবানন্দপুরে শরৎ স্মৃতি-সভায় জ্বরের জন্যে যাওয়া হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন—

'তরুণ সাহিত্যিকেরা চালিয়াতের দল, ওরা কেউ দেবানন্দপুরে যাবে না খবর নিয়ে জানলুম, এমনকি 'শনিবারের চিঠি'র দলও নয়। এরা সবাই নিজেদের শরৎচন্দ্রের চেয়ে বড় মনে না করলেও অন্তত সমকক্ষ বলে মনে করে। তুমি কাগজে রিপোরট পড়েই দেখো, নামকরা সাহিত্যিকদের একটা প্রাণীও সেখানে থাকবে না। অবিশ্যি রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র যাবেন সভাপতি হিসাবে। তিনি নামজাদা লেখকগোত্রে পড়েন না। সাহিত্যিকের দল বলে কোন জিনিস নেই জানবে, এ-রাজ্যে সবাই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারো চেয়ে কম বলে বিবেচনা করেন না সেখানেই যত মুসকিল।'

অর্থাৎ অনেক কিছু দেখেশুনেই বোধহয় অনেক কিছু সম্পর্কে উদাসীন, না, আত্মনিবিষ্ট হয়ে থাকতেন লোকটি। বন, ফুল, পাখি, পাহাড়, ইছামতী নিয়ে ভুলে থাকতেন, প্রকৃতির জগতে। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রকৃতির সৃজন এই শিশু'কে নিয়ে ইদানীং। বাবলু এসে যেন, ভবানী বাঁড়ুজ্যের কথায়, 'অন্য জগতের সন্ধান দেয়' তাঁকে।

কেবল কি দশ ফেবরুয়ারির কথা, রোজকারের দিনলিপিতে বাবলু আর বাবলু। ফেবরুয়ারির তেরো তারিখের দিনলিপি 'আজ সকালে বাবলুকে নিয়ে বেড়াই। বাবলুর আমি খেলার সাথী। আমি না হলে ওর খেলা হয় না। কেমন চমৎকার সকল কথা বলে। ওর সব আমার ভালো লাগে বড়।' এর পরদিন, অর্থাৎ চোদ্দ তারিখ, 'বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে বার হই। শিরীষ ফলের ঝুমঝুমি করে দি। ও বলে ফল পাড়ো। ফল ভাঙো।'—এভাবেই চলছে পাতার পর পাতা। এ কি শুধু অপত্য স্নেহের আতিশয্য?

'মানুষ বিভূতিভূষণ' প্রবন্ধে কালিদাস রায় লিখেছেন, 'বিভূতির সঙ্গে আলাপে আমি সাহিত্যের প্রসঙ্গই তুলতাম, দেখতাম তাতে সে শরৎচন্দ্রের মতোই বেশিক্ষণ যোগ দিতে পারত না, সে বিজ্ঞান দর্শনের প্রসঙ্গ তুলত, শেষ পর্যন্ত ভগবৎপ্রসঙ্গ। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠলেই বিভূতির বাগ্মিতা দেখা দিত।...একদিন সে বলল, বাবলুর মধ্য দিয়ে আমি যেন ভগবানের মহিমার আস্বাদ পাচ্ছি।'

'ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড় ধর্মগ্রন্থ'—এ-কথা বলেছে ইছামতীর ভবানী বাঁড়ুজ্যে। ভবানীর কথা—'তিনি শিশুবেশে আমায় জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর হাতে বন্ধনই তো মুক্তি।'—ইছামতীর ভবানী এই কথার মধ্য দিয়ে ধরা দিল বিভূতি-ভূষণে। বিভূতিভূষণ, ভবানীতে।

এ কী হল সেই বাবলুর? অতটুকু শিশুকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি, যায়

যায়! অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারদিক থেকে। বুঝি চরম মুহূর্ত উপস্থিত। আর সেই মুহূর্তে যে পরম ঘটনা ঘটল আজও তা রহস্যাবৃত।

প্রথমে বুঝতে পারা যায়নি অসুখটা। এপরিলের ছ' তারিখেও দেখছি বিভূতি-ভূষণের ডায়েরিতে লেখা—'আজ মাইনে পেয়ে বাবলুর জন্যে বড় মাছ আধ সের কিনে আনি।' বাবলুকে বড় মাছ খাইয়ে মাইনে পাওয়া সার্থক হল বাবার। বাবলুও খুশি এবং বোঝা যাচ্ছে সুস্থও। আর চোদ্দ এপরিলের লেখা, 'ভয়ানক দুর্ভাবনা, বাবলুর জ্বর ছাড়লো না।' অর্থাৎ ক'দিন আগেই জ্বরে ধরেছে বাবলুকে এবং পালা করে আসছে। ভেবেছিলেন দু'দিনেই ছাড়বে জ্বর। ছাড়ল না। চোদ্দ এপরিল পড়ল সেবার পয়লা বৈশাখ, হালখাতার দিন। সামাজিক কর্তব্যের দায়ে কল্যাণীই ঠেলে পাঠালেন গোপাল-নগর হাটে, বনগাঁয় আমন্ত্রণকারীদের দোকানে। বড়দের হাত ধরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে এসেছে দোকানে, মিষ্টির ঠোঙা হাতে নিচ্ছে। আর তিনি একলা, বাবলু পড়ে আছে জ্বরে! বসা হল না দোকানে ওর কথা মনে পড়তে। বনগাঁ পেঁছেই ফিরে এলেন, এ-সব কথা বসে বসে লিখলেন দিনলিপিতে।

ষোলো তারিখ লিখছেন, 'বাবলু ভালো নেই, রোজ জ্বর আসচে। আমি বাঁশ-বাগানে বসে কত ভাবি। খেতে ভালো লাগে না। কিছু করতে ভালো লাগে না।'

উনিশ তারিখ, 'আবার জ্বর এলো ওর। কী মনের কষ্ট। ও বলে, বাবাই, ভালো হয়ে গেলে ভালো তেল মেখে তোমার সঙ্গে নেয়ে আসবো। বনশিমের বীজ নিয়ে দু'জনে কত খেলা করেচি।'

বাইশ এপরিল, 'বাবলু সর্বদাই ডাকে আমাকে বিছানায় শুয়ে। ও বলে, বাবাই, ভালো হলে তোমার সঙ্গে ভাত খাবো। মন কী খারাপ।'

শুধু ওই কথা, আর কিছু নেই ডায়েরিতে। স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। লেখা বন্ধ। 'অনশ্বর' বইখানি লিখতে শুরু করেছিলেন, পড়ে রইল। একদা হাজারিবাগ-রামগড়ের মাঝামাঝি বাস পথের পাশে 'ভরহেচ নগর' লেখা এক প্রাচীন পরিত্যক্ত প্রাসাদ দেখে কল্পনায় যে কাহিনী দানা বেঁধেছিল, সংক্ষেপে তা নিয়ে 'ভরহেচ নগর' নামে গল্পাকারে লিখেছেন। এবার তাকেই বিস্তারিত রূপ দিতে হাত দিয়েছিলেন 'অনশ্বর' বইয়ে। এক পাশে সরিয়ে রাখলেন খাতাকলম। বাবলু ভালো না হলে আর কিছু লিখবেন না।

হঠাৎ পঁচিশ তারিখ জ্বরটা যেন ছেড়ে গেল। দেখা যাক কাল কী হয়। না, পরদিনও এলো না জ্বর। এবার তাহলে ছেড়ে গেল জ্বর। ডাক্তার আশার বাণী শোনালেন। সাতাশ তারিখও বাবলুকে নিজ্বর দেখে স্কুলের পথে পা বাড়ালেন বিভূতিভূষণ।

একী, আবার জ্বর এলো! রাতে বড় ডাক্তার এসে রোগের নাম করতেই মুখ শুকিয়ে গেল বাপ-মার। টাইফয়েড।

রোগটা ও'দের দু'জনেরই চেনা। এ-বাড়িতে এসেই কল্যাণীকে পড়তে হয়েছিল ওই রোগের কবলে। যমের সঙ্গে লড়াই। আরও বেশি মূল্য দিয়ে এ রোগটিকে একদা চিনতে হয়েছিল বিভূতিভূষণকে—মা মৃণালিনীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তাঁর কাছ থেকে এই টাইফয়েড। আজ তাঁর বাবলুকে আক্রমণ করেছে সেই কালান্তক রোগ! শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মা-বাবা।

আড়াই বছরের একটা শিশু, কতটুকু তার ক্ষমতা। পারবে কি ওর শোণিত-কণিকা এই সর্বনাশা শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে বিজয়ী হতে? পারবে কি মৃত্যুকে পরাভূত

করতে এক আবেগচর্চিত জননী, তাঁর অন্তরবেদনা দিয়ে? অপত্য স্নেহ-বিহ্বল এক পিতৃহৃদয়, শুভকামনার শক্তিতে?

হতাশা শুধু ডাক্তারের চোখে-মুখেই নয়, যমের সঙ্গে যুদ্ধক্লান্ত শিশুটির মুখে শেষ মিনতি ফুটে উঠেছিল।

উদ্বেগ। নিরালম্ব, অসহায়, অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে বাবলুর শিয়রে দিবারাত্র বসে আছেন দু'জনে। প্রহরা দিচ্ছেন। যেন মৃত্যু এলে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে দেখবেন মুখোমুখি। চোখে-মুখে সেই প্রাণপাত প্রতিজ্ঞা।

এ-সময়েই ঘটনাটি ঘটল।

স্নানাহারের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই কল্যাণীর। এ-অবস্থায় রোগীর শুশ্রূষাই বা করবে কে? স্বামী তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন, যাও স্নান করে এসো। আমি তো আছি।

মা ছেলেকে ছেড়ে একদণ্ডও দূরে যেতে চাইছেন না। প্রায় জোর করেই তাঁকে ওঠানো হল।

বাড়ির পিছনেই ইছামতী, কোনক্রমে দু'-ডুব সেরেই চলে এলেন। যেতে আসতে কেবল যা সময়। কিন্তু এ কী? ঘরে পা' দিয়েই চমকে উঠলেন কল্যাণী, কে এ? তাঁর স্বামী?—বাবলুর শিথান ছুঁয়ে যেন এক ভিন্ন মানুষ বসে আছেন! যে লোকটিকে রেখে গিয়েছিলেন তিনি কোথায়? এ তো সেই ক্লান্ত, শ্রান্ত উদ্বেগাকুল পিতা নয় বাবলুর! বসে আছেন, অন্য এক বিভূতিভূষণ। একটা প্রচণ্ড নিশীথ-ঝড়ের তাণ্ডবের পর এক প্রসন্ন আলোর প্রভাত যেন অর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে সে-বিভূতিভূষণের চোখে।

কল্যাণী!—আবেগজড়িত কণ্ঠে ডেকে উঠলেন বিভূতিভূষণ।

কী হয়েছে? কেন অমন করছ? কাছে এসে স্বামীকে ধরলেন কল্যাণী।

এ আমি কী দেখলাম, কাকে দেখলাম কল্যাণী!

কী দেখলে? কল্যাণী উদ্বেগব্যাকুল।

কে যেন এসেছিল।—আচ্ছন্নের মত বলে চললেন বিভূতিভূষণ, আমার বাবলুকে নিতে এসেছিল।

কী বলছ তুমি! শিউরে ওঠে মায়ের সর্বশরীর। মুহূর্তে ঝলসে ওঠে মনে পুঁটিদির সতর্কবাণী। কাঁদতে কাঁদতে বাবলুকে জড়িয়ে ধরলেন মা, না না, আমার বাবলুকে আমি দেবো না, দেবো না, না—।

আমিও তাই বলে দিয়েছি।—বিভূতিভূষণ বলে যাচ্ছেন, তুমি চলে যেতেই সে ঘরের মধ্যে এলো। আমার দিকে চেয়ে বললে, ওকে নিতে এসেছি, তুমি ছেড়ে দাও ওকে, সরে যাও। আমি চিৎকার করে উঠলেম—না-না-না, সরে যাবো না, যাবো না, আমি দেবো না আমার বাবলুকে। বলেই বাবলুকে জড়িয়ে ধরলেম বুকে। সে বললে, ওর আয়ু তো ফুরিয়ে গিয়েছে, কী করে ওকে রাখবে? আমি বললেম, রাখবো আমার জীবন দিয়ে। সে হাত পাতলে, তবে দাও তোমার আয়ু। তারই ইঙ্গিতে আমি বাবলুর মাথায় হাত রেখে বললেম—তথাস্তু, দিলেম। সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হল ওই অজ্ঞাত আগন্তুক।

কল্যাণীর তখন সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। চোখ দিয়ে জল ঝরছে অঝোরে।

কে জানে, কী ঘটেছিল সেই দ্বিপ্রহরে। কোন্ দেবতার প্রসারিত হাত থেকে বাবলুকে বাঁচাতে নিজ পরমায়ু সেদিন দান করলেন বিভূতিভূষণ! ধরা পড়েছিল কি বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপে কোন আসন্ন ভবিতব্য? না তা দেবযানস্রষ্টার সাময়িক

আত্মবিস্মরণ?

নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এ নিয়ে। বাবলু কিন্তু সেরে উঠতে লাগল এর পর থেকেই এবং ক'দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ।

ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কেবল থেকে গেল না, জোরালো হল আরো। তবে তা সাময়িক। পরবর্তী ঘটনা সব প্রশ্নেরই মীমাংসা করে দিয়ে গেল। এবার সেই কাহিনীর দিকে আসা যাক।

॥ একুশ ॥

সেবার উনত্রিশ ভাদ্র ও'র জন্মদিনের আয়োজন হল মামাশ্বশুর নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সুইনহো স্ট্রিটের বাড়িতে। থাকতেই হবে ওদিন ও'কে।

হোক জন্মদিনের উৎসব, কিন্তু বিশেষভাবে ওই উনত্রিশ তারিখটার হেতু?

হাঁ, ওইটেই নাকি ও'র জন্মদিন। আর 'নাকি' কেন, স্বয়ং বিভূতিভূষণই বলেছেন, তাঁর জন্মদিন উনত্রিশ ভাদ্র।

তবে যে দেখা যাচ্ছে, ঢাকুরিয়ার এক অনুষ্ঠানে একত্রিশ ভাদ্র জন্মদিন বলে উপস্থিত থেকে মানপত্র গ্রহণ করেছেন আগের বছর? তার আগের বছরও তাই—বনগাঁ কলেজে। আসলে ওর কোনটাই ঠিক নয়।

এই এক বিচিত্র-কাণ্ড যা কেবলমাত্র বিভূতিভূষণেই সম্ভব।

পথের পাঁচালীর পর ক্রমবর্ধমান খ্যাতিতে গেঁয়োযোগীরও ভিখ জুটতে লাগল। বনগাঁর 'সাধুজন পাঠাগার'-এর লোক এলেন বিভূতিভূষণের কাছে। জন্মদিনে ও'কে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিজেদের এলাকার এই প্রতিভাকে বরণ করতে চান তাঁরা।

তা বনগাঁর সন্তান বিভূতিভূষণকে আবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিতে হবে কেন বনগাঁয়, এক কথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু জন্মদিনটা কবে?

দ্যাখো হাঙ্গামা! মুশকিলে পড়লেন বিভূতিভূষণ। মহানন্দ-মৃণালিনী কেউই নেই বেঁচে। এখন কে বলে দেয়? তবে হাঁ, মনে আছে, তাঁর জন্মদিনে একটু ভালো-মন্দ রান্না করতেন মা, জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে। সমবয়সীদের ডেকে খাওয়াতেন সম্ভব হলে। জাহ্নবী একবার বায়না ধরে, তারও জন্মদিন করে খাওয়াতে হবে অমনি। সে স্মৃতি ভুলবার নয়। মা বকে দিয়েছিলেন, মেয়েমানুষের জন্মোটাই তো দুঃখের জন্যে তার আবার মহোচ্ছব! জাহ্নবি, সেই জাহ্নবী সেদিন কেঁদেছিল। ছোট ছিল তো। পরে আর কাঁদেনি। কতো কথা মনে পড়ে। সেই পাঁচুগোপাল যেদিন খাতা আবিষ্কার করলো, সেও তো এক জন্মদিন। অনেক ভেবে ভেবে বললেন, পুজোর আগে, ভাদ্রেই—তবে একদম শেষাশেষি হবে।

আগন্তুকদের তো হবে না তাতে। অবশ্য ভাদ্র হলে হাতে সময় আছে। ঠিক বার করে ফেলবেন তারিখটা। ও'রা পরে এসে জেনে যাবেন।

তারপর উনত্রিশ তারিখটা কী করে মাথায় এলো বোঝা ভার। তারিখটা ও'দের জানিয়ে দিলেন। সেই থেকে ওটাই চালু। তবে মাঝখানে ঢাকুরিয়ার দলকে একত্রিশ তারিখের কথা বলেছিলেন। সেটা পরে মনে হয়েছিল ঠিক নয়। ওটা শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। কোন কারণে ওই তারিখটা স্মরণে পড়ে, তারই প্রভাব হয়ত কাজ করেছে।

আবার ফিরে গেলেন উনত্রিশ তারিখে। বিভূতি অনুরাগীরা ওই উনত্রিশ তারিখটাকেই ও'র জন্মদিন জানেন। বিভূতিভূষণও স্বয়ং আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতেন তাঁদের আয়োজিত জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। মানপত্র গ্রহণ করতেন, আনত হয়ে বরণ করতেন সকলের দীর্ঘায়ুকামনা, মালাচন্দন, আশীর্বচন। এদিনের আমন্ত্রণ তিনি সাধ্যমত প্রত্যাখ্যান করতেন না, আবার হন্যে হয়েও ছুটতেন না। কবি বন্ধু কালিদাস রায়ের স্মৃতিচারণে তা স্পষ্ট হয়েছে। ঘটনাটি সেই ঢাকুরিয়ার জন্মোৎসবের দিনের।

'ঢাকুরিয়ায় বিভূতি-জন্মতিথির উৎসবে যোগদান করলাম, সকালবেলায়। তারপর কথা ছিল বনগাঁয়ে তার জন্মোৎসব হবে, তাতে আমি সভাপতিত্ব করব, আমরা দুজনে অপরাহ্ণে সেখানে যাব। বিভূতি আমাকে প্রায়ই বলত, 'ভগবানের সম্বন্ধে ভক্তিমূলক কবিতা লিখুন। আর কেন, বয়স হল, ভগবানে মন দিন।' খাওয়াদাওয়ার পর বিভূতিকে বললাম, 'তুমি ভগবান ভগবান করো, ভগবানের কি জানো বলত?' সে বললে, 'আপনি বন্ধজীব, আপনাকে ভগবানের মাহাত্ম্যের কথা না বুঝিয়ে ছাড়ব না।' তারপর বিভূতি ভগবানের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা শুরু করলে তাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কোথায় গেল তার অভিনন্দন, কোথায় গেল আমার বনগ্রাম গমন। বনগাঁর জনসাধারণ পথপানেই চেয়ে থাকল। শেষে শুনেছিলাম, তারা বিভূতির ছবির গলায় মালা পরিয়ে সভার কার্য শেষ করেছিল।' এ সেই একত্রিশ ভাদ্রের জন্মদিন।

আসলে বিভূতিভূষণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের জন্ম তারিখ। শেষটায় কী করে যেন উনত্রিশ তারিখটাকেই জন্মদিন সাব্যস্ত করে ল্যাঠা চুকিয়ে দেন। অনেক অনেক দিন পরে, কল্যাণী দেবী আর তাঁর ভাই চন্ডীদাস খুঁজেপেতে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতাখানা যদি না বার করতে পারতেন তাহলে ওই পরমদিনটি যে আঠাশে ভাদ্র, তা আমরা জানতাম না। জীবৎকালে তা জানতে পারেননি বিভূতিভূষণও। পিতার ডায়েরি, খাতা, সব নাড়াচাড়া করলেও খেয়াল করেননি।

বিভূতিভূষণের ডায়েরিগুলি লক্ষ্য করলেও বোঝা যায় সন, তারিখ, সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন ছিলেন। নোটবুক সর্বদাই থাকতো কাছে, তবে তাতে গাছপালা, ফুল, লতাপাতার নাম টুকে রাখার ঝোঁকই বেশি। তারিখওয়ালা ডায়েরি বইয়ের থেকে কিছুটা ধরা যায়, তবে রোজ লেখা হত না অনেক সময়, দু'তিন দিনেরটা একসঙ্গে লিখতেন তখন। তাতে মাঝে মাঝে গোলমাল হয়েছে। গরমিল হয়েছে স্মৃতিকথনকালে। আর তারিখহীন যে খাতায় দিনলিপি আছে, তাতে আরও অসুবিধা হবে হিসাব মেলাতে। বিভূতিভূষণের এই ত্রুটির উল্লেখ করে তাঁর অন্যতম অনুরাগী-সহচর সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী তাঁর 'স্মৃতিচিত্রে' মন্তব্য করেছেন, 'এর কারণ বিভূতিভূষণের কাছে সব সময়েই প্রকৃতি মুখ্য হয়ে উঠেছে, মানুষ গৌণ।'

খোদ মানুষটিই গৌণ হয়ে গিয়েছেন নিজের কাছে, সুতরাং জন্মদিন, সন, তারিখ, তিথিনক্ষত্রের পঞ্জী আগলায় কে? বিয়ের আগে কল্যাণীর কাছে লেখা চিঠিতে দেখা যাবে, যে বয়সে এবং যে ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বয়সটা কমিয়ে দেখানোর গরজ বোধ করে, সেই ক্ষেত্রে নিজ বয়স তিন বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। দিললীর সেই বাড়ির নম্বর ভুলের ব্যাপারটাও কোন ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ এটাই বিভূতিভূষণে স্বাভাবিক ছিল।

বাবলুর সেই অসুখের পর দেড় মাস কেটে গিয়েছে। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বাব্যুর

সঙ্গে আবার বেড়াতে যায়। ছোটাছুটি করে। বাবাকে না পেলে নিজেই বেরোয় খেলতে। জুলাইয়ের পাঁচ তারিখেও দেখছি বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে লেখা—'বাবলু দুষ্টু হয়েচে। কেবল বাইরে গিয়ে খেলা করে বেড়ায়।' আর ঠিক তার পরদিন, ছয় জুলাই, বাঁওড়ের ধার দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন। বাবলু তা-তা করে দিলে। কল্যাণী ঘরের কাজে মন দিয়েছিলেন। হঠাৎ একদল ছেলের ডাক। বাইরে এসে দেখেন, একী! সবাই ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে লোকটিকে। হাঁটতে পারছেন না বিভূতিভূষণ। আষাঢ় মাসের শেষ সময়। বর্ষা-পিছল বাঁওড়ের পাড় ধরে চলতে গিয়ে পিছলে পড়েন। পা মচকেছে। আরও একবার পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন হরিনাভিতে মাসটারির সময়। আবার তেমনি শয্যাগত হলেন। সেই যে শুলেন, গোটা জুলাই আর উঠতে পারলেন না। লেখাও বন্ধ। পড়া চলে শুয়ে শুয়ে। 'অমিয় নিমাই চরিত' পড়েন। এ খবর তাঁর ডায়েরিতে আছে। লেখা বন্ধ হলেও ডায়েরি কি না-লিখে পারেন মহানন্দতনয়? সেই কিশোর বয়স থেকে চলে এসেছে—জীবনধারার সমতালে। মাঝখানে ক'বছরের লেখা দুঃখের ঝড়ে এলোমেলো উড়ে গিয়েছে কোথায়। পরের ডায়েরিতে আছে তার স্মৃতিচারণ। সে-ডায়েরি লিখতেই যে হবে তাঁর। সাধ্য নেই শরীরে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবু ছাড়ছেন না ডায়েরি। ছয় জুলাইয়ের ডায়েরিতে পা মচকানোর কথা আছে। পরদিনের পাতায় লেখা, 'পা মচকে শয্যাগত'। তার পরদিন—'পা ভেঙে ঐ'। তারপর শুধু 'ঐ', 'ঐ', 'ঐ' লেখা চলছে পনের তারিখ অবধি। লিখবার, ভাববার শক্তি নেই, তবু 'ঐ' লিখেও ধারাটাকে অব্যাহত রাখছেন!

পনেরোর পর থেকে দু'একটা শব্দ, কথা, বাক্য লেখা শুরু। যেমন—'বাবলু কেবল ফু দেয়', 'অমিয় নিমাই চরিত পড়ি', '৩রা আগস্ট স্কুলে গেলুম অতি কষ্টে', ইত্যাদি।

স্কুলে গেলেন বটে, তবে দু'তিন দিনের বেশি নয়। আবার একটা ফোড়া উঠলো পায়ে। তা নিয়েও সপ্তাহখানেক ভোগান্তি। একটু ভালো হলে কল্যাণী ও'কে নিয়ে ব্যারাকপুর চলে এলেন। বললেন, ক'দিন স্কুল থাক না। বিভূতিভূষণেরও তাই মনে হচ্ছিল, একটু বিশ্রাম যেন দরকার। চণ্ডীদাস সিনেমার টিকেট কিনে আন'লা—মেজদা-মেজদিদের নিয়ে 'মাইকেল মধুসূদন' দেখা হবে মীনা সিনেমায়।

অবশ্য, সিনেমার ভিড়ে শো দেখার চাইতে ঘেঁটুবনের নিবিড় ভিড়ে ফুলের শোভা দেখার আনন্দ অনেক বেশি চণ্ডীদাসের এই মেজদার। তাঁর 'হে অবণ্য কথা কও'-র একটি কথা—'এই ঘেঁটুফুল কেন যে আমাকে মাতিয়ে দেয় তা কি বলব। কোথায় লাগে সিনেমা-থিয়েটার দেখার আনন্দ'।

জীবনে সিনেমা দেখেছেন কর গুনে। বন্ধ ঘরে বেশিক্ষণ থাকা তাঁর পোষায় না। গভীর স্নেহ তাঁর ওই তরুণ চণ্ডীদাসের প্রতি। ওর দাবি। তাছাড়া, সুপ্রভা, খুকু—এদের নিয়ে দেখেছেন সিনেমা, কল্যাণীকে নিয়ে আর দেখলেন কই? গেলেন, এবং দেখে ভারি খুশি হয়ে ফিরলেন। তারিখটা সতেরো আগস্ট, বাঙলা বত্রিশ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার। সেদিনের ডায়েরিতে সিনেমার কথা লেখা আছে। স্মরণীয় বইকি, দরজা আঁটা হলঘরে বসে শিল্পরস উপভোগের অভিজ্ঞতা তো বেশি নেই। সব ক'বারই প্রায় অন্যের উপরোধে পড়ে যাওয়া। একবার শুধু গিয়েছিলেন সাগ্রহে—সিনেমা নয়, নৃত্যনাট্য দেখতে এবং সে এক কাণ্ড।

মেঘমল্লারের নৃত্যরূপ দিয়েছেন শিল্পী মণি বর্ধন। শো হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে। সে কী আনন্দ বিভূতিভূষণের! শহরের লোক দেখবে, তাঁর গাঁয়ের

লোক দেখবে না? বারাকপুরে এসে মাসিমা, পিসিমা, জ্যেঠিমা, খুড়িমা, সইমা, পুঁটিদি —সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। সাজো-সাজো রব পড়ে গেল গ্রামময়। অনেকেই তাঁরা শহর কলকাতা দেখেননি। শহর দেখবেন, শহরের নাচগান দেখবেন, টিকেট লাগবে না। খরচা কেবল ট্রেন ভাড়া। শহরে কারো কারো খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। কানু-মামাকে বলে রেখেছেন, বিধবারা কিছুই খাবেন না। তবে অন্যেরা, যদি রাত হয়ে যায়, বুঝেছ কিনা! ঢের বুঝেছেন নিরঞ্জনবাবু। তবে ঈশ্বরেচ্ছায় দশ-বিশজনকে একবেলা আপ্যায়ন করার অবস্থা তাঁর আছে। বিভূতিবাবুর এও তো একটা উৎসব। হোক না-হয় খরচখরচা কিছু।

সে এক দৃশ্য! খালি পা, খালি গা, অর্থাৎ ব্লাউজপত্তর জন্মে ও'রা ব্যবহার করেননি। হাতে পানের ডিবে, পিকদানি, দোকতাপাতা, ইত্যাদি নিয়ে সামনের সারি উজ্জ্বল করে গ্রাম বারাকপুর অধিষ্ঠিতা। তাঁরা বসেছেন লেখকের নিজস্ব 'পাশ'-এর অগ্রাধিকারে। পিছনের সারি পেয়েছে সুন্দরী, সুবেশা, সুরভিতা শহর কলকাতা। কিন্তু পিছনের ও'রা নাচ দেখবেন কি, সামনে যাঁরা বসেছেন তাঁদের দেখেই অস্থির! সামনের সারি আবার পিছন ফিরে শহর দেখে থ, বলে কিনা, কলির কেতা কলকেতা! গ্রাম গড়াগড়ি খাচ্ছে পিছন ফিরে শহর দেখে, শহর গড়ায় গ্রামের রগড় দেখে। ভাগনী উমা আজও হেসে গড়াগড়ি খায় সে অবিস্মরণীয় দৃশ্য বর্ণনায়। তীরভূমি, জনপদ-বধূ ইত্যাদি বইয়ের লেখক শচীন ব্যানারজির বাড়ি বসে, একদিন তাঁর স্ত্রী, বিভূতি-ভূষণের ভাগনী এই উমা দেবী সত্যিই হেসে গড়ালেন আমার সামনে।

তা হাসুন, মামা তাঁর বারাকপুরবাসিনীদের দেখিয়ে ধন্য। নিজের লেখার শো দেখানোর সুযোগ তো আর জোটেনি তাঁর ভাগ্যে!

লেখার কিছু এসে যায়নি তাতে। লিখে চলেছেন অনলস সাধনায়। শরীরটা একটু সুস্থ হতেই আবার কলম ছুটেছে। কিন্তু একী লিখছেন তিনি? একটির নাম 'খেলা', আর একটি 'শেষ লেখা'। গল্প দুটি পরে তাঁর কুশলপাহাড়ীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহিত্যরসিকরা যাই বলুন, কল্যাণীর কিন্তু ভালো লাগলো না মোটেই। 'খেলা'য় আছে, এক বালককে নিয়ে তার বাবার খেলা এবং হঠাৎ একদিন বালককে লুকোচুরি খেলায় ফেলে রেখে তার বাবার চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া।

এ কী শ্রী তোমার গল্পের? কল্যাণী ভারি ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রশ্ন করেন।

নিরুত্তর বিভূতিভূষণ শুধু হাসেন।

আর 'শেষ লেখা'য় সেই দেবযানের সুর। বক্তব্যটা হচ্ছে, যথার্থ জ্ঞানের চোখ যখন মানুষের খুলে যায় তখন আর কোন মোহই তাকে বেঁধে রাখতে পারে না এই ধূলির জগতে।

'শেষ লেখা' পড়ে কল্যাণীর মন কেন জানি ভারাক্রান্ত হল। শেষ লেখাই কি ও'র লেখার শেষ কথা?

কাকে প্রশ্ন করা, বারণ করা ওসব লিখতে? বিভূতিভূষণও যেন অন্যমনস্ক কিছুদিন ধরে। পুজোর ছুটি শুরু হতে আরো ক'দিন দেরি। কিন্তু মন কেমন যেন ছুট-ছুট করছিল। কল্যাণীকে বললেন, চলো বেরিয়ে পড়ি।

কোন অভিজ্ঞ বেতনজীবী লম্বা বন্ধের মুখে কামাই দেন না। বিভূতিভূষণ তাই-ই যখন চাইছেন জেনেশুনে, কল্যাণীও বাবলু-কোলে প্রস্তুত।

মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে গল্পের আসর জমাতেন টিফিনে। শিক্ষকদের নিয়ে বসত পরলোকতত্ত্বের আসর। ক'দিন আগে একটা ফিসটও হল ছাত্র-শিক্ষক মিলে।

প্রধান উদ্যোক্তা বিভূতিভূষণ।

সেপটেম্বরের ছয়, ও'র জীবনে একটা বিশেষ দিন। ওই তারিখ ও'কে বাঙলার অধ্যাপকপদে নিয়োগের সিম্ধান্ত করেন বনগাঁর কলেজ কর্তৃপক্ষ। স্থির হল বিভূতি-ভূষণ যোগদান করবেন পূজার ছুটির পর যোল নবেম্বর কলেজ খুললে।

এই বনগাঁয় এখন কলেজ। একদা গাঁ থেকে আড়াই ক্রোশ পায়ে হে'টে পড়তে আসতেন বালক বিভূতিভূষণ। সেদিন কত অসহায়। সেই ভরতি হওয়ার দিনটি কোন দিন কি ভুলবেন? দিনলিপি তৃণাঙ্কুর-এর তৃতীয় সংস্করণের ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় লেখা—'একটি ছোট ছেলে বর্ষার জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে মায়ের কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্য বে'ধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে—এমন মুখচোরা যে কাউকে বলতে পারচে না ভর্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে।'

সেই ছেলেটি আজ গাঁয়ের স্কুলের শিক্ষক। এখন বনগাঁর কলেজের অধ্যাপক হতে যাচ্ছে।

সেপটেম্বরের বারো তারিখে হঠাৎ স্কুলে এসে টিফিনে ছেলেদের নিয়ে ছেলে-বেলার সেই চু-কপাটি খেলা জুড়ে দিলেন মাঠে খুব আনন্দ করলেন, আনন্দ দিলেন ছাত্রদের। তারপর স্কুল থেকে সটান বাড়ি। পরদিন বাবলু-কল্যাণীকে নিয়ে পাড়ি দিলেন। প্রথমে উঠলেন ব্যারাকপুর ভূতনাথ কুটিরে, শ্বশুরবাড়ি। মাঝের একদিন বাদ দিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান। ঠিক হল জন্মদিনের পরদিনই সকালে ঘাটশিলা রওনা হবেন। ফর্দ তৈরি।

উনত্রিশ ভাদ্র, শুক্রবার, ইংরাজি পনেরো সেপটেম্বর, উনিশ শ' পঞ্চাশ, সন্ধ্যায় নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সুইনহো স্ট্রিটের বাড়ি একে একে সাহিত্যিকরা জড়ো হতে লাগলেন বিভূতি-জন্মোৎসব-বাসরে। বিভূতিভূষণ প্রস্তুত বেলা না পড়তেই।

এটাও তাঁর বৈশিষ্ট্য। গাড়ির পথে কোথাও যেতে হলে অনেক আগে থেকেই পাঁয়তারা চলবে। স্টেশনে হাজির হবেন গাড়ির নির্দিষ্ট সময়ের নিদেন আধ ঘণ্টা আগে। এসে বসে থাকবেন, লোকজনের আনাগোনা দেখবেন।

কেউ কেউ এর মধ্যে ও'র গ্রাম্য স্বভাব দেখেছেন। গ্রামাঞ্চলে ডাকের নৌকো বা যাত্রীবাসের কোন সময়-বালাই নেই। দূরপল্লীতে বা অরণ্য-পর্বতে স্টেশন যেখানে দূরপাল্লার পথ, ট্রেনের সংখ্যা স্বল্প, সকালের গাড়ি ফসকালে ফের গাড়ি সন্ধ্যায়, সেখানে অমন সতর্কতা দরকার। তাই বলে মিরজাপুর স্ট্রিট থেকে শিয়ালদা স্টেশন বা ব্যারাকপুর থেকে কলকাতা পে'ছানোর জন্য এমন ব্যাপার কৌতুককর। কেউ এ নিয়ে ঠাট্টা করলে বিভূতিভূষণের জবাব, কলকবজার ব্যাপার বাপু, 'কিছু বিশ্বাস নেই!

শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই বাবলু বায়না ধরলে, বাবাই, গাড়ি।

বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। ট্যাকসি জোগাড় হল না, হল ঘোড়ার গাড়ি। সুইনহো স্ট্রিটে সবাই অবাক। পথ পায়দল চালিয়ে যিনি পায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন সেই লোক কিনা বাসের পথে একেবারে অশ্বশকটে হাজির!

আর বলো কেন। হেসে বাবলুকে দেখিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ, ওর পুণ্যেই হল।

বাবলুর পুণ্যে কতটা যে ব্যয় করতে পারেন ওই মানুষটি, করেও ফেলেছেন কতটা ইতিমধ্যে, সে খবর কি জানত সেদিনের উৎসবসভার বন্ধুরা?

অনেকেই সেদিন উপস্থিত। সজনীকান্ত দাস, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, বাণী রায়, জাহানারা বেগম, মন্মথ ঘোষ প্রমুখ উৎসবসভাকে জমিয়ে তুললেন। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত চলল সঙ্গীত আবৃত্তি, আলোচনা, শুভকামনা, আপ্যায়নাদি। উৎসবশেষে নানা উপহার দিলেন বন্ধুরা ও'কে। প্রকাশক গজেন মিত্র এর মধ্যে একটি কাজ সেরে রাখলেন। একখানি মোটাসোটা সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা দিলেন ও'র হাতে। খাতাটির উপরে সোনার জলে লেখা—'কাজল', নিচে লেখা—'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'।

পথের পাঁচালী-অপরাজিতর পরে 'কাজল' নামে সম্পূরক গ্রন্থ রচনার সংকল্প ছিল বিভূতিভূষণের। অ্যাদ্দিন হয়ে ওঠেনি। সেইটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রকাশক। বিভূতিভূষণ হেসে ফেললেন।

তারপরই চোখে জল। সে-রাতের দিনলিপিতে উৎসব-উপহারের বিবরণী দিতে দিতে হঠাৎ লেখা থেমে গেল। শেষ লাইনটি—'বাবার দশ টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়চে। কতদিন ধরে মায়ের হাতে একটি পয়সা নেই। খড়ের ঘরে জল পড়চে।'

এবারেও বাবলুর কল্যাণেই—ট্যাকসি করে হাওড়া। তারপর সেকেনড ক্লাসের টিকেট কেটে ট্রেন। ত্রিশ ভাদ্র শনিবার নাগপুর প্যাসেঞ্জার ও'দের ঘাটশিলায় পৌঁছে দিল দুপুরে। কল্যাণীর দিকে চেয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, ছুটিটা এবার সবাই মিলে ঘাটশিলাতেই কাটাবো।

ধলভূমগড় রাজ এস্টেট এই ঘাটশিলা। লালমাটি, শালবন, সাদা পাথর, শতনুড়ি পর্বত। উত্তরে ফুলডুংরি, সিদ্ধেশ্বরডুংরি। তার পশ্চিমে রোয়াম, রাকা মাইনস বা তামা পাহাড়, যাদুগোড়ার অরণ্য-পর্বত। পূবে সুর্দা, চাপরি, স্বর্ণপাণি। দক্ষিণে মৌভাণ্ডার, মুসাবনি আর এদেলবেরা অরণ্য। এবং সর্বোপরি আছে বালুচরি পাড়ে মোড়া প্রাচীন কবিদের বর্ণিত 'সোনার নদী'—সুবর্ণরেখা। এ এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় 'সত্যিই এমন সুন্দর স্থান দেখিনি, মা। অরণ্য পর্বত-সমন্বিত হরিদ্বারও বুঝি এমন সুন্দর নয়।' বিভূতিভূষণের পরামর্শেই 'প্র-না-বি'ও তাঁর মধুপুরের পথ ঘুরিয়ে আটচল্লিশ সাল থেকে এখানে আসতে শুরু করেছেন। ওদিকে গালুডিতে সুবর্ণাচলে আছেন নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। নির্জন কবি জীবনানন্দও অবসরে এসে 'গালুডির হাওয়া খেয়ে' যান। ডাহিগড়ায় 'গৌরীকুঞ্জে' বিভূতিভূষণ। কাছেই ঘর নিয়ে থাকেন গজেন মিত্র। থাকেন এসে মন্মথ ঘোষও। পরিব্রাজক সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক কারণেই একটু বেশি। দূরপাল্লা কলকাতার বাইরে তাঁরও প্রথম স্টেশন এখন এই ঘাটশিলা। উঠবেন এই গৌরীকুঞ্জেই। দু'জনে মিলে ঘুরবেন, বেড়াবেন এখানে। একসঙ্গে গড়াগড়ি যাবেন এক বিছানায়, ভ্রমণতালিকা তৈরি হবে। তারপর 'দুর্গা' বলে একদিন বেরিয়ে পড়া, দু'জনে অবশ্য দু'পথে। নিরঞ্জন চক্রবর্তী এসে বাড়ি করে বসলেন। দেখা যাবে আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে—বাড়ী আছে তাঁদেরও

এখানে। জায়গা নিয়েছেন, এসে থাকছেন বিখ্যাত কিছু সংগীতশিল্পী, চিত্রাভিনেতা। আসেন বাণী রায়, সুলতা কর, শিল্পী শৈল চক্রবর্তী। মোট কথা, বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের যেন একটা অবকাশ কলোনী এই ঘাটশিলা। ফলে আরও বাঙালী ও তরুণ-তরুণীর ভিড় হয় এখানে। অনেক আকর্ষণ এখানকার। প্রধান কোন্‌টি? প্রমথনাথ বিশীর কথা উদ্ধৃত করছি, 'ঘাটশিলায় যারা বেড়াতে যায় তাদের প্রধান আকর্ষণ বিভূতিভূষণ।'

তবে ওই আউটিং-এর দল আসবে মরসুমে একবার, পূজায়। আরও দেরি আছে তার। সাহিত্যিকদের পূজার লেখায় শেষ তুলির টান পড়বে তার আগেই। এখানকার শালবীথিতে, ফুলডুংরির ঢালুতে, সুবর্ণরেখার তীরে বসে যাবেন এক একজন শিল্পী। এই তপোবনে বসেই গাঁথা হবে ও'দের বাণীর মন্দারমাল্য। বিহার রাজ্যের এখান থেকেই আসবে শারদীয় বাংলা সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

লেখাগুলি ডাক করে দিয়ে শুরু ও'দের মেলামেশা, ঘোরাফেরা, আনন্দের আসর। তার আগে সবাই ব্যস্ত, নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে নির্জন নিবিষ্টতা সংরক্ষণ।

সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুবর্ণরেখা। তীরের এক নির্জন শালবনের মধ্যে বসে লিখে চলেছেন বিভূতিভূষণ। টেবিল—সেই চামড়ার সুটকেসটি। ওপাশে এক হরীতকীবাগানে কলম চলছে প্রমথ বিশীর। মৌখিক চুক্তি দু'জনের মধ্যে, কেউ কারো সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারবেন না। চুক্তিটার দস্তুরমত একটা নাম দেওয়া হয়েছে, 'বিশী-ব্যানারজি প্যাক্ট'। কিন্তু চুক্তিভঙ্গের অপরাধ ঘটছে দু'তরফেই ঘন ঘন। দেখা যাবে শালবনে সুটকেস ফেলে গুটি গুটি ব্যানারজি চলে এসেছেন বিশীর কাছে, একটা চুরুট দেবে?

বিশী ভ্রূ-কুঞ্চিত করবেন, কী কথা ছিল?

অপরাধ স্বীকৃত হবে। চুরুটটা তো বাগানো গেল! অনুপ্রবেশকারী ব্যানারজি চলে যাবার উদ্যোগ করতেই বিশী ফিরে ডাকবেন, তা আগমন যখন ঘটেছে, দু'মিনিট কথা বলা যাক। কিন্তু সাবধান, আর যেন এ-রকম না হয়।

দু'জনেই কসম খান, কবুল করেন। মহালয়া এসে গেল প্রায়। আর সময় নষ্ট নয়। জোর কলম। হঠাৎ বিস্মিত ব্যানারজি দেখবেন, মূর্তিমান বিশী অপরাধী-প্রায় ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়ানো, দেশলাইটা যদি একটু...।

নাও, একটা বিড়িও খাও বরং। দু'দণ্ড গল্পের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত আকর্ষণটা হাজির করা।

আকর্ষণ আরও একটা ছিল—হুঁকো-কলকের। শালবনের একপ্রান্তে 'গৌরীকুঞ্জ'। কল্যাণী মাঝে মাঝে তামাক সেজে দিয়ে যেতেন। লেখার সময় এক 'ছিলিম তামুক' টেনে নিতে পারলে ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে ভাবনাটাও খোলতাই হয়। তবে হাঁ, কড়া তামাক চলবে না, বড্ড কাশি হয়। মিঠেকড়া চাই। একটু মিঠেকড়া খোশ কথাও তো চাই তাহলে ওসময়। অতএব চুক্তি টেঁকে না। প্র-না-বি এ-রকম একটি চিত্র দিয়ে পরে বলেছেন 'নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির যে দশা, বিশী-ব্যানারজির প্যাক্টেরও তাই।'

যা-ই বলুন না কেন কলকাতার কাগজওয়ালারা, একটু আড্ডা ছাড়া ও'রা পারবেন না। রাখতেও পারেন না শেষ পর্যন্ত সবার বায়না। পূজো এসে যায়। কিছুদিনের জন্য ও'দের কলম বন্ধ।

সেবার পূজার মরসুমে টাটানগরে সাহিত্যসভা। প্রধান অতিথি বিভূতিভূষণ, বৈকালিক ভ্রমণের নাম করে বেরিয়ে পড়লেন গৌরীকুঞ্জ থেকে, কাউকে কিছু না

বলে। এখান থেকে টাটানগর গাড়িতে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। তবে ওই যে কথা 'কলকবজার ব্যাপার'। হাতে, বলা বাহুল্য, বেশ সময় রেখেই বেরোলেন। অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ছ'টায়। চারটে নাগাদ তিনি স্টেশনে হাজির।

ও'কে প্লাটফরমে বসে থাকতে দেখে স্টেশন মাসটার কাছে এলেন।

গাড়ি আসচে না কেন মশাই। পাকড়াও করলেন তাঁকে।

কথা শুনে স্টেশন মাসটারের মাথায় হাত। টাটানগরের গাড়ি তো পৌনে চারটেয় বেরিয়ে গেল। ফের রাত আটটায়। অর্থাৎ সময়ের হিসাবটা ঠিকই ছিল মানুষটির, বেঠিক কেবল গাড়ির খবরটা। এখন উপায়? উদ্যোক্তারা কেবল অসন্তুষ্টই হবেন না. অপ্রস্তুতও হবেন যে সাধারণের কাছে!

মানুষটিকে ভালোই চিনতেন স্টেশন মাসটার। বললেন, উপায় একটা আছে। কিন্তু সে আপনি পারবেন কি? বড্ড টিডিয়াস জারনি।

ও'র কথার মধ্যে যেন গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন বিভূতিভূষণ। বললেন, টিডিয়াস কী মশাই, গরুর গাড়ি হোক না। মোদ্দা কথা, সাড়ে ছ'টায় পৌঁছানো যাবে কিনা বলুন।

তা হয়ত পারবেন। ঠিক গরুর গাড়ি নয়, একটা মালগাড়ি আসছে, টাটানগরই যাবে। দেবো ব্যবস্থা করে?

মালগাড়ি? মালগাড়িই সই।

গাড়ির ক... গারড ও'কে তুলে নিয়ে যতটা খুশি ততটা উদ্বিগ্ন। পয়েন্টস-ম্যান যদি পথে দেরি করিয়ে দেয়?

বিভূতিভূষণের কিন্তু এভাবে যেতে বেশ মজা লেগে গিয়েছে। ধীরে ধীরে চলা, দেখে দেখে চলা। তিনি ও'কে আশ্বস্ত করলেন, সময়মত পৌঁছলে তো ভালই হল, না হলেও ক্ষতি নেই। এও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

সেবার যেমন, ঘাটশিলা থেকে ইংরাজি নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে গালুডি যাবেন। গাড়ির প্রস্তাব বাতিল করে চললেন পায়ে হেঁটে। সাঁওতালপল্লী জগন্নাথ-পুরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কানে এলো একটি বাঙলা গান—'হরি দুঃখ দাও যে-জনারে'। হাঁ, একটি লোক এদিকেই আসছে গাইতে গাইতে। নীলকণ্ঠের এই গানটি বাবা গাইতেন। ও'র কানে এ শুধু কি গান! এ সুদূরস্মৃতির নূপুর-শিঞ্জন। লোকটি কাছে আসতে তাকে সবটা গাইবার জন্য ধরলেন। সে লজ্জা পেয়ে বললে— বাবু 'উশ্চারণ' হয় না।

এই অভিজ্ঞতাগুলিই বড় লাভ ও'র। 'বনে-পাহাড়ে'তে এসব লেখা আছে। হোক পথে দেরি।

এবার অবশ্য, ছ'টার মধ্যেই মালগাড়ি টাটানগর স্টেশনে পৌঁছে দিল প্রধান অতিথিকে।

হঠাৎ এমনি উধাও হওয়া ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে কল্যাণীর, নুটু-যমুনারও। কিন্তু আর একজনের? ছোট ব্যানারজি বাবুর মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে বেজায়। ফিরে এলেই বাবাকে সে জোর শাসন করলে, সবটা বচনে নয়, বেশিটাই ব্যঞ্জনায় এসব চলবে না। তাকে ফেলে আবার কোথায় যাওয়া? কিসের যাওয়া?

না, আর যাওয়া নয় এ ক'দিন ওকে ছেড়ে ছাব্বিশ আশ্বিন অর্থাৎ তেরো অকটোবর উনিশ শ' পঞ্চাশ, বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে লেখা—'বিকেলে বাবলুকে নিয়ে বেড়াতে গেলুম ও রেল লাইনের ধারে বসি। বাবলু বলে, তুই কোথাও যেতে

পারবিনে, তোকে ঘাড় ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবো।'

বাবাকে ওই ভাষায় বলা? হায় হায়, ভাষাজ্ঞান হয়েছে নাকি ওইটুকু ছেলের। ঠিক তার পরের পাতায়, সাতাশ আশ্বিন লেখা—'বাবলুকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে গেলুম। বাবলু উল্টোপাল্টা বলে—বাবাই সত্যিমিথ্যে কথা বলছি। সত্যিমিথ্যে।'

বয়সটা নিয়েই যা ঝামেলা, নেহাৎ ঊনতিন। না হলে মহানন্দর জ্যেষ্ঠপুত্র বিভূতি-ভূষণ তস্য জ্যেষ্ঠপুত্র বাবলু। অর্থাৎ বাবলু তো এ-বাড়ির ভবিষ্যৎ বড়বাবু। এদিকে নুটু-যমুনা নিঃসন্তান। ফলে বড়-মেজো-ছোট—সবার দায়িত্বই ওর কাঁধে। অতএব' কথা তো তাকে বলতেই হবে সব। এবং অন্যদের চলতে হবে তার অর্থ বুঝে, মনের ভাব আন্দাজ করে। বাবলু তার যেমন খুশি বলবে, বলেও। পাতার পর পাতা পিতা লিখে রাখছেন সে-সব কথা, বাণীর মত। ষোল অকটোবর, ঊনত্রিশ আশ্বিন—'বিশ্বপতি-বাবু এলেন। বাবলুকে দেখে বললেন, ভারি ইনটেলিজেনট ছেলেটি। বাবলুকে নিয়ে কানুমামার বাড়ি ও সেখান থেকে রিজ-এ। ও সেই পাথরে বসে বলচে এখানে মা-কল্যাণী চা খেয়েছিল। আমায় বলচে, কান ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। বলে কান ধরলে।'

হেট-হেট। বাপের কাঁধে চেপে বাবলু হাতের চাবুক চালায়। সোনার নদীর তীর বরাবর ঘোড়া হয়ে বাপ ছোটেন। ধবলীর বন থেকে পিয়াল বন বা বুরুডির জঙ্গল থেকে কাপড়গাদিঘাট পর্যন্ত একটানা ছোটা। কাপড়গাদিঘাটের শিলাসনে বসে বিশ্রাম করতে বেশ লাগে। লোকপ্রবাদ, ঘাটশিলার সেই যে রঙ্কিনীদেবী তিনি একবার তাড়া খেয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বেঁধা পরবে দেবীর কাছে নরবলি হত। সেবার যাকে স্থির করা হয়েছে বলির জন্য তার ছেলে চটে গিয়ে দেবীকেই মুষল নিয়ে মারতে যায়। ভয়ে দেবী ছুটতে ছুটতে সামনে দেখেন বিপদ—এই সোনার নদী। এবার উপায়? এক ধোবার কাপড়ের গাদা ছিল এখানে। অগত্যা তার মধ্যেই নাক ডুবিয়ে দিলেন দেবী। তবু রক্ষা। খুশি হয়ে দেবী ওই ধোবাকেই রাজা করে দেন। রাজ্যের নাম হল ধবলরাজ্য—যা থেকে ধলভূম। পরে অবশ্য হাত বদল হয় রাজত্বের। বর্তমান রাজা রাজপুত বংশোদ্ভূত। রঙ্কিনী আজো আছেন। কিন্তু ওই লোক-কথার সত্যমিথ্যা যাচাই করবে কে? ও-সম্বন্ধেও বাবলুর সেই কথা 'সত্যিমিথ্যে' মিলিয়েই সিদ্ধান্ত করতে হবে। না হলে কাহিনী আরও আছে। কাছেই কিছু শিলাখণ্ড। কোন্ কালের নানা চিত্রবিচিত্র আঁকা রয়েছে তার গায়। লোকে বলে পঞ্চ-পাণ্ডব এখানে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। আর কাপড় কেচে নিয়েছিলেন ওই কাপড়-গাদিঘাটে। দুটো জায়গায়ই ভালো লাগে বিভূতিভূষণের। বাবলুকে ওই পাণ্ডবদের কাপড় কাচার গল্প বলেন। কেন? এখানে কাপড় কাচে কেন? বাবলুর জিজ্ঞাসা। বাবা বলেন, বেচারি পাণ্ডবেরা! আমার মতই অবস্থা! বনে টো-টো করে ঘুরলে আর কাঁহাতক কাপড় সাফ রাখা যায়!

কোন বিকালে যাবেন রেল লাইনের ধারে। বিকালে তখন এখান দিয়ে যেত বম্বে মেল। কানাডিয়ান ইনজিন তার। বাবলু বলে নাককাটা ইনজিন। তা দেখাতে হবে ওকে।

তবে ছোটাছুটি কি আর রোজ পোষায়? মাঝে মাঝে মাদুর পড়ে রাস্তার মোড়ের আমগাছতলায়। আসরটা প্রধানত বাবলুর। রাজ্যের গল্প বলো সেখানে বসে। পায়ে পায়ে আরও এসে জুটবেন দু'চারজন।

ঘাটশিলার জগদীশ হাই স্কুলের শিক্ষক যতীশ মুখারজিরাও ক'জন বাড়ি

ফেরার পথে দু'দণ্ড বিশ্রাম নেবেন এখানে, এই মাদুরে। এই যতীশবাবু! ছেলে স্মৃতীশ তখন স্কুলের ছাত্র। ওই বয়সেই সাহিত্যে বেশ অনুরাগ। গল্প লেখার মকশ করছে লুকিয়ে। কিন্তু লুকোনো রইল না আর বিভূতিভূষণের কাছে। ছোটর সঙ্গে ছোটর মত মিশে জেনে নিয়েছেন ওর গোপন সাধনার কথা। তার পর থেকেই দু'জনে সে প্রায় বন্ধুত্ব। কিশোর স্মৃতীশ সমবয়সী ফেলে বয়স্ক বিভূতিভূষণের সঙ্গে সময় কাটায়। বিভূতিভূষণও পথ চেয়ে থাকতেন স্মৃতীশ কখন আসবে।

না, আর সে আসবে না কোনদিন। গত বছর সে সবার কাছ থেকেই চলে গিয়েছে —বুঝি বা দেবযানের পথে। আজ বাপ আসেন শূন্য বুক নিয়ে। ও'র সঙ্গে কথা বলে সান্ত্বনা খ'ুজে পান অসহায় পিতা যতীশচন্দ্র। সব ভুলে যাওয়া যায় এখানে।

আসেন হেডমাসটার গোকুল পাইনও। একজন দু'জন করে আসর জমাট হয়। অদূরে বিশ্রাম কুঁইরির তেলেভাজার দোকান। লোকটির নামও দ্যাখো বিশ্রাম! বিভূতি-ভূষণের মাদুর পর্যন্ত সহজেই সেখান থেকে পি'য়াজি, বেগুনি, আলুর চপের গন্ধ পে'ৗছায়। পথচলতি কেউ যদি সে অবস্থায় একঠোঙা মুড়ি আর তেলেভাজা নিয়ে ও-দরবারে আসন চাইত, মাদুরের উদার অভ্যর্থনা সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হত তার দিকে।

সামনেই রামকৃষ্ণ আশ্রম। বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফিরবার পথে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এখানে থামবেন। বিভূতিভূষণের উদ্দেশে বলবেন, আসছেন তো সন্ধ্যার পর?

নিশ্চয়। একে বাড়ি পে'ৗছেই যাবো।

বাবলুকে বাড়ি পে'ৗছে সন্ধ্যার পরে গিয়ে বসবেন রামকৃষ্ণ আশ্রমে। বেদান্ত দর্শন থেকে নানা শাস্ত্রকথা চলবে স্বামীজির সঙ্গে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুশিক্ষিত। ছাত্রজীবনের পর থেকেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বিভূতিসাহিত্যের তিনি অনুরাগী পাঠক। একজন গৃহীর এত জ্ঞান, এত ভক্তি দেখে মুগ্ধ তিনি। ঘাটশিলার অনেক সন্ধ্যা, অনেক রাত্রি দু'জনের ভগবৎ কথনে কাটে। বেশ কাটল এবার পূজার দিন ক'টাও।

॥ বাইশ ॥

পঁচিশ অকটোবর, কার্ত্তিকের আট তারিখ সোমবার সেবারে কোজাগরী পূর্ণিমা। উদ্যোগী-উৎসাহী একদল সেই সন্ধ্যায় বিভূতি-সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন স্থানীয় সরকারি ডাক্তার সুবোধকুমার বসুর বাড়ি।

অনুষ্ঠানের বেশবাস নিয়ে দেওর-বউদি গলদঘর্ম। নুটু-কল্যাণী কিছুতেই ও'কে বোঝাতে পারছেন না, বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাক চাই। বাইরে এমন সময় হেডমাসটার গোকুল পাইনের গলা শোনা গেল, কই হে, বিভূতিবাবু, আছেন তো? না আবার জঙ্গলে পালিয়েছেন?

না না, এই যে আছি। ভিতর থেকে বিভূতিভূষণ সাড়া দিলেন।—কিন্তু এরা যা শুরু করেছে তাতে পালাতেই হবে জঙ্গলে।

মান্য অতিথিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন গোকুলবাবু। তিনিই অনুষ্ঠানের পুরোহিত। অভ্যাগতদের মধ্যে স্থানীয় বাঙালীসমাজের বিশিষ্ট নরনারী তো আছেনই, আগত সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্র মিত্র, সুমথ ঘোষ, সুলতা

কর, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখরাও সমবেত হয়েছেন সেই সন্ধ্যায়।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যকীর্তির সুখ্যাতি করে একে একে বক্তারা তাঁকে সম্বর্ধিত করলেন। ধলভূমগড়ের রাজ এসটেটের ম্যানেজার সাহিত্যানুরাগী মানুষ। বিভূতিভূষণের সঙ্গে সে-কারণে যথেষ্ট হৃদ্যতা। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে তিনি ঘোষণা করলেন, বাঙালী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের অবকাশ-যাপন ও সাহিত্যসাধনের সুবিধার জন্য তিনি ঘাটশিলাতে এক ভূখণ্ড দান করবেন তাঁদের এসটেট থেকে।

এখানে 'কবি-কলোনী' গড়ে তুলবার একটা পরিকল্পনা ছিল বিভূতিভূষণের। এসটেট ম্যানেজার বঙ্কিমবাবুকে প্রায়ই তিনি বলতেন কথাটা। আজ এই উৎসবে তিনি বিভূতিভূষণের সেই বাসনার উদ্দেশেই ওই ঘোষণাটি উপহার দিলেন। সবাই খুশি। এবং খুশিতে প্রবোধ সান্যাল একবার বক্তৃতা করার পর আবাব উঠলেন একটা আবৃত্তি করতে।

আবৃত্তি একটা বিভূতিভূষণকেও করতে হল। একটু বক্তৃতাও হল তার আগে, সম্বর্ধনার উত্তরে। কিন্তু কী বলছেন তিনি! গোটা উৎসবের আনন্দ নিবিয়ে দিলেন যেন!

প্রথমে 'কবি-কলোনী'র জন্য বঙ্কিমবাবু জমি দিচ্ছেন বলায আনন্দ প্রকাশ করলেন। বেশ। কিন্তু তার পরে বললেন, আজ অনুষ্ঠানে বসে মনে হচ্ছিল, সম্বর্ধনা বেশি হলে দ্রুত মৃত্যু ঘটে সম্বর্ধিতের। মনে হয়, সভায় ডেকে লোকটার কানের কাছে বার বার করে বলে দেওয়া হচ্ছে, তুমি অনেক দিয়েছ, আমরা খুব কৃতজ্ঞ, কিন্তু আর ঋণী কোরো না আমাদের। অর্থাৎ, যা হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার সরে পড়ো।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানেন, এসব ব্যাপারে বিভূতিভূষণের কতকগুলি খুঁতখুঁতি আছে। যেমন তাঁর ধারণা, লাইফ ইনসিওর করলে সকাল সকাল লোকটা মরে যায। এ-ভয়ে বীমা করেননি জীবনে।

এদিনকার কথাগুলিতে তাঁরা ও'র এ-রকম মনোভাবের তীব্র আপত্তি জানালেন। বিভূতিভূষণ বাধা দিলেন—না, না, আপনাদের কথা বলছি না। এ আমার নিজের চিন্তা। অনুরাগী বন্ধুরা যখন আমার জীবনের সাধনার মূল্যায়ন করেন, আমারও তখন মনে মনে জীবনের সর্ব কাজের, সব কথার একটা হিসাবনিকাশ চলছিল।

ও-সব কী কথা! কথার মোড় ঘোরাতে কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন—একটা আবৃত্তি হোক।

আচ্ছা। হেসে থেমে গেলেন বক্তা। তারপরে শুরু করলেন আবৃত্তি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

কিন্তু এই কবিতা কি এই উৎসবের উপযোগী? ঘরে বিজলি আলো, বাইরে কোজাগরীর জ্যোৎস্না, সব যেন সত্যিই ঢাকা পড়ে গেল একটা আশঙ্কার অবগুণ্ঠনে।

জীবনের শেষ বছর (১৯৫০) স্ত্রীপুত্র সহ বিভূতিভূষণ।

OCTOBER, 1950

25 Wednesday ৮ই কার্ত্তিক, পূর্ণিমা

[illegible]

26 Thursday ৯ই কার্ত্তিক, প্রতিপদ

শেষ লেখা মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে। পূর্ণচ্ছেদ দিনলিপির ধারায়।

সেই সম্বর্ধনার দু'দিন পর। বিকালবেলা বেড়াতে গিয়েছিলেন কাছেই এক অরণ্য-ঘেরা পাহাড় ধারাগিরিতে। ফুলডুংরির মত এই আরণ্য-পর্বতটিও ছিল বিভূতি-ভূষণের প্রিয় জায়গা। কখনো সঙ্গী জোটে, না জুটলে নিঃসঙ্গ বিচরণ। কখনও সঙ্গে থাকেন মামাশ্বশুর নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং কলকাতার চারটারড অ্যাকাউনট্যানট প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা নামে, রাত্রি গাঢ়তর, ঘনতর হয়। এক সময় পথ হাতড়ে নেমে আসেন সেই পাহাড় থেকে।

এদিন সঙ্গে ছিলেন লরিবাংলোর ভক্তদা, কানুমামা প্রমুখ ক'জন। পাহাড়ে উঠতে উঠতে গল্প চলছে। বনচূড়ায় দ্বিতীয়ার চাঁদ। শাল, পিয়াল আর আমলকী গাছের ফাঁক বেয়ে জ্যোৎস্না ঝরছে ঝুর ঝুর। পাশের কণ্টিকারি ঝোপ কেমন একটা মাতাল গন্ধ ছড়াচ্ছে। এক অপার্থিব মায়ালোক যেন ঘিরেছে ধারাগিরিকে।

একটা শিলাসনে অনেকক্ষণ বসার পর বিভূতিভূষণ উঠে পড়লেন। হাঁ, রাত অনেক, সঙ্গী দলটিও নামতে চান। কিন্তু উপরের দিকে উঠছেন কেন বিভূতিভূষণ? ও'রা ডাকলেন, আর উঠবেন না, এবার চলুন, ফিরে যাই।

আবিষ্টের মত উঠে চলেছেন লোকটি, যেন এই মায়ালোকের আরও সান্দ্ররহস্যে. আরও অগম্য গোপনে পে'ছিতে চান। ও'রা সঙ্গে থাকলেন অগত্যা। উঠছেন, আর উঠছেন, এক সময় ক্লান্ত হয়ে একটু পিছিয়েই পড়লেন তাঁরা। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের মানুষটি। হঠাৎ এক ভয়ার্ত চিৎকার।

কী হল! দ্রুত ও'রা ছুটে উপরে গিয়ে দেখেন, দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছেন বিভূতিভূষণ। কাঁপছেন থর থর করে। ব্যাপার কী?

সামনে একটা খাটিয়া। কেউ একজন আপাদমস্তক ঢাকা তাতে নতুন কাপড়ে। নিচে নতুন সরায় সি'দুর-কলা সাজানো।

ধারাগিরি ও'দের সবার চেনা পাহাড়। এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেননি এখানে। যদি মড়ার খাটিয়া হবে, সঙ্গের লোকজন?

থাক ওসব প্রশ্ন। বিভূতিভূষণকে বোঝাতে লাগলেন, কী হল, এই দেখে ভয় পেয়েছেন? ও পাহাড়ীদের মড়া বোধহয়। চলুন এখান থেকে, নামি।

বিভূতিভূষণের মুখে কথা নেই। সর্বাঙ্গে ঘাম। টলতে টলতে নিচে নামছেন এক সঙ্গীর কাঁধে হাত দিয়ে।

কথা যোগাচ্ছে না ও'দের মুখেও। একা একা অরণ্য-পর্বতে, নির্জন জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে যিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীবনভোর, প্রেততত্ত্ব, আত্মার রহস্য ইত্যাদি যাঁর গবেষণা, কী জিনিস তাঁকে ভয় দেখাতে পারে! সানুদেশে নেমে বিশ্রামের জন্য একটা শিলাসনে ও'রা বসালেন বিভূতিভূষণকে। মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন ও'র চোখের দিকে। বিভূতিভূষণই বললেন, একটু বিশ্রামের পর। বললেন—কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেম, আজ একেবারে প্রত্যক্ষ করলেম।

কী? ও'দেরও গলা কে'পে গেল প্রশ্ন করতে।

আমায় বোধহয় চলে যেতে হবে শিগগির।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কে যেন হঠাৎ আমায় ডেকে নিয়ে গেল ওই খাটিয়ার কাছে। কার ইঙ্গিতে যেন মড়ার কাপড়টা তুলে দেখলাম। জানো কী দেখলাম?

সঙ্গীরা বুঝি শুনতে চান না আর। কাঁপছেন, ভয় পাচ্ছেন তাঁরা ও'র কথা শুনতে। তবু শুনতে হল। বিভূতিভূষণ বললেন, দেখলাম, ওই মড়ার মুখটা আমার

অভিভাবকত্ব করা দরকার। কল্যাণী আসবার আগে সে-সবের অনেকটাই তো সামলাতে হয়েছে যমুনাকে। আজও হয়। ঘোমটা টেনে তফাৎ থাকলে চলবে?

আর থাকলেই হল? ভাদ্রবধূকেই ডাকবেন ভাশুর, চলো ফুলডুংরি। চলো চান করতে যাই পুকুরে। যমুনা কল্যাণীর কাছে হেসে ফেলে—দেখসে বড়দি কাণ্ড খড়দার। তা যতো ইচ্ছে হাসো, ওসব গায়ে মাখেন না লোকটি। গায়ে মাখেন না ফলে ও'রাও। কিন্তু অনেক খ'ুটিয়েও আজকের অসুখের কোন সূত্র পেলেন না যমুনা-কল্যাণী। তবু একটা কিছু না করলে স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। দু'জনে পরামর্শ করে আলমারি থেকে দু'একটা ওষুধবড়ি খাইয়ে দিলেন রোগীকে।

কে জানে ওদের ডাক্তারির গুণেই কিনা, নানারকম ওষুধ পড়তেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বিভূতিভূষণ।

নুটুর উদ্বেগ ছিল। 'কল' থেকে ফিরেই নানাভাবে দাদাকে পরীক্ষা করলেন। না, ঠিক আছেন। নিশ্চিন্ত।

দুপুরের পর একটু ঘুমিয়েছিলেন কল্যাণী। দেওরের ডাকে ধড়ফড় করে উঠলেন. কী হল ঠাকুরপো?

দ্যাখো না দাদার কাণ্ড! আবার সেই ছেলেমানুষি। বলছে. যেমন আছি চলে যাবো, সাজগোজ আবার কী।

ক্ষুব্ধ ছোট ভাই অনুযোগ জানালেন বউদিকে। বউদি ততোধিক ক্ষুব্ধ। বললেন, থাক ঠাকুরপো. কিছুর দরকার নেই। কাল সকালে ও-জামাকাপড় আমি ভিখিরি ডেকে বিলিয়ে দেবো।

বিভূতিভূষণ নির্বাক। ও'র ওই নির্বিবাদ জিদে, স্ত্রীর অভিমান ফেটে পড়ে, রাজবাড়ি, কত লোকজন আসবে, কত পোশাকে। তার মধ্যে ওই উটকো পোশাকে যেতে যদি ও'র সাধ হয়, যাবেন।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল কল্যাণীর, আমাদের সাধ-ইচ্ছের আর কী বা দাম!

অভিমান! কল্যাণীর অভিমান! ও'র মুখের দিকে তাকালেন বিভূতিভূষণ। তারপরে হেসে ডাকলেন, শোনো, চলে যেও না রাগ করে।

কল্যাণী পাশের ঘরে চলে যেতে যেতে ফিরলেন।

বিভূতিভূষণ বললেন, সাজিয়ে দিতে চাইছো! দাও, যত খুশি, সাজিয়ে দাও, আমি আপত্তি করব না আর।

জরিপাড় ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি. কাঁধে শাল, অপেক্ষমাণ গাড়িতে গিয়ে উঠলেন বিভূতিভূষণ। ইচ্ছে ছিল বাবলুকেও সঙ্গে নেবেন। কিন্তু ও কী নিমন্ত্রণ বাবার, ছেলেসুদ্ধ হাজির হওয়া! আপত্তি করলেন জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু। বাবলু জানে বাবাই তাকে রেখে যাবেন না নিমন্ত্রণে। সেও সেজেগুজে হাত ধরেছে বাবার। অপ্রস্তুত বিভূতিভূষণ হাত ছেড়ে দিলেন। অবাক বাবলুও। গাড়ি চলে গেল।

প্রমথনাথ বিশী, সুমথ ঘোষ, অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখ অনেক লোক উপস্থিত বঙ্কিমবাবুর ওখানে। বঙ্কিমবাবু অভ্যাগতদের তাঁর নতুন তৈরি কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখালেন। বিভূতিভূষণ উঠলেন না। শরীরটা আবার খারাপ লাগছে। না এলেই বুঝি ভালো হোত। বসলেন বটে সবার সঙ্গে, খেতে পারলেন না কিছু। আয়োজনের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ প্রায়। আনন্দের বদলে একটা উদ্‌বেগ ও'কে নিয়ে। একটা জিনিস খেয়েছিলেন, যা না খেলেই ভাল হত। সেটা শিঙাড়া। সুমথবাবুর কথা—'শিঙাড়াটা একদম [illegible] হয়ে গিয়েছিল। আমরা আর

কেউ ছুঁইনি পর্যন্ত'।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফেরার জন্য গাড়িতে উঠলেন। গাড়ির মধ্যে বমি করলেন দুবার। সঙ্গে প্রমথ বিশী ও সুমথ ঘোষ। পথে প্রমথবাবু নেমে গেলেন তাঁর বাড়ি ওঁকে একেবারে ঘরে পেঁছে দিয়ে ফিরবেন সুমথবাবু। গাড়ি দাঁড়ালো গৌরীকুঞ্জের সামনে। বিভূতিভূষণ উঠতে যাচ্ছেন, দাঁড়িয়েই বললেন, আমায় ধরো। একেবারে ভেঙে পড়লেন সুমথ ঘোষের গায়ে। ড্রাইভার ঘরের সামনে গিয়ে ডাক্তারবাবু, ডাক্তার-বাবু বলে ডাকতেই একসঙ্গে কল্যাণী-যমুনা ছুটে এলেন। ড্রাইভার তাঁদের চেনা। ও-রকম ডাকছে কেন? বাইরে এসে দেখলেন, ওরা ধরাধরি করে বিভূতিভূষণকে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন।

নুটুবিহারী তখনও চেমবার থেকে ফেরেননি। বারান্দায় তুলতেই স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন কল্যাণী—ইশ, বরফের মত ঠান্ডা!

তখনকার মত বাইরের বারান্দাতেই বিছানা করে শুইয়ে দেওয়া হল ওঁকে।

শুশ্রূষায় লেগে গিয়েছেন কল্যাণী-যমুনা! নুটু ছুটে এলেন চেমবার থেকে।

তখনও মাঝে মাঝে বমি চলছে। নটু নিজে ডাক্তার। কিছু ওষুধ দিলেন। রাতটা কাটল। ডাক্তার হলেও নুটু তো ছোটভাই। দাদার চিকিৎসার পরামর্শের জন্য পরদিন ডেকে আনলেন সরকারী ডাক্তার সুবোধ বসুকে।

অবস্থাটার একটা মোড় ঘুরল পরদিন। হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন রোগী। বাড়ির মধ্যে স্বস্তির হাওয়া। উৎকণ্ঠা কেটে যাওয়ায় সোমবার সকালে বিভূতিভূষণের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিরঞ্জনবাবু কলকাতার ট্রেনে চাপলেন। সুমথবাবুরা রবিবার যাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন। তাঁরাও বিদায় নিলেন।

ভালোই গেল দিনটা। রাতে ঘুমও হল বেশ। মঙ্গলবার, বেশ বেলা হয়েছে। বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছেন বিভূতিভূষণ। কল্যাণী এটা-ওটা কাজ করছেন ঘরের মধ্যে। বিভূতিভূষণ চোখ মেললেন, শোন।

কাছে এলেন কল্যাণী, কিছু চাই?

বাবলু কোথায়?

ও-ঘরে, নিয়ে আসবো!

থাক। তুমি বরং বস একটু কাছে। কয়েকটা কথা তোমায় বলা উচিত।

তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন?—কাছে বসে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন কল্যাণী। কথা তো আছেই, সময়ও তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

বোধহয় এবার ফুরিয়েই আসছে কল্যাণী।—কেমন একটা উদাস কণ্ঠে কথা বলছেন বিভূতিভূষণ, হয়ত কথা বলার, এমন করে একান্তে বলবার আর সময় পাবো না মানকু।

আবার বাজে কথা বকা শুরু করেছ! কল্যাণী ধমক দিলেন, এখন তো তুমি সুস্থ হয়ে উঠছ। ঠাকুরপো কালকেই বললে, কিচ্ছু ভয়ের নেই আর।

বিভূতিভূষণ হাসলেন, তোমার ঠাকুরপোর এক আলমারি ওষুধের আয়ুধেও কারো নিঃশেষিত পরমায়ু ফিরিয়ে দিতে পারে না কল্যাণী।

না, আমি উঠে যাই তাহলে। এ-সব কথা শুনতে পারবো না।—কল্যাণীর হাত-খানা থর্‌থর করে কাঁপছে ওঁর হাতের মুঠোয়। কিন্তু কর্তব্যপালনে স্বামী তাঁর দৃঢ়তর। কথাগুলি বলতেই হবে তাঁকে আজ। বললেন, তোমাকে কঠোর, কঠিন হতে হবে, শক্ত হতে হবে কল্যাণী। আমার দেবযানে আমি বলেছি, 'যাঁকে ভগবান কৃপা

করেন, শুদ্ধ আধার করে নিতে তার সব কিছু ভোগ ও কামনার জিনিস ধ্বংস করে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেন। ভগবানের কৃপা সেখানে বজ্রের মত কঠোর, নির্মম, ভয়ঙ্কর। সর্বনাশের মূর্তি ধরে তা আসে জীবনে। ধ্বংসের মূর্তিতে নামে। সে-রকম কৃপার বেগ সামলাতে পারে ক'জন?'

তেমন কৃপা চাইনে আমি, তুমি চুপ করো। এ-সব সহ্য করবার শক্তি আমি কোথায় পাবো বল? একটা বিদীর্ণপ্রায় হৃদয়ের হাহাকারকে চেপে রাখতেই বুঝি দাঁত দিয়ে শক্ত করে ঠোঁট চেপে রাখলেন কল্যাণী। ও'র আনত মাথায় হাত রেখে যেন শক্তিদান করতে চাইছেন বিভূতিভূষণ, নিশ্চয় পারবে কল্যাণী। জীবনের পরম সত্য জানতে চেষ্টা কর। মৃত্যু, সে তো শেষ নয়, দুঃখেরও নয়। আমার দেবযানে বিশ্বাস রেখো। আত্মা অবিনাশী।—'সর্বজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে

অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।'

হঠাৎ বাবলুর কান্না। কল্যাণী বললেন, নিয়ে আসি ওকে?

না, এখন নয়। বাবলুর প্রতি এই প্রথম ঔদাসীন্য। বললেন, যাও, ওকে শান্ত কর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিমূঢ় কল্যাণী উঠে এলেন। তখনও বিভূতিভূষণ বলে চলেছেন—ন হণ্যতে হণ্যমানে শরীরে।

দক্ষ চিকিৎসক নুটুবিহারী সান্ত্বনা দিলেন, কিছু ভাবনার নেই বউদি। তিন দিন কেটে গিয়েছে। এখন তো একদম সুস্থ দাদা।

কল্যাণী স্বস্তি পান না, তবে ও-রকম করছেন কেন! কাছে গেলেই 'বাসাংসি জীর্ণানি'—কী সব বলছেন!

ওসব দাদার পাগলামো বউদি।

কী কাজে যমুনা ঢুকেছিলেন ও-ঘরে। তাঁকে ডাকলেন, বউমা, দেখতে পাচ্ছো কতো আলো, সারা ঘরবাড়ি ভরে গিয়েছে আলোতে।—তারপর থেমে বললেন, আমার জন্যে ভেবো না। আমি তো পরম শান্তির পথে চলেছি। দেবযানে বিশ্বাস কোরো। তবে নুটু, ও তো ছোট, ওকে দেখো।

যমুনাও স্বামীকে বললেন, কেমন যেন ভয় করছে তাঁর।

নুটু হেসে ফেললেন, ও-সব দাদার পাগলামো।

পাগলামোই বটে! ছোট ভাইও বুঝতে পারলেন বুধবার সকালে। দাদার অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে চিন্তান্বিত ডাক্তার নুটুবিহারী।

আবার এ-রকম হল কেন ঠাকুরপো! কল্যাণী উৎকণ্ঠিতা।

কিন্তু কী যে হল, তা বলবেন কি করে ডাক্তার। তিনিও ঘাবড়ে গিয়েছেন। ডাক্তার সুবোধ বসুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। টাটানগরের ডাক্তার ব্রহ্মপদ বড় চিকিৎসক, তাঁকেও ফোনে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু রোগী যেন দ্রুত কেমন হয়ে পড়ছে। কল্যাণীর বুক কাঁপছে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কালকের ও'র কথাগুলি মনে পড়ে। না, আজ আর সরে যাবেন না স্বামীর কাছ থেকে। কাছে বসে বললেন, বল, কত কথা বলবে বলেছিলে। সব আমি শুনব।

শুনবে? আনন্দে উজ্জ্বল বিভূতিভূষণ। শুনবে? থেমে থেমে বলছেন কথা। বোধহয় কষ্ট হচ্ছে। তবু থামতে বলবেন না কল্যাণী, ওটুকুও যদি না শুনতে পান আর! না, টাকা পয়সা দেনা-পাওনা দলিল-পত্রের কোন কথা নয়। সংসারপথে প্রলোভন জয় করে সৎ জীবন যাপনের উপদেশ, বাবলুকে মানুষ করার দায়িত্ব আর দেবযানে বিশ্বাস রাখার কথা। কল্যাণীও সে মুহূর্তে জানতে চাননি প্রশ্ন করে,

কোথায় কত টাকা পাওনা, কোন্ প্রকাশকের সঙ্গে কী কথা ছিল। ও'কেই শুধু কয়েকবার বলতে শোনা গেল, গজেনকে বড় দরকার ছিল।

কীসে দরকার প্রশ্নও করেননি কেউ। তিনিও বলেননি। না, 'কাজল' লেখার প্রশ্ন আর নেই। ইছামতীর দ্বিতীয় খণ্ডও না, আরও, আরও পরিকল্পনা সব পড়ে রইল। কে লিখবেন আর? দীর্ঘজীবন ধরে অবিচ্ছিন্ন ধারায় লিখে আসা সেই দিনলিপিতে পর্যন্ত ছেদ পড়ল। রোগে, দুঃখে, দুর্বিপাকে একদিনও থামেনি ওই ডায়েরি লেখা। অসহ্য যন্ত্রণায় শয্যাগত দিনগুলিতে যিনি অন্তত—'ঐ'—'ঐ'—'ঐ'—লিখেও জীবনের পৃষ্ঠার মত ডায়েরির পাতা শূন্য থাকতে দেননি। তাঁর দিনলিপির পাতাগুলিও আজ সাদা। কোজাগরী পূর্ণিমার সেই সম্বর্ধনার রাত্রেই শেষ লেখা, তাতে সামান্য ক'টি কথা—

'আজ ও-বেলা ডাক্তারের বাড়ি জন্মদিনের অভিনন্দন হোল। প্রবোধ সান্যাল আবৃত্তি করলে। অনেক লোক ছিল। জ্যোৎস্না রাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলুম বাসায়।'

সূর্য পশ্চিমে ঢলছে, নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন বিভূতিভূষণ। দাদাকে ফেরাতে ওষুধ-ইনজেকশানে গলদঘর্ম চেষ্টা করছেন নুটু আর হতাশ হচ্ছেন যেন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কার ছায়া দুলতে থাকল গৌরীকুঞ্জের 'পরে।

আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন বিভূতিভূষণ। নুটু এক দাগ ওষুধ এনে দাঁড়ালো, দাদা!

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন তিনি। ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কী ওটা?

ওষুধ, খেয়ে নাও দাদা।

ওষুধ! থাক নুটু।—ক্ষীণকণ্ঠ। টেনে টেনে বললেন, তুই বরং আমার কাছে বোস।

নুটু অবশ্য দু'পা' দূরেও যাচ্ছেন না। কল্যাণী তো আছেনই। কী একটা ওষুধ মালিশ করছেন পেটে। যমুনা এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছেন। আর তার ফাঁকে বাবলুকে সামলাচ্ছেন ও-ঘরে।

নুটু বসে আছেন বিছানার পাশে। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, আমরা কত ভাইবোন ছিলেম—না রে! আজ কেবল তুই আর আমি। এর পর তুই একলা। চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বিভূতিভূষণের।

দাদা!—ধমক দিতে গিয়ে নুটুও কেঁদে ফেলেন। নিজেকে সামলে নিতে পারছেন না তিনি। তবু তিনি ডাক্তার। বুক বাঁধতে চেষ্টা করেন।—আমার কথা রাখবে না দাদা?

নুটুর হাতখানা বুকের 'পরে টেনে নিলেন বিভূতিভূষণ। ছোট ভাইয়ের হাত!

তবে ওষুধটা খাও।

দে। হাঁ করে ওষুধটা খেলেন। তার পরে করুণভাবে মিনতি, আর আমাকে ওষুধ খেতে বলিসনে ভাই। তুই বরং এক কাজ কর। ঘরে গীতা আছে, তুই পড়, আমি শুনি।

গীতা হাতে নিয়ে নুটু জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ অধ্যায় পড়ব দাদা?

বিশ্বরূপ দর্শন—একাদশ অধ্যায়।—চোখ বুজে আবার যেন ধ্যানমগ্ন হলেন তিনি। নুটু পড়ে চললেন। একে একে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত পড়ে তাঁর মনে হল, ব্যাখ্যাটাও পড়ে যাই। সপ্তদশ শ্লোক শুরু করলেন—

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ, তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্, দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

কিরীটিধারী, গদাচক্রহস্ত, সর্বত্র তেজঃপুঞ্জস্বরূপ দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাময় এক অপ্রমেয় পুরুষকে সর্বদিকে অবলোকন করছি।

নুটু বাঙলা বলে যেতেই বিভূতিভূষণ আবার চোখ খুললেন। বললেন, ব্যাখ্যার দরকার নেই। ওতে সময় বেশি যাচ্ছে। তুই শুধু পড়ে যা।

নুটু আবার পড়তে থাকলেন—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥

মর্ত্য থেকে অমর্ত্যলোক বিস্তারী এক জ্যোতির্বলয় যেন রচিত হল সে মন্ত্রে। যেন পরম পথিকের মহাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়েছে গৌরীকুঞ্জে। এমন সময় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এলেন। নিমীলিতনেত্র হলেও যেন বুঝতে পারলেন বিভূতিভূষণ। অস্ফুট কণ্ঠে আহ্বান জানালেন স্বামীজিকে। সৌম্যমূর্তি স্বামী প্রজ্ঞানন্দও যেন কিঞ্চিৎ ব্যথাতুর। ও'র শিয়রে বসে, মুখ, ললাট—সমগ্র অবয়ব অবলোকন করলেন।

কী দেখছেন স্বামীজি?—কল্যাণী যেন কোন দৈববাণী শুনতে চাইছেন। সে কথার উত্তর দিলেন না স্বামীজি। বোধহয় উত্তর নেই। শুধু বিভূতিভূষণের কানের কাছে মুখ নিলেন, নামগান করি?

গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ শেষ হয়েছে। ও'র মুখে যেন এক প্রশান্তির ছায়া। মাথা কাত করে সম্মতি জানালেন নামগানে। স্বামীজি শুরু করেন, 'গুরুর্ব্রহ্মাঃ গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুরেব মহেশ্বরঃ।' গাইলেন রামকৃষ্ণ নামমালা। কীর্তন করে চললেন, বিভূতিভূষণের প্রিয় ওই জাতীয়সঙ্গীত—'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্—'। জপ করলেন রামনাম 'রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।' তারপর নির্বাণ স্তোত্র—'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্' আবৃত্তি।

শোনাচ্ছেন কাকে? চৈতন্য লুপ্ত হল কি? নামগান থামিয়ে ও'র মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন স্বামীজি। কিন্তু না, এক চৈতন্যলোক থেকে নিত্যচৈতন্যলোকে নিলীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভূতিভূষণ সজ্ঞান। তবে যাত্রা বোধহয় শুরু হয়েছে। কথা বললেন, যেন কোন দূরলোক থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর। বললেন, থামলেন কেন স্বামীজি, বলুন, পুণ্যনাম শুনি। এখনও বাকি কতো নাম, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামপ্রসাদ—কত পুণ্যনাম!

স্বামীজি আবার শুরু করলেন, ওঁ বুদ্ধায় দিবাকরায়, গোতম চন্দ্রমায়—।

নুটুর আর সাধ্য নেই কিছু করবার। কল্যাণী যেন পাথর হয়ে যাচ্ছেন।

ঘাটশিলার আকাশে ধীরে ধীরে রাত নেমে এলো। তার আড়ালে এক মহা-সর্বনাশ প্রতীক্ষারত গৌরীকুঞ্জের দুয়ারে। সময় বুঝি হয়ে এলো। মুরাতিপুরের আকাশে কান্না ছড়িয়ে যে শিশু যাত্রা শুরু করেছিল একদিন, কত কাল পরে, কত পথ হেঁটে, কত থেমে, কত চলে আজ বুঝি তাঁর বিদায়লগ্ন আসন্ন।

ও কার কান্না এ মুহূর্তে?—তখনও সজ্ঞান তিনি। বললেন বাবলু! বাবল কাঁদছে কল্যাণী, ওর কাছে যাও।

না। বাবলুকে পরেও পাবেন কল্যাণী। কিন্তু যে পরমনির্ভর চলে যাচ্ছেন, তাঁকে কি আর পাবেন পরে? কাঁদুক বাবলু। কল্যাণী উঠবেন না। সেই শেষ বেলায় কী

ভেবে হঠাৎ স্নান করে নিলেন, তারপর একখানা রঙিন লালপেড়ে শাড়ি পরে কপালে বড় করে একটা টিপ দিয়ে, সেই যে কল্যাণী স্বামীর পাশে বসলেন, আর ওঠেননি উঠবেন না। দুটি চোখে জ্বালিয়ে রাখা অকম্প দীপশিখা। বুঝি শেষ আরতি করছেন আরাধ্যতমের। বাবলুর জন্য উনি নিজ আয়ু দান করেছিলেন, কল্যাণী কি পারেন নিজ আয়ু সমর্পণ করে ওঁকে বাঁচাতে?—আমি সব আমার তুলে দিচ্ছি ঠাকুর। তুমি ওঁকে বাঁচাও। শিয়রে কল্যাণী—মূর্তিমতী প্রার্থনা। তবু সংশয়, তবু কেঁপে ওঠা শঙ্কায়। চোখের জলেই বুঝি নিবে যায় চোখের আলোর প্রজ্বলিত দীপশিখা। তবু যদি দেবতা মুখ তুলে না তাকান, জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকে, সবচেয়ে বড় সর্বনাশকে কি আজ চোখের সামনেই ঘটতে দেখতে হবে? হোক, সে আঘাত তিনি বুক পেতে নেবেন। বুক ভেঙে তাঁর চুরমার করে দিক নির্দয় নিষ্ঠুর সে ভয়ঙ্কর বজ্রবাণ। কাঁদুক বাবলু। ওর সারাজীবনের কান্নাকে কী দিয়ে তিনি ভোলাবেন? কল্যাণী উঠলেন না।

নুটু নিয়ে এলেন বাবলুকে। ঘর ভরতি তখন লোক। সবাইকে বাবলু চেনে না। অবাক সে। বাবাই কেন চোখ বুজে শুয়ে আছে! মা-কল্যাণী কেন কোলে নিচ্ছে না তাকে। মার চোখে কি জল? কাঁদছে? বললে, কাকিমা, মা-কল্যাণী কাঁদছে, সাট করে দাও। এ কী কাকিমাও কাঁদছে? কী হয়েছে, দাও মুছে দি।

নুটু বললেন, দাদা, এই যে বাবলু।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে অতি কষ্টে চোখ মেললেন বিভূতিভূষণ। আবার চোখ বুজলেন। ক্ষণিকের অমর্ত্য-আলোকেই হয়ত দেখে নিলেন নিজ জীবনের সমস্ত অধ্যায়কে। ঠোঁটে একটা আশ্চর্য হাসির প্রতিভাস। আস্তে আস্তে চোখের আলো নিবে গেল। জীবনদীপও বুঝি নির্বাপিত।

এ কী হল ঠাকুরপো! হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন কল্যাণী। নুটু দাদার হাতখানা তুলে ধরলেন। আন্দাজ করতে চাইলেন ক্ষীণ জীবনস্রোত তখনও বইছে কিনা। সহসা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠল রোগশয্যা। আবার,...আবার..., কী এক অলৌকিক কম্পন সমগ্র রোগীদেহে। মনে হচ্ছে, কোন অদৃশ্য হস্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে খাটখানাকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর স্তব্ধ সব। সব শেষ। আর্তনাদ করে স্বামীর বুকে আছড়ে পড়লেন কল্যাণী।

পায়ের 'পরে মুখ থুবড়ে পড়লেন যমুনা কাঁদতে কাঁদতে। জানালার গরাদে মাথা দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন ছোট ভাই। হায়! বিভূতিভূষণ তখন সকল কান্নার ওপারে।

রাত তখন সাড়ে আটটা। পনের কার্তিক, বুধবার, তের শ' সাতান্ন, ইংরাজি উনিশ শ' পঞ্চাশ, পয়লা নবেমবর। ধরণীর ধূলি থেকে ছাপ্পান্ন বছরের এক চলমান জীবনের চিরবিদায়।

ঘর থেকে ধীরে বেরিয়ে এলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। সংসারত্যাগী নির্লিপ্ত পুরুষ। মৃত্যুকে জানেন অমৃতলোকের সিংহতোরণ বলে। তবু তাঁকেও চোখের জল মুছতে হল গৈরিকবসনপ্রান্তে! প্রজ্ঞানন্দের কথা—না, দুঃখ নয়, এ অশ্রু আনন্দের। উন্নত আত্মার দেহবন্ধন ছিন্ন করার এই কম্পন তাঁর সুজ্ঞাত। তিনি জানতেন, উন্নততর আত্মার দেহান্তরকালে ওই ব্যাপার ঘটে থাকে। কিন্তু সচরাচর অমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য ঘটে না। এবার তা প্রত্যক্ষ করলেন। এমন আত্মার দেবযান-যাত্রায় তাঁর কানের কাছে নামগান করার পুণ্য অর্জিত হল। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের তাই এই

আনন্দাশ্রু।

সুবর্ণরেখার তটে, বিভূতিভূষণের প্রিয় সেই শিলাবেষ্টিত 'পঞ্চপাণ্ডব'-এ তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হল পরদিন দুপুরে। ভস্ম হল সব মর্ত্যবন্ধন। এক অবিনাশী আত্মার উত্তরণ হল পরম অমৃতলোকে।

বৃহস্পতিবার আকাশবাণী খবর ছড়িয়ে দিল দেশময়। সুবর্ণরেখার ছলছল জল, ঢেউ তোলে বুঝি দূর ইছামতীতেও। কান্না কেবল ঘাটশিলাতেই নয়, কান্না তখন কলকাতায়, বনগাঁয়, বারাকপুরে, বঙ্গময়।

কিন্তু কার জন্যে? পাঁচ নবেমবর আনন্দবাজার পত্রিকায় সজনীকান্ত দাস লিখলেন, 'অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এইরূপ হইবার কারণ সাধক বিভূতিভূষণের নিজের সৃষ্টি।' তিনি বললেন, 'বয়সের অসমতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ ও বিভূতিভূষণেব মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য আছে। তিনজনেই ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন।' সজনীকান্তর কথা, 'ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে নিগূঢ় নিরেট ও অন্ধ ব্যবধান কল্পনা করিয়া আমরা আতঙ্কিত হই, বিভূতিভূষণ দীর্ঘকালের সাধনায় অন্তরে অন্তরে তাহার অসারতা উপলব্ধি করিতে পাবিয়াছিলেন। মাঝখানের যবনিকা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া পরপারের রহস্য কিছু পরিমাণে উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভয় ছিল না।'

কিন্তু ভয় অন্যের। এলো তা আরও ভয়ঙ্কররূপে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার ক'দিনের মধ্যেই পাকুড় থেকে এক চিঠি এলো গৌরীকুঞ্জে। লিখছেন জনৈক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত পত্র, কিন্তু বক্তব্য স্পষ্ট—আরও বিপদ আসছে, অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করুন।

সদ্য স্বামী হারিয়েছেন কল্যাণী। এর চাইতেও বড় বিপদ কী ঘটতে পারে? কে ভয় দেখাচ্ছে এভাবে চিঠি দিয়ে? কই, বৈদ্যনাথ চ্যাটারজি বলে কেউ তো ও'দের পরিচিত নেই! চিঠিটা ঘাটশিলা পুলিশের হাতে দেওয়া হল, যদি কিনারা কিছু হয়। না. পুলিশ সূত্র পেল না চিঠির বা কোন রহস্যাবৃত বৈদ্যনাথের। নুটু ভরসা দিলেন. ভয় কি বউদি, আমি তো এখনও আছি।

মিথ্যা হল সে ভরসা। সর্বনাশ এলো। এলো ভয়ঙ্কর মূর্তি ধবে।

ঠিক সাতদিন পর, আট দিনের মাথায়, বুধবার। সুবর্ণরেখার তীরে পঞ্চপাণ্ডব শ্মশানের একটু দূরে সন্ধ্যাবেলা আবিষ্কৃত হল ডাঃ নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহ!

কী হয়েছিল কেউ জানে না। কেউ দেখেনি সেই ঘনায়মান সন্ধ্যায় সর্বনাশ কেমন করে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নিল কথক মহানন্দর সর্বশেষ সন্তানটিকে। শুধু পাওয়া গেল নুটুবিহারীর প্রাণহীন দেহের পাশে একটা কারবলিক অ্যাসিডের শিশি—শূন্য।

সাপের ভয়ে ওখানে প্রায় বাড়িতেই ওই জিনিসটি রাখা হত। বাবলুর হাত থেকে বাঁচাতে তার কাকাই ক'দিন আগে তা নিজের আলমারিতে তুলে রেখেছিলেন। সেই শিশিই আজ দেখা দিল কি মৃত্যুদূত হয়ে!

গৌরীকুঞ্জের আকাশ-বাতাস আজ বিষনিঃশ্বাসে ভরা। কল্যাণী-যমুনা দুই সদ্য-বিধবার দীর্ঘশ্বাসে থর থর করে কাঁপছে গৌরীকুঞ্জ। অসহ্য, দুরন্ত অসহ্য প্রহর কাটছে ঘাটশিলার। বাবলুকে বুকে আগলে কল্যাণী-যমুনা ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন, কোথায় যাবেন। আবার চিঠি এমন সময়, এবারও সেই পাকুড় থেকে। সেই রহস্যময় বৈদ্যনাথ চ্যাটারজির চিঠি—এখনও সরে পড়ুন, আরও বিপদ আসছে।

এবার পালাতেই হবে। পালাতে হবে বাবলুর জন্য। এই সেই বাবলু। কাজলের মধ্য দিয়ে অপু, বাবলুর মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ চেয়েছিলেন স্বীয় জীবনের নবীন উজ্জীবন। বাবলুকে বুকে চেপে ধরলেন কল্যাণী। পরদিনই ট্রেনে চাপলেন। ট্রেন ছুটে চলল কলকাতার দিকে।

কল্যাণীর কানে তখনও অনুরণিত হচ্ছে স্বামীর শেষ বাণী,—আমার দেবযান-এ বিশ্বাস রেখো কল্যাণী। আত্মা অবিনাশী। লোক থেকে লোকান্তরে তার চির অভিসার। কল্যাণী তা-ই বিশ্বাস করবেন। সঙ্গিনী হবেন সেই লোকোত্তর অভিসারে। এ তাঁর প্রার্থনা, এই তাঁর প্রত্যয়।

তিনি চোখ মেলেছিলেন মুরাতিপুরের আকাশে। তারপর বারাকপুর, পথ চলা শুরু। শেষ নেই সে-পথের। পথের কবির চলাব ছন্দ স্তব্ধ হতে পারে না পঞ্চপাণ্ডব মহাশ্মশানেই। 'চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদুসুম্ভু স্বয়ম্'—সত্য হোক জীবনে এই চলার বেগের অমৃত।

বারাকপুরের বনপথে শ্যামসুধার অন্বেষণে সে কিশোর আবার হয়ত আসবে। কঞ্চি হাতে লুকোচুরি খেলবে বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে। তার অঙ্গে ঝরবে আকন্দ আর সাঁইবাবলার রক্তিম রেণু, ঘেঁটু আর সোঁদালির সৌরভ। সে হারিয়ে যাবে বন-ধুঁদুলের আড়ালে, উলটি-বাঁচরা-বৈঁচি ঝোপের জটলায়। আবার একদিন বনশিম-তলার ঘাট দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইছামতীতে, স্রোতের সঙ্গে উধাও হবে। খেলা তার শেষ হবে না তবু। তারাশঙ্করের ভাষায়—'গ্রামের পথে চলবে বাঙালি অরণ্যে বিচরণ করবে বাঙালিসমাজের উত্তরপুরুষ, গ্রামদেবতা, অরণ্যদেবতার মধ্যে সাক্ষাৎ পাবে পথের পাঁচালীর গীতিকারের, আরণ্যকের রূপকারের। ইছামতীর কূলে কূলে, যুগে যুগে বিচরণশীল রইলেন বিভূতিভূষণ। ইছামতীতে স্নানার্থীরা, নৌকারোহীরা দেখতে পাবে —ইছামতীর স্রোত—মাটির বুক থেকে বাঙলার মানুষের মনের বুকে নামছে গঙ্গোত্রীর মত, বিভূতিভূষণ আগে চলেছেন শাঁখ বাজিয়ে ভগীরথের মত। জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরে দেখতে পাবে—পুলকবিগলিতচিত্ত একজন বসে আছেন, তিনি বিভূতিভূষণ! অন্ধকার রাত্রে অজস্র জোনাকিভরা কোন সাঁইবাবলার গাছ দেখে যে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবে, সে-ই দেখতে পাবে, সে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন বিভূতিভূষণ। কোন সৌভাগ্যবানের দৃষ্টিতে যদি দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বলে—সে দৃষ্টিতে যখনই তার চোখে পড়বে—বর্তমানকালের মধ্যেই অতীত বা ভবিষ্যৎকাল; চর্মচক্ষুর দৃষ্টি-গণ্ডির ধৃত স্থানকে অতিক্রম করে দূর-দূরান্তরে, লোকলোকান্তরের কোন স্থান; তারই চোখে পড়বে—সেই কালে এবং স্থানে বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর চোখ দুটি দিব্য-শিখায় প্রদীপের মত জ্বলছে।'

'আলোক সারথি' তিনি। তিনি পথের কবি। শেষ নেই তাঁর জীবনের, শেষ নেই চলার। 'অপরাজিত' লেখক বিভূতিভূষণেরই ঘোষণা—'সে জন্মজন্মান্তরের পথিক-আত্মা, দূর হইতে সুদূরে নিত্যনূতন পথহীন পথে তার গতি। এই বিপুল নীলাকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল আনড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বর্হির্ষদ পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ।'